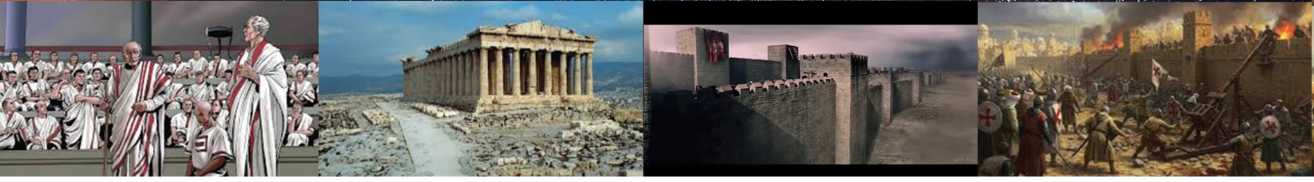


মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ-মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল

আব্দুল ওয়ারিথ বিন আবদ আল মুঘনী





সূচিপত্র



Sphinx of Giza



Leopon

বইটি লেখার পটভূমি

পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ এর নামে শুরু করছি। প্রথমেই বলে নেয়া উচিত, এই বইটি লিখার কোন নিয়ত আমার ছিল না। আমি সুরাতুল হিজর পড়ে কি বুঝলাম – তা নিজে পড়ার জন্য লিখে রাখতে চেয়েছিলাম – যাতে ৬মাস বা ১ বছর বছর পরে আমি এই লেখাগুলো পড়তে পারি এবং মনে করতে পারি যে, আমি সূরা হিযর পড়ার সময় কি কি চিন্তা আমার মনে এসেছিল বা আমি কি বুঝেছিলাম। কিন্তু সুরাতুল হিজরের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আমি কোরআন ও হাদিসে উল্লেখিত তথ্য অনুসন্ধান, ইতিহাস অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে এগিয়ে যেতে যেতে এবং ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ লিখতে লিখতে এই বইয়ের প্রায় অর্ধেক যখন লিখা হয়ে গেলো তখন আমার মনে হল যে, এই কথাগুলো অন্যদের জানানো দরকার, তখন আমি আমার লেখা পুরোপুরি শেষ হলে তা বই আকারে প্রকাশ করার নিয়ত করি। আমি সকল তথ্যগুলো একসাথে বের করে তারপর বইটি লিখিনি। কোরআন, হাদিসের উপর ভিত্তি করে অল্প একটু লিখে তারপর সেই হাদিস এবং ইতিহাসের তথ্য মিলিয়েছি। এভাবে অন্যান্য হাদিসের সাথে সম্পর্কিত তথ্য ও ইতিহাস খুজেছি। এভাবে ইতিহাসের তথ্যের উপর ভিত্তি করে আরও তথ্য খুঁজেছি এবং নিজেই অবাক হয়েছি যে, একটির পর একটি তথ্য ও ইতিহাস কিভাবে হাদিস অনুসারে মিলে যাচ্ছে ! দেখলাম যে, কোরআনে- হাদিসে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইশারা- ইঙ্গিত দেয়া আছে যা আপনাকে অনেক বড় তথ্য ও সিদ্ধান্তে উপনীত করবে। খুব ভালোভাবে খেয়াল না করলে এই ইশারা-ইঙ্গিতগুলো আপনার নজরে পড়বে না বা চিন্তা –ভাবনায় আসবে না।

বইটিতে উল্লেখিত সকল হাদিসের তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স দেয়া আছে। আপনি চাইলে, বইটিতে উল্লেখিত বিভিন্ন সম্রাট, বিজ্ঞানী, চুক্তি বা যুদ্ধের নাম দিয়ে বা এই বইয়ে উল্লেখিত সকল ইংলিশ নাম ও টার্মসগুলো সার্চ করে বইয়ে উল্লেখিত সকল তথ্য যাচাই-বাছাই করতে পারবেন। এভাবে বইয়ে উল্লেখিত সকল হাদিস এবং তথ্য ও ঘটনাকে নিরীক্ষণ ও যাচাইযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

একজন গবেষকের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে, সে গবেষণা করে যে তথ্য পাবে তা পরিপূর্ণভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ করা। আমি এই বইয়ে সেটাই করতে চেষ্টা করেছি। গবেষণা করে বইটি লিখার আগ পর্যন্ত আমি নিজেও এই বইয়ে উল্লেখিত তথ্য সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। ইয়াজুজ-মাজুজ কারা, জুলকারনাইন কে ছিলেন, জুলকারনাইনের প্রাচীর কোনটি, দাজ্জাল কে বা কারা, দাজ্জাল কবে আবির্ভূত হয়েছে, ইত্যাদি বিষয়ে অন্য সবার মতই আমিও বিভিন্ন কল্প কাহিনী শুনতাম। বইটি লিখতে গিয়ে ইয়াজুজ-মাজুজ, দাজ্জাল সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য পেয়েছি যা আগে কোন দিন কল্পনাও করিনি। আশা করি, এই বইটি কোরআন ও হাদিসের বইয়ের পর আপনার জীবনে পড়া অন্যতম সেরা একটি বই হবে।

বইটির প্রতিটি টপিক বা বিষয় একটি অপরটির সাথে এত গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত যে পাঠক মাঝখান থেকে পড়লে বইটির কিছুই না বুঝার সম্ভাবনা আছে। এমন কি পাঠক একটি পৃষ্ঠা না পড়ে এগিয়ে গেলে পরে হয়তো তিনি আর কিছুই বুঝতে পারবেন না। আমি অনুরোধ করব, বইটির প্রথম ৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বুঝতে একটু কষ্ট হলেও বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা পড়বেন এবং ভালোভাবে বুঝার জন্য দুইবার পড়বেন। অনুগ্রহ করে বইটি সম্পূর্ণ না পড়ে বইটি নিয়ে কোন মতামত দেয়া থেকে বিরত থাকবেন। সম্পূর্ণ বইটি না পড়লে আপনি বইটিতে দেয়া তথ্যগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বা মিল খুঁজে পাবেন না ফলে বইটি বুঝতে পারবেন না।

এই বইটির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যেন কোরআন নিয়ে, হাদিস নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। কোরআনকে যেন না বুঝে শুধু তিলাওয়াতের বই হিসেবে রেখে দেয়া না হয়। আমার চিন্তাভাবনাগুলো যেন অন্য মানুষকে আরও সঠিক এবং বিস্তারিত জ্ঞানের দিকে ধাবিত করে। এই বইটি পড়লে আশা করি, ইয়াজুজ-মাজুজ কারা? ইয়াজুজ-মাজুজ কবে মুক্তি পেয়েছে? জুলকারনাইনের প্রাচীর কোনটি? জুলকারনাইন কে ছিলেন? কবে জুলকারনাইনের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে? দাজ্জাল কি? দাজ্জাল কে বা কারা? দাজ্জালের মতাদর্শ কি? দাজ্জাল কবে আবির্ভূত হয়েছে? ইমাম মাহদির আগমন, ইসা আঃ এর আগমন সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা আপনার হবে। এই বইয়ে সঠিক যা কিছু আছে তা নিঃসন্দেহে আল্লাহ এর তরফ থেকে এসেছে আর ভুল ও মন্দ বিষয়গুলো আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহ আমার ভুলত্রুটি ক্ষমা করুক। আমার আলোচনার বিষয়গুলোতে, আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন। যত বড় আলেম-ই হোক না কেন, কারো কথা বা ব্যাখ্যা চিন্তাভাবনা না করে অন্ধের মত বিশ্বাস করবেন না। এই বইয়ের ব্যাখ্যা – বিশ্লেসনগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তারপর গ্রহন করবেন বা বর্জন করবেন।

যেভাবে বইটি লেখার নিয়ত ছাড়াই সুরাতুল হিজরের ব্যাখ্যা লেখা থেকে আমার বই লেখা শুরু হয়েছিল, সেভাবেই বইটি প্রকাশ করলাম।

*** যে কেউ এই বইটিকে সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখে প্রকাশ করতে পারবেন। বইটি ইন্টারনেটে যে কেউ পিডিএফ (PDF) আকারে যে কোন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে পারবেন।

*** বইটি সম্পূর্ণ কপিরাইট মুক্ত (copyright free / Public Domain / Public property) I কিন্তু বইটি থেকে প্রাপ্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ যদি কেউ তার বইয়ে বা অন্য কোথাও ব্যাবহার করেন তাহলে অবশ্যই রেফারেন্সে তথ্যটি যে এই বই থেকে পেয়েছেন তা উল্লেখ করবেন। অর্থাৎ রেফারেন্সে বইটির নাম, লেখকের নাম এবং পৃষ্ঠা নাম্বার উল্লেখ করবেন।

*** যে কেউ চাইলে, বইটিকে ইংলিশে অনুবাদ করে যে কোন ওয়েবসাইটে আপলোড করতে পারবেন। যেমনঃ kdp.amazon.com বা https:/archive.org ইত্যাদি।

অনুগ্রহ করে বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বেন, মাঝখান থেকে পড়লে কোন কিছুই না বুঝার বা ভুল বুঝার সম্ভাবনা প্রবল। অনুগ্রহ করে, সম্পূর্ণ বইটি না পড়ে বইটি সম্পর্কে কোন মতামত দেয়া থেকে বিরত থাকবেন।

সুরাতুল হিজর পড়ে যা বুঝলাম

১) আলিফ-লাম-র, এগুলো কিতাবের এবং সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াতসমূহ।

কোরআনের এই রকম অনেক আয়াত আছে যেমনঃ সূরা বাকারার প্রথম আয়াত। আলিফ লাম মিম। এই ধরণের আয়াত সাধারণত সূরার প্রথমে থাকে যার অর্থ সরাসরি আমরা বুঝতে পারি না। আয়াত শব্দের অর্থ প্রমাণ/ evidence. কোরআনের আয়াতগুলো প্রতিটি হচ্ছে এক একটি প্রমাণ যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই; আনুগত্য পাবার অধিকার একমাত্র আল্লাহ এর। এগুলো হচ্ছে কোরআনের আয়াত যা সকল কিছুকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে। আমার মনে হয়, এই ধরণের আয়াতগুলো পাঠকারীকে আগেই সতর্ক করে দেয় বা বলে দেয় যে – এই সুরায় রূপক অর্থপূর্ণ আয়াত রয়েছে –তাই পাঠক যেন সেইভাবে চিন্তাভাবনা করে।

২) যারা কুফরী করেছে, তারা একসময় কামনা করবে যদি তারা মুসলিম হত!

দ্রুতই এমন একটি সময় আসবে যখন অবিশ্বাসীরা আক্ষেপ করে বলবে যে, তারা যদি আগেই মুসলিম হত।

এই সময়টা দুনিয়াতে ও হতে পারে আখিরাতেও হতে পারে যখন তারা এই আক্ষেপ করবে।

৩) ছেড়ে দাও ওদেরকে, ওরা খেতে থাক আর ভোগ করতে থাক, আর আশা ওদেরকে উদাসীনতায় ডুবিয়ে রাখুক, শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে।

তাদেরকে খেতে দাও এবং আনন্দ করতে দাও এবং (দুনিয়াবি বিভিন্ন) আশায় বিভ্রান্ত থাকতে দাও, এজন্য যে তারা দ্রুতই জানতে পারবে।

অবিশ্বাসী লোকেরা খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা দুনিয়ায় আনন্দ উপকরণ জমা করণে এবং বিভিন্ন দুনিয়াবী সফলতা অর্জনে লিপ্ত থাকে। যেমনঃ কিভাবে রান্না করলে মজা হবে, কোন কোন মজাদার খাবার ইফতারিতে খেতে হবে; জীবনের ক্ষেত্রে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে বা সরকারি কর্মকর্তা, প্রচুর টাকা উপার্জন করতে হবে। দুনিয়ায় সফলতার বিভিন্ন মাইলফলকে তারা লক্ষ্য স্থির করে তারপর আশা করতে থাকে যে, এই মাইলফলক অর্জন করলে তার জীবনটা কত সহজ হবে, কত আরাম আয়েশে কাটবে। যেমনঃ সরকারি চাকরি পেলে সুন্দরী বৌ হবে, একটা মোটামুটি নিশ্চিত জীবিকার ব্যবস্থা হবে, সমাজে সম্মান পাওয়া যাবে, ইত্যাদি। এই সবে ব্যস্ত থেকে তারা কোরাআনে আল্লাহ এর দেয়া আয়াত/প্রমানসমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় পায় না। এই দিকে তাদের কোন মনযোগ-ই থাকে না। তারা দীনের/ ধর্মীয় বিষয়গুলো "আলেমদের" উপর ছেড়ে দিয়ে নিজেরা খাওয়া- খাদ্যে লিপ্ত থাকে আর আশায় থাকে। তাদেরকে এই অবস্থায়-ই ছেড়ে দিতে আল্লাহ বলছেন; তিনি আরও বলছেন যে, তারা দ্রুতই জানতে পারবে। এখন আমরা দেখতে পাবো, তারা কি জানতে পারবে।

৪) আমি কোন জনপদকে তার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ধ্বংস করিনি। আমি এমন কোন শহরকে ধ্বংস করিনি যাকে ধ্বংস করার জন্য পূর্ব থেকেই একটা সময় নির্ধারণ করে রাখিনি। অর্থাৎ যারা দুনিয়ার বিভিন্ন আশায় আছে, খাওয়া-দাওয়ায়, আনন্দে ব্যস্ত আছে তারা জানতে পারবে তাদেরকে আল্লাহ কখন ধ্বংস করবেন। তোমরা খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ- ফুর্তি ও দুনিয়ায় বিভিন্ন মাইলফলক অর্জনের আশায় বা আরাম – আয়েশ, সুখ -স্বাচ্ছন্দ্য পাবার আশা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে থাকো যতক্ষণ না তোমাদের জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার পূর্বনির্ধারিত সময়টি চলে না আসছে।

৫) কোন জাতি তার ধ্বংসের নির্দিষ্ট কালকে ত্বরান্বিত করতে পারেনা এবং বিলম্বিতও করতে পারেনা।

কোন জনগোষ্ঠী তাদের ধ্বংসের সময়টি এগিয়ে আনতে পারবে না অথবা পিছিয়েও দিতে পারবে না।

অর্থাৎ যত উন্নত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা একটি জনগোষ্ঠী নিক না কেন একটি জনগোষ্ঠী তাদের ধ্বংসের সময়টি কোনভাবেই আগাতে বা পিছাতে পারবে না। এই সময় আল্লাহ পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস বা ভুমিকম্প সহনশীল বাড়ি /কাঠামো নির্মাণ করে ধ্বংসের এই সময় পরিবর্তনের কোন উপায় নেই। আল্লাহ এর পূর্ব নির্ধারিত ধ্বংসের সময় যখন এসে পড়বে তখন সেই জনগোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যাবে।

৬) তারা বলেঃ ওহে, যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমিতো নিশ্চয়ই উম্মাদ!

এই আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, আল্লাহ এর রসূল মুহাম্মাদকে (সাঃ) কাফিররা কি ধরণের বাজে কথা বলে কষ্ট দিয়েছিল। আল্লাহ এর রসুলকে (সাঃ) নিয়ে বর্তমান বিশ্বেও বিভিন্ন দেশে (বাংলাদেশ সহ) অনেকে না না ধরণের বাজে কথা বলছে। এই রকম অবস্থায় আল্লাহ কি করেন তা আমরা পরবর্তী আয়াতগুলোকে দেখব।

৭) তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট ফেরেশতাদের হাজির করছ না কেন?'

এখানে অবিশ্বাসীরা আল্লাহ এর রসুলকে (সাঃ) ফেরেশতা নিয়ে এসে নিজেকে সত্য প্রমাণ করার জন্য দাবী/ চ্যালেঞ্জ করেছে। তাদের চ্যালেঞ্জের জবাব আল্লাহ কিভাবে দেন সেটা আমরা পরের আয়াতে দেখব।

৮) যথাযথ কারণ ছাড়া আমি ফেরেশতা পাঠাই না, পাঠালে কাফিরদেরকে আর কোন অবকাশ দেয়া হবে না। আমি ফেরেশতা পাঠালে শুধু সত্য সহই পাঠাই, এবং তখন তাদেরকে কোন সুযোগ দেয়া হবে না।আল্লাহ অবিশ্বাসীদের চ্যালেঞ্জ শুধু গ্রহন-ই করেন নি বরং তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ফেরেশতা পাঠানোর অর্থ হচ্ছে তোমাদের ঈমান আনার সময় শেষ, সুযোগ শেষ।

আল্লাহ ফেরেশতা পাঠানোর অর্থ হচ্ছে অপরাধীদের ধ্বংসের সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে এবং তা প্রকাশও করে দেয়া হয়েছে। ঐ শাস্তি ঐ নির্দিষ্ট সময়ে তাদের উপর পড়বে- এর কোন ব্যতিক্রম হবে না। এই কথাটা আল্লাহ আগেই বলেছেন যে, প্রতিটি জনগোষ্ঠীকে ধ্বংসের সময় আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন, ফেরেশতাদের সত্য সহ পাঠিয়ে আল্লাহ শুধু সেই সত্যটিকেই প্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ এই কথা বলেননি যে, আল্লাহ ফেরেশতাদের শাস্তি দেয়ার জন্য পাঠান। আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ ফেরেশতা পাঠালে সত্য সহ পাঠান আর

সেই সত্যের ভিতরে অপরাধীদের শাস্তির এবং বিশ্বাসীদের বিজয়ের কথাটিও থাকে ফলে আল্লাহ এর শাস্তি অপরাধীদের উপর পড়ে এবং বিশ্বাসীদের বিজয় হয়।

আল্লাহ জিবরাইলকে সত্য সহ অর্থাৎ কোরআনসহ পাঠিয়েছেন। এই কোরআন অর্থাৎ সত্য পাঠানোর অর্থই হচ্ছে অপরাধীদের সময় শেষ, তাদের ধ্বংসের সময় চলে এসেছে। কোরআনে বলা আছে অপরাধীদের কখন, কোথায়, কিভাবে আল্লাহ শাস্তি দিবেন –আর আল্লাহ যা বলেছেন তার ব্যতিক্রম কিছুই হবে না। তাদেরকে আর কোন সময় বা সুযোগ দেয়া হবে না। সুতরাং আল্লাহ যখন ফেরেশতা পাঠান তখন কেবল সত্য সহই পাঠান আর এই সত্যের ভিতরে অন্যায়কারীদের জন্য শাস্তিও থাকে যেটা আমরা এই সুরায় দেখব। অপরাধীদের পরাজয় এবং শাস্তি যে অবধারিত হয়ে গেছে কোরআন নাযিল করেই আল্লাহ

এটা নিশ্চিত করেছেন। সত্য (কোরআন) যখন চলে এসেছে তখন সত্যই (কোরআন-ই) অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করবে, তাদের সুযোগ শেষ।

৯) নিশ্চয় আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমি তার সংরক্ষক।

এই সূরার প্রেক্ষাপটে বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ ফেরেশতা পাঠালে তাকে/ তাদেরকে যে সত্য সহ পাঠান তা এই আয়াতে পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিলেন। কোরআনে বলা আছে কখন, কোন জাতিকে ধ্বংস করা হবে, এর নির্দিষ্ট সময় আমরা বুঝতে না পারলেও আমরা বুঝতে পারি একটি সমাজ, জনগোষ্ঠী কোন কোন কাজ করলে, অন্যায়ের কোন পর্যায়ে পৌঁছালে আল্লাহ সেই জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেন। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ যে বলেছেন, তাদেরকে আর সময়, সুযোগ দেয়া হবে না – সত্য কোরআন সহ জিবরাইলকে পাঠিয়ে আল্লাহ এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। কোরআনে থাকা শাস্তির আয়াতগুলোই কোরআনে উল্লেখ করা সময়ে অপরাধীদের, সীমা লঙ্ঘনকারীদের ধ্বংস করবে। এর কোন ব্যতিক্রম হবে না কারণ আল্লাহ নিজেই কোরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন।

আল্লাহ নিজে কোরআনে কোন পরিবর্তন আনবেন না এবং অন্য কাউকে পরিবর্তন করতে দিবেন না। এই কথাটিই আল্লাহ এখানে বলেছেন যে, আল্লাহ নিজেই কোরআনের সংরক্ষণকারী।

১০) তোমার পূর্ববর্তী জাতিগুলোর কাছেও আমি রসূল পাঠিয়েছিলাম।

১১) তাদের কাছে এমন কোন রসূল আসেনি যাকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি।

অর্থাৎ অতীতে আল্লাহ যতগুলো জাতির কাছেই রসূল (দূত) প্রেরন করেছেন তাদের সবাইকে মানুষ অপমান করেছে; তাদের নিয়ে বাজে কথা বলেছে। এখান থেকে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট যে, যারাই ইসলাম প্রচার করবে তাদেরকেই লোকেরা এই ধরণের বাজে কথা বলবে। তখন সেই সব জাতির সাথে আল্লাহ যে আচরণ করেছেন মুহাম্মাদ (সাঃ) কে নিয়ে যারা বাজে কথা বলছে, ঠাট্টা -বিদ্রুপ করছে এবং উনার অনুসারীদের মধ্যে যারা ইসলাম প্রচার করছে তাদেরকে নিয়ে যারা ঠাট্টা –বিদ্রুপ করছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সেই ব্যবস্থাই নিবেন, যে ব্যবস্থা আল্লাহ পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে এই সব লোকদের ব্যাপারে নিয়েছিলেন।

১২) এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে তা সঞ্চার করি।

এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে এটি ঢুকিয়ে দেই।

আল্লাহ অপরাধীদের অন্তরে/ হার্টে কিছু একটা ঢুকিয়ে দেন। আল্লাহ অপরাধীদের অন্তরে/ হার্টে কি ঢুকিয়ে দেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পরবর্তী আয়াতগুলোতে পাবো।

১৩) তারা এর প্রতি ঈমান আনবে না যদিও অতীতে তাদের (মত লোকদের) উদাহরণ রয়েছে।

কার প্রতি ঈমান আনবে না? অতীতে কি উদাহরণ রয়েছে – দেখা যাক পরবর্তী আয়াতগুলোতে আমি এই প্রশ্নের উত্তর পাই কি না?

১৪) এবং যদিও তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়, আর তারা তাতে উপরে উঠতে থাকে,
১৫) তারপরও তারা বলবে, 'আমাদের চোখকে ধাধিয়ে দেয়া হয়েছে! নিশ্চয়ই আমাদের উপর যাদু করা হয়েছে।'

আল্লাহ বলছেন, ফেরেশতা পাঠানো নয় বরং তার চেয়ে আরও বড় প্রমাণ যেমন আকাশের দরজা খুলে দিয়ে তাদেরকে উপরে উঠতে দিলেও তারা ঈমান আনবে না। এর প্রমাণ তো আমরা নিজেরাই; আমরা আমাদের জীবনে কতবার বিপদে পড়ে আল্লাহ এর কাছে ওয়াদা করি যে, এইবার যদি আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেন বা আমি যা চাচ্ছি তা যদি দিয়ে দেন তাহলে আর কখনো আল্লাহ এর হুকুম অমান্য করবো না। কিন্তু আমরা কি কথা রাখি?

১৬) এবং আমি আকাশে বিরাট তারা স্থাপন করেছি এবং যারা দেখবে তাদের জন্য সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি।

যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে আল্লাহ এই আয়াতে প্রমাণ দিয়েছেন যে তিনিই একমাত্র ইলাহ এবং কোরআন সত্য কিতাব।

১৭) আর প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়ত্বান থেকে এটিকে সুরক্ষিত করে দিয়েছি।

আল্লাহ নিজের ক্ষমতা ও শক্তি এখানে প্রদর্শন করেছেন।

১৮) সে ছাড়া যে গোপনে কথা শোনে এবং তার পিছনে জলন্ত শিখা ছোটে।

সূরা জীনে আল্লাহ এই আয়াতের সাথে সম্পর্কিত কিছু তথ্য আমাদেরকে দিয়েছেন।

আর আমরা (জীনেরা) আকাশের খবর নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমরা সেটাকে পেলাম কঠোর প্রহরী বেষ্টিত ও জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডে পরিপূর্ণ। (৮) আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে গোপনে খবর শোনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডের সম্মুখীন হয়। (৯) (সূরা জীন ৮-৯)

বিভিন্ন জাদুকররা যে মানুষের বা বস্তুর অতীত এবং ভবিষ্যৎ বলতে পারার দাবী করে তারা এই সব জীনদের সাথে যোগাযোগ করে। আর জীনেরা মহাকাশ থেকে এই সব তথ্য/জ্ঞান সংগ্রহ করত। তাদের কিছু তথ্য ভুল হয় আবার কিছু সঠিক হয়।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে নবী (সাঃ) বললেন, "তারা কিছুই বলে না।" তারা বলল, "হে আল্লাহর রাসূল, কখনও কখনও তারা এমন কথা বলে যা সত্য হয়ে যায়।" নবী (সাঃ) বললেন, "এগুলো জিনদের দ্বারা ছিনিয়ে নেওয়া কথা, যারা তাদের বন্ধুদের কানে ফিসফিসিয়ে বলে, এবং এতে একশোরও বেশি মিথ্যা মিশ্রিত থাকে।" (সূত্র: সহীহ আল-বুখারী ৬২১৩, সহীহ মুসলিম ২২২৮)

অর্থাৎ পৃথিবীর বাহিরে মহাকাশ থেকে জ্ঞান অর্জন করলে এমন কিছু জ্ঞান অর্জনের সুযোগ আছে যা তখনকার সাধারণ মানুষের কাছে জাদু বলে পরিচিত ছিল। আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে কেউ যদি বলতঃ আজকে বেলা ১১ টায় সমুদ্রে জোয়ার আসবে এবং বিকাল ৫ টার দিকে ভাটা আসবে তাহলে মানুষ অবাক হত; আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে কেউ যদি বলত ঘূর্ণিঝড় আজ থেকে ২ দিন পর সন্দীপ-হাতিয়ায় আঘাত হানবে, তাহলে মানুষ তাকে ভবিষ্যৎ বলতে পারা লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করত, আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে যদি কেউ বলতে পারত যে, ২ দিন পর বৃষ্টি হবে তাহলে তাকে মানুষ ভবিষ্যৎ বলতে পারা যাদুকর হিসেবে স্বীকৃতি দিত। এই সব-ই জাদুর ভিতরে অন্তর্ভুক্ত হত।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) বলেছেন, যে যত বেশি জ্যোতির্বিদ্যা (মহাকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান) অর্জন করল সে আসলে তত বেশি জাদু বিদ্যাই অর্জন করল। [বিশুদ্ধ হাদিস] - [আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও আহমদ কর্তৃক বর্ণিত] - [সুনান আবু দাউদ - ৩৯০৫]

এখন জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশ্বাসীরা বলবেন, জ্যোতির্বিদ্যা (Astrology) আর জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomoy) এক জিনিস নয়।

আমরা এখন জ্যোতির্বিদ্যাতে (Astrology) বিশ্বাস করি না, আমরা বিশ্বাস করি জ্যোতির্বিজ্ঞানে (Astronomoy)। আপনাকে বুঝতে হবে, নবীর (সাঃ) সময়ে, ১৪০০ বছর আগে, জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে কিছু ছিল না, তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানকেই জ্যোতির্বিদ্যা বলা হত। তখন মহাকাশ সংক্রান্ত সকল জ্ঞানের একটি নামই ছিল - তা হল জ্যোতির্বিদ্যা (Astrology) ***।

*** (রেফারেন্সঃ Dooley, Brendan (June 2021). তাদের গবেষণামূলক বই "From astrology to astronomy: renaissance and early modern perspectives" এ. Berliner Theologische Zeitschrift. 38 (1). Walter de Gruyter GmbH: 156–175. doi:10.1515/bthz-2021-0010. লিখেছেন যে, “From ancient times through the seventeenth century European astronomy and astrology remained two sides of the same coin”) অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান আলাদা কোন বিষয় ছিল না। উভয়টি মিলে একটি বিষয়ই ছিল। অর্থাৎ, যে জ্ঞানকে আজকে জ্যোতির্বিজ্ঞান বলা হচ্ছে ৪০০ বছর আগেও তাকে জ্যোতির্বিদ্যাই বলা হত।)

আজকে যেভাবে বলা হয় সূর্য, চাদের, পৃথিবীর গতি ও অবস্থানের পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা হয়; আজকে যেভাবে বলা হয়, মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে বর্ষাকালে বেশি বৃষ্টি হয়, নবী সাঃ এর সময়ে আরবের লোকেরাও একই ধরণের কথা বলতেন।

যায়েদ বিন খালিদ (রাঃ) বলেন: রাতে বৃষ্টির পর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হুদাইবিয়ায় ফজরের নামাজ পড়ালেন। নামাজ শেষে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরা কি জানো তোমাদের রব কী বলেছেন?" তারা উত্তর দিল: "আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন।" এ কথা শুনে তিনি (সাঃ) বললেন, "তিনি (আল্লাহ) বলেছেন: 'আমার কিছু বান্দা আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং কিছু কাফের হিসেবে সকাল করেছে। যে বলে: আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার উপর ঈমান আনে এবং তারাদের উপর অবিশ্বাস করে; আর যে বলে: অমুক তারার উদয়ের কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার উপর অবিশ্বাস করে এবং তারাদের উপর তার বিশ্বাস স্থাপন করে।" (রিয়াদুস সালেহিন ১৭৩১, বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা, সুনান আবু দাউদ বই: ২৯, হাদিস ৩৮৯৭, ইমাম মালিক এবং আন-নাসাঈ দ্বারাও বর্ণিত ; চল্লিশটি হাদিসে কুদসী)
(*) ইসলাম-পূর্ব আরবরা বিশ্বাস করত যে তারার অবস্থানের পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাত হয়।

তারা বা নক্ষত্রের অবস্থান পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টি হওয়ায় বিশ্বাস করা আর চাদের, সূর্যের অবস্থান পরিবর্তনের কারণে জোয়ার-ভাটা হওয়ায় বিশ্বাস করা একই কথা, তেমনিভাবে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টিপাত হয় – এই কথা বিশ্বাস করা বা বলা একই কথা।

বর্তমানে আবহাওয়া সংক্রান্ত অনেক ভবিষ্যৎবানী বিজ্ঞানীরা করছে এটমোসফিয়ার সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের মধ্যে দিয়ে, মেটিওরলোজি (meteorology) সংক্রান্ত জ্ঞান ব্যাবহারের মাধ্যমে এবং Weather Satellite/ meteorological satellite ব্যাবহারের মাধ্যমে।

বর্তমানে meteorological Science ব্যাবহার করে বলা হয়, পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদ ও সূর্যের অবস্থানের পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রের জোয়ার ভাটা হয়। জোয়ারের উচ্চতা কম-বেশি হয়, এমন কি জোয়ারের উচ্চতা কত মিটার হবে-তাও পূর্ব থেকেই বলে দেয়া হয়; ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রেও বলা হয় যে জোয়ারের উচ্চতা কত ফুট হবে? কিন্তু আমরা এগুলোকে যাদুকরের ভবিষ্যৎবানী হিসেবে আখ্যায়িত করছি না কারণ এই ভবিষ্যৎবানী করার পিছনের জ্ঞান আমরা জানি। একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝা যাকঃ ধরুন, আপনার ঘড়িটি হাতে নিয়ে কেউ বলে দিল যে, আপনি কবে, কোথা থেকে, কত টাকা দিয়ে এই ঘড়িটি কিনেছেন – আপনি এতে অবাক হবেন এবং এই ঘটনাকে যাদু হিসেবে আখ্যায়িত করবেন কারণ এই ঘটনার পিছনে যে জ্ঞান আছে তা আপনার অজানা। এখন কেউ যদি আপনাকে বলে দেয় যে, আপনি যেই দোকান থেকে ঘড়িটি কিনেছেন সেই দোকানের CCTV footage দেখে এই তথ্য যাদুকর পেয়েছে তাহলে আপনি বলবেন – "এটা তো কোন যাদু নয়" – কারণ আপনার ঘড়ি সম্পর্কে যাদুকর (বিজ্ঞানী বা টেকনোলজির ব্যবহারকারী) তথ্য কিভাবে পেয়েছে সেটা আপনি

জানেন – এজন্য এখন এই ব্যাপারটিকে আপনি আর যাদু হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না! যাদু একটি জ্ঞান, বিজ্ঞান ও একটি জ্ঞান। কোরআন একটি জ্ঞান যা আল্লাহ এর কাছ থেকে এসেছে যা আমাদের কাছে অন্য সকল জ্ঞানের স্বরূপ উম্মোচন করে।

যাদু কি? কোনো কাজের মধ্যে কি কি লক্ষণ থাকলে তা যাদু হিসেবে বিবেচিত হবে?

যাদুর মূল বিষয় হচ্ছে, যাদুকর আল্লাহ এর নবীকে বা আল্লাহ এর আয়াতকে ভুল প্রমাণ করতে চায় বা আল্লাহ এর আয়াতের সাথে প্রতিযোগিতা করতে চায় বা আল্লাহ এর যে গুণাবলী আছে তার সাথে প্রতিযোগিতায় নামে। কোনো কিছু কখন যাদুবিদ্যা বলে বিবেচিত হবে এবং যাদুবিদ্যার উদ্দেশ্য কি - তা কোরআনের আয়াত পড়লে বুঝা যায়ঃ

“ফির’আউন বলল, ‘যদি তুমি কোনো নিদর্শন এনে থাক, তবে তুমি সত্যবাদী হলে তা পেশ কর।’(১০৬) তখন মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং সহসাই ওটা এক জীবিত অজগরে পরিণত হল। (১০৭) আর সে তার হাত (বগল থেকে) টেনে বের করল, তখন তা দর্শকদের দৃষ্টিতে সাদা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। (১০৮) ফির’আউন সম্প্রদায়ের নেতারা বলল, ‘এ তো একজন সুদক্ষ জাদুকর।(১০৯) ’সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করতে চায়, এখন তোমাদের পরামর্শ কি?’ (১১০) তারা বলল, ‘তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দাও, আর নগরে নগরে সংগ্রাহক পাঠিয়ে দাও’।(১১১) তারা তোমার কাছে সব বড় বড় যাদুকরকে নিয়ে আসবে।(১১২) যাদুকররা ফিরআউনের নিকট এসে বলল, আমরা যদি বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্য পুরস্কার আছে তো?(১১৩) সে বলল, হ্যাঁ এবং তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’ (১১৪) তারা বলল, ‘হে মূসা! তুমিই কি (প্রথমে যাদু) ছুঁড়বে, না আমরাই ছুঁড়ব?’ (১১৫) সে বলল, ‘তোমরাই ছুঁড়’। যখন তারা বান ছুঁড়ল তখন লোকজনের চোখ যাদুগ্রস্ত হয়ে গেল, তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা বড়ই সাংঘাতিক এক যাদু দেখাল। (১১৬) আমি মূসার কাছে ওহী করলাম, ‘তোমার লাঠি ছুঁড়ে দাও’। তখন তা তাদের অলীক বস্তুগুলোকে গ্রাস করতে শুরু করল। (১১৭) প্রকৃত সত্য প্রকাশ হয়ে গেল, তারা যা সাজিয়েছিল তা নিস্ফল হয়ে গেল।” (১১৮) (সূরা আল আ’রাফঃ১০৬-১১৮)

সূরা আল আ’রাফের এই আয়াতগুলি থেকে বুঝতে পারলাম যে, জাদুকরদের যাদু আল্লাহ এর আয়াতকে এবং তার রসূলকে মিথ্যা প্রমাণে প্রতিযোগিতা করে। এখান থেকে আমরা আরও বুঝতে পারলাম যে, ফেরায়ুনসহ অন্য রাজা-বাদশারা যাদুকে খারাপ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করত না। তারা যাদুকে একটি জ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করত যার মাধ্যমে তারা ভবিষ্যৎ জানতে চাইত; যেমনঃ আগামী বছর ফসল কেমন হবে? বন্যা হবে কি না? কোন যুদ্ধে গেলে জয়ী হওয়া যাবে? ইত্যাদি বিষয় তারা যাদুকরদের কাছ থেকে জানতে চাইত। তখনকার সময়ে, রাজা-বাদশাদের কাছে যাদুর অনেক কদর ছিল।

বর্তমানে আমরা বিজ্ঞান বলতে আমরা যা জানি তা আসলে হচ্ছে যাদুর একটি শাখা। যাদুকররা নতুন একটি মতাদর্শ নিয়ে এসেছে যে, যাদু এবং আল্লাহ এর আয়াতকে সমান হিসেবে তারা মানুষের কাছে তুলে ধরছে এবং আল্লাহ এর আয়াত এবং যাদু (বিজ্ঞান) উভয়টিতেই বিশ্বাস স্থাপন করতে প্রচার করছে।

আল্লাহ বলেন, "আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে" । (সূরা আল- কামারঃ ৪৯)

জাদুকর/বিজ্ঞানিরা এই পরিমাপটি জানতে চায়। কারণ এই পরিমাপটি জানতে পারলে তারা আল্লাহ এর সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তন করতে পারবে বা আল্লাহ এর সৃষ্টির মত কিছু তৈরি করেছে বলে দাবী করতে পারবে। মাটি, ফসল, গবাদি পশু, হাস –মুরগী- মানুষ, মহাকাশ, তারা, সূর্য, চাঁদ, ইত্যাদি সবাইকেই আল্লাহ একটা নির্দিষ্ট পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন; বিজ্ঞানীরা মাটি, ফসলের উপর গবেষণা করে এদের জৈবিক ক্রিয়ার মেকানিজম (mechanism) বের করেছে। হাস-মুরগি, গরু, ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করেছে আর তাদের মাংস, দুধ, ডিম হবার মেকানিজম জেনেছে তারপর এদেরকে নিয়ে আরও পরীক্ষা করে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে বেশি দুধ, মাংস দেয়া গরু- গাভী, হাস, মুরগীর জাতের আবিষ্কার করার দাবী তারা করছে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আজকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বা বিজ্ঞানীরা অনেক কিছু বলছে যা কোরআনের সাথে মিলে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে অনেক 'আলেম' মুসলিম ও অমুসলিমদের দাওয়াত দিচ্ছেন যে, "দেখো, কোরআন সত্য না হলে ১৪০০ বছর আগে কোরআনে এই বিষয়গুলোর তথ্য সঠিকভাবে কিভাবে আসল?" এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই বিষয়গুলো কিভাবে জানল? এটাই তো সমস্যা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছে যে, আল্লাহ যে গায়েবের কথা তোমাদেরকে জানিয়েছেন সেটা আমরা কোরআন ও আল্লাহ এর প্রেরিত রসূলগণ ছাড়াও অন্য জায়গা থেকে জানতে পারি – আর এটাই হচ্ছে যাদুর উদ্দেশ্য – কোরআনকে চ্যালেঞ্জ করা। যাদুর কাজ হচ্ছে আল্লাহ এর আয়াতকে মিথ্যা প্রমাণ করা কিন্তু যাদুকররা সেটা করতে অতীতে ব্যর্থ হয়ে এখন অন্যভাবে কোরআনকে চ্যালেঞ্জ করছে। এখন যাদুকররা আল্লাহ এর আয়াতের সাথে অন্যভাবে প্রতিযোগিতা করছে। আজকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বা বিজ্ঞানীরা পরোক্ষভাবে বলছে যে, দেখো মুসলিমরা, আমরা যা বলছি তা তোমাদের কোরআনের সাথে মিলে যাচ্ছে সুতরাং তোমরা আমাদের উপর ঈমান আনো, আমাদেরকে বিশ্বাস করো যে রূপভাবে তোমরা কোরআনের উপর ঈমান এনেছ। এটা হচ্ছে ইয়াজুজ-মাজুজ ও শয়তানের একটি ফাঁদ। যা দিয়ে সে মুসলিমদের ঈমান নষ্ট করে দিচ্ছে। বিজ্ঞানের ভিত্তিতে আপনি যদি কোরআনকে যাচাই করেন এবং তার (বিজ্ঞানের) উপর ভিত্তি করে ঈমান আনেন তাহলে আপনি প্রথমে বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করছেন; তারপর বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কোরআনকে বিশ্বাস করছেন। এটাই হচ্ছে বিজ্ঞানের কোরআনকে চ্যালেঞ্জ করা। শয়তান এটাই চাচ্ছে যে, মানুষ যে রকমভাবে কোরআনকে বিশ্বাস করে, ঠিক তেমনিভাবে তারা যেন বিজ্ঞানকেও বিশ্বাস করে। এজন্য কোরআনে থাকা মানুষের অজানা জ্ঞানগুলোকে শয়তান জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের কাছে হাজির করার দাবী করছে।

নবী (সাঃ) বলেছেন, মহাকাশ সম্পর্কিত জ্ঞান (Astrology/Astronomy) যে যত বেশি অর্জন করবে –সে তত বেশি জাদুবিদ্যাই অর্জন করল। মানুষ যখন ভুমি থেকে কিছু উপরে অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করেছে, Weather Satellite বসিয়েছে তখন মানুষ বলতে পারছে যে আজকে আকাশ পরিস্কার, আলোক উজ্জ্বল থাকলেও ৫ দিন পর সন্দীপ, হাতিয়ায় ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানবে এবং সারা দেশে বৃষ্টি হবে। কিন্তু সব সময় আবহাওয়ার পূর্বাভাস শতভাগ মিলে না; দেখা যায় ঘূর্ণিঝড় গতিপথ পালটে সন্দীপ –হাতিয়ার দিকে না গিয়ে কক্সবাজারের দিকে চলে যায়, ৩ দিন পর বৃষ্টি হওয়ার কথা বললে দেখা যায় বৃষ্টি হয় ৪ দিন পর। এই বিষয়গুলো জাদুবিদ্যার সাথে মিলে কারণ জাদুকররা যা বলে তার কিছু সত্যি হয়, কিছু মিথ্যা হয় যা বর্তমানে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মত - যা শতভাগ না মিলে – কিছু সত্যি হয়, কিছু মিথ্যা হয়।

কোরআনে আল্লাহ অদৃশ্য জগতের কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন যার ভিতরে অতীতের অনেক ঘটনা রয়েছে, যার সম্পর্কে আমাদের জানার কথা না। আল্লাহ এই কথা বলেছেনও যে, আল্লাহ আমাদেরকে অদৃশ্য অতীতের অনেক তথ্য কোরআনে জানিয়েছেন যা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব না।

আল্লাহ বলেন, “এটা সেই অদৃশ্য বিষয়ক সংবাদ যা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করছি; এবং যখন তারা স্বীয় লেখনীসমূহ নিক্ষেপ করছিল যে, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের প্রতিপালন করবে তখন তুমি তাদের নিকট ছিলে না; এবং যখন তারা কলহ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না। ”(সূরা আলে-ইমরানঃ৪৪)

অর্থাৎ কোরআনের একটি আকর্ষণ হচ্ছে যে, আপনি কোরআন পড়লে অতীতে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা জানতে পারবেন যা আপনার পক্ষে অন্য কোনভাবে জানা সম্ভব ছিল না। তার মধ্যে একটি সৃষ্টির শুরু। আল্লাহ বলেনঃ

“অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, আকাশ আর যমীন এক সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম, আর প্রাণসম্পন্ন সব কিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?” (সূরা আম্বিয়াঃ ৩০)

এটা হচ্ছে কোরআনে বর্ণিত মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুর অবস্থা। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা তাত্ত্বিকভাবে এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, শুরুতে মহাবিশ্ব একটি বস্তুই ছিল যার আয়তন (mass) খুবই কম ছিল পরে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। কোরআনে বর্ণিত মহাবিশ্ব সৃষ্টির একটি অবস্থার সাথে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বর্ণনা মিলে যাওয়াতে বেশিরভাগ মুসলিম “আলেম” অনেক খুশি হয়েছেন, তারা এই ব্যাপারটিকে কোরআন যে আল্লাহ এর থেকে এসেছে – এটা প্রমাণ করার জন্যও ব্যাবহার করেন।

এখন বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুর সময় কি অবস্থা হয়েছিল, Big Bang (মহা বিস্ফোরণ তত্ত্ব) এর সময় কি হয়েছিল তার ছবি তুলতে – দেখা যাচ্ছে এটা তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব অর্থাৎ কাগজে- কলমে সম্ভব।

মহাবিশ্ব যখন সৃষ্টি হয়েছে তখন প্রচুর আলোর উৎপত্তি হয়েছে – সেই আলো প্রতি সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটার বেগে চলে মহাবিশ্বের কোথাও না কোথাও হয়তো আছে। সেই আলো যদি কোন টেলিস্কোপের লেন্সে এসে পড়ে আর ছবিও তোলা হয়ে যায়, তাহলেই তো মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়ের অনেক অজানা তথ্য মানুষ জানতে পারবে। কিছুদিন আগে আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' দাবী করেছে যে তারা ১৩০০ কোটি বছর আগের মহাকাশের কিছু অংশের ছবি তুলতে পেরেছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে। অর্থাৎ ১৩০০ কোটি বছর আগের অতীত তারা দেখেছে। এটা কিভাবে সম্ভব? জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা গ্যালাক্সি, নক্ষত্র/তারা, গ্রহ, গ্যাস, ইত্যাদির যে ছবি তুলেছে তা ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দুরের, অর্থাৎ আলো সেই সব গ্যালাক্সি, নখত্র/তারা, গ্রহ, গ্যাস, ইত্যাদির থেকে জেমস ওয়েবে আসতে ১৩০০ কোটি বছর সময় লেগেছে তাই এই ছবি ঐ সব গ্যালাক্সি, তারা, গ্রহ, গ্যাসের ১৩০০ কোটি বছর আগের। এই ছবিতে প্রায় ১০ হাজার গ্যালাক্সি দেখা যাচ্ছে। একটি গ্যালাক্সিতে লক্ষ্ লক্ষ গ্রহ, নক্ষত্র থাকে। এখন যদি এই সব গ্যালাক্সি আমাদের সাথে কোনভাবে কথা বলতে পারে, তাহলে তারা আশ্চর্য হবে এবং তারা বলতে পারে, " হে মানব জাতি আমরা ১৩০০ কোটি বছর আগে কেমন ছিলাম সেটা সম্পর্কে এখন তোমরা কিভাবে জানতে পারো? এটা তো পরিষ্কার জাদু!" কারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাদের ১৩০০ কোটি বছর আগের ছবি কিভাবে তুলেছি সেই জ্ঞান তাদের কাছে নেই – এজন্য তারা এই বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে পারবে না –ফলে তারা এটাকে যাদু মনে করবে কিন্তু আমাদের কাছে এই ঘটনাকে যাদু মনে হচ্ছে না কারণ আমরা এই বিষয়ের পিছনের জ্ঞান জানি।

মহান আল্লাহ বলেন, "তুমি বলঃ তারা কত কাল ছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই; তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ছাড়া তাদের অন্য কোন অভিভাবক নেই; তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে অংশীদার করেন না। "(সূরা কাহাফঃ২৬)

আল্লাহ বলছেন, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তারই – এই জ্ঞানে তিনি কাউকেই অংশীদার করবেন না অর্থাৎ কেউই এমন দাবী করতে পারবে না যে – " আমরা আল্লাহ এর আয়াত ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয় জানতে পেরেছি" – যে দাবী আজকের মহাকাশবিজ্ঞানি/ যাদুকররা করছেন যে, তারা কোরআন ছাড়াই মহাকাশ গবেষণা করে মহাকাশের ও পৃথিবীর শুরুর অবস্থা জানতে পারছেন। এটা হচ্ছে, গায়েবের বা অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান অর্জনে আল্লাহ এর আয়াতের সাথে প্রতিযোগিতা করা –এটাই তো যাদু এবং শিরক।

যারা কোরআনে বর্ণিত মহাকাশ সৃষ্টির একটি অবস্থার সাথে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের Big Bang (মহা বিস্ফোরণ তত্ত্ব) Theory মিলে যাওয়াতে খুশি হয়েছেন তারা কি বুঝতে পারছেন যে মহাকাশ সম্পর্কিত জ্ঞান/ জ্যোতির্বিজ্ঞান হচ্ছে যাদু?

"বলুন: "আল্লাহ ছাড়া আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই গায়েব (অদৃশ্য) জানে না" [সুরা আল-নামলঃ ২৭:৬৫]

"আমি আমার বান্দাহের প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তাহলে তোমরা তার (কোরআনের) মত কোনো সূরা এনে দাও এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর, যদি তোমরা যা বলছ তা সত্যি হয়। "(সূরা বাকারাঃ ২৩)

আল্লাহ সূরা বাকারার ২৩ নাম্বার আয়াতে বলছেন যে, কাফিরদের দাবী যে কোরআন আল্লাহ এর পক্ষ থেকে আসেনি – এই কথা যদি সত্য হয় তাহলে তারা কোরআনের মত একটি সূরা আনতে পারবে। কিন্তু তারা যদি কোরআনের মত একটি সূরা আনতে না পারে; তাহলে বুঝা যাবে যে, কোরআন আল্লাহ (সৃষ্টিকর্তার) এর কাছ থেকেই এসেছে। অতীতে বহু কবি চেষ্টা করে কোরআনের মত কোনো সূরা আনতে পারে নি। এখন বিজ্ঞানীরা/ যাদুকররা দাবী করছে যে, কোরআনে থাকা গায়েবের তথ্য তারা কোরআন ছাড়াই জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে আনতে পারছে। বিজ্ঞানীরা/যাদুকররা এটা মুখে বলছে না কিন্তু তারা পরোক্ষভাবে এটাই বলছে যে, হে মানবজাতি/ মুসলিমরা তোমরা বিজ্ঞানের প্রতি ঈমান আনো - যে রূপ ঈমান তোমরা কোরআনের উপর এনেছো।

যাদুবিদ্যার মাধ্যমে আল্লাহকে, আল্লাহ এর আয়াতকে চ্যালেঞ্জ করা হয়, যাদুবিদ্যার মাধ্যমে শুধু যে আল্লাহ এর আয়াতকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় তাই না – বরং আল্লাহ এর আয়াতের সমতুল্য কিছু এনে উপস্থিত করার চেষ্টা করা হয়। এটা প্রমাণ করার জন্য যে, আল্লাহ আমাদেরকে যে গায়েবের তথ্য দিয়েছেন সেই গায়েব আমরা, কোরআন ছাড়া, নিজেরাই জানতে পারি। এই সব-ই হচ্ছে আল্লাহকে; আল্লাহ এর আয়াতকে চ্যালেঞ্জ করা। তাহলে, দেখা যাচ্ছে, জ্যোতির্বিজ্ঞান-ই যাদুবিদ্যা।

গায়েবের জ্ঞান বা অদৃশ্য জগতের জ্ঞান আল্লাহ তার রসূলের (সাঃ) মাধ্যমে যা আমাদের জানাবেন, শুধুমাত্র তাই আমরা জানতে পারব – এটাই হচ্ছে ওহীর মর্যাদা ও গুরুত্ব। সবাই যদি ওহীর জ্ঞান বা তথ্য পাওয়ার দাবী করে, তাহলে ওহীর কোন মর্যাদা বা গুরুত্ব থাকে না; সেই সাথে সাথে নবী, রসূলদের ও কোন গুরুত্ব থাকে না।

মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে এবং অহংকার সহকারে গ্রহণ করে, তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না উট, সূঁচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে। আমি এইভাবেই পাপীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি'। (সূরা আল-আরাফ: ৪০)

এখন আমাদেরকে চিন্তা করে দেখতে হবে যে, পৃথিবীতে কত সম্পদ নষ্ট হচ্ছে, কত মানুষ অনাহারে আছে, সমুদ্রের নিচে কত সম্পদ লুক্কায়িত আছে, প্লাস্টিক সমস্যার জন্য পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, সর্বোপরি পৃথিবীকে আরও

সুন্দর করে কিভাবে আমরা বাসযোগ্য করতে পারি – সেটা নিয়ে অর্থ ব্যয় না করে মানুষ অর্থ, শ্রম ব্যয় করছে চাঁদে অথবা মঙ্গল গ্রহে কিভাবে বসবাস করা যায় সেটা নিয়ে? এই বিষয়টা কি অবাক করার মত নয়? অবিশ্বাসীরা কি বুঝতে পেরেছে আল্লাহ তাদের অপকর্মের কারণে এবার সমগ্র পৃথিবীতেই গজব পাঠাবেন এবং পৃথিবীতে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। তাই কি তারা অন্য গ্রহে চলে গিয়ে আল্লাহ এর আযাব থেকে বাচতে চায়? কিয়ামত দিবস থেকে বাচতে চায়? দুষ্ট জীনেরা কি তাদেরকে এই ধরণের বুদ্ধি দিয়েছে? বর্তমান সমসাময়িক সময়ে হলিউডের মুভিগুলোতে দেখা যায়, পৃথিবীতে ভয়াল বন্যা হয়েছে বা মহাকাশ থেকে উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে বা সারা পৃথিবীতে ব্যাপক ভুমিকম্প হচ্ছে – মানব জাতির অস্তিত্ব হুমকির মুখে - তারপর মানুষ (নায়ক-নায়িকা) কিভাবে প্রযুক্তি/টেকনোলজি ব্যাবহার করে সেই সকল বিপর্যয়কে অতিক্রম করে বেচে গেলো এবং মানবজাতি রক্ষা পেল।

প্রায়ই দেখি পত্রিকায় লিখা হয়, "যদি কোন কারণে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে মানুষ বসবাস করবে কোথায়? এজন্য জ্যোতিরর্বিজ্ঞানীরা মহাকাশে মানুষের বসবাসের জন্য উপযোগী গ্রহ বা উপগ্রহ খুঁজছে!" আমরা কোরআন থেকে জানি, পৃথিবী ধ্বংস হবে কিয়ামত দিবসে – কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব থাকবে – শুধুমাত্র কিয়ামতের দিন পৃথিবীতে সূর্য উঠবে পশ্চিম দিক থেকে এবং কিয়ামত দিবস/ শেষ বিচারের দিন শুরু হবে। তাহলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা/যাদুকররা কি অবিশ্বাসী মানুষদের জন্য আলাদা গ্রহ খুজে বের করতে চান যেখানে তারা বসবাস করবে ফলে তাদের উপর কিয়ামত আসবে না কারণ কিয়ামত তো হবে পৃথিবীতে?

পূর্বের যমানাগুলোতে কিছু মানুষ যাদুবিদ্যায় জড়িত ছিল, কিছু জাতি আল্লাহ বিরোধী ছিল ফলে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন কিন্তু এবার প্রায় পুরো মানবজাতি যাদুবিদ্যায় (বিজ্ঞানে) বিশ্বাস করে, প্রায় পুরো মানবজাতি বুঝে হোক বা না বুঝে হোক যাদুবিদ্যার (বিজ্ঞানের) চর্চায় লিপ্ত। জুলকারনাইনের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ার পর মানবজাতির এই অবস্থা হয়েছে।

জুলকারনাইনের প্রাচীর কোনটি? ইয়াজুজ-মাজুজ কারা?

সাহিহ বুখারির ৩৩৪৬ নাম্বার হাদিস থেকে জানা যায়, এক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি প্রাচীরটিকে কারুকার্য খচিত চাদরের মত দেখেছি। নবী (সাঃ) বললেন, "তুমি তা ঠিকই দেখেছ"।

বুঝা যাচ্ছে, এই প্রাচীরটি মক্কা, মদিনা থেকে এতটুকু দূরত্বে অবস্থিত যেখানে অন্তত একজন সাহাবীর যাতায়াত ছিল। অনেকে মনে করেন যে, এই প্রাচীর গায়েবের বিষয় বা অদৃশ্য জগতের কিছু হবে, আবার অনেকে মনে করেন এই প্রাচীর অচেনা, অজানা জায়গায়, এমন কি মাটির নিচে অবস্থিত কিন্তু ব্যাপারটা যে আসলে সে রকম কিছু নয় তা এই হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে। এই হাদিস থেকে এটিও বুঝা যাচ্ছে যে, জুলকারনাইনের প্রাচীর বহু

দূর থেকেও দেখা যায় কারণ একটি প্রাচীরকে চাদরের মত তখন-ই লাগবে যখন এটিকে আপনি অনেক দূর থেকে দেখবেন। এখান থেকে আরেকটি ব্যাপার-ও বুঝা গেলো যে, এই প্রাচীর আকারে অনেক বড় কারণ এটি অনেক দূর থেকেও দেখা যায়। সূরা কাহফের ৯৩-৯৮ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন,

"৯৩. চলতে চলতে সে যখন দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌছল, তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল, যারা ভাষা কম-ই বুঝতে পারে। ৯৪. তারা বলল, হে যুল-কারনাইন! ইয়াজূজ ও মাজূজ তো যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করছে। তাই আমরা কি আপনাকে খরচ দেব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দেবেন? ৯৫) সে বলল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক যা দিয়েছেন তা-ই যথেষ্ট, কাজেই তোমরা আমাকে শক্তি-শ্রম দিয়ে সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে এক সুদৃঢ় প্রাচীর গড়ে দেব। ৯৬) আমার কাছে লোহার পাত এনে দাও।' শেষ পর্যন্ত যখন সে দু'পাহাড়ের মাঝের ফাঁকা জায়গা পুরোপুরি ভরাট করে দিল সে বলল, 'তোমরা হাপরে দম দিতে থাক।' শেষ পর্যন্ত যখন তা আগুনের মত লাল হয়ে গেল তখন সে বলল, 'আনো, আমি এর উপর গলিত তামা ঢেলে দেব।' ৯৭) অতঃপর তারা সেটা অতিক্রম করতে পারল না এবং সেটা ভেদও করতে পারল না। ৯৮) সে বলল, এটা আমার রব-এর অনুগ্রহ। অতঃপর যখন আমার রব এর প্রতিশ্রুত সময় আসবে তখন তিনি সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। আর আমার রব-এর প্রতিশ্রুতি সত্য।" (সূরা কাহফ ৯৩-৯৮)

জুলকারনাইনের প্রাচীর কোনটি ? তার ইঙ্গিত আছে এই হাদিসে –রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন ঘুম থেকে এমন অবস্থায় জেগে উঠলেন যে, তার মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাভ এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিলঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী! আজই ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী মিলিয়ে বৃত্ত তৈরী করে দেখান। যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) বলেনঃ আমি এ কথা শুনে বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ লোক জীবিত থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, ধ্বংস হতে পারে; যদি অনাচারের আধিক্য হয়। [বুখারীঃ ৩৩৪৬,৩০৯৭ মুসলিমঃ ২৮৮০]

এই কথাগুলো আল্লাহ এর রসূল (সা) কোন দিন যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) কে বলেছিলেন সেটা আমাদের জানতে হবে কিন্তু এটা বের করা কঠিন, এমন কি কোন বছরে বলেছিলেন সেটা বের করাও কঠিন হবে। কিন্তু ইতিহাস থেকে এতটুকু জানা যায় যে, যয়নব বিনতে জাহাশ রাঃ কিছু কম-বেশি ৬২২ সালে ইসলাম গ্রহন করেছিলেন এবং মদিনায় হিজরত করেছিলেন। তিনি কিছু কম-বেশি ৬২৫ সালে যায়েদ ইবনে হারেসাকে রাঃ বিয়ে করেন। ৬২৬ সালে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। তারপর যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) আল্লাহ এর রসুলকে (সাঃ) বিয়ে করেন। কম-বেশি ৬৩২-৬৩৩ সালের দিকে আল্লাহ এর রসুলের (সাঃ) মৃত্যু হয়। তারমানে এই কথাগুলো আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) কে ৬২২ সাল থেকে ৬৩২ সালের ভিতরে

বলেছেন – এমন সম্ভাবনাই বেশি। এখন আমরা দেখব, এই সময়ের ভিতরে পৃথিবীতে বড় বড় কোন কোন ঘটনা ঘটেছে –যেগুলোতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হয়েছে বা দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে চুক্তি হয়েছে?

ইতিহাস গবেষণা করলে দেখা যায়, এই সময়ের মধ্যে ৬২৬ সালে কনস্টান্টিনোপলের অবরোধ সংঘটিত (Siege of Constantinople) হয়েছিল। স্লাভস (Slavs), এভার (Avars) এবং পারস্য সাম্রাজ্য, কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেছিল যেখানে শেষ পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর (Wall of Constantinople) অতিক্রম করা বা ধ্বংস করা স্লাভস (Slavs), এভার (Avars) এবং পারস্য সাম্রাজ্যের পক্ষে সম্ভব হয়নি ফলে বাইজেনটাইনরা (খ্রিষ্টানরা) রক্ষা পায়। কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর (Wall of Constantinople) পুরো কনস্টান্টিনোপল শহরটিকে ঘিরে রেখেছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে এত জটিল এবং বড় প্রাচীর কমই আছে। কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরই হচ্ছে জুলকারনাইনের প্রাচীর – এমন একটি সম্ভাবনা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এই প্রাচীর হচ্ছে বাইজেনটাইন এম্পায়ারের (ইস্টার্ণ রোমান এম্পায়ার) ক্রিস্টিয়ান লোক ও পারস্য সাম্রাজ্যের লোকদের মধ্যে শত্রুতার প্রতীক। এটি যদি না থাকে অর্থাৎ তাদের মধ্যে যদি শত্রুতা না থাকে তাহলে উভয় দেশের লোকেরা একে অন্যের ভূখণ্ডে যেতে পারবে তাদের মধ্যে পণ্য আমদানি- রপ্তানি হবে, ব্যবসা হবে এবং সেই সাথে সাথে বিশ্বাস, আদর্শ, জ্ঞানের বিনিময় হবে। শেষ পর্যন্ত, ৬৩০ সালে বাইজেনটাইন এম্পায়ার (ইস্টার্ণ রোমান এম্পায়ার) এবং পারস্যের সাম্রাজ্যের মধ্যে শান্তি চুক্তি হয়। তখন পারস্যের সম্রাট ছিল কাভাড ২ (Kavad 2) এবং বাইজেনটাইন সম্রাট ছিল হিরাক্লিয়াস (Heraclius) যার নিয়ন্ত্রনে ছিল কনস্টান্টিনোপল যা কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। বাইজেনটাইনরা ছিল ক্রিস্টিয়ান আর পারস্যের লোকেরা ছিল জরথুস্ত্রবাদ (Zoroastrianism) বা পারসিক ধর্মের। শান্তি চুক্তির ফলে জরথুস্ত্রবাদ (Zoroastrianism) বা পারসিক ধর্মের বিশ্বাস, জ্ঞান সম্পর্কে কনস্টান্টিনোপলের খ্রিষ্টান লোকেরা জানতে পারল কারণ তখন দুই ভূখণ্ডের লোকেরা একজন আরেকজনের সাথে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিল। এভাবে জরথুস্ত্রবাদের (Zoroastrianism) বিশ্বাস ও জ্ঞান কনস্টান্টিনোপলের খ্রিষ্টান লোকেদের মধ্যে কিছুটা ছড়িয়ে পড়ল। ৬৩০ সালে বাইজেনটাইন এম্পায়ার (ইস্টার্ণ রোমান এম্পায়ার) এবং পারস্যের সাম্রাজ্যের মধ্যে শান্তি চুক্তি হয়েছিল – এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

এখন আমরা জানতে চাই জরথুস্ত্রবাদ (Zoroastrianism) কি? এই ধর্মের একটি মূল বিষয় হচ্ছে দ্বৈতবাদ (Dualism বা Dualistic cosmology) যা মুলত বুঝায় সকল ক্ষেত্রে ২ টি বিপরীতমুখী শক্তির সহাবস্থান থাকবে। (Zarathustra was the first to see in the struggle between good and evil the essential wheel in the working of things.) এই বিপরীতমুখী ২ টি শক্তির সহাবস্থানের কারণেই পৃথিবী ঠিক থাকবে, সমাজ ঠিক থাকবে, রাষ্ট্র ঠিক থাকবে, মহাকাশ ঠিক থাকবে। ধরুন, আপনি একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক। তাদের বিশ্বাস হচ্ছে, এই প্রতিষ্ঠান ঠিক মত কাজ করতে হলে বিপরীতমুখী ২ টি দল থাকতে হবে যাদের আদর্শ, লাভের বিষয়, স্বার্থ - পরস্পর বিপরীতমুখী হতে হবে কিন্তু তারা একই সাথে একই প্রতিষ্ঠানে সহাবস্থান করবে। এই রকম বিপরীতমুখী ২ টি দল/শক্তি না থাকলে আপনার প্রতিষ্ঠান ঠিকমত চলবে না, যেমনঃ মালিক পক্ষ ও ট্রেড

ইউনিয়ন। অর্থাৎ যেকোন সংগঠনে ২ টি বিপরীতমুখী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দল সহাবস্থানে থাকতে হবে – তাহলে সংগঠন ঠিকভাবে কাজ করবে, সংগঠন শক্তিশালী হবে; যেমনঃ গনতন্ত্রে সরকারি দল ও বিরোধী দল। এই ধর্মের প্রাচীন বিশ্বাস হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তার হুকুম মেনে চলা ফেরেশতা থাকলে সৃষ্টিকর্তার হুকুম বিরোধী শয়তান/জিন/ইবলিশ এরও সহাবস্থানে থাকতে হবে তাহলেই মহাকাশ, পৃথিবী ঠিকমত চলবে। অন্যথায় পৃথিবী, মহাকাশ, সমাজ, রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যাবে –এটা হল জরথুস্ত্রবাদের একটি প্রাচীন বিশ্বাস যাকে Dualism বা Dualistic cosmology বা duotheism বা bitheism বা ditheism বলা হয়ে থাকে যাকে বাংলায় 'দ্বৈতবাদ' বলা হয়। প্রাচীন এই নীতিতে বিশ্বাসীরা শয়তান/ইবলিশকে বিশ্বাস করে আবার ফেরেশতাদেরকেও বিশ্বাস করে। তাদের এই বিশ্বাস খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ সাল (500 BCE) আগের জরথুস্ত্রবাদে ছিল যা অন্তত ৭০০ সাল (700 CE) পর্যন্ত অটুট ছিল। ৬২৬ সালে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ (Siege of Constantinople) করেছিল এই দ্বৈতবাদ বিশ্বাসে বিশ্বাসী পারস্যের জরথুস্ত্রবাদীরা (সাসানিডস)। তাছাড়া তাদের সাথে অবরোধে অংশগ্রহণকারী স্লাভিসরাও (Slavs) তখন এই দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিল। পরবর্তীতে তারা ধীরে ধীরে খ্রিষ্টান হয়ে যায় (৭ম শতাব্দীতে তাদের খ্রিষ্টান হওয়া শুরু হয়) আর অবরোধে অংশগ্রহণকারী আরেক দল এভারসরা (Avars) ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে কোন ধর্মে বিশ্বাসী ছিল তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি তবে ১৪ তম শতকে তারা সবাই মুসলিম হয়ে যায়।

জরথুস্ত্রবাদে দ্বৈতবাদের এই বিশ্বাস যখন ছিল (খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ (500 BCE) সাল) তখন ইউরোপে ছিল Classical Antiquity (ধ্রুপদী সভ্যতা বা প্রাচীনত্বের) এর যুগ। এই তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা থেকে বুঝা যায় যে, সবকিছু একই সুতায় গাঁথা এবং এখান থেকেই বুঝা যাবে, জুলকারনাইনের প্রাচীর আল্লাহ বিরোধী কোন জ্ঞানকে আটকে রেখেছিল।

পূর্বে ইয়াজুজ-মাজুজ যাদুবিদ্যার মাধ্যমে আল্লাহ এর আয়াতকে ভুল প্রমাণ করতে চাইত, তার নবীকে ভুল প্রমাণ করতে চাইত, আল্লাহ এর ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ এর হুকুম কার্যকর করতে ব্যর্থ করতে চাইত – এজন্য অতীতে তারা যাদুকরদের কাছে যেত এবং ভবিষ্যৎ জানতে চাইত। তারপর যাদুকরদের কাছে যদি শুনত ভবিষ্যতে খারাপ কিছু আছে তাহলে ভবিষ্যতের সেই খারাপ কিছুকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করত। যেমনঃ রাজারা যাদুকরদের কাছে শুনত অমুক যুদ্ধে গেলে সে হারবে না জিতবে? যদি যাদুকর বলত, 'হারবে'; তাহলে সেই যুদ্ধে যেত না। এইভাবে তারা আল্লাহ এর নির্ধারিত বিষয়কে (ভবিষ্যৎকে/তকদীরকে) প্রতিরোধ করতে চাইত। যাদুকররা রাজাদের আরও ভবিষ্যৎবাণী করত যে, আগামী বছর বৃষ্টিপাত, ঝড়, বন্যা,ফসল ইত্যাদি কম না বেশী হবে, ইত্যাদি না না রকম ভবিষ্যতবাণী শুনে রাজারা আসলে আল্লাহ এর নির্ধারিত গজবে তাদের যেন ক্ষতি না হয় –সেটাই নিশ্চিত করতে চাইত। আমাদের সময়ে এই যাদুকররা ভিন্ন নামে আবির্ভূত হয়েছে এবং ভিন্ন রূপে আল্লাহ বিরোধিতা চলছে। যেমনঃ বিজ্ঞানীরা বলছেঃ ঘূর্ণিঝড় হয় নিম্নচাপের কারণে, ভুমিকম্প হয় মাটির নিচে টাইটনিক প্লেটের নড়া –চরার কারণে, বন্যা হয় বন্যা রক্ষা বাঁধ না থাকাতে বা অতি বৃষ্টির কারণে,

মহামারী হয় ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার কারণে, ইত্যাদি। আল্লাহ এর হুকুমে যে বন্যা, ভুমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, ইত্যাদি সবকিছু হয় – তার কোন স্বীকৃতি বিজ্ঞানীরা দেয় না।

খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ সালে যার মাধ্যমে জরথুস্ত্রবাদ শুরু হয় তার নাম হচ্ছে জরাথুষ্ট্র (Zarathushtra Spitama),যে জরাথুষ্ট্র/জরোয়াস্টার (Zoroaster) নামেই অধিক পরিচিত। গ্রিকদের মতে, জরাথুষ্ট্র (জরোয়াস্টার) হচ্ছেন যাদু ও জ্যোতির্বিদ্যার উদ্ভাবক (Magi 2500 years ago/Magic in modern term)। জরথুস্ত্রবাদে ধর্ম পুরোহিতদের বলা হয় Magi বা Magos যার আদি অর্থ হচ্ছে যাদুকর। Magi শব্দটি যখন ১২০০ সালের দিকে ল্যাটিন (Latin) থেকে ইংলিশে প্রবেশ করে তখন এর অর্থ করা হয় wise man বা জ্ঞানী লোক। অর্থ পাল্টে যাদুকর থেকে 'জ্ঞানী লোক' করা হয়েছে । Magi বা Magos যার আরবী হচ্ছে 'মাজুস' (Majus) যার পারসি শব্দ হচ্ছে 'মাগুস' (Magus) যার পারসিক অর্থ হচ্ছে জরথুস্ত্রবাদী। অর্থাৎ কোরআনে আল্লাহ যে ইয়াজুজ-মাজুজের কথা বলেছেন তার মাজুজ বলতে বুঝা যাচ্ছে জরথুস্ত্রবাদী যাদুকর বা শুধু 'যাদুকর' বা যাদুতে বিশ্বাসী। মাজুস (Majus) শব্দটি কোরআনের সূরা হাজ্জ এর ১৭ নাম্বার আয়াতেও আছে যার অর্থ অনেক অনুবাদক 'যাদুকর' বা 'জরথুস্ত্রবাদী যাদুকর' হিসেবে উল্লেখ করেছেন (Dr. Mustafa Khattab, The Clear Quran (টীকা দেখুন)) । তখনকার সময়ে খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ সাল থেকে ৬৫১ খ্রিস্টাব্দ (Achaemenid Empire থেকে Sasanian Empire) পর্যন্ত প্রায় ১২০০ বছর পারস্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল জরথুস্ত্রবাদ। তাহলে, বুঝা গেলো, **মাজুজ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'যাদুকর' বা 'যাদুতে বিশ্বাসী'।**

ইয়াজুজ শব্দের অর্থ কি? ইয়াজুজ শব্দটির অর্থ খোঁজার জন্য আমি মাজুস (Majus) শব্দটিকে সূত্র (clue) হিসেবে নিয়ে দেখেছি যে ইয়াজুস (Yajus) নামে কিছু পাওয়া যায় কি না? আমি যেটা পেলাম তাহলো, ইয়াজুস (Yajus) শব্দটি হিন্দু ধর্মে অর্থাৎ পৈত্তলিক ধর্মে আছে। হিন্দুধর্মে যজু (Yajus) বলতে যজুর্বেদের (Yajurveda) সেই অংশকে বোঝায় যেখানে আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রার্থনার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যা কালকালেশ্বর তীর্থ (Kalakaleshvara Tirtha)আনুষ্ঠানিকভাবে পালনের সময় সম্মানিত ব্যক্তিদের দ্বারা আবৃত্তি করা বৈদিক গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগকে প্রতিনিধিত্ব করে।(Yajus in Hinduism signifies the section of the Yajurveda focused on rituals and prayers, representing a vital category of Vedic texts recited by respected individuals during ceremonial observances at Kalakaleshvara Tirtha.) এখানে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আমার মতে, কোরআনে থাকা ইয়াজুজ শব্দটি পৈত্তলিকদের দিকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ**, ইয়াজুজ শব্দটির অর্থ হচ্ছে পৈত্তলিক সম্প্রদায় বা পৈত্তলিকতায় বিশ্বাসী।**

জুলকারনাইন যে প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন তা পৈত্তলিকতায় ও জাদুতে বিশ্বাসীদের প্রতিরোধী একটি প্রাচীর। আপনারা জানেন, ইসা আঃ এর অনুসারীদের উপর রোমান (পৈত্তলিক) ধর্মের অনুসারী, পৈত্তলিক রোমান সম্রাটরা ভয়াবহ নির্যাতন করে যা কনস্ট্যান্টাইন বন্ধ করেন। এই বিষয়ে পরবর্তিতে আরও বিশদ আলোচনা করা

হয়েছে। ইয়াজুজ, মাজুজ শব্দ দুটির অর্থ মনে রাখলে পরবর্তী আলোচনা বুঝতে সুবিধা হবে। এখন আমরা জরথুস্ত্রবাদ *(*Zoroastrianism)নিয়ে আরও প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস জানব।

'Pliny the Elder' যিনি একজন রোমান লেখক, ফিলোসফার এবং রোমান সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন, তিনি বলেছেন যে, জরথুস্ত্র (Zoroaster) হচ্ছে যাদুর উদ্ভাবক – যে যাদু শিখার জন্য গ্রিকরা উদগ্রীব, আকাঙ্ক্ষিত ছিল। যে যাদু শিখার জন্য পিথাগোরাস, এমপেডোক্লেস (Empedocles), ডেমোক্রিটাস (Democritus), প্লেটো (Plato) বহু পথ পাড়ি দিয়েছিল এবং এই যাদু শিখে এসে অন্যদের শিখিয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য, বিজ্ঞানী ডেমোক্রিটাসকে Formulation of Atomic Theory of Universe এর জন্য আজও স্মরণ করা হয়। ক্লাস ৯-১০ এ জ্যোতির্বিদ, গণিতবিদ পিথাগোরাসের উপপাদ্য সবাই পড়েছেন। বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটোকে প্রায় সবাই চিনে। প্ল্যাটনিক স্কুল (Platonic school) থেকেই ১৫শ শতাব্দীতে রেনেসাঁ ত্বরান্বিত হয়।

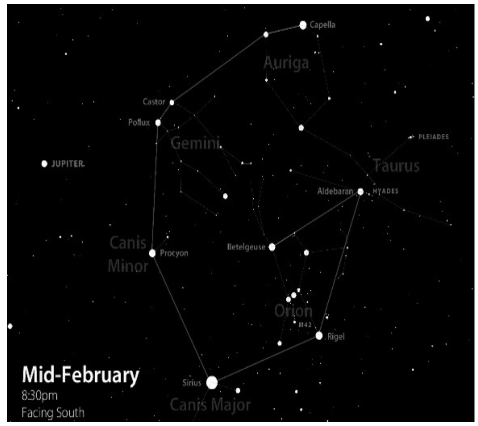
১০ম শতাব্দীর বাইজেনটাইন এনসাইক্লোপিডিয়া সুদা (Suda) এর এস্ট্রোনমিয়াতে (Astronomia) লিপিবদ্ধ আছে যে, বেবিলননিয়ানরা জ্যোতির্বিদ্যা শিখেছে জরথুস্ত্র (Zoroaster) কাছ থেকে। অর্থাৎ জরথুস্ত্রবাদ তখন যাদুবিদ্যা (জ্যোতির্বিদ্যা/ জ্যোতির্বিজ্ঞান) দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। প্রাচীনকালে, জ্যোতিষীবিদ্যা বা জ্যোতির্বিদ্যা বা জ্যোতির্বিজ্ঞান বা যাদুবিদ্যার সাথে জ্যামিতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। আকাশের তারা ও তাদের অবস্থান দেখে জ্যোতিষী বা জ্যোতির্বিদরা ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ, বৃত্ত, ইত্যাদি না না ধরণের জ্যামিতিক আকৃতি অঙ্কন করত। প্রাথমিক পর্যায়ে জামিতির জ্ঞান (ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ, বৃত্ত, ইত্যাদি) জ্যোতিষী বা জ্যোতির্বিদরা মহাকাশে গ্রহ, উপগ্রহ, পৃথিবী ও তারাদের অবস্থান ও গতি নিয়ে পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ করতে ব্যাবহার করতেন। অর্থাৎ, জ্যামিতির উদ্ভব ও বিকাশ এবং মহাকাশ সংক্রান্ত জ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ একই সাথে হয়েছে। প্রাচীনকালে প্রায় সকল বৈজ্ঞানিক, গণিতবিদ একই সাথে জ্যোতির্বিদও ছিলেন, তারা সবাই মহাকাশ নিয়ে গবেষণা ও জ্ঞান অর্জন করতেন। তাই, জ্যামিতির জ্ঞানের সাথে মহাকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মহাকাশের নক্ষত্র, গ্রহ, চাঁদ, পৃথিবীর অবস্থান ও এদের মধ্যে সম্পর্ক জানার জন্য এবং মহাকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্যামিতি যেমনি বেবহৃত হয়েছে তেমনি মহাকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে জ্যামিতির অনেক জ্ঞান অর্জিত হয়েছে এবং জ্যামিতির নতুন নতুন শাখার উদ্ভব হয়েছে। যেমনঃ গোলকীয় জ্যামিতি (Spherical geometry) ও ত্রিকোণমিতি (Trigonometry)।

মহাকাশে বিভিন্ন তারা বা নক্ষত্রের অবস্থান ও গতি, গ্রহের অবস্থান ও গতি এবং ভবিষ্যতে এদের অবস্থান কোথায় হবে তা নিরূপণের জন্য গোলকীয় জ্যামিতি (Spherical geometry) ও ত্রিকোণমিতির (Trigonometry) উদ্ভব হয়েছে। জ্যামিতি থেকে এসেছে বীজগণিতসহ (algebra) গণিতের প্রায় সকল শাখা। বর্তমানে মহাকাশ

সংক্রান্ত জ্যামিতির শাখাকে প্ল্যানেটারী জ্যামিতি (Planetary geometry) বলা হয়। যেমনঃ স্টার অফ ডেভিড (Star of David).





ছবি; প্রাচীনকালে, জ্যোতিষী বা জ্যোতির্বিদরা আকাশে তারাদের মধ্যে সরলরেখা টেনে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ, বৃত্ত, আঁকতেন। প্রাচীনকাল থেকেই জ্যামিতির জ্ঞান, গণিতের বিভিন্ন থিওরি ও মহাকাশ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক জ্ঞান – উভয় জ্ঞান একে অপরের পরিপূরক। বর্তমান বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখার শিকড় হচ্ছে জ্যামিতি। যেহেতু মহাকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান বা জ্যোতির্বিদ্যা বা জ্যোতির্বিজ্ঞান যাদু বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত আর জ্যামিতির অনেক জ্ঞান (যেমনঃ গোলকীয় জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি) এসেছে মহাকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়ে তাই, বিজ্ঞানের অনেক কিছুই যাদুবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে কারণ জ্যামিতি থেকে এসেছে বর্তমান বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখা-প্রশাখা।

রোমান পৈত্তলিকদের মতাদর্শ ও যাদু এবং জরথুস্ত্রবাদে বিশ্বাসীদের মতাদর্শ ও যাদুর জ্ঞানকে আটকানোর জন্যই জুলকারনাইন প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। অর্থাৎ জুলকারনাইনের প্রাচীর ছিল পৈত্তলিকতা এবং জাদুবিরোধি একটি জ্ঞানের প্রাচীর যা যাদু ও পৈত্তলিকতায় বিশ্বাসী পশ্চিমা রোম ভিত্তিক রোমান সাম্রাজ্য ও জরথুস্ত্রবাদে বিশ্বাসী পারস্য সাম্রাজ্যকে ও তাদের মতাদর্শকে দমন করত। এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী লোকেরা তাদের মতাদর্শ বা যাদু অর্জনে এবং প্রচারে অগ্রসর হলে অসুবিধা কি? সমস্যা হচ্ছে, তারা লোকদের সহজেই নিজেদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী করে ফেলবে কারণ তারা যাদুবিদ্যা দিয়ে এমন কিছু করবে যে, মানুষ ধোঁকায় পড়ে তাদেরকে বিশ্বাস শুরু করবে - যেটা বিগত ১০০ বছর ধরে হচ্ছে।

যতটুকু জানা যায়, আলেকজান্ডার জরথুস্ত্রবাদের সকল ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলেছিল ফলে তাদের মূল ধর্মগ্রন্থের অনেক কিছুই আজকে আর পাওয়া যায় না। তাছাড়া কাদেশিয়ার যুদ্ধে মুসলিমদের কাছে পরাজিত হবার পর জরথুস্ত্রবাদে বিশ্বাসী পারস্যের লোকেরা অনেকেই ভারতে চলে আসে, অনেকে পারস্যেই (বর্তমানে

ইরান,ইরাক) থেকে যায়, অনেকে ইউরোপে চলে যায়। কাদেশিয়ার যুদ্ধে মুসলিমদের কাছে পরাজয়ের পর জরথুস্ত্রবাদ অনেকটাই দুর্বল হয়ে যায় ।

বর্তমানে জরথুস্ত্রবাদ নামে যে ধর্ম আছে তা ১৪০০ বছর আগের 'জরথুস্ত্রবাদ' থেকে অনেকটাই পরিবর্তিত। খ্রিষ্টান,ইহুদী, মুসলিমদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এখন জরথুস্ত্রবাদ এক ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী একটি ধর্মে পরিণত হয়েছে।
জরথুস্ত্রবাদে Dualism (দ্বৈতবাদ) বলতে এখন শুধু মানুষের ভিতরে ভালো-মন্দের সহাবস্থানকে বুঝায় যার মধ্য থেকে শুধু ভালোটিকে বেছে নেয়ার জন্য বলা হয়।

কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরই কি সেই প্রাচীর যেটা জুলকারনাইন তৈরি করেছিলেন?

৬২৬ সালে যখন পারস্য যখন কনস্টান্টিনোপল দখল করতে চায়, তখনকার সময়ে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর ধ্বংস করার মত প্রযুক্তিই পৃথিবীতে ছিল না। পরবর্তীতে ১৪৫৩ সালে সুলতান মাহমুদ-২ এর আক্রমণে এই প্রাচীর ধ্বংস হয়। তিনি ৫৫ দিন ধরে কনস্টান্টিনোপল (Constantinople) অবরোধ করেন, সে সময় তিনি ১২টি মতান্তরে ৬২ টি কামান দিয়ে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরে (Wall of Constantinople) আঘাত করেন যে কামানগুলো তখনকার সময়ের সেরা কামান ছিল। এর মধ্যে একটি কামান ছিল ২৭ ফুট লম্বা যার মধ্যে ২৭০ কেজি থেকে ৬৫০ কেজি ওজনের লোহার বা পাথরের বল ১ মাইল দূর থেকে নিক্ষেপ করা যেত। পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় কামান। শেষ পর্যন্ত সকল কামানের আঘাতে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর (Wall of Constantinople) এক জায়গা দিয়ে ভেঙ্গে পড়ে এবং সুলতান মাহমুদের বাহিনী কনস্টান্টিনোপল জয় করেন।

জুলকারনাইনের দেয়াল ভাঙ্গার পরপরই ১৪৫৪ সালের ৯ ই এপ্রিল লদির শান্তি চুক্তির (Treaty of Lodi; Peace of Lodi) মধ্যে দিয়ে রেনেসাঁর পটভূমি তৈরি হয় । এতে রিপাবলিক অফ ভেনিস (Republic of Venice) এবং ডাচী অফ মিলানের (Duchy of Milan) মধ্যে সংগঠিত হওয়া লমবার্ডীর যুদ্ধ (Wars in Lombardy) শান্তি চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়। ফলে পরবর্তী ৪০ বছর ইতালিতে স্থিতিশীলতা আসে যা ইতালিতে রেনেসাঁর উদ্ভবকে ত্বরান্বিত করে। রেনেসার (Renaissance) অর্থ হচ্ছে 'পুনর্জন্ম' বা 'পুনর্জাগরণ' বা 'নবজাগরণ'। ইতালির ফ্লোরেনসে (Italian High Renaissance, 1492) প্রথম রেনেসাঁর উদ্ভব হয় যা পরবর্তীতে পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপে 'রেনেসা' শুরু হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৯২ সালে) আর এটি চলে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যা ইউরোপের মধ্যযুগ (অন্ধকার যুগ) থেকে আধুনিক যুগে প্রবেশের মধ্যবর্তী সময়কাল বলে ধরা হয়। রেনেসাঁর সময় জ্যোতিরর্বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, চিত্রকর্মে ইউরোপ ব্যাপক অগ্রসর হয় –যা মূলত ছিল প্রাচীন

গ্রীক মতাদর্শ, শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার ধারাবাহিক উন্নতি যার শিকড় ছিল প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা (Greko Roman World এবং Classical Antiquity/ধ্রুপদী সভ্যতা / প্রাচীনতা)। কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক ইস্টার্ন রোমান সম্রাটদের বন্ধ করে দেওয়া প্লাটনিক স্কুল (Platonic school) পুনরায় ইতালির ফ্লোরেন্স চালু হয় যা রেনেসাঁর উদ্ভবে মূল ভূমিকা পালন করে। আধুনিক ইতিহাসবিদরা ৩০০ সাল থেকে ১৪৯২ সাল পর্যন্ত সময়কে মানব সভ্যতার জন্য মধ্য যুগ বা অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন এই কারণে যে, এই সময়ে বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, কলা, চিত্রকর্মে মানব জাতির কোনো উন্নতি হয়নি বললেই চলে। ৩৫০ সাল থেকে ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত কনস্টান্টিনের কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর অক্ষত ছিল। যখন ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর ভেঙ্গে যায় তখন-ই ১৪৫৪ সালের ৯ই এপ্রিল লদির শান্তি চুক্তির মাধ্যমে রেনেসাঁর আবির্ভাবের পটভূমি তৈরি হয়। ফলস্রুতিতে ১৪৯২ সালে ইতালিতে প্রথম রেনেসাঁর উদ্ভব হয় যা পরবর্তীতে সারা ইউরোপ এবং পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। রেনেসাঁর যুগ হচ্ছে মূলত প্রাচীন গ্রীক ও রোমের প্রাচীনত্বের মতাদর্শ ভিত্তিক যুগের অগ্রগামিতার একটি যুগ । রেনেসাঁ শব্দের অর্থ হচ্ছে পুনঃ জাগরণ। নাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, দীর্ঘদিন পর বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ পুনরায় চালু হওয়াতে তারা এই যুগকে পুনঃ জাগরণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। রেনেসাঁ থেকেই বর্তমান আধুনিক বিশ্বের প্রায় সকল মতাদর্শ এসেছে যার শিকড় হচ্ছে প্রাচীন গ্রীক মতাদর্শ।

এখন প্রশ্ন আসে, সুলতান মাহমুদ-২ ও তার বাহিনী কি ইয়াজুজ-মাজুজ ছিলেন? তারা তো মুসলিম ছিলেন। এই প্রশ্নের উত্তর তিরমিযী ৩১৫৩ নাম্বার হাদিসে আছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "ইয়াজুজ ও মাজুজ প্রতিদিন মাটি খুঁড়ে, এমনকি যখন তারা সূর্যের রশ্মি দেখতে পায়, তখন তাদের নিয়ন্ত্রক ব্যাক্তি বলে: "ফিরে যাও, আমরা আগামীকাল মাটি খুঁড়বো।" তারপর আল্লাহ তা'আলা এটিকে আগের চেয়ে শক্তিশালী করে দেন। (এটি চলতে থাকবে) এমনকি যখন তাদের সময় এসে যাবে, এবং আল্লাহ তাদেরকে মানুষের বিরুদ্ধে পাঠাতে চান, তখন তারা মাটি খুঁড়বে, এমনকি তারা সূর্যের রশ্মি দেখতে পায়, তখন তাদের নিয়ন্ত্রক/ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি বলবে: "ফিরে যাও, আমরা আগামীকাল মাটি খুঁড়বো, ইনশা-আল্লাহ (যদি আল্লাহ চান)।" তখন তারা বলবে: " ইনশা-আল্লাহ (যদি আল্লাহ চান)।" তারপর তারা সেখানে ফিরে আসবে এবং তারা যেমন রেখেছিল তেমনই থাকবে। তাই তারা মাটি খুঁড়ে মানুষের কাছে বেরিয়ে আসবে এবং তারা সমস্ত পানি পান করবে। লোকেরা নিজেদের দুর্গে তাদের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে শক্তিশালী করবে। তারা আকাশের দিকে তীর ছুঁড়বে এবং সেগুলো রক্ত মাখা অবস্থায় তাদের নিকট ফিরে আসবে এবং তারা বলবে: "আমরা পৃথিবীবাসীদের পরাজিত করেছি এবং আসমানবাসীদের উপর কর্তৃত্ব করেছি।" "অতঃপর আল্লাহ তাদের ঘাড়ের নীচে একটি কীট প্রেরণ করবেন এবং এর মাধ্যমে তাদের হত্যা করবেন।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ,

পৃথিবীর পশুরা তাদের মাংস খেয়ে মোটাতাজা হবে।" (সুনান ইবনে মাজাহ ৪০৮০) [তিরমিযিঃ ৩১৫৩, ইবনে মাজাহঃ ৪১৯৯, হাকিম মুস্তাদরাকঃ ৪/৪৮৮, মুসনাদে আহমাদঃ ২/৫১০, ৫১১]।

এখানে পরিষ্কার যে, যারা জুলকারনাইনের প্রাচীর ভাঙতে আসবে তাদের নেতা সমাজে মুসলিম হিসেবে স্বীকৃত থাকবে এই হাদিস থেকে এটা পরিষ্কার কারণ 'ইনশা-আল্লাহ' কথাটি মুসলিমরাই বলে থাকে। এখানে একটি বিষয় খেয়াল করার মত – আল্লাহ এর রসূল সাঃ উক্ত ব্যক্তিকে মুসলিম বলে অভিহিত করেন নি। তিনি বলেছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি "ইনশা-আল্লাহ" বলবে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে, সেই ব্যাক্তিকে আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি দেন নি।

যারা যাদুতে বিশ্বাস করে, ভবিষ্যতবাণী জানার জন্য যাদুকরদের কাছে যায় তারা সবাই ইয়াজুজ-মাজুজের অন্তর্ভুক্ত যদিও সেই ব্যাক্তি সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হয়।

অটোমান সাম্রাজ্যের (উসমানীয় খেলাফতের) পূর্বপুরুষ সেলজুকদের মধ্যে যাদুবিদ্যার প্রচলন ছিল যার মাধ্যমে মুলত ভবিষ্যতবাণী করা হত এবং জানতে চাওয়া হত ভবিষ্যতে কোন কাজ করলে লাভ না ক্ষতি হবে। রাজা, বাদশাহদের মধ্যে যাদুকরদের কাছে যাওয়ার প্রবণতা বেশি ছিল কারণ তারা জানতে চাইত ভবিষ্যতে কোনো যুদ্ধ-অভিযান পরিচালনা করলে – তাতে তারা যুদ্ধে হারবে নাকি জিতবে?

"অটোমানদের প্রাসাদের দুটি অংশ ছিল: এন্দেরুন (অভ্যন্তরীণ অংশ) এবং বিরুন (বাহ্যিক অংশ)। এন্দেরুনের লোকেরা প্রাসাদে বাস করত। বিরুনের বাইরে ঘর ছিল। তারা ছিলেন মাদ্রাসায় শিক্ষিত পণ্ডিত (ওলেমা), যেমন সুলতানের শিক্ষক, প্রধান চিকিৎসক, প্রধান শল্যচিকিৎসক, চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং মুনাজ্জিম-বাশি (প্রধান জ্যোতিষী)। মুনাজ্জিম-বাশির অবস্থান ১৫ শতকের শেষের দিকে এবং ১৬ শতকের প্রথম দিকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাসাদের জন্য পঞ্জিকা আকারে প্রথম ক্যালেন্ডার পাওয়া যায় দ্বিতীয় মুরাদের (১৪২১-১৪৫১) রাজত্বকালে। মাহরুসে-ই ইস্তাম্বুল ফেতিহনামেসি নামে একটি ইতিহাস বই থেকে জানা যায় যে ফাতিহ সুলতান মেহমেদ-২ (কনস্টান্টিনোপল বিজয়ী; ১৪৫১-১৪৮১) কিছু জ্যোতিষীর (মুনাজ্জিমের) সাথে পরামর্শ করেছিলেন। আরেকটি বই, "তারিহি আতা"-তে, 'ফাতিহ সুলতান মেহমেদ দ্য কনকাররের' মুনাজ্জিমকে 'ফাতিহ আসেম মেহমেত এফেন্দি' হিসেবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু তার সম্পর্কে অন্য কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তবুও, এই বইগুলির সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে ফাতিহ (সুলতান মাহমুদ- ২) মুনাজ্জিমদের সাথে পরামর্শ করছিলেন"। (প্রকাশিত 2007, বারিস ইলহান, সিএ, এনসিজিআর; দ্য অ্যাস্ট্রোলজি অফ অটোমান এম্পায়ার; পৃষ্ঠা-22)

অটোম্যানদের পূর্বপুরুষ সেলজুক সময় থেকেই এই জাতির প্রধানরা জ্যোতিষীদের কাছ থেকে ভবিষ্যতবাণী নিত। অটোম্যান সুলতান মাহমুদ-২ কনস্টান্টিনোপল বিজয় করেন ১৪৫৩ সালে আর প্রথম ক্যালেন্ডার পাওয়া যায় মুরাদ-২ (১৪২১-১৪৫১) এর শাসন আমলের যিনি সুলতান মাহমুদের আগে অটোমেন সম্রাট ছিলেন।

সুলতান বায়েজিদ-২ (১৪৮১-১৫১২ সাল) এর শাসন আমলে জ্যোতির্বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ্যার ব্যাপক প্রচার প্রসার ঘটে। ১৬ তম শতাব্দীতে রাজপ্রাসাদে বসবাসকারীদের জন্য বাৎসরিক ক্যালেন্ডার, রমজানের সময়, রাশিচক্র horoscopes (zayice) প্রস্তুত করতেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসাব করে বের করতেন, আগামী বছর কখন যুদ্ধ করলে, বিয়ে, ইত্যাদি করলে ভালো হবে। তারা আকাশে তারা, উল্কাপিণ্ডের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন এবং চন্দ্র গ্রহন ও সূর্যগ্রহন পর্যবেক্ষণ দেখে এসবের ব্যাখ্যা প্রাসাদের লোকদের জানাতেন। এ সকল জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা/জ্যোতিষী (munajjims) ও প্রধান জ্যোতির্বিজ্ঞানী/জ্যোতিষী (munajjim-bashi) প্রাসাদের বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিল। অর্থাৎ ভবিষ্যৎবানীর ব্যাপারটি অটোমান সাম্রাজ্যে বহু আগে থেকেই প্রচলন ছিল যা ১০ম শতক থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত ধীরে ধীরে ব্যাপক প্রসার পেয়েছে। এমনকি ভবিষ্যতবাণী নেয়ার প্রথাটি অটোমানদের পূর্ব পুরুষ সেলজুকদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। প্রাথমিকভাবে এটি সম্রাটদের মধ্যে প্রচলন থাকলেও ধীরে ধীরে তা সব জায়গায় ছড়িয়ে যায়। (প্রকাশিত ২০০৭, বারিস ইলহান, সিএ, এনসিজিআর; দ্য অ্যাস্ট্রোলজি অফ অটোমান এম্পায়ার; পৃষ্ঠা-২২)

সুতরাং এরা যে ইয়াজুজ-মাজুজের দল এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ জ্যোতিষীদের কাছে গেলে এবং তাদের থেকে ভবিষ্যৎ বাণী নিয়ে বিশ্বাস করলে কেউ আর মুসলিম থাকতে পারে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোন গণকের/যাদুকরের কাছে গিয়ে তাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, তার চল্লিশ রাত পর্যন্ত নামাজ কবুল হবে না।" (মুসলিম-২২৩০) থেকে বর্ণিত।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি ঋতুবতী মহিলার সাথে, অথবা কোন মহিলার পায়ুপথ দিয়ে সহবাস করে, অথবা কোন গণকের (যাদুকরের) কাছে যায় এবং তার কথা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে অবিশ্বাস করল" । "(সুনান ইবনে মাজাহ - খণ্ড ১, হাদিস ৬৩৯)

ইসলামে যারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করে তাদেরকে যাদুকর বা গণক বলা হয়।

সুলতান মাহমুদের সবচেয়ে বড় ২৭ ফুট দৈর্ঘ্যের কামানটি (The Basilic) অরবান (Orban/Urban) নামের একজন হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানী তৈরি করে দিয়েছিল যাকে গ্রীক ইতিহাসবিদ Laonikos Chalkokondyles ডেসিয়ান বলে অভিহিত করেছেন। এটি যুদ্ধখেত্রে নিয়ে যেতে ৯০ টি ষাঁড় এবং ৪০০ লোক লেগেছিল। এর গোলার ওজন ছিল ৫৪০-৬০০ কেজির মত। মূলত এই কামানের গোলাই কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরকে ভাঙতে বড় ভুমিকা রেখেছে। আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) যে বলেছেন, "ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যেহ যুলকারনাইনের দেয়ালটি খুঁড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা এ প্রাচীরের প্রান্ত সীমার এত কাছাকাছি পৌছে যায় যে, অপরপাশ্বের আলো দেখা যেতে থাকে, তখন তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকটি বলে, 'চলে যাও আগামীকাল খুঁড়ব'। কিন্তু আল্লাহ প্রাচীরটিকে পূর্বের চেয়ে আরও মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে নেন।" এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কারণ সুলতান মাহমুদ ৫৫ দিন

ধরে প্রাচীরে কামানের গোলা দিয়ে আঘাত করেছেন; ইতিহাসবিদরা বলেন যে, প্রাচীরের ধ্বংস প্রাপ্ত দেয়ালের যে ধ্বংসস্তূপ হচ্ছিল তা জমে গিয়ে যেন দেয়ালের মত কাজ করছিল এবং এই ধ্বংসস্তূপকে ভাঙা বা সরানো যেন আরও বেশি কঠিন হয়ে যায়- এই ধ্বংসস্তূপ যেন প্রাচীরের চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল যা ভেদ করতে আরও অনেকদিন গোলা নিক্ষেপ করতে হয়েছিল। প্রতিদিন গোলার আঘাতে প্রাচীরের যে ছোট ছোট অংশগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হত তা বাইজেনটাইনরা (ইস্টর্ন রোমান এম্পায়ারের আরেক নাম বাইজেনটাইন এম্পায়ার) রাতেই মেরামত করে ফেলত। এভাবে চলতে চলতে একদিন আল্লাহ এর হুকুমে গোলার আঘাতে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের একটি অংশ ভেঙ্গে পড়ে। আল্লাহ এর রসূলের সাঃ কথার সাথে ইতিহাসের এই কথাগুলোর মিল আমরা খুঁজে পাচ্ছি। এছাড়া সুলতান মাহমুদ-২ এর বাহিনীতে হাজার হাজার খ্রিষ্টান সেনা ছিল। খ্রিষ্টানরা মূলত পৈত্তলিক কারণ তারা ইসা আঃ এবং উনার মাতা মরিয়মের মূর্তি নির্মাণ করে। আর পৈত্তলিকরাই হচ্ছে ইয়াজুজ।

এছাড়া ইয়াজুজ-মাজুজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে – এরা জমিনে অশান্তি করে। সুলতান মাহমুদের সৈন্যরা কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর ৩ দিন ধরে কোন ধরণের নিয়মনীতি ছাড়াই অর্থোডক্স গির্জা ধ্বংস, অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের গণহত্যা, ব্যাপক লুটপাট, গণধর্ষণের যে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি করেছিল তা হতে পরিষ্কার যে, সুলতান মাহমুদের দলে প্রচুর পরিমাণে ইয়াজুজ-মাজুজের উপস্থিতি ছিল। সুলতান মেহমুদ-২ এর বিজ্ঞানী অরবান ও তার দল যে যাদুতে (বিজ্ঞানে) বিশ্বাসী ছিল – এটা তো নিশ্চিত-ই কারণ সে ছিল অমুসলিম এবং বিজ্ঞানী। যাদুতে বা বিজ্ঞানে বিশ্বাসীরাই হচ্ছে মাজুজ।

হাদিসে, আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজকে মানুষের বিরুদ্ধে পাঠাবেন বলা হয়েছে – এই কথার অর্থ কি? আমি মনে করি, এই কথার অর্থ হচ্ছে ইয়াজুজ-মাজুজ যে টেকনোলজি নিয়ে আসবে তা মানুষকে ধ্বংস করবে। ভয়াবহ বোমা, যুদ্ধবিমান ও না না রকম ভয়াবহ যুদ্ধের অস্ত্র আবিস্কার করবে ইয়াজুজ-মাজুজ যা নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে হত্যা করবে, ইয়াজুজ-মাজুজের মতবাদ - Dualism/দ্বৈতবাদ – (গনতন্ত্র) মানুষকে দলে দলে ভাগ করে দিবে – ফলে মানুষের মধ্যে শান্তি থাকবে না, সমাজে ন্যায় বিচার বলতে কিছুই থাকবে না।

"তাই তারা (ইয়াজুজ-মাজুজ) মাটি খুঁড়ে মানুষের কাছে বেরিয়ে আসবে "– ইয়াজুজ-মাজুজ মানুষের মধ্যে বের হয়ে আসবে - এই কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে তারা মানুষের মধ্যে তাদের বিশ্বাস, জ্ঞান ও মতাদর্শ (বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য,পলিটিকাল সায়েন্স, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও গনতন্ত্রের জ্ঞান, ইত্যাদি) ছড়িয়ে দিবে। ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর ধ্বংসের পরই ইউরোপে আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্রের (প্রিন্টিং প্রেস) আবিস্কার এবং উন্নয়ন হয়, যার ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের যাদুর জ্ঞান(জ্যোতির্বিদ্যা), মতাদর্শ, বিশ্বাস সারা পৃথিবীতে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রিন্ট করা বিভিন্ন বই থেকে সকলেই যাদুবিদ্যা/জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান অর্জন করতে শুরু করে। পূর্বে যাদুকররা/বিজ্ঞানীরা অল্প কিছু মানুষের মধ্যে তাদের যাদুর জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে পারলেও আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্রের

(প্রিন্টিং প্রেস) আবিস্কারের ফলে তারা ধ্রুপদী প্রাচীনত্ব (Classical Antiquity) এবং গ্রিক-রোমান সভ্যতার মতাদর্শ, জরথুষ্ট্রবাদের দ্বৈতবাদের জ্ঞান ও যাদুর জ্ঞানের (জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ও বিজ্ঞানের) বই, পত্রিকা দ্রুতই সারা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে দেয়।

ইয়াজুজ- মাজুজ তাদের জ্ঞান ও মতাদর্শ সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে এতটাই ছড়িয়ে দিয়েছে যে, এখন সারা বিশ্বের মানুষ একই ধরণের পোশাক পড়ছে, একই ধরণের চিন্তাভাবনা করছে। আলাদা কৃষ্টি, সংস্কৃতি বলতে এখন আর কোথাও কিছু নেই – সকলেই ইয়াজুজ-মাজুজের মতাদর্শ, খাদ্য, পোশাক,গান ,বাজনা, চিন্তাভাবনা গ্রহন করে ইয়াজুজ- মাজুজ হয়ে গেছে। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার ছেলে-মেয়েদের পোশাক একই হয়ে যাচ্ছে; আগের মত সাংস্কৃতিক কোনো পার্থক্য এখন আর নেই- অর্থাৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা (বই, পত্রিকা, টেলিভিশন, ইন্টারনেট) উন্নত হওয়ায় ইয়াজুজ-মাজুজের জ্ঞান এখন দ্রুতই সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে।

এখন আপনি সমাজের যেখানেই যাবেন সেখানেই জরথুষ্ট্রবাদের দ্বৈতবাদ (Dualism) পাবেন। যেমনঃ রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারি দল বনাম বিরোধী দল, কারখানা বা বেসরকারি বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে মালিক পক্ষ বনাম শ্রমিক ইউনিয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ বনাম ছাত্র সংসদ, পরিবারে পুরুষ বনাম নারী অধিকার – এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই –যেখানে জরথুষ্ট্রবাদের দ্বৈতবাদ (Dualism) প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্কুল – কলেজে বিজ্ঞানের নামে মহাকাশ সম্পর্কিত জ্ঞান তথা যাদুর প্রাথমিক জ্ঞান দেয়া হচ্ছে যেমনঃ ভুমিকম্প হয় মাটির নিচে টাইটোনিক প্লেটের অবস্থান পরিবর্তনের কারণে, জোয়ার –ভাটা হয় চাদের অবস্থান পরিবর্তনের কারণে, বাংলাদেশে বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টিপাত হয় মৌসুমি বায়ুর কারণে, ইত্যাদি। সৃষ্টিকর্তার কোন স্বীকৃতি এই লেখাপড়া বা বিজ্ঞান চর্চায় নেই। এখানে, আল্লাহ যে বৃষ্টি, ভুমিকম্প, জোয়ার-ভাটা দেন তার বদলে এগুলো ঘটার কারণ হিসেবে মৌসুমি বায়ু, টাইটোনিক প্লেটের নড়াচড়া ও চাঁদের অবস্থান ও আকর্ষণ শক্তিকে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। পরীক্ষার খাতায় কোন ছাত্র যদি এই কথা লিখে বা বলে যে, মৌসুমি বায়ুর কারণে বাংলাদেশে বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টিপাত হয় –তাহলে তার কি ঈমান থাকবে? সে তো মাজুজদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এমন কি কেউ যদি বলে যে, "পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার" তাহলেও সে জ্যোতির্বিদ্যা বা জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশ্বাসী বলে গণ্য হবে ফলে যাদুতে বিশ্বাসী অর্থাৎ মাজুজদের অন্তর্ভুক্ত হবে কারণ আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) বলেছেন, যে যত বেশি জ্যোতির্বিদ্যা (মহাকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান) অর্জন করল সে আসলে তত বেশি যাদু বিদ্যাই অর্জন করল। [আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও আহমদ কর্তৃক বর্ণিত] - [সুনান আবু দাউদ - ৩৯০৫] ইসলামে যাদুবিদ্যা অর্জন করা হারাম।

আমার মতে, ইয়াজুজ-মাজুজের যাদুর (জ্যোতির্বিজ্ঞানের) জ্ঞান এবং দ্বৈতবাদের জ্ঞান সকল মানুষের মধ্যে প্রচার -প্রসার, চর্চা ও স্বীকৃতি পাওয়াই হচ্ছে ইয়াজুজ-মাজুজের মানুষের মধ্যে বের হয়ে আসা। এখন সমাজের সকল স্কুল- কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান চর্চার নামে ইয়াজুজ –মাজুজের আল্লাহ বিরোধী যাদুর জ্ঞান অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হচ্ছে – এটাই হচ্ছে ইয়াজুজ-মাজুজের মানুষের মধ্যে বের হয়ে আসা।

এখন আমরা মোটামুটি নিশ্চিত যে, কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর-ই (Wall of Constantinople) হচ্ছে জুলকারনাইনের নির্মিত প্রাচীর। কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর নির্মাণ করেছেন রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন (Constantine) যাকে অনেকে কনস্টানটাইন দ্য গ্রেট (Constantine the Great) বলে থাকেন।

কনস্টানটাইনই কি জুলকারনাইন?

কনস্টানটাইন ছিলেন একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাসক। তাঁর জীবন ও শাসনের সাথে সম্পর্কিত কোনও সমসাময়িক ইতিহাস বা জীবনী এখন আর টিকে নেই। কনস্টানটাইন ২৭শে ফেব্রুয়ারী, আনুমানিক ২৭২ খ্রিস্টাব্দে নাইসাস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কনস্টানটাইন তার বাবা কনস্টানটিয়াসের (Constantius) সাথে খুব কম সময় কাটাতেন যিনি রোমান সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন, সম্রাট অরেলিয়ানের রাজকীয় দেহরক্ষীর অংশ ছিলেন। একজন সহনশীল এবং রাজনৈতিকভাবে দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে কনস্টানটিয়াস (Constantius) কর্মজীবনে দ্রুতই উপরের দিকে অগ্রসর হন এবং রোমান সম্রাট ডায়োক্লেটিয়ানের কাছ থেকে ডালমাটিয়ার গভর্নর পদ অর্জন করেন।

২৯৩ সালে ডায়োক্লেটিয়ান (Diocletian) সাম্রাজ্যকে ভাগ করে দেন, পূর্ব ও পশ্চিমের আরও উপবিভাগের উপর শাসন করার জন্য দুজন সিজারকে নিযুক্ত করেন। প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ অগাস্টাসের অধীনস্থ থাকবেন কিন্তু তাদের নির্ধারিত ভূমিতে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের সাথে কাজ করবেন। এই ব্যবস্থাকে পরবর্তীতে টেট্রার্কি (Tetrarchy) বলা হয়। সিজারের পদে ডায়োক্লেটিয়ানের প্রথম নিযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন কনস্ট্যান্টিয়াস (কনস্টানটাইনের পিতা)। কনস্টানটাইনের বাবা সিজার পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই কনস্টানটাইন ভবিষ্যতে সিজার হিসেবে নিয়োগের জন্য প্রধান প্রার্থী হয়ে ওঠেন। কনস্টানটাইন ডায়োক্লেটিয়ানের দরবারে যান, যেখানে তিনি তার বাবার সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী হিসেবে বসবাস করতেন।

পূর্বদিকে কনস্টানটাইন

৩০৩ সালের বসন্তের মধ্যে কনস্টানটাইন পূর্ব ফ্রন্ট থেকে নিকোমিডিয়ায় আসেন, সেই সময় তিনি ডায়োক্লেটিয়ানের "ভয়াবহ নির্যাতন" শুরু হওয়ার সাক্ষী হন, যা রোমান ইতিহাসে খ্রিস্টানদের (ইসা আসঃ এর অনুসারী) উপর সবচেয়ে ভয়াবহ নির্যাতন ছিল। ৩০২ সালের শেষের দিকে, ডায়োক্লেটিয়ান এবং গ্যালেরিয়াস খ্রিস্টানদের সম্পর্কে জানার জন্য ডিডিমায় অ্যাপোলোর (Apollo) দৈববাণী (Oracle) শুনতে একজন দূত পাঠান। কনস্টানটাইন যখন ডিডিমা থেকে দূত ফিরে আসেন তখন প্রাসাদে তার উপস্থিতির কথা মনে করতে পারেন। সম্রাট ডায়োক্লেটিয়ান খ্রিষ্টানদের (ইসাঃ এর অনুসারীদের) উপর সর্বজনীন নির্যাতনের জন্য রাজকীয় আদালতের দাবি মেনে নেন। ৩০৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ডায়োক্লেটিয়ান নিকোমিডিয়ার নতুন গির্জা ধ্বংস করার নির্দেশ দেন, ইসা আঃ এর অনুসারীদের ধর্মগ্রন্থগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে দেন এবং ইসা আঃ এর

অনুসারীদের ধনসম্পদ জব্দ করেন। পরবর্তী মাসগুলিতে, গির্জা এবং ধর্মগ্রন্থ ধ্বংস করা হয়, ইসা আঃ এর অনুসারীদের সরকারী পদ থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং পুরোহিতদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এখানে কিছু জানার বিষয় আছেঃ ৩০৩ সালে যারা খ্রিষ্টান ছিল তারা প্রকৃত অর্থে ইসা (আঃ) এর অনুসারী ছিল। তাদের সবার মধ্যে ইসাঃ এর প্রকৃত আদর্শ ছিল কি না – সেটা জানা সম্ভব নয় কিন্তু খ্রিষ্টানরা যাদুবিদ্যার বিরুদ্ধে ছিল – এটা নিশ্চিত (আমরা একথাও ধরে নিতে পারি যে, তখনো কিছু খ্রিস্টানের মধ্যে ইসা (আঃ) এর প্রকৃত আদর্শ – যে আদর্শের কথা ইসলাম বলে তা ছিল)। কিন্তু তখনকার সময়ের রোমান সম্রাট ডায়োক্লেটিয়ান এবং গ্যালেরিয়াস ছিল যাদুবিদ্যা ও যাদুকরদের অন্ধ ভক্ত, তারা যাদুকরদের অন্ধের মত বিশ্বাস করত। তাই, তখনকার খ্রিষ্টান ধর্ম বিশ্বাস যেহেতু যাদুকরদের বিরুদ্ধে ছিল তাই ডায়োক্লেটিয়ান এবং গ্যালেরিয়াস যখন খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে একজন যাদুকরের কাছে মতামত চাইতে গেল তখন সেই যাদুকর সকল খ্রিষ্টানদের নির্যাতনের নির্দেশ দেয়। তখনকার সময়ের রোমানরা জানত না যে, আসলে এরা যাদুকর –তারা মনে করত এরা সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে তথ্য পায় কারণ যাদুকরদের অনেক ভবিষ্যৎবানী মিলে যেত। অ্যাপোলোকে (Apollo) রোমানরা তীরবাজি,গান, নাচ,ভবিষ্যতবাণী, সূর্য, রোগ -সুস্থতা,ইত্যাদির ঈশ্বর (god) বলে বিশ্বাস করত। তারা আরও বিশ্বাস করত যে, এই God এবং অন্যান্য god ওরাকলের (Oracle) এর মাধ্যমে কথা বলে বা ভবিষ্যতবাণী দেয়। ওরাকল কোন ব্যাক্তি বা বস্তু উভয়-ই হতে পারে। এরা আসলে যাদুকর ছিল কিন্তু রোমানরা এদেরকেই ধর্মগুরু হিসেবে মানত। রোমানদের এই ধর্মকে বর্তমানে রোমান ধর্ম বা পৈত্তলিক ধর্ম বলে।

(পৈত্তলিক ধর্ম কাকে বলে? পৈত্তলিক ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যে ধর্মে মূর্তিপূজা করা হয় বা মূর্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, আগুনের পুজা করা হয় বা আগুনকে সম্মান করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ধর্মমতে বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টিকর্তার ছেলে মেয়ে, স্ত্রী, বাবা- মা, ইত্যাদি থাকতে পারে। তারা প্রচুর দেব –দেবী বা 'god' আছে এরূপ বিশ্বাস করে। এই সংজ্ঞা মতে বর্তমান কালের খ্রিষ্টান ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, বৌদ্ধধর্মও পৈত্তলিক ধর্মের মধ্যেই পড়ে। তাই, বর্তমানকালে ইসলামের অনুসারীরা ছাড়া সকল ধর্মের লোক-ই ইয়াজুজ এর অন্তর্ভুক্ত হবে)

আমরা জানি, কোরআন নাযিলের আগ পর্যন্ত জীনেরা মহাকাশে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে পারত এবং তারাই এই সব ওরাকলদের (Oracle) বিভিন্ন ভবিষ্যৎবানী করার জন্য তথ্য দিতো বলে বুঝা যায়। আর এই সবকিছুকেই ইসলামে যাদু বলা হয়। অর্থাৎ রোমান ধর্ম (পৈত্তলিক ধর্ম) জরথুস্ত্রবাদের মত (Zoroastrianism) যাদুবিদ্যা দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

এই সময়ে কনস্টানটাইন কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন সেটা জানা যায়নি তবে এটুকু জানা যায় যে, এই সময়ে তিনি ইসা (আঃ) এর অনুসারীদের (খ্রিষ্টান) বিরুদ্ধে নির্যাতনে অংশগ্রহন করেননি। এখন আমরা কোরআনের আয়াতের সাথে এই ঘটনাগুলোকে মিলাব। মনে রাখতে হবে যে, জুলকারনাইন নিয়ে কোরআনের সূরা কাহাফে যে আয়াতগুলো আছে সেগুলোর রূপক অর্থ (Metaphor) আছে।

“আবার সে এক পথ ধরল। (৮৯) চলতে চলতে সে সূর্যোদয়ের স্থানে পৌঁছল। সে সূর্যকে এমন এক জাতির উপর উদয় হতে দেখতে পেল, আমি যাদের জন্য সূর্য থেকে বাঁচার কোন আড়ালের ব্যবস্থা করিনি”। (৯০) (সূরা কাহফঃ ৮৯-৯০)

এখানে সূর্য উদয়ের স্থান বলতে পূর্বদিক বুঝানো হয়েছে। কনস্টানটাইন পূর্বদিকে গিয়েছে। সূর্যের থেকে আড়াল না পাওয়ার অর্থ হচ্ছে সূর্যের তাপে কষ্ট পাওয়া। পূর্বদিকে গিয়ে কনস্টানটাইন দেখেছেন যে, ইসা আঃ এর অনুসারীদের উপর নির্যাতন চলছে, তাদের কষ্ট হচ্ছে কিন্তু তাদের পক্ষে কেউ নেই – এই বিষয়টাকেই আল্লাহ রূপকভাবে বুঝিয়েছেন যে, ইসা আঃ এর অনুসারীদের উপর রোমান পৈত্তলিকরা যে নির্যাতন করছে তাতে ইসা আঃ এর অনুসারীদের কষ্ট হচ্ছে, সেই কষ্ট থেকে বাচার জন্য ইসা আঃ এর অনুসারীদের (খ্রিস্টানদের) কোন উপায় বা আড়াল আল্লাহ রাখেননি।

পশ্চিম দিকে কনস্টানটাইন

কনস্টানটাইন গ্যালেরিয়াসের দরবারে থাকার অন্তর্নিহিত বিপদ বুঝতে পেরেছিলেন, যেখানে তাকে কার্যত জিম্মি হিসেবে রাখা হয়েছিল। তার ক্যারিয়ার পশ্চিমে তার বাবার দ্বারা উদ্ধার পাওয়ার উপর নির্ভর করছিল। কনস্টানটাইন দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি গ্যালেরিয়াসের কাছ থেকে লুকিয়ে পশ্চিমে ব্রিটেনে তার বাবার কাছে চলে যান। কিছুদিন পর তার বাবা মারা যাওয়ার আগে কনস্টানটাইনকে নতুন রোমান সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। ব্যাপক প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ শুরু হয়, কনস্টানটাইন অনেকগুলো যুদ্ধ করেন এবং সকল ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ দমন করে তিনিই রোমের সফল সম্রাট হিসেবে আবির্ভূত হন। কনস্টানটাইন ২৯ অক্টোবর ৩১২ তারিখে রোমে প্রবেশ করেন এবং শহরে এক বিশাল অভিযান করেন যা আনন্দ-উল্লাস দিয়ে বরণ করা হয়। ৩১৩ সালে, তিনি মিলানে লিকিনিয়াসের সাথে দেখা করেন; লিকিনিয়াস এবং কনস্টানটাইনের সৎ বোন কনস্টানটিয়ার মধ্যে বিবাহ হয় যা তাদের মৈত্রী নিশ্চিত করে। এই বৈঠকের সময়, সম্রাট কনস্টানটাইন ও লিকিনিয়াস ‘মিলানের আদেশে’ (Edict of Milan) সম্মত হন যা আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রিস্টধর্ম এবং সাম্রাজ্যের সকল ধর্মের প্রতি পূর্ণ সহনশীলতা প্রদান করে। এই দলিলে খ্রিস্টানদের জন্য বিশেষ সুবিধা ছিল, তাদের ধর্মকে বৈধতা দেওয়া হয় এবং ডায়োক্লেটিয়ানের নিপীড়নের সময় জব্দ করা সমস্ত সম্পত্তি তাদের পুনরুদ্ধার করে দেয়ার আশ্বাস প্রদান করা হয়। অর্থাৎ এই আদেশের মাধ্যমে খ্রিষ্টানদের (ইসা আঃ এর অনুসারীদের) উপর নির্যাতন বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে লিকিনিয়াস বিশ্বাসঘাতকতা করে কনস্টানটাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হলে কনস্টানটাইন তাকে দমন করেন।

এখন আমরা কোরআনের আয়াতের সাথে এই ঘটনাগুলোকে মিলিয়ে দেখবঃ

“একবার সে (জুলকারনাইন) এক রাস্তা ধরল। (৮৫) চলতে চলতে যখন সে সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছল, তখন সে সূর্যকে অস্বচ্ছ জলাশয়ে ডুবতে দেখল আর সেখানে একটি জাতির লোকেদের সাক্ষাৎ পেল। আমি বললাম, ‘হে যুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার কিংবা তাদের সঙ্গে (সদয়) ব্যবহারও করতে পার।’ (৮৬) (সূরা কাহফঃ৮৫-৮৬)

এখানে সূর্যাস্তের স্থান মানে হচ্ছে পশ্চিম দিক কারণ সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। সেখানে সূর্যকে অস্বচ্ছ জলাশয়ে ডুবতে দেখার অর্থ, আমার মনে হচ্ছে, রোম ভিত্তিক রোমান সাম্রাজ্যের নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র ও অন্তর্দ্বন্দ্বে রোমান সাম্রাজ্যের সূর্য ডুবে যাচ্ছে। রোমান সাম্রাজ্য আর বেশিদিন টিকবে না। আমরা জানি, ৪৭৬ সালে রোম ভিত্তিক পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়। রোম থেকে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টানটাইন কনস্টান্টিনোপলে নিয়ে আসেন ৩৩০ সালে। তাহলে, রোম ভিত্তিক পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের আধিপত্যের পতন ৩৩০ সালেই হয়ে যায় কারণ ৩৩০ সালের পর রোমের আর রোমান সাম্রাজ্যে তেমন কোন প্রভাব থাকে না।

তাই, পশ্চিমে গিয়ে জুলকারনাইন যে ঘোলা জলে সূর্য ডোবা দেখেছেন সেটি আসলে ষড়যন্ত্র, অন্তর্দ্বন্দ্বতে রোমের পতন।

“সে বলল, ‘যে ব্যক্তি যুলম করবে আমি তাকে অচিরেই শাস্তি দেব, অতঃপর তাকে তার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে, তখন তিনি তাকে কঠিন ‘আযাব দেবেন” । (৮৭) (সূরা কাহফ ৮৭)

আগের আয়াতে আল্লাহ জুলকারনাইনকে বলেছিলেন যে, জুলকারনাইন চাইলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারে বা ক্ষমাও করতে পারে। জুলকারনাইন তাদেরকে শাস্তি দেয়াটাকেই বেছে নেন। আমরা দেখছি যে, কনস্টানটাইন যুদ্ধ করে ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের হত্যা করেন অর্থাৎ অপরাধীদের শাস্তি দেন। কনস্টানটাইন নিজের স্ত্রী ও পুত্রকেও অপরাধ করার কারণে হত্যা করেছিলেন।

এখন আমরা নিশ্চিত হলাম যে, কনস্টানটাইন-ই হচ্ছেন জুলকারনাইন। আল্লাহ চাইলে, বিষয়টা সামনে আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

“তারপর সে আরেক পথ ধরল। (৯২) চলতে চলতে সে দু’ পাহাড়ের মাঝে এসে পৌঁছল। সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল। যারা ভাষা কমই বুঝতে পারে। (৯৩) তারা বলল, ‘হে যুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়া’জূজ ও মা’জূজ যমীনে অশান্তি তৈরি করছে, তাই আমরা কি আপনাকে এ জন্য কিছু খরচ দেব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটা প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন’? (৯৪) সে বলল, ‘আমাকে আমার প্রতিপালক যা দিয়েছেন তা-ই যথেষ্ট, কাজেই তোমরা আমাকে শক্তি-শ্রম দিয়ে সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে এক সুদৃঢ় প্রাচীর গড়ে দেব। (৯৫) আমার কাছে লোহার পাত এনে দাও।’ শেষ পর্যন্ত যখন সে দু’পাহাড়ের

মাঝের ফাঁকা জায়গা পুরোপুরি ভরাট করে দিল সে বলল, 'তোমরা হাপরে দম দিতে থাক।' শেষ পর্যন্ত যখন তা আগুনের মত লাল হয়ে গেল তখন সে বলল, 'আনো, আমি এর উপর গলিত তামা ঢেলে দেব।'(৯৬) এরপর তারা (অর্থাৎ ইয়াজূজ-মা'জুজ) তা অতিক্রম করতে পারবে না, আর তা ভেদ করতেও পারবে না। (৯৭) সে বলল, 'এ আমার প্রতিপালকের করুণা, যখন আমার প্রতিপালকের ওয়া'দার নির্দিষ্ট সময় আসবে, তখন তিনি তাকে ধূলিসাৎ করে দেবেন আর আমার প্রতিপালকের ওয়া'দা সত্য। (৯৮) (সূরা কাহফঃ৯২-৯৮)

"চলতে চলতে সে দু' পাহাড়ের মাঝে এসে পৌঁছল। সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল। যারা ভাষা কমই বুঝতে পারে। "(৯৩) (সূরা কাহফঃ৯৩)

এই আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, জুলকারনাইন চলতে চলতে দু'পাহাড়ের মাঝে এসে পড়ে অর্থাৎ ২ টি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের/জাতির মাঝে এসে পড়ে। কনস্টানটাইন ২ টি শক্তিশালী সাম্রাজ্য - রোমান সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্যের মাঝে কনস্টান্টিনোপলে এসে পড়েন।

"এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ভাষা কমই বুঝতে পারে" – আল্লাহ চাইলে, এই কথার ব্যাখ্যা পড়ে এই বইয়ে পাবেন। তারা বলল, 'হে যুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়া'জূজ ও মা'জূজ যমীনে অশান্তি তৈরি করছে, তাই আমরা কি আপনাকে এ জন্য কিছু খরচ দেব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটা প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন'? (৯৪) (সূরা কাহফঃ৯৪)

আমার মতে এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, ঐ জায়গার লোকেরা (অর্থাৎ ইসা আঃ এর অনুসারীরা) কনস্টানটাইনকে বলল যে, রোম ভিত্তিক রোমান সাম্রাজ্য বা গ্রেকো রোমান সভ্যতা এবং পারস্য সাম্রাজ্য, যারা পৈত্তলিক ও যাদুবিদ্যায় পারদর্শী, পৃথিবীতে অনেক অশান্তি করছে; কনস্টানটাইন কি তাদের জন্য একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিবেন যাতে তারা নিরাপদে থাকতে পারে?

সম্রাট কনস্টানটাইন কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর পুরো কনস্টান্টিনোপল শহরকে ঘিরে তৈরি করেছিলেন।

সে বলল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক যা দিয়েছেন তা-ই যথেষ্ট, কাজেই তোমরা আমাকে শক্তি-শ্রম দিয়ে সহযোগিতা কর, আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে এক সুদৃঢ় প্রাচীর গড়ে দেব। (৯৫) (সূরা কাহফঃ ৯৬)

জুলকারনাইন/ কনস্টানটাইন বলেছিলেন যে, তিনি দুই সাম্রাজ্য - পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে শক্তিশালী এক প্রাচীর তৈরি করে দিবেন এজন্য তাকে টাকা বা অর্থ দিতে হবে না কারণ আল্লাহ তাকে রোমান সম্রাট করেছেন, সুতরাং প্রাচীর নির্মাণের জন্য তার কাছে যথেষ্ট টাকা আছে; তিনি এই কাজে এই সকল লোকদের শক্তি ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করতে বলেছিলেন।

'আমার কাছে লোহার পাত এনে দাও।' শেষ পর্যন্ত যখন সে দু'পাহাড়ের মাঝের ফাঁকা জায়গা পুরোপুরি ভরাট করে দিল সে বলল, 'তোমরা হাপরে দম দিতে থাক।' শেষ পর্যন্ত যখন তা আগুনের মত লাল হয়ে গেল তখন সে বলল, 'আনো, আমি এর উপর গলিত তামা ঢেলে দেব।' (৯৬) (সূরা কাহফঃ৯৬)

এখানে লোহার পাত বলতে রূপক অর্থে শাস্তি বা নিষ্ক্রিয় করা বা অসার করাকে বুঝানো হয়েছে।

কোরআনে আল্লাহ অন্য কিছু আয়াতে বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন অপরাধীদের লোহার বেড়ি পড়ানো হবে। এই আয়াতগুলোতে কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদের লোহার বেড়ি পড়ানোর মানে হচ্ছে – এটা তাদের জন্য শাস্তি বা নিষ্ক্রিয় করা। এই অর্থটিই আমি এই সূরা কাহাফের ৯৬ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যায় নিচ্ছি।

দু'পাহাড়ের মাঝের জায়গা ভরাট করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে এর ভিতর দিয়ে কিছু যেতে বা আসতে পারবে না। কনস্টানটাইন রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানীকে রোম থেকে কনস্টান্টিনোপলে নিয়ে আসেন। যেখানে রাজধানী হয় সেই জায়গা সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে ভরে উঠে। আর রাজধানীকে ভেদ করে পারস্য সাম্রাজ্যের যাদুকর/বিজ্ঞানী ও পশ্চিমা রোম ভিত্তিক গ্রীক-রোমান যাদুকরদের/বিজ্ঞানীদের/ পৈত্তলিকদের মিলন হবার সম্ভাবনা নেই। যদি রাজধানীকে ভেদ করতেই হয় তাহলে পারস্য সাম্রাজ্য রোমান সাম্রাজ্যকে হারাতে হবে কারণ রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী-ই এখন কনস্টান্টিনোপলে। কিন্তু রোমানরা এটা মেনে নিবে না। মূলত জুলকারনাইনের এই প্রাচীরটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্য ও পশ্চিমা যাদুকর এবং পৈত্তলিকদের মধ্যে যাতে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন না হয় সেটা নিশ্চিত করা। পশ্চিমে খ্রিষ্টানরা যেন যাদুবিদ্যাকে নিজেদের ধর্মের ভিতরে ঢুকিয়ে ধর্ম ও যাদুর মিশ্রণ তৈরি না করে এবং গ্রীক রোমান সভ্যতার মতাদর্শের (প্রাচীনত্বের) বিরোধিতা করে তার জন্য একটি জ্ঞানের সংরক্ষক দেয়াল। কনস্টান্টিনোপলে যে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী নিয়ে আসা হয়েছে – এটাই হচ্ছে জুলকারনাইনের প্রাচীর যা দুই সাম্রাজ্যের মানুষদের পরস্পর থেকে আলাদা রাখবে ফলে তারা যাদুবিদ্যার ও পৈত্তলিকতার তথ্য আদান-প্রদান করতে পারবে না। রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী যদি রোমে থাকত তাহলে পারস্য হয়তো রোমান সাম্রাজ্যের কনস্টান্টিনোপল দখল করে নিলে রোমানরা ততটা ক্ষিপ্ত হত না যতটা ক্ষিপ্ত এখন রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে পারস্য হামলা করলে রোমানরা হবে – কারণ রাজধানীর পতন তো কোনভাবেই কোন সাম্রাজ্য মেনে নিবে না। পৈত্তলিক ও যাদুকরদের এই দুই সাম্রাজ্য এক হলেই তারা মানুষের জন্য অপ্রতিরোধ্য হয়ে যাবে। এজন্য রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম থেকে কনস্টান্টিনোপলে সরিয়ে আনাই হচ্ছে জুলকারনাইনের প্রাচীরের একটি অংশ। কনস্টান্টিনোপল ও এতে সংরক্ষিত জ্ঞানই যাদুকর সাম্রাজ্যের তথা পারস্য ও গ্রীক রোমান সভ্যতার (প্রাচীনত্বকে) অগ্রসর হবার পথে বাধার প্রাচীর স্বরূপ। কনস্টান্টিনোপলকে সংরক্ষিত করার জন্য যে প্রাচীর জুলকারনাইন পুরো শহরকে ঘিরে তৈরি করেছেন তা মূল প্রাচীর কনস্টান্টিনোপল শহরকে সংরক্ষণ করবে কারণ কনস্টান্টিনোপলের পতন হলে এতে সংরক্ষিত জ্ঞান ও হারিয়ে যাবে যা জাদুবিদ্যাকে এবং গ্রীক রোমান সভ্যতাকে (প্রাচীনত্বকে) প্রতিরোধ করত। এই জ্ঞান হচ্ছে ইসা

আঃ এর অনুসারীদের/ খ্রিষ্টানদের মধ্যে থাকা সেই জ্ঞান যার মাধ্যমে তারা কোনটি যাদুবিদ্যা ও 'সৃষ্টিকর্তা বিরোধী মতাদর্শ' সেটি চিনতে পারত এবং এর প্রতিরোধ করত।

পারস্যের সাথে কনস্টান্টিনোপলের অনেকবার যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু পারস্য সাম্রাজ্য কখনই কনস্টান্টিনোপল নামের এই প্রাচীরকে ভাঙতে পারেনি। জুলকারনাইন যে বলেছে, "তোমরা হাপরে দম দিতে থাক" – এর মাধ্যমে লোহাকে আগুনের মত গরম করা – এর মানে হচ্ছে কনস্টান্টিনোপল প্রতিটি যুদ্ধেই পারস্যকে অসার, নিষ্ক্রিয় করেছে। অর্থাৎ আগুনের মত গরম লোহায় হাত দিলে যেমনি হাত পুড়ে যায় তেমনি কনস্টান্টিনোপলে যতবার পারস্য হাত দিয়েছে ততবার তাদের হাত পুড়ে গেছে অর্থাৎ পারস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে – যাদুকররা ও যাদুতে বিশ্বাসীরা দুর্বল হয়ে গেছে, তারা তাদের যাদুবিদ্যা ও মতাদর্শ মানুষের মধ্যে প্রচার করতে পারেনি। তেমনিভাবে কনস্টান্টিনোপলে (বাইজেনটাইন এম্পায়ারে) যতদিন অর্থোডক্স চার্চ (eastern Oxthodox church) শক্তিশালী অবস্থানে ছিল ততদিন তারা পশ্চিমা রোমান বা গ্রেকো রোমান সিভিলাইজেশনের (Greko Roman World/Civilization) দ্বারা প্রভাবিত ক্যাথোলিক চার্চে তথা সকল খ্রিষ্টানদের মধ্যে পৈত্তলিকতা, প্রাচীনত্বের মতাদর্শের অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করেছে এবং তারা অনেকাংশে সফলও ছিল। জুলকারনাইন বলেছে যে, তোমরা হাপরে দম দিতে থাকো – আমি মনে করি, এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই দুই সাম্রাজ্যের/ মতাদর্শের (গ্রেকো রোমান সিভিলাইজেশনের এবং পারস্য সাম্রাজ্যের) বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখো – হাপরে দম দিতে থাকো – অর্থাৎ কনস্টান্টিনোপলের অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করতে থাকো যাতে এই শহর নিরাপদ থাকে। তারপর সে বলেছে যে, 'আনো, আমি এর উপর গলিত তামা ঢেলে দেব।' গলিত তামা ঢেলে দেবার মানে হচ্ছে কোন কিছুকে আরও সুরক্ষিত করা। কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর তৈরি করে কনস্টানটাইন এই শহরকে (রাজধানী কনস্টান্টিনোপলকে) আরও সুরক্ষিত করেছেন। এই প্রাচীর ধ্বংস না করে বা ভেদ না করে কেউই দুই সাম্রাজ্যকে আলাদা করে রাখা রাজধানী কনস্টান্টিনোপল নামক প্রাচীরকে ভেদ করতে পারবে না এবং এই শহরের মানুষের মধ্যে জাদুবিরোধি ও পৈত্তলিকতা বিরোধী যে জ্ঞানের প্রাচীর আছে তা অক্ষত থাকবে। মূলত জুলকারনাইনের প্রাচীর (কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর) পৃথিবীতে দ্বৈতবাদ, নাস্তিকতা, যাদুবিদ্যা (বিজ্ঞান) এবং পৈত্তলিকতাকে নতুন রূপে আবির্ভূত হওয়া থেকে বাধা দিয়ে রেখেছিল।

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ ডেকে বলবেন, হে আদম! তিনি বলবেন, আমি তোমার খিদমতে হাযির। যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ বলবেন, জাহান্নামীদের (নিক্ষেপ করার জন্য) বের কর। আদম (আঃ) বলবেন, কী পরিমাণ জাহান্নামী বের করব? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। আর এটা ঘটবে ঐ সময়, যখন (কিয়ামতের ভয়াবহতায়) শিশু বুড়িয়ে যাবে। (আয়াত): আর প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করে ফেলবে, আর মানুষকে দেখবে মাতাল, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে মাতাল নয়, কিন্তু আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠিন (যার কারণে তাদের ঐ অবস্থা ঘটবে)- (সূরাহ হাজ্জ ২২/২) ।

এ ব্যাপারটি সাহাবাগণের নিকট বড় কঠিন মনে হল। তখন তাঁরা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্য থেকে (মুক্তি প্রাপ্ত) সেই লোকটি কে হবেন? তিনি বললেনঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর যে ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে এক হাজার আর তোমাদের হবে একজন" । (সাহিহ বুখারি ৬৫৩০)

এই হাদিসে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ এর রসূল আদম আঃ থেকে শুরু করে সর্বশেষ যেই লোক জাহান্নামে যাবে তাদের সবাইকেই ইয়াজুজ-মাজুজ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ আদম আঃ এর সময়ের যে সকল লোক ছিল তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে যাবে তারাও ইয়াজুজ-মাজুজ। তাহলে জুলকারনাইন কোন ইয়াজুজ-মাজুজকে প্রাচীর দিয়ে আটকালেন? সূরা কাহফের ৯৪ নাম্বার আয়াতে এই প্রশ্নের উত্তর আছে ।

তারা বলল, 'হে যুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়া'জূজ ও মা'জূজ যমীনে অশান্তি তৈরি করছে, তাই আমরা কি আপনাকে এ জন্য কিছু খরচ দেব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটা প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন'? (৯৪) (সূরা কাহফঃ৯৪)

খেয়াল করে দেখুন, তারা জুলকারনাইনকে কি বলছে? তারা বলছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজ জমিনে অশান্তি করছে অর্থাৎ ইয়াজুজ –মাজুজ জুলকারনাইনের প্রাচীর নির্মাণের আগে থেকেই জমিনে মুক্ত অবস্থায় ছিল এবং তারা অশান্তি করছিল।

যারাই যমীনে অশান্তি করে তারা সকলেই ইয়াজুজ-মাজুজের অন্তর্ভুক্ত তাই প্রতিটি অবিশ্বাসী যারা জাহান্নামে যাবে তারা সবাই ইয়াজুজ-মাজুজ। ইয়াজুজ-মাজুজকে জুলকারনাইন প্রাচীর দিয়ে মানবজাতির ভিতরে প্রবেশ থেকে বাধা দিয়ে রেখেছেন কথাটির অর্থ হচ্ছে ইয়াজুজ-মাজুজকে আল্লাহ বিরোধিতার - পরবর্তী ধাপে যাওয়া থেকে আটকে রেখেছিল জুলকারনাইনের প্রাচীর। ইয়াজুজ মাজুজের মতাদর্শ, বিশ্বাস ও যাদুর জ্ঞান মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া থেকে বাধা দিয়ে আটকে রেখেছিল এই প্রাচীর। জুলকারনাইনের প্রাচীর ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ১৪৫৩ সাল থেকে ইয়াজুজ-মাজুজ আল্লাহ বিরোধিতার নতুন বা আরও নিম্ন স্তরে প্রবেশ করেছে। শিরক, কুফরের নতুন ধারণা ও অবিশ্বাসের নতুন দাওয়াত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে যা জুলকারনাইনের প্রাচীর ভাঙ্গার আগ পর্যন্ত মানব সমাজে বিদ্যমান ছিল না। যেমনঃ দ্বৈতবাদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানের নামে যাদুবিদ্যা, আল্লাহ এর হুকুমে জমিতে ফসল হয় এর বদলে সার ও কীটনাশকের ফলে ফসল হয় – এই ধরনের হাজারো বিশ্বাস। সবচেয়ে ভয়াবহ যেই কাজটা তারা করেছে তা হচ্ছে 'রব', মালিক, সৃষ্টিকর্তা বলতে কি বুঝায় - তার সংজ্ঞাই তারা পালটে দিয়েছে ফলে মানুষ রব হিসেবে আল্লাহকে আর ডাকছে না কারণ 'রব' কাকে বলে সেটাই তো মানুষ এখন জানে না ফলে নিজেকে নামাযী জানা সত্ত্বেও আসলে সে যে ইয়াজুজ-মাজুজ ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে গেছে সেটা সে বুঝতে পারছে না । জুলাকারনাইন যে প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন তা ছিল জ্ঞানের সংরক্ষক প্রাচীর আর তার কাজ ছিল রব কাকে বলে- তার সংজ্ঞা ঠিক রাখা, সবকিছু যেমনঃ ফসল, বন্যা, ঝড়বৃষ্টি, অসুস্থতা, ভুমিকম্প, ইত্যাদি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে হয় – এই বিশ্বাসকে ঠিক রাখা। একজন মানুষ ইহুদী, খ্রিষ্টান,

মুসলিম,হিন্দু হতে পারে কিন্তু সে যেন জানে – 'রব' এর সংজ্ঞা কি ? সে যেন সৃষ্টিকর্তাকে সবকিছু করনেওয়ালা, দেনেওয়ালা, আইনদাতা হিসেবে বিশ্বাস করে – এই বিশ্বাসগুলোকে ঠিক রাখার কাজ করেছে জুলকারনাইনের প্রাচীর। এই প্রাচীর ভেঙ্গে যাওয়ার পর মানুষ এখন সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে অন্যকিছুকে বন্যার কারণ, বৃষ্টির কারণ, অসুস্থতা কারণ হিসেবে বিশ্বাস করছে – এই রকম হাজারো বিশ্বাসে মানুষ এখন সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করছে। আল্লাহকে বিশ্বাসের পরিবর্তে বন্যা ঠেকাতে বাঁধ, ভুমিকম্প ঠেকাতে ভুমিকম্প প্রতিরোধী বাড়ি, ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতি ঠেকাতে পূর্বাভাসের উপর বিশ্বাস করছে। অর্থাৎ জুলকারনাইনের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ার পর মানুষ ধর্মকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানে বিশ্বাস শুরু করেছে, বিজ্ঞান যেহেতু সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে না তাই মুসলিম, খ্রিষ্টান, ইহুদী নির্বিশেষে যারাই এখন সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করছে, তারাই নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে ভয়াবহ নাস্তিকতার উদ্ভব হয়েছে যদিও মানুষ নিজেও জানে না যে – সে আসলে নাস্তিক হয়ে গেছে; সে গির্জায় যায়, মসজিদে যায়, মন্দিরে যায়, প্যাগোডায় যায় কিন্তু বিশ্বাস করে যে, মাটিতে সঠিক মাত্রায় সার ও কীটনাশক দেয়ার ফলে ফসল ভালো হয়েছে - যা একটি নাস্তিকের বিশ্বাস। ইয়াজুজ- মাজুজ জুলকারনাইনের প্রাচীর ভাঙ্গার পর প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের বা বিশ্বাসের বা মতাদর্শের সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা, নাম পরিবর্তন করেছে যেমনঃ জ্যোতির্বিদ্যাকে জ্যোতিরর্বিজ্ঞান নামে, কনস্টান্টিনোপলকে ইস্তানবুল নামে, ইত্যাদি।

১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ার পরের বছর ১৪৫৪ সালের ৯-ই এপ্রিল লদির শান্তি চুক্তির (Treaty of Lodi; Peace of Lodi) মাধ্যমে ইউরোপে রেনেসার উদ্ভবের পটভূমি তৈরি হয়েছিল। সেই রেনেসাঁর সময় থেকেই পৃথিবীতে নতুন সরকার ব্যবস্থা এসেছে। মানুষকে বিশ্বাস করানো হয়েছে যে – মানুষই সকল কিছুর পরিমাপক! (humanism) – যে মতাদর্শের শিকড় হচ্ছে গ্রীক পৈত্তলিক ধর্ম বিশ্বাস বা আদর্শ। অর্থাৎ মানুষ নিজেই নির্ধারণ করবে কোনটা অন্যায়, কোনটা ন্যায় - চুরি করলে কি শাস্তি হবে? বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক ভালো না মন্দ ? মদ পান মন্দ কাজ না স্বাভাবিক মানবিক ব্যাপার? সৃষ্টিকর্তাকে আইনদাতা হিসেবে অস্বীকার করে মানুষকে আইনদাতা হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে।

মূলত জুলকারনাইনের প্রাচীর ছিল জ্ঞানের সংরক্ষক প্রাচীর যেই জ্ঞানকে কনস্টান্টিনোপলের খ্রিষ্টান/ ইসা আঃ এর অনুসারী পুরোহিতরা এবং অর্থোডক্স খ্রিষ্টানরা সংরক্ষণ করত। কনস্টান্টিনোপলে যে অর্থোডক্স চার্চ ছিল তা ইসা আঃ এর প্রকৃত বিশ্বাস না হলেও তারা যাদুবিদ্যা/ জ্যোতির্বিদ্যা ও পৈত্তলিকতা থেকে খ্রিষ্টান ধর্মকে যথাসম্ভব পরিষ্কার রেখেছিল –যেহেতু পৃথিবীর সকল চার্চ ও ধর্মযাজকরা নিজেদের মধ্যে জ্ঞান ও বিশ্বাসের চর্চা আদান-প্রদান করে- তাই যতদিন কনস্টান্টিনোপল টিকে ছিল ততদিন যাদুবিদ্যা / জ্যোতির্বিদ্যা পুরো ইউরোপের কোথাও বড় ধরণের প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি কিন্তু ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর ৩ দিন ধরে সুলতান মাহমুদের বাহিনী যাদেরকে আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) ইয়াজুজ-মাজুজের বাহিনী বলেছেন; তারা ব্যাপক লুটপাট, হত্যা, গির্জা ধ্বংস করা, ধর্ষণ করার ফলে খ্রিষ্টানদের এই জাদুবিরোধি / জ্যোতির্বিদ্যা বিরোধী

ধারার লোকেরা (অর্থোডক্স চার্চ) দুর্বল হয়ে পড়ে, তারা ইউরোপে (মুলত রাশিয়ায়) গিয়ে আশ্রয় নেয় কিন্তু সম্বলহীন এই লোকেরা/পুরোহিতরা আর কখনোই তাদের প্রভাব বা বিশ্বাস ইউরোপে দাড়া করাতে পারেনি কারণ তারা নিজেরাই তখন আশ্রিত। এইভাবে জুলকারনাইন জ্ঞানের যে প্রাচীর যাদুকর (জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের) ও পৈত্তলিকদের সামনে দাড় করিয়েছিলেন সেটা ধ্বংস হয়ে যায়। এটা বুঝতে হলে আমাদেরকে তখনকার সময়ের ইসা আঃ এর অনুসারীদের অবস্থা এবং সেই সময়ে কনস্টানটাইন কখন কোন কাজ করেছেন –সেটা বুঝতে হবে।

যতটুকু জানা যায়, কনস্টানটাইন ৩১৩ সালে Edict of Milan জারি করার পর নিজেকে প্রকাশ্যে ইসা আঃ এর অনুসারী হিসেবে ঘোষণা করেন। (এই আলোচনায় এখন থেকে খ্রিষ্টান শব্দটি ব্যাবহার না করে আমি ইসা আঃ এর অনুসারী কথাটি ব্যাবহার করবো তাহলে তখনকার পরিস্থিতি বুঝতে আপনাদের আরও সুবিধা হবে।) কনস্টানটাইন চাইছিলেন ইসা (আঃ) এর ধর্মকে এবং এর অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, সুসংহত করতে। তিনি ইসা (আঃ) এর ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেখা যায়, ইসা (আঃ) এর অনুসারীদের মধ্যে অনেক মত পার্থক্য, বিশ্বাসের পার্থক্য আছে এবং তাদের ধর্মীয় আচারেও অনেক পার্থক্য দেখা যাচ্ছিল। তাই তিনি একটি কাউন্সিল (সভা) ডেকেছিলেন ৩২৫ সালে যা Council of Nicea নামে পরিচিত। তিনি চাচ্ছিলেন ইসা আঃ এর অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে যাতে পূর্বের মত ইসা আঃ এর অনুসারীরা আর নির্যাতনের শিকার না হয় – কোন বহিঃশত্রু বা অন্য কোন ধর্মে বিশ্বাসী জাতি যেন খ্রিস্টানদের/ ইসা আঃ এর অনুসারীদের উপর অত্যাচার করতে না পারে। আমরা জানি, ঐক্যবদ্ধ না থাকলে পরাজয় ,পতন ও নির্যাতিত হওয়া নিশ্চিত। তখনকার সময়ে ইসা আঃ এর অনুসারীদের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও সকলেই নিজেদের ইসা আঃ এর সঠিক অনুসারী বলে দাবী করছিল আর প্রত্যেকটি বিশ্বাসের পক্ষেই নেতৃত্বে ছিল পুরোহিত/আলেমরা ফলে কাউকেই অবিশ্বাসী বলে ঘোষণা দেয়া সম্ভব ছিল না; তাহলে ইসা আঃ এর অনুসারীদের মধ্যেই গৃহযুদ্ধ লেগে যাবার আশংকা ছিল। এজন্য কনস্টানটাইন তখনকার সময়ের ইসা আঃ এর অনুসারীদের আলেম/পুরোহিত/ বিশপদের নিয়ে একটি ঐক্যমত্যে পৌঁছানোর জন্য একটি কাউন্সিল (সভা) ডেকেছিলেন ৩২৫ সালে। এই কাউন্সিলে কনস্টানটাইন কোন মতামত দেননি বা কোন ভোটও দেন নি কারণ তিনি কোন আলেম বা পুরোহিত ছিলেন না। তিনি অন্য আলেমদের/ বিশপদের উপস্থিতিতে বিবাদমান আলেমদের/বিশপদের আলোচনা শুনেন। আলোচনা শেষে আলেমদের/ পুরোহিতদের ভোটের আয়োজন করা হয়। কাউন্সিলে মোট ৩২৩ ভোট পড়েছিল। ভোটের বিষয় ছিল ইসা আঃ আল্লাহ এর পুত্র কি না? Trinity (একের ভিতর তিন) সঠিক কি না?

আলেকজান্দ্রিয়ার গির্জায় আরিয়াস নামে একজন বিশপ ছিলেন, যিনি বলেছিলেন যে ইসা আঃ এবং পবিত্র আত্মা (জিব্রাইল আঃ) হলেন আল্লাহ এর সৃষ্টি। তার প্রতিপক্ষ আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ/পুরোহিত/আলেম আলেকজান্ডার বলেছিলেন যে আল্লাহ , ইসা আঃ এবং পবিত্র আত্মা (জিব্রাইল আঃ) এক বস্তু, কিন্তু তিন ব্যক্তি

(Trinity)। অর্থাৎ বিশপ আলেকজান্ডার Trinity এর পক্ষে ছিলেন; তিনি ইসা আঃ কে আল্লাহ এর পুত্র বলে দাবী করেছিলেন। অপরদিকে বিশপ/আলেম/পুরোহিত আরিয়াস বলেছিলেন, ইসা আঃ এবং জিব্রাইল আঃ উভয়েই আল্লাহ এর সৃষ্টি ; তিনি Triniti (একের ভিতর তিন) এর বিরুদ্ধে ছিলেন।

কোরআনের আলোকে আমরা বুঝতে পারছি যে, বিশপ/আলেম/পুরোহিত আরিয়াস-ই সঠিক ছিলেন। কিন্তু তখনকার সময়ের ইসা আঃ এর অনুসারী বলে দাবী করা আলেম/বিশপদের ভোটাভুটিতে আরিয়াসের মতাদর্শের পক্ষে ভোট পড়ে ৫ টি আর আলেকজান্ডারের মতাদর্শের পক্ষে ভোট পড়ে ৩১৮ টি। ফলে প্রায় সকল গির্জায় আলেকজান্ডারের মতাদর্শ (Trinity) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশপ আরিয়াস আলেকজান্ডারের এই মতবাদ (Trinity) কখনোই মেনে নেননি। এই সময়ে কনস্টানটাইন সত্যটা জানতেন এবং হয়তো এই জন্যই - ভোটের এই ফলাফলকে কখনো রাষ্ট্রীয় আদেশ আকারে জারি করেননি। ফলে ইসা আঃ আল্লাহ এর পুত্র কি না? – এই ব্যাপারটি নিয়ে ইসা আঃ এর অনুসারীদের মধ্যে বিভেদ থেকেই যায়। ভোটের এই ফলাফল 'Nicene Creed' নামে পরিচিত যা পরবর্তীতে কনস্টানটাইনের মৃত্যুর পর ইস্টার্ন রোমান সম্রাট (বাইজেন্টাইন সম্রাট) থিওডেসিয়াস-১ (Theodosius I) ৩৮১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে তা সকল চার্চে অনুসরণ করতে বলে ফলে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রায় সকল চার্চে Trinity এর বিস্তার ঘটে।

আল্লাহ যে, সূরা কাহফে জুলকারনাইনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "……তারা ভাষা কম-ই বুঝে… (সূরা কাহফঃ ৯৩)"

আমি মনে করি, এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, জুলকারনাইন (কনস্টানটাইন) এমন লোকদের জন্য প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন যারা ইনজিলের (বাইবেলের) ভাষা বুঝতে পারেনি। বর্তমানকালে যে বাইবেল পাওয়া যায়, যা ইঞ্জিলের বিকৃতরূপ সেখানেও আছে যে, ইসা আঃ বলছেন, "My Father is greater than I (John 14-28) (অর্থঃ আমার পিতা (*) আমার চেয়ে বড়). "I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me" (KJV John-5-30). (অর্থঃ "আমি নিজে থেকে কিছুই করতে পারি না; যেমন শুনি, তেমনই বিচার করি; আর আমার বিচার ন্যায্য; কারণ আমি নিজের ইচ্ছামত কাজ করি না, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছামত কাজ করি" – এখান থেকে তো পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, ইসা আঃ আল্লাহ এর রসূল ছিলেন। (*)বাইবেলে আল্লাহকে "God the Father" বলা হয়েছে। বাইবেলের ভাষায় সৃষ্টিকর্তাকে God the Father বলা হয়)

মূল ইঞ্জিলেতো শিরক থাকার প্রশ্নই আসে না কিন্তু কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক রোমান সাম্রাজ্যের খ্রিষ্টান পুরোহিতরা ও সাধারণ খ্রিষ্টানরা ইঞ্জিলের ভুল অর্থ বুঝেছে বা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছে তাই তারা বিশপ আলেকজান্ডারের মতাদর্শ (Trinity) এবং 'ইসা আঃ আল্লাহ এর পুত্র' এর পক্ষে ভোট দিয়েছে – মানে তারা

ইঞ্জিলের ভাষা বুঝতে পারেনি –তাই তারা ভাষাতো কম-ই বুঝে বরং অহঙ্কার করে যিনি সঠিক বুঝেছেন সেই বিশপ/আলেম আরিউসকে (Arius) গির্জা থেকে বের করে দিয়েছিল। পরবর্তীতে আরিউসের বিশ্বাস ও মতাদর্শ থেকে ইসা আঃ এর অনুসারীদের একটি শাখা বের হয় যার নাম দেয়া হয় 'আরিয়ানিসম' (Arianism) যারা Trinity তে বিশ্বাস করত না এবং ইসা আঃ কে আল্লাহ এর রসূল হিসেবে মানত। যতটুকু জানা যায় এবং বুঝা যায়, শেষ পর্যন্ত, এই 'আরিয়ানিসম' (Arianism) শাখায় থেকে এবং ইসা আঃ আল্লাহ এর রসূল – এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী এবং এই মতাদর্শের উপর-ই কনস্টানটাইন মারা যান। সুতরাং, কনস্টানটাইন আসলে ছিলেন ইসা আঃ এর একজন প্রকৃত অনুসারী –অর্থাৎ তিনি একজন মুসলিম ছিলেন। পরবর্তীতে 'আরিয়ানিসম' (Arianism) ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায় এবং খ্রিষ্টানদের এই শাখাটি বর্তমানে আর নেই। কনস্টানটাইনের মৃত্যুর পর বর্তমানে তার অনেক মূর্তি ও না না ধরণের শিরকি কথা তার সম্পর্কে খ্রিষ্টানরা বললেও তিনি যে এই সব কিছুতে জড়িত ছিলেন না তার প্রমাণ এটাই যে, তিনি ইসা আঃ কে আল্লাহ এর নবী ও রসূল হিসেবে বিশ্বাস করতেন এবং Trinity (একের ভিতর তিন) তে বিশ্বাস করতেন না।

জুলকারনাইনের প্রাচীরের মূল উদ্দেশ্য যে, দুই সাম্রাজের লোকদের মিলনের ফলে দ্বৈতবাদ ও যাদুবিদ্যাকে (জ্যোতির্বিদ্যাকে/ বিজ্ঞানকে) ও পৈত্তলিকতাকে ছড়িয়ে পড়তে না দেয়া, সেটা হাদিস থেকেও বুঝা যায়ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন ঘুম থেকে এমন অবস্থায় জেগে উঠলেন যে, তার মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাভ এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিলঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী! আজই ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী মিলিয়ে বৃত্ত তৈরী করে দেখান। যয়নব (রাঃ) বলেনঃ আমি এ কথা শুনে বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ লোক জীবিত থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, ধ্বংস হতে পারে; যদি অনাচারের আধিক্য হয়।" [বুখারীঃ ৩৩৪৬,৩০৯৭ মুসলিমঃ ২৮৮০]।

যইনব বিনতে জাহাস (রাঃ) ইসলাম গ্রহন করেন ৬২২ সালে আর আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) মারা যান ৬৩২/৬৩৩ সালে। ৬৩০ সালে পারস্য ও কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে শান্তি চুক্তি হয় – এর মানে হচ্ছে কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক রোমান সাম্রাজ্য দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী এবং যাদুতে বিশ্বাসী পারস্য সাম্রাজ্যকে বাধা দেয়ার কাজ বা দমনের কাজ আর করবে না বরং উভয়ের মধ্যে যাওয়া আসা হবে, তথ্য আদান-প্রদান হবে ফলে পৃথিবীব্যাপী যাদুবিদ্যা/ জ্যোতির্বিদ্যা ও দ্বৈতবাদ কিছুটা হলেও ছড়িয়ে পড়বে। এজন্যই হয়তো নবী (সাঃ) বলেছেন যে, আজই ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী মিলিয়ে বৃত্ত তৈরী করে দেখান। একটি প্রাচীর বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী মিলিয়ে যে বৃত্ত হয় ততটুকু ছিদ্র হবার মানে হচ্ছে এটি রূপক অর্থে ছিদ্র হয়েছে অর্থাৎ ঈমানের জন্য ক্ষতিকর যে জ্ঞান এই প্রাচীর আটকে রেখেছিল তা এইরকম ছোট একটি ছিদ্র দিয়ে বের হওয়া শুরু হয়েছে। এখান থেকে আরেকটি কথাও আমরা বুঝতে পারি যে, জুলকারনাইন যে জ্ঞানের প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন তা একদিনেই পুরোটা ভেঙ্গে পড়বে না বরং তা ধীরে ধীরে

ভেঙ্গে পড়বে অর্থাৎ আল্লাহ বিরোধী যে জ্ঞান জুলকারনাইনের প্রাচীর আটকে রেখেছিল তা ধীরে ধীরে দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে এবং সব শেষে যখন সম্পূর্ণ প্রাচীরটি ভেঙ্গে পড়বে –তখন আল্লাহ বিরোধী জ্ঞান দ্রুত সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে। ১৪৫৩ সাল থেকে যেমনটি হয়েছে।

যতটুকু জানা যায়, কনস্টানটাইন ইসা আঃ এর শিক্ষার উপরই মৃত্যু বরণ করেন। এখানে আমাদের একটা বিষয় বুঝা দরকার যে, ২য় ও ৩য় শতাব্দীতে ইসা আঃ এর জমানা ছিল। উনার অনুসারীদের মধ্যে অনেক দল/ফিরকা ছিল যেমনি বর্তমানে মুহাম্মাদ সাঃ এর অনুসারীদের মধ্যে অনেক দল/ফিরকা আছে কিন্তু আমরা সবাই নিজেদের মুহাম্মাদ সাঃ এর অনুসারী বলে দাবী করি এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মত বলে দাবী করি। আমরা কেউই, এক দল অন্য কোন দলকে কাফির ঘোষণা করি না। ২য়,৩য় শতাব্দীতে আজকে আমরা যাদেরকে খ্রিষ্টান বলে ডাকি তারা সবাই নিজেদেরকে ইসা আঃ এর অনুসারী বলে দাবী করত, তাদের মধ্যে অনেক ফিরকা বা দল থাকলেও তারা কেউই কাউকে অবিশ্বাসী বলে ঘোষণা দিতে পারত না। কনস্টানটাইন সত্যটা জানলেও ৯৯% বিশপের (আলেমের) বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি কিছু করতে পারতেন না –তাহলে গৃহযুদ্ধ লেগে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল বলেই মনে হয় –এজন্যই হয়তো তিনি জোর করে ইসা আঃ এর সঠিক পরিচয়কে মানুষের উপর চাপিয়ে দেননি। তাছাড়া কনস্টানটাইন নিজে কোন বিশপ (আলেম) ছিলেন না, ফলে ধর্মের বিষয়ে মানুষ তার কথা - না শোনার-ই কথা। এ সকল কারণে হয়তো কনস্টানটাইন সবকিছু জেনেও জোর করে সত্যিটাকে কারো উপর চাপিয়ে দেননি।

কনস্টানটাইন চেয়েছিলেন ইসা আঃ এর অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে এবং পারস্য ও রোম ভিত্তিক গ্রেকো-রোমান সাম্রাজ্যের / সভ্যতার অত্যাচার থেকে ইসা আঃ এর অনুসারীদের রক্ষা করতে, এজন্যই তিনি রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম থেকে কনস্টান্টিনোপলে সরিয়ে নিয়ে আসেন এবং কনস্টান্টিনোপলের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রাচীর নির্মাণ করেন।

কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর কিভাবে ইয়াজুজ-মাজুজকে আল্লাহ এর সীমা লঙ্ঘনের পরবর্তী ধাপে যেতে বাধা দিয়েছে?

কনস্টানটাইন অনেক চার্চ নির্মাণ করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম ভ্যাটিকান সিটিতে নির্মিত সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা (St. Peter's Basilica) যা কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবার পর ১৫০৬ সালে গ্রেকো রোমান সভ্যতার নতুন রূপ রেনেসাঁর (Italian High Renaissance) সময় সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পুনঃ নির্মাণ করা হয়।

কনস্টানটাইনের মৃত্যুর পর থেকেই গ্রীকদের পৈত্তলিক মতাদর্শ খ্রিষ্টান ধর্মালম্বিদের মধ্যে প্রবেশ করা শুরু করে। কনস্টান্টিনোপলের উপর প্রথম আঘাত আসে থিওডোসিয়াস-১ এর মৃত্যুর পর। সম্রাট থিওডোসিয়াস-১ (Theodosius-1) পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটরা গ্রেকো রোমান সভ্যতা (Classical Antiquity/ প্রাচীনত্ব) কে

কঠোরভাবে দমন করেছিলেন। থিওডোসিয়াস-১ (Theodosius-1) রোমানদের প্রচলিত অলিম্পিক গেমস বন্ধ করে দেন, যা রোমানরা তাদের বিশ্বাসে God Zeus এর সম্মানার্থে আয়োজন করত। এ সময় কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক রোমান সম্রাটরা প্ল্যাটোনিক স্কুলও বন্ধ করে দিয়েছিলেন যেখানে দার্শনিক প্লাটোর মতাদর্শ শিক্ষা দেয়া হত।

কিন্তু থিওডোসিয়াস-১ এর মৃত্যুর পর কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক রোমান সাম্রাজ্য ২ ভাগে ভেঙ্গে যায়। কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক ইস্টার্ণ রোমান এম্পায়ারের সম্রাট হন আর্কাডিয়াস (Arcadius) আর রোম ভিত্তিক পশ্চিমা রোমান এম্পায়ারের সম্রাট হন তার ভাই অনারিয়াস (Honorius). এই ঘটনার পর থেকে কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক ইস্টার্ণ রোমান এম্পায়ারকে আধুনিক ইতিহাসবিদরা নাম দিয়েছেন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য (Byzantine Empire) আর রোম ভিত্তিক পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যকে সরাসরি নাম দেন রোমান এম্পায়ার। বর্তমান আধুনিক ইতিহাসবিদদের কাছে গ্রীক মতাদর্শ ভিত্তিক গ্রেকো রোমান এম্পায়ারই হচ্ছে আসল রোমান এম্পায়ার, মাঝখানে কনস্টানটাইন এসে তাদের প্ল্যানে বাঁধার দেয়াল তৈরি করেছিলেন তাই তারা কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ারকে, রোমান এম্পায়ার বলে মানতেই নারাজ এজন্য তারা ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ারের নাম দিয়েছেন বাইজেন্তাইন এম্পায়ার।রোমান সাম্রাজ্য দুই ভাগে ভাগ হবার পর কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক ইস্টার্ণ রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট থিওডোসিয়াস-২ জুলকারনাইনের প্রাচীর ঘিরে আরেকটি প্রাচীর নির্মাণ করেন যা থিওডোসিয়ান দেয়াল (Theodosian Walls) নামে পরিচিত। তিনি তখন-ই বুঝতে পেরেছিলেন যে, রোম ভিত্তিক পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্য হবে গ্রেকো রোমান সভ্যতা ও প্রাচীনত্ব (Classical Antiquity) ভিত্তিক যার সাথে কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক ইস্টার্ণ রোমান সাম্রাজ্যের কখনো মিল হবে না, তাই ঐদিক থেকে হামলা একদিন না একদিন হবেই। তাই, থিওডোসিয়ান প্রাচীর /দেয়াল (Theodosian Walls) নির্মাণ করে কনস্টান্টিনোপলকে আরও সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেন তিনি। এই দুই সাম্রাজ্যের ইসা আঃ এর অনুসারী পুরোহিত/বিশপ/আলেমদের মধ্যে ধীরে ধীরে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা দিতে থাকে। পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের (Greko-Roman World) ইসা আঃ এর অনুসারী রোমান ক্যাথোলিক চার্চের আলেমদের/বিশপদের মধ্যে রোমান ধর্মের (পৈত্তলিক ধর্মের) অনেক বিশ্বাস ঢুকে যেতে থাকে যা তারা ইসা আঃ এর আনীত ধর্মের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে থাকে। কিন্তু এতে বাধা হয়ে দাড়ায় কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক ইস্টার্ণ রোমান সাম্রাজ্যের অর্থোডক্স চার্চের পুরোহিত/ আলেমরা। কিন্তু ধীরে ধীরে কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক ইস্টার্ণ রোমান সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে, রোম ভিত্তিক পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের ক্যাথোলিক চার্চের পোপ নিজেকে সার্বজনীন আইনের এখতিয়ারের (universal jurisdiction) দাবিদার (Papal supremacy) বলে দাবী করলে এবং অন্যান্য আরও কিছু বিষয়ে নিজেদের মতামত চাপিয়ে দিতে চাইলে রোম ভিত্তিক ক্যাথোলিক চার্চের (Roman Catholic Church) সাথে কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক অর্থোডক্স চার্চের (Eastern Orthodox Church) পরিপূর্ণ বিভাজন হয় যা বড় বিভাজন (Great Schism 1054 CE) নামে পরিচিত।

আল্লাহ চাইলে, এই বইয়ের পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাবো যে, ক্যাথোলিক চার্চের পোপের আধিপত্য (Papal supremacy) বা সার্বজনীন আইনের অধিকার (universal jurisdiction) দাবী করার মধ্যে দিয়েই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম দ্বৈতবাদ ভিত্তিক রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পটভূমি তৈরি হয়। পোপের আধিপত্য (Papal supremacy) বা সার্বজনীন আইনের অধিকার (universal jurisdiction) বলতে বুঝায়, ক্যাথোলিক চার্চের পোপ একাই সকল চার্চের ক্ষমতার মালিক ও আইন দেয়ার অধিকার রাখেন এবং তিনি একাই সকল খ্রিষ্টানদের আত্মার ও রক্ষক! অর্থাৎ খ্রিষ্টানদের জন্য আইন এখন থেকে আর তাদের ধর্মগ্রন্থ (বাইবেল) থেকে আসবে না বরং তা আসবে ক্যাথোলিক চার্চের পোপের কাছ থেকে। ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী, আমরা বুঝতে পারি যে, এই কাজ করে ক্যাথোলিক চার্চ ও ক্যাথোলিক চার্চের পোপ নিজেকে আসলে 'রব' বলে দাবী করেছিল। কিন্তু কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক খ্রিষ্টান অর্থোডক্স চার্চ, ক্যাথোলিক চার্চের পোপের আধিপত্য (Papal supremacy) এবং সার্বজনীন আইনের অধিকার (universal jurisdiction) এর চরম বিরোধিতা করে ফলে ক্যাথোলিক চার্চের (Roman Catholic Church) সাথে ইস্টার্ণ অর্থোডক্স চার্চের (Eastern Orthodox Church) পরিপূর্ণ বিভাজন হয় যা বড় বিভাজন (Great Schism 1054) নামে পরিচিত। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কনস্টান্টিনোপলে সংরক্ষিত জ্ঞান বা জুলকারনাইনের প্রাচীর কিভাবে পৈত্তলিকতা, যাদু, দ্বৈতবাদ এবং মানুষকে 'রব' (আইনদাতা) দাবী করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয় যে, ১১৮২ সালে রোমান ক্যাথোলিক চার্চের অনুসারীদের ইস্টার্ণ অর্থোডক্স চার্চ (Eastern Orthodox Church) কঠোরভাবে দমন করেন। এতে রোমান ক্যাথোলিক চার্চের অনুসারীদের বেশিরভাগ পালিয়ে যায় এবং বাকি ৪০০০ কে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি দেয়া হয়। এটি ইতিহাসে Massacre of the Latins 1182 নামে পরিচিত। সংক্ষেপে বলতে পারি, কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চের প্রতি বিরোধ ও বিদ্বেষ শুরু থেকেই ছিল রোমান ক্যাথোলিক চার্চের প্রতিষ্ঠাতাদের। কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্য ২ ভাগে (পশ্চিমা এবং ইস্টার্ন) ভেঙ্গে যাবার পর রোমান ক্যাথোলিক চার্চ, ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চের উপর তাদের প্রভাব বাড়াতে থাকে। ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ, বিশ্বাস নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেয়া দেয়।

এ ব্যাপারে ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চের মতামত হচ্ছেঃ অর্থোডক্সরা ফিলিওককে (Filioque)কেবল হিমশৈলের চূড়া হিসেবে দেখে যা রোমান ক্যাথোলিক চার্চে প্রকৃতপক্ষে ধর্মতত্ত্বের আরও গভীরভাবে প্রোথিত সমস্যার একটি লক্ষণ মাত্র, যা এতটাই গভীরভাবে প্রোথিত যে তারা এটিকে ধর্মবিরোধী বলে মনে করে, এমনকি কিছু বৈশিষ্ট্য অনুসারে, "ঈশ্বরকে দেখতে" ("see God") এবং ঈশ্বরকে জানার অক্ষমতাও বলে মনে করে। অর্থোডক্সরা, ক্যাথোলিকদের ধর্মবিরোধীতাকে ফ্রাঙ্কিশ পৌত্তলিকতা (Frankish paganism), আরিয়ানবাদ (Arianism), প্লেটোনিস্ট (Platonist) এবং অ্যারিস্টটলীয় (Aristotelian) দর্শন এবং থমিস্ট যুক্তিবাদ (Thomist rational) এবং বস্তু নির্ভর স্কলাস্টিকিজমের (objective Scholasticism) মধ্যে নিহিত বলে অভিযোগ করে। এখান থেকে

আবারও দেখা যাচ্ছে যে, কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক খ্রিষ্টান অর্থোডক্স চার্চ, রোম ভিত্তিক ক্যাথোলিক চার্চের খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যে পৈত্তলিকতা ও গ্রেকো রোমান সভ্যতার এবং প্রাচীনত্বের মতাদর্শের অনুপ্রবেশের বিরোধী ছিল।

এখানে উল্লেখ্য রোমান ধর্মের পৈত্তলিকতা (যাদু) ও প্লেটোনিস্ট (Platonist) তথা প্রাচীনত্বকে (Classical Antiquity) কে দমন করা ছিল কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটদের বৈশিষ্ট্য। কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক রোমান সম্রাট থিওডোসিয়াস-১ এথেন্সে অবস্থিত প্লেটোনিস্ট (Platonist) স্কুল বন্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে দার্শনিক প্লেটোর মতাদর্শ শিক্ষা দেয়া হত। তারা রোমান পৈত্তলিকদের কঠোর হাতে দমন করেছিলেন। রোমান পৈত্তলিকদের অলিম্পিক গেমস বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু সকল ধরণের পৈত্তলিকতা ও প্রাচীনত্বের (Classical Antiquity) দর্শন রোমান ক্যাথোলিক চার্চের মাধ্যমে খ্রিষ্টানদের মধ্যে পুনরায় প্রচলন শুরু হয়েছিল - যে ধারা এখনো চলমান আছে। জুলকারনাইনের প্রাচীর গ্রেকো রোমান সভ্যতাকে এবং প্রাচীনত্বকেও (Classical Antiquity) দমন করেছিল। কিন্তু এই প্রাচীর ১৪৫৩ সালে ভেঙ্গে যাবার পরপরই অর্থাৎ ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ারের পতনের পরপরই ইউরোপের ইতালির ফ্লোরেন্সে পুনরায় প্লেটোনিস্ট (Platonist) স্কুল চালু হয় যা রেনেসাঁর জন্ম দেয় আর রেনেসাঁতে পুনরায় , " মানুষ সকল কিছুর পরিমাপক" নামক, গ্রীক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় যার উপর ভিত্তি করে সরকার গঠিত হয় যেখানে ধর্মের কোন স্থান নেই, সৃষ্টিকর্তার কোন স্বীকৃতি নেই। মানুষই মানুষকে আইনদাতা হিসেবে নিযুক্ত করে এবং সেই নিযুক্ত করা আইনদাতাদের (সংসদ সদস্যদের) দেয়া আইন মানে।

ইস্টার্ণ রোমান সাম্রাজ্যের অর্থোডক্স চার্চকে ধ্বংস করার জন্য ১২০৪ সালে পরিচালিত হয় সেক অফ কনস্টান্টিনোপল (sack of Constantinople) যাতে ক্রসেডাররা ইস্টার্ণ রোমান সাম্রাজ্য দখল করে নেয় এবং ৩ দীন ধরে অর্থোডক্স চার্চ ও এর অনুসারীদের উপর ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন চালায় যা এতটাই ভয়াবহ ছিল এখনো রোমান ক্যাথোলিক চার্চের পোপ, অর্থোডক্স চার্চের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে কিন্তু এখনো এই দুই ধরণের চার্চ ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে সমঝোতা বা মিল হয়নি। শেষ পর্যন্ত সুলতান মাহমুদ -২ জুলকারনাইনের প্রাচীর ১৪৫৩ সালে ভেঙ্গে ফেলার পর আবারো ৩ দিন ধরে অর্থোডক্স চার্চ ও এর অনুসারীদের উপর বর্বর নির্যাতন চালায়। এ সকল কারণে রোমান ক্যাথোলিক চার্চ যা মূলত গ্রেকো রোমান সভ্যতা ও Classical Antiquity এর ধারক, বাহক পশ্চিম ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার করে এবং পশ্চিম ইউরোপ থেকে অর্থোডক্স চার্চ প্রায় হারিয়েই যায়। বর্তমানে ইস্টার্ণ অর্থোডক্স চার্চ মূলত রাশিয়ায় শক্তিশালী অবস্থানে আছে কিন্তু এটিও আজ থেকে ১০০০ বছর আগের ইস্টার্ণ অর্থোডক্স চার্চের বিশ্বাস ও মতাদর্শ থেকে অনেকটাই দূরে সরে গেছে।

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, জুলকারনাইনের প্রাচীর (কনস্টানটাইনের প্রাচীর) মূলত কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক ইস্টার্ণ রোমান সাম্রাজ্যকেই রক্ষা করত যা ইয়াজুজ-মাজুজের গ্রেকো রোমান সভ্যতাকে এবং পৈত্তলিকতাকে এবং প্রাচীনত্বকে (classical antiquity) দমন করত – সেই সাথে সাথে পারস্য সাম্রাজ্যের

জরাথুস্ট্রবাদের দ্বৈতবাদ ও জাদুবিদ্যাকে দমন করত। জুলকারনাইনের প্রাচীর এই দুই সভ্যতার শয়তানের যাদু ও হারুত-মারুতের থেকে যাদুকররা যা শিখেছিল তাকেও দমন করত। মজার বিষয় হচ্ছে কনস্টানটাইন ছাড়া ইস্টার্ণ রোমান সাম্রাজ্যের অন্য সম্রাটরা জানতো-ও না যে, পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্য ও এর প্রাচীনত্বের মতাদর্শকে এবং পারস্য সাম্রাজ্যকে দমনের মাধ্যমে তারা আসলে ইয়াজুজ-মাজুজকে আল্লাহ বিরোধিতার পরবর্তী ধাপে উঠা থেকে বিরত রাখছিল। ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর ভেঙ্গে ইস্টার্ণ রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপ তথা বিশ্ব, প্রাচীনত্ব (classical antiquity) বা গ্রেকো রোমান সভ্যতার উপর ভিত্তি করেই বর্তমান আধুনিক বিশ্বে এসেছে। অলিম্পিক গেমস পুনরায় চালু হয়েছে।

জুলকারনাইনের প্রাচীর মূলত হচ্ছে জ্ঞানের প্রাচীর যা যাদুর জ্ঞানকে (শয়তানের যাদুর জ্ঞান এবং হারুত-মারুতের যাদুর জ্ঞানকে) একত্রিত হতে দেয়নি যতদিন এই প্রাচীরটি ছিল; প্রাচীরটির নাম কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক রোমান এম্পায়ার বা 'ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ার' বা 'বাইজেনটাইন এম্পায়ার' যার রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল।

পারস্য সাম্রাজ্যে ছিল জরথুস্ত্রবাদ (Zoroastrianism) যাতে ছিল হারুত-মারুতের যাদুর ব্যাপক প্রচলন ও উৎকর্ষতা অন্য দিকে গ্রেকো রোমান সাম্রাজ্যে (রোমে) ছিল শয়তানের যাদুর ব্যাপক উৎকর্ষতা মাঝে হচ্ছে কনস্টান্টিনোপল (Eastern Roman Empire) যা সর্বদা এই দুই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ছিল এবং এদের মতাদর্শের বা যাদুর বিরুদ্ধে কাজ করেছে। সম্রাট কনস্টান্টিন এর পর যারা ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ারের সম্রাট হয়েছিলেন তারা হয়তো জানতেনও না যে, তারা আসলে এই দুই যাদুকেই দমন করে রাখছেন এবং এদের মতাদর্শ দ্বৈতবাদ ও প্রাচীনত্বকেও দমন করছিলেন। মনে করে দেখুন, জুলকারনাইন প্রাচীর নির্মাণের পর বলেছিলেন,"তারা এটা পরিমাপ করতে পারবে না" এর ব্যাখ্যা হচ্ছে পৈত্তলিকরা ও যাদুকররা বুঝতেও পারবে না যে, এই প্রাচীর আসলে একটি জ্ঞানের প্রাচীর যা যাদুর ২ ধরণের জ্ঞানকেই দমন করছে এবং এই দুই ধরণের যাদুকে মিলিত হতে দিচ্ছে না। এটা কিভাবে? রোমের রোমান ধর্মের বা পৈত্তলিক ধর্মের অনুসারীদের ধ্বংস করেন কনস্টানটাইন (জুলকারনাইন) - যিনি ছিলেন ইসা আঃ এর একজন প্রকৃত অনুসারী। তিনি রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী নিয়ে আসেন কনস্টান্টিনোপলে। Great prosecution of Christianity (৩০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩১৩ খ্রিস্টাব্দ) তে রোমান (পৈত্তলিক) ধর্মের অনুসারীরা ইসা (আঃ) এর অনুসারীদের (খ্রিস্টানদের) উপর ভয়াবহ নির্যাতন করে ফলে ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ারের খ্রিষ্টান সম্রাটরা ঐ সময়ের রোমান (পৈত্তলিক) ধর্মের অনুসারীদের ও তাদের মতাদর্শকে কঠোর হাতে দমন করে। এই অবস্থা যতদিন ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ার (বাইজেন্তটাইন এম্পায়ার) ছিল ততদিন ছিল; শেষদিকে দুর্বল হয়ে গেলেও তারা অন্তত রোমান পৈত্তলিকদের যাদু জাতীয় জ্ঞানের বিকাশকে ও পৈত্তলিকতাকে কিছুটা হলেও বাধা দিতে পারতেন। সুলতান মাহমুদ -২ কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর সেখানের খ্রিস্টানদের উপর যে ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়েছিলেন তাতে রোমান ধর্মবিরোধী

(পৈত্তলিকতাবিরোধী ও যাদু বিরোধী) খ্রিষ্টানদের যে শক্তিটি পশ্চিম ইউরোপে ছিল তা ধ্বংস হয়ে যায় এবং পারস্য ও রোমান ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে যাদুর জ্ঞানের প্রচার - প্রসার শুরু হয়।

অন্যদিকে কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলিমদের কাছে পরাজিত হবার আগ পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্যের জরথুস্ত্রবাদে বিশ্বাসী সম্রাট ও যাদুকরদের ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ারই দমন করে রেখেছিল। কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটরা পারস্যকে দমন করতো নিজেদের সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য কিন্তু তারা হয়তো জানত না যে, পারস্যকে দমনের মাধ্যমে আসলে তারা জরথুস্ত্রবাদের জাদুকেই দমন করছে ! আল্লাহ এর পরিকল্পনা এত-ই কৌশলী !!! জুলকারনাইন প্রাচীর নির্মাণের পর বলেছিলেন,"তারা এটা পরিমাপ করতে পারবে না" – আসলেই ৩৩০ সাল থেকে ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত কেউই পরিমাপ করতে পারেনি যে, আসলে এটা কিসের প্রাচীর? কিভাবে ইয়াজুজ-মাজুজকে এই প্রাচীর জমিনে অশান্তি করার পরবর্তী ধাপে যাওয়া থেকে বিরত রেখেছে!

জুলকারনাইনের প্রাচীর কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ারের পতনের পর রোমান ধর্মের বিশ্বাসে দেবতা অ্যাপোলোর ("God Apollo") নামে মহাকাশযান অ্যাপোলো-৭ ও অ্যাপোলো-৯ (Apollo 7, Apollo11) মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। জরাথুস্ট্রবাদের দ্বৈতবাদের উপর ভিত্তি করে গঠিত গনতন্ত্রে ২ টি বিপরীত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলের (সরকারি দল ও বিরোধী দল) সহাবস্থানে পৃথিবীর বেশিরভাগ রাষ্ট্র চলছে। এই রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থায় সৃষ্টিকর্তাকে আইনদাতা হিসেবে অস্বীকার করা হয়েছে; তার বিপরীতে মানুষকে আইনদাতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

জরথুস্ত্রবাদে হারুত মারুতের বিকৃত কাহিনী

আল্লাহ কোরআনে বলেন, "এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়ত্বানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত, সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়ত্বানরাই কুফুরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের (বেবিলনের) দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর পৌঁছানো হয়েছিল এবং ফেরেশতাদ্বয় কাউকেও (তা) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না,এতদসত্ত্বেও তারা উভয়ের নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করতো, যা দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করতো, কিন্তু তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহর বিনা অনুমতিতে কারও ক্ষতি করতে পারত না, বস্তুতঃ এরা এমন বিদ্যা শিখত, যা দ্বারা তাদের নিজেদের ক্ষতি সাধিত হত আর তাদের কোন লাভ হত না এবং অবশ্যই তারা জানত যে, যে ব্যক্তি যাদুবিদ্যা শিখবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না, আর যার পরিবর্তে তারা স্বীয় আত্মাগুলোকে বিক্রয় করেছে, তা কতই না জঘন্য, যদি তারা জানত"। (সূরা বাকারাহঃ ১০২)

সূরা বাকারার ১০২ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম আল-হাসান আল-আসকারী বলেছেন যে, ইমাম জাফর আস-সাদিক বলেছেন যে, নূহের (আ.) যুগের পর অনেকেই জাদুর মাধ্যমে অন্যদের প্রতারণা করতে

শুরু করে। আল্লাহ তাআলা সেই সময়ের রাসূলের কাছে দুজন ফেরেশতা পাঠান যাতে তারা মানুষকে জাদু কী তা দেখাতে পারেন এবং ব্যাখ্যা করতে পারেন যে, আল্লাহ কেন এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন। বলেন: (অর্থ: সেই নবী ঐ ফেরেশতাদেরকে মানুষের মতো আবির্ভূত হতে এবং আল্লাহ তাদের যা দেখিয়েছেন তা মানুষকে শেখাতে বলেছিলেন। তাই ঐ দুই ফেরেশতা মানুষকে জাদু এবং তা অকার্যকর করার উপায় শেখাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগে তারা মানুষকে জানিয়ে দিতেন যে: আমরা আল্লাহর বান্দাদের জন্য পরীক্ষার মাধ্যম, যাতে তারা আল্লাহর আনুগত্য করে এবং যা শিখে তা দ্বারা জাদুকে বাতিল করে দেয়, কিন্তু নিজে যেন জাদুতে লিপ্ত না হয় এবং যাদুর মাধ্যমে অন্যদের ক্ষতি করে 'কাফির' (অবিশ্বাসী) না হয়ে যায়।

বলেছেন যে জাদু কামনাকারীরা শয়তানের জাদু শিখেছিল যা তারা সুলায়মান (আঃ) এর সিংহাসনের নীচে পুঁতে রেখেছিল এবং এই জাদুর জন্য সুলায়মানকে দায়ী করেছিল। এর মাধ্যমে যাদুকররা জাদুকরী মন্ত্র (শয়তানের থেকে শিখা যাদু) এবং হারুত ও মারুতের দখলে থাকা যাদুর জ্ঞান - উভয় থেকেই যাদুর জ্ঞান অর্জন করছিল" । আমি মনে করি, এটিই এই আয়াতের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা। জাফর আস সাদিক, শিয়া এবং সুন্নি উভয়ের নিকট সম্মানিত। তিনি ইমাম আবু হানিফা (হানাফি মাজহাব) এবং ইমাম মালিক ইবনে আনাসের (মালিকি মাজহাব) শিক্ষক ছিলেন।

এখন আমরা দেখব, শয়তান কিভাবে মানুষকে হারুত-মারুতের ঘটনাকে মিথ্যা কাহিনী বানিয়ে ধোঁকা দিয়ে দিয়েছে বা বলতে পারেন যাদুতে বিশ্বাসী মাজুজরা কিসে বিশ্বাস করে সেটা জানব। মনে রাখবেন, আমরা নিচের ঘটনা/কাহিনিকে বিশ্বাস করি না – কিন্তু মাজুজরা তাতে বিশ্বাস করে আর এই বিষয়ে তাদের বিশ্বাস হচ্ছে কঠিন বিশ্বাস।

যাদুকর ও যাদুতে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস করা গল্পটা সংক্ষেপে এভাবে বলা যেতে পারে। "মানবজাতির সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে, তাদের পাপপূর্ণতা এবং অশ্লীলতার কারণে ফেরেশতারা অভিযোগ করতে শুরু করে যে ঈশ্বর তাদের প্রতি খুব বেশি সহনশীল। কিন্তু ঈশ্বর উত্তর দিয়েছিলেন যে যদি ফেরেশতারা একই আবেগ এবং চাপের মুখোমুখি হত যা মানুষকে এই দৈহিক পাপ করতে বাধ্য করে, তাহলে তারাও নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হত না। ফেরেশতারা স্বেচ্ছায় মানুষের মতো পৃথিবীতে নেমে যেতে এবং তাদের মতো অপরাধ করা থেকে বিরত থাকতে স্বেচ্ছায় রাজি হন। ঈশ্বর এটি সম্ভব করেছিলেন। দুই শুদ্ধতম এবং মহৎ ফেরেশতা, হারুত এবং মারুত, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং কিছু সময়ের জন্য একটি নির্দোষ জীবনযাপন করেন যতক্ষণ না তাদের একজন সুন্দরী মহিলা (কিছু ভাষ্যে ফার্সের রাজকুমারী হিসাবে বর্ণিত) এবং তার স্বামীর মধ্যে মধ্যস্থতা করতে বলা হয়। দুই ফেরেশতা মহিলার প্রতি মোহিত হয়ে পড়েন, কিন্তু তিনি তাদের দৈহিক আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিরোধ করেন যতক্ষণ না তারা তাকে একটি বড় জিনিস বিনিময়ে প্রদান করেন। কেউ কেউ বলেন যে, সেই মহিলা হারুত-মারুতের কাছ থেকে আল্লাহ এর অবর্ণনীয় নাম আবিষ্কার করেছিলেন যা তাকে রাতে জান্নাতে / আসমানে আরোহণ করতে সক্ষম করেছিল। এই নাম জপে, মহিলাটি উপরে উঠে শুক্র গ্রহ (জহরা/জোহরা) রূপে

আকাশে নিজেকে সংযুক্ত করে এবং পাপে লিপ্ত হওয়া ফেরেশতাদের পৃথিবীতে শক্তিহীন করে ফেলে। এটা গল্পের এক রূপ, ভিন্ন একটি রূপও আছে। সেটা হচ্ছেঃ

মহিলা তাদের মদ খাওয়াতেন, যার ফলে তারা একজন নির্দোষ পথচারীকে হত্যা করেছিল। এই সমস্ত কিছুতে ক্ষুব্ধ হয়ে, আল্লাহ অপরাধী ফেরেশতাদের উপর কঠোর শাস্তি দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু, একজন মহান ফেরেশতার (অথবা কিছু সংস্করণে একজন নবী, এদ্রিস) মধ্যস্থতায়, তিনি তাদের এই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী আযাব অথবা পরকালে নরকীয় আযাবের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তারা প্রথমটি বেছে নিয়েছিল এবং ব্যাবিলনের একটি কূপে শৃঙ্খলিত করে বন্দী করা হয়েছিল। হামদ-আল্লাহ মোস্তওফির (লে স্ট্রেঞ্জ, ল্যান্ডস, পৃষ্ঠা ৭২-এ উদ্‌ধৃত) মতে, কূপটি "পাহাড়ের চূড়ায়" ছিল। নিষিদ্ধ জাদুবিদ্যার সন্ধানকারীরা পতিত ফেরেশতাদের কাছ থেকে শিক্ষা পেতে সেখানে যেতেন। কুফা পণ্ডিত আবু মোহাম্মদ সোলায়মান বিন। মেহ-রান আ'মাশ (মৃত্যু ১৪৮/৭৬৫) বলেছেন যে হাজ্জাজ রা'স আল-জালুত (নির্বাসিত শাসক) কে একজন জিজ্ঞাসু, ধার্মিক মুসলিমকে কূপের দিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং "তারা দেখতে পেলেন দুটি পাহাড়ের মতো বিশাল, উল্টো ঝুলন্ত দুটি ফেরেশতা, তাদের মাথা মাটির থেকে কিছুটা উপরে, এবং গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত শৃঙ্খলিত। বিস্ময়ে ধার্মিক ব্যক্তি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলেন, যার ফলে শৃঙ্খলিতরা প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে লাগল, এবং তাদের কোলাহল তাকে এতটাই ভীত করে তুলেছিল যে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল"(রেফারেন্সঃ কাজভিনি, আতর আল-বেলাদ, পৃষ্ঠা ৩০৫-৭)।

উপরের কাহিনীর হারুত (Haurvatat) (romanized: hauruuatāt), মারুত (Ameretāt) এবং জোহরা (Anāhid/Anahita) জরথুস্ত্রবাদ ধর্মে অনেক উচ্চ আসন পেয়েছে। তারা এদের উপাসনা করে। নিম্নে জরথুস্ত্রবাদে হারুত, মারুত এবং জোহরার পদ মর্যাদার ব্যাপারে আলোচনা করা হলঃ

হারুতঃ হাউরভাতাত (Haurvatat) (/ˈhəʊrvətæt/; আবেস্তান: রোমান ভাষায়: hauruuatāt) হল আবেস্তান ভাষার শব্দ যা "সম্পূর্ণতা" বা "পরিপূর্ণতা" এর জরথুষ্ট্রীয় ধারণাকে বোঝায়। গাথিক-পরবর্তী জরথুষ্ট্রীয় ধর্মে, হাউরভাতাত ছিল পানি, সমৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যের সাথে যুক্ত আমেশা স্পেন্টা (Amesha Spenta)। সাধারণ যুগের জরথুষ্ট্রীয় ঐতিহ্যে, হাউরভাতাত মধ্য ফার্সি হোর্দাদ হিসাবে আবির্ভূত হয়, যা নতুন ফার্সি ভাষায় খোর্দাদ হিসাবে অব্যাহত রয়েছে। ১৯২৫ সালের ইরানি নাগরিক ক্যালেন্ডার, যা জরথুস্ট্রিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে মাসের নাম গ্রহণ করেছিল, বছরের তৃতীয় মাসের নাম খোরদাদ।

মারুতঃ আমেরেতাত (Ameretat) (রোমান ভাষায়: amərətāt) হল জরথুষ্ট্রীয় দেবত্ব/ঐশ্বরিক অমরত্বের ধারণার আবেস্তান ভাষার নাম। তারা বিশ্বাস করে, আমেরদাদ হল পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবন এবং পরকালে চিরস্থায়ীতার আমেশা স্পেন্টা (Amesha Spenta)।

জোহরাঃ অনাহিতা (Anāhid/Anahita) /ɑːnəˈhiːtə/) হল একজন পারস্য বা ইরানী দেবীর নামের প্রাচীন ফার্সি রূপ এবং সম্পূর্ণ এবং পূর্ববর্তী রূপে আরাদ্বী সুরা অনাহিতা (Arədvī Sūrā Anāhitā) হিসেবে আবির্ভূত হয়, যা

একটি ইন্দো-ইরানী মহাজাগতিক ব্যক্তিত্বের আবেস্তান নাম যাকে "জল" (আবান) এর দেবত্ব হিসাবে সম্মান করা হয় এবং তাই উর্বরতা, নিরাময় এবং জ্ঞানের সাথে যুক্ত। ইরানে অনাহিতা নামে একটি মন্দিরও রয়েছে।
পল ডি লাগার্দ (Paul de Lagarde, *Gesammelte Abhandelungen*, Leipzig, 1866.) প্রথম জরথুস্ত্রবাদে (Zoroastrianism) উপরের কাহিনীর হারুতকে হাউরভাতাত (Haurvatat), মারুতকে আমেরেতাত (Ameretat) (রোমান ভাষায়: amərətāt) এবং জোহরাকে অনাহিতা (Anāhid/Anahita) হিসেবে চিহ্নিত করেন। অর্থাৎ উপরের কাহিনী হচ্ছে জরথুস্ত্রবাদের (Zoroastrianism) একটি কাহিনী যা পারস্যের বহু লোকেরা এখনো বিশ্বাস করে। এখন বুঝা যাচ্ছে পৃথিবীকে সুন্দর না করে, পৃথিবীর হাজারো সমস্যা সমাধান না করে বিজ্ঞানীরা চাঁদে বা মঙ্গল গ্রহে বাস করতে চায় কেন।
উপরে বর্ণিত সূরা বাকারার ১০২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ যাদু শিক্ষার ২ টি উৎসের কথা বলেছেন। একটি হচ্ছে শয়তানের থেকে যাদু শিক্ষা করা এবং অপরটি হচ্ছে হারুত-মারুতের কাছ থেকে যাদু শিক্ষা করা। যতটুকু বুঝা যাচ্ছে, প্রাচীন গ্রীক রোমান সাম্রাজ্যের পৈত্তলিক রোমান ধর্মের অনুসারী যাদুকর বা গণকরা শয়তানের নিকট থেকে যাদু শিখত এবং ভবিষ্যতবাণী করত। অপরদিকে, পারস্যের লোকেরা ছিল জরথুস্ত্রবাদী। তারা খুব সম্ভবত হারুত-মারুতের যাদু শিখত কারণ তারা হারুত মারুতকে দেবতা বলে পুজা করত। হারুত –মারুতের বিকৃত ঘটনা জরথুস্ত্রবাদ ধর্মে আছে যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা যায়, হারুত-মারুত বেবিলনে অবস্থান করেছিল আর বেবিলন পারস্যে অবস্থিত। এই পারস্যেরই রাষ্ট্র ধর্ম ছিল জরথুস্ত্রবাদ। তখনকার সময়ে খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ সাল থেকে ৬৫১ খ্রিস্টাব্দ (Achaemenid Empire থেকে Sasanian Empire) পর্যন্ত প্রায় ১২০০ বছর পারস্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল জরথুস্ত্রবাদ। ‘Pliny the Elder’ যিনি একজন রোমান লেখক, ফিলোসফার এবং রোমান সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন, তিনি বলেছেন যে, জরথুস্ত্রবাদ ধর্মের প্রবর্তক জরথুস্ত্র (Zoroaster) হচ্ছে যাদুর উদ্ভাবক - যে যাদু শিখার জন্য গ্রিকরা উদগ্রীব, আকাঙ্ক্ষিত ছিল। যে যাদু শিখার জন্য গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ পিথাগোরাস (ক্লাস ৯-১০ এ পিথাগোরাসের উপপাদ্য সবাই পড়েছেন), Empedocles, Democritus (Democritus কে formulation of Atomic Theory of Universe এর জন্য আজও স্মরণ করা হয়), প্লেটো (Plato - দার্শনিক) বহু পথ পাড়ি দিয়েছিল এবং এই যাদু শিখে এসে অন্যদের শিখিয়েছিল। (Platonic school থেকেই ১৫শ শতাব্দীতে রেনেসাঁ ত্বরান্বিত হয়)। অর্থাৎ বুঝা যাচ্ছে, সেই সময়ে হারুত-মারুতের থেকে শেখা যাদুর প্রচলন বেশি ছিল পারস্যের জরথুস্ত্রবাদীদের মধ্যে আর এই যাদু শিখার জন্যই তৎকালীন বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদরা পারস্যে আসত।
এই সময়েই ৩৩০ সালের দিকে জুলকারনাইন অর্থাৎ কনস্টানটাইন প্রাচীর নির্মাণ করেন যা কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর নামে বিখ্যাত। এটি মূলত একটি জ্ঞানের প্রাচীর। কনস্টানটাইন রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম থেকে সরিয়ে কনস্টান্টিনোপলে নিয়ে আসেন এবং এই রাজধানীর সুরক্ষায় একে ঘিরে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর নির্মাণ করেন। কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ার বা বাইজেন্তটাইন সম্রাটরা কঠোর হাতে গ্রীক

পৈত্তলিক রোমান ধর্মের যাদুকে দমন করেন এবং একই সাথে তারা পারস্যের জরথুস্ত্রবাদে বিশ্বাসী সাম্রাজ্যর লোকেদেরও দমন করেন ফলে তাদের যাদুবিদ্যা ইউরোপে বা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। আশ্চর্যজনক আরেকটি বিষয় হচ্ছে, কনস্টান্টিনোপল শহরটি এই দুই ধরণের যাদুকরদের সাম্রাজ্যের একবারে মাঝে অবস্থিত। কনস্টান্টিনোপলের একদিকে ছিল রোম ভিত্তিক রোমান সাম্রাজ্য অপরদিকে ছিল পারস্য সাম্রাজ্য। যতদিন কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর ছিল ততদিন অর্থাৎ ৩৩০ সাল থেকে ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় মধ্যযুগ(*)। এই সময়কালে জ্যোতির্বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প –কলা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদির তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি তাই এই সময়কালকে (মধ্যযুগকে) ইতিহাসবিদরা মানবজাতির ‘অন্ধকার যুগ’ বলে অভিহিত করেছেন। যখন-ই এই প্রাচীর ভেঙ্গে গেলো তখন-ই জ্যোতির্বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, টেকনোলজি, সাহিত্য, শিল্প-কলা আবার অগ্রসর হওয়া শুরু হল যে যুগের নাম দেয়া হয়েছে রেনেসাঁ। রেনেসাঁর সুত্রপাত হয় ইটালিয়ান হাই রেনিসেন্স (Italian High Renaissance) এর মাধ্যমে ১৪৯২ সালে। আর ইটালিয়ান হাই রেনিসেন্স এর প্রেক্ষাপট তৈরি হয় ১৪৫৪ সালের ৯ ই এপ্রিল লদির শান্তি চুক্তির (Treaty of Lodi) মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবার পরের বছর-ই ইয়াজুজ-মাজুজের যাদু (জ্যোতির্বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান) চর্চার নতুন ধাপে প্রবেশ করার দরজা খুলে যাবার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি। কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর-ই যে জুলকারনাইনের প্রাচীর এই বিষয়ে সন্দেহের আর কোন সুযোগ আমি দেখি না। আর জ্যোতির্বিজ্ঞান যে যাদু বিদ্যা এতেও কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান বিজ্ঞানের বহু কিছু যে যাদুবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বা যাদুর জ্ঞানের ফসল – এতেও কোন সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন আসে বিজ্ঞানের কতটুকু আমরা গ্রহন করতে পারব? আমার মতে, জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত অর্থাৎ মহাকাশ সম্পর্কিত সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে বর্জন করতে হবে। যেমনঃ পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কত? এটা মহাকাশ সম্পর্কিত জ্ঞান। এই জ্ঞান যাদুবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। যাদুবিদ্যা অর্জন করা হারাম। যারা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস করবে তারাও যাদুতে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তারাও মাজুজ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

টেকনোলজির কিছু জিনিস আমরা গ্রহন করতে পারি যেগুলোর সাথে মহাকাশ সম্পর্কিত জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই । যেমনঃ সাইকেল কিভাবে বানাতে হয়। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার করা বিভিন্ন মতবাদ ও টেকনোলজির কোনটা যাদু অর্থাৎ হারাম আর কোনটা হালাল এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত দিতে হলে অধিকতর গবেষণা ও লেখাপড়া প্রয়োজন যা এই মুহূর্তে আমাদের নেই। এ ব্যাপারে ভিন্ন একটি বা একাধিক বই লিখতে হবে কারণ বিজ্ঞানীরা বিগত ৫০০ বছর ধরে হাজারো মতবাদ ও টেকনোলোজি আবিষ্কার করেছে - এর কোনটা জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান থেকে এসেছে আর কোনটার সাথে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান জড়িত নয় তা খুঁজে বের করা কঠিন কাজ। এতটুকু জেনে রাখুন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত সকল জ্ঞান যাদুবিদ্যা এবং হারাম।

(*) আধুনিক ইতিহাসবিদরা মধ্যযুগকে মানবজাতির জন্য অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন যার সময়কাল তারা ধরেছেন ৪৭৬ সাল থেকে ১৫০০ সাল পর্যন্ত। তারা জুলকারনাইনের প্রাচীরের বিষয়টি জানলে হয়তো ৩৩০ সাল থেকে ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত সময়কালকেই মানবজাতির জন্য মধ্যযুগ বা অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করতেন।

মাজুজ অর্থাৎ গণক অর্থাৎ যাদুকরদের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোন গণকের (যাদুকরের) কাছে গিয়ে তাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, তার চল্লিশ রাত পর্যন্ত নামাজ কবুল হবে না।" (মুসলিম-২২৩০) থেকে বর্ণিত।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি ঋতুবতী মহিলার সাথে, অথবা কোন মহিলার পায়ুপথ দিয়ে সহবাস করে, অথবা কোন গণকের (যাদুকরের) কাছে যায় এবং তার কথা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে অবিশ্বাস করল" । "(সুনান ইবনে মাজাহ - খণ্ড ১, হাদিস ৬৩৯)

প্রাচীনকালে বা মুহাম্মাদ সাঃ এর সময় যাদুকরদের বা যারা ভবিষৎবাণী করত তাদেরকে কেন গণক বলা হত? গণক হচ্ছেন সেই ব্যাক্তি যে গণনা বা হিসাব করে। গণকরা আকাশের তারা (নক্ষত্র), গ্রহ, সূর্য, চাঁদের অবস্থান দেখে সেই ছবিগুলো নিজেরা আঁকত তারপর এই সকল নক্ষত্র বা তারা, গ্রহ, চাঁদ, সূর্যের মধ্যে সরল রেখা টেনে বা বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি তৈরি করে গণনা বা হিসাব করত। তারা একটি গ্রহের উপর অপর গ্রহের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করত যা সম্ভবত বর্তমানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বা অভিকর্ষ শক্তি বা মহাকর্ষ শক্তি নামে জ্যোতির্বিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তারপর তারা তাদের গণনা বা হিসাবের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতবাণী করত। এই ভবিষ্যৎবানীর মধ্যে মানুষের জীবনের ঘটনা, ঝড়, বন্যা, বৃষ্টির পূর্বাভাস, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এজন্য তাদেরকে গণক বা জ্যোতিষী বলা হত। জ্যামিতির প্রাথমিক ধারণা জ্যোতিষী বিদ্যার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। জ্যামিতি থেকে এসেছে বীজগণিতসহ গণিতের প্রায় সকল শাখা। গণক বা জ্যোতিষীরা হচ্ছে যাদুকর, তাহলে তো বীজগনিতেও শিরক থাকার কথা। কিন্তু বীজগণিতে কি শিরক আছে?

মহান আল্লাহ কোরআনের সূরা বাকারার ১০৫ নাম্বার আয়াতে বলেছেন যে, তিনি পুরষ্কার প্রদানে অসীম। (Allah is the lord of infinite bounty)

মহান আল্লাহ কোরআনের সূরা নাযমের ৩২ নাম্বার আয়াতে বলেছেন যে, আল্লাহ ক্ষমা করায় অসীম। (Surely your Lord is infinite in forgiveness)

মহান আল্লাহ কোরআনের সূরা নিসার ১৩০ নাম্বার আয়াতে বলেছেন যে, আল্লাহ অসীম প্রাচুর্যময়। (Allah is infinite in plenty)

বীজগণিতে অসীম বা Infinite (∞) নামে একটি টার্ম (Term) আছে যা কোন সংখ্যা নয় বরং এটি একটি ধারণা বা Concept. বীজগণিতে অসীম বা Infinite এর চিহ্ন হচ্ছে ∞. বীজগণিতে অসীম বা Infinite বলতে বুঝায় যে, কোন সিরিজ বা ফাংশন বা ঘটনা সীমাহীনভাবে অর্থাৎ অসীমভাবে চলতে থাকবে। সাধারণ বীজগণিতে ১ কে ০ দিয়ে ভাগ করলে যদিও এর মানকে অনির্ধারিত (Undefined) ধরা হয়েছে কিন্তু বীজগণিতের একটি শাখা ক্যালকুলাসে এর মানকে অসীমের কাছাকাছি বলে ধরা হয়। (While division by zero is undefined in basic algebra, in calculus and limits, 1/0 (or similar expressions) can be interpreted as approaching infinity)

আমরা জানি, অসীম বা Infinite গুণটি একমাত্র আল্লাহ এর গুনাগুণ বুঝানোর জন্যই প্রযোজ্য হবে, অন্য কোন কিছুর সাথে এই গুণবাচক বিশেষণটি প্রয়োগ করলে সেটা শিরক হবে। এখন বিজ্ঞানের কোন ছাত্র যদি লেখে যে, এই ফাংশন বা সংখ্যার সিরিজটির মান অসীম (Infinite), তাহলে তার বড় শিরক করা হবে ফলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। বীজগণিতে অসীম বা Infinite এর চিহ্ন বা প্রতীক হচ্ছে, ∞.

বীজগণিত, ক্যালকুলাস ছাড়া পদার্থবিদ্যা (physics) অচল। অর্থাৎ বিজ্ঞানের ২ টি বিষয় (গণিত ও পদার্থবিদ্যা) আপনি অসীম বা Infinite (∞) Concept ছাড়া স্কুল, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়তে পারবেন না। আবার ফাংশন বা সংখ্যার সিরিজটি অসীম বা Infinite – (যেমনঃ F(x)=1+3+ 5+...............+∞) এই কথা লিখলে বা বললে আপনার বড় শিরক করা হবে ফলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। এখন আপনি কি করবেন – এই সিদ্ধান্ত আপনার। আপনার এলাকার 'আলেম' বা মুফতি বা ইমাম সাহেবকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই কারণ এই বিষয়ের জ্ঞান তাদের নেই। এই বিষয় জানার জন্য 'তাফসির ইবনে কাসির' বা 'বেহেস্তি জেওরের' মত বই পড়লে কোন লাভ হবে না কারণ এই সব বিষয়ে ঐ বইগুলিতে কিছুই খুঁজে পাবেন না আপনি। এই সব বিষয়গুলো বুঝতে হলে, জানতে হলে আপনাকে কোরআন বুঝে বুঝে পড়তে হবে এবং চিন্তা করতে হবে; পরিবেশ পরিস্থিতি ও নতুন নতুন ধারণাকে কোরআনের জ্ঞানের নিরিখে তুলনা করতে হবে। তাহলে, আশা করা যায়, আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথ দেখাবেন। সকল ফিতনা থেকে বাচার উপায় হচ্ছে কোরআন বুঝে বুঝে পড়া এবং এর বিষয়বস্তু মেনে চলা।

জ্যোতির্বিদ্যা বা মহাকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্যামিতির দুটি শাখা ত্রিকোণমিতি ও গোলকীয় জ্যামিতির উদ্ভব হয়েছিল। জ্যোতিষীবিদ্যা বা গণকের বিদ্যা বা জ্যোতির্বিদ্যার সাথে জ্যামিতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত আর জ্যামিতি থেকে এসেছে বীজগণিত যার ভিতরে রয়েছে শিরক ও কুফরি মতবাদ ও বিশ্বাস।

প্রাচীনকালে জ্যোতিষী বা গণক বা জ্যোতির্বিদরা বিভিন্ন গণনা ও হিসাব করে ভবিষ্যতবাণী করত। এখন বীজগণিত ব্যাবহার করে মানুষ কি ভবিষ্যৎবানী করছে? হ্যাঁ, করছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, ব্যবসায় সেলস ফোরকাসট (Sales Forecast) করা হচ্ছে বীজগণিতের সম্ভাব্যতা তত্ত্বের (Theory of Probability) উপর ভিত্তি

করে। বীজগণিতের সম্ভাব্যতা তত্ত্ব ক্লাস-৯-১০ এ-ই ছেলে-মেয়েদের পড়ানো হচ্ছে। সম্ভাব্যতা তত্ত্ব (Probability theory) হল গণিতের একটি শাখা যা দৈব ঘটনা (random events) এবং তাদের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে। এটি একটি গাণিতিক কাঠামো যা অনিশ্চিত ঘটনা বিশ্লেষণ করতে এবং তাদের সম্ভাবনা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। সম্ভাবনা তত্ত্বের মূল ধারণা হল, একটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাকে একটি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা, যা 0 থেকে 1 এর মধ্যে থাকে। এখানে 0 মানে ঘটনাটি ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই (অসম্ভব), এবং 1 মানে ঘটনাটি নিশ্চিতভাবে ঘটবে। একটি ঘটনার সম্ভাবনা হল সেই ঘটনা ঘটার সম্ভবনা কতটুকু, যা একটি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এই সংখ্যাটি 0 থেকে 1 এর মধ্যে থাকে। সম্ভাব্যতা গণনার জন্য কিছু সূত্র রয়েছে, যেমন যোগের সূত্র (addition rule), গুণের সূত্র (multiplication rule), এবং শর্তাধীন সম্ভাবনা (conditional probability)। আগেই বলা হয়েছে যে, জ্যোতিষী বিদ্যা বা জ্যোতির্বিদ্যার সাথে জ্যামিতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত আর জ্যামিতি থেকে এসেছে বীজগণিতসহ গণিতের প্রায় সকল শাখা। সুতরাং জ্যোতিষীরা যে ভবিষ্যৎবানী করত তা বীজগণিতে থাকাটাই স্বাভাবিক। এখানে বীজগণিতে একটি শিরক এবং একটি কুফরের উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

গণিতে 'পাই' (Pi) এর প্রতীক (π)। 'পাই' এর মান আমরা কিভাবে পাই? সাধারণভাবে, বৃত্তের পরিধিকে এর ব্যাস দিয়ে ভাগ করলে 'পাই' এর মান পাওয়া যায়। 'পাই' এর মান ৩.১৪১৫……। এই মান অপরিবর্তনীয় ধরা হয়েছে। প্রাচীনকালে 'পাই' এর মান প্রথম আবিষ্কার করেন মিশরীয় ও বেবিলনিয়নরা। যদিও তাদের পাইয়ের মান আজকের মানের চেয়ে কিছু কম ছিল। বেবিলনের জ্যোতিষী বা গণক বা যাদুকররা বা বিজ্ঞানীরা কিভাবে পাইয়ের মান জানতে পারল? এর উত্তর হয়তো আছে হারুত-মারুতের ঘটনার ভিতরে। হারুত- মারুত বেবিলনেই অবস্থান করেছিলেন। হারুত-মারুতের বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

বিগত ২০০ বছরে বিজ্ঞান ও টেকনোলোজি যতটা উৎকর্ষতা অর্জন করেছে তা আগের ৫০০০ বছরেও মানুষ করতে পারেনি। হঠাৎ করেই মানুষের বুদ্ধিমত্তার কি এতটাই উৎকর্ষতা অর্জিত হল যে, গত ২০০ বছরেই মানুষ বিগত ৫০০০ বছরের চেয়ে বেশি উন্নতি করে ফেলল?

বর্তমান বিজ্ঞানের জ্ঞানের শিকড় হচ্ছে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা বা প্রাচীনত্ব (Classical Antiquity) থেকে এখন পর্যন্ত যতজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আছেন তারা সবাই মহাকাশ গবেষণা করেছেন এবং বিভিন্ন মতবাদ বা থিওরী দিয়েছেন। তারা সবাই জ্যোতির্বিদ বা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। যেমনঃ গ্রীক গণিতবিদ, বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ – পিথাগোরাস; গ্রীক জ্যোতির্বিদ, গণিতবিদ ও ভূগোলবিদ - ক্লডিয়াস টলেমী (Claudius Ptolemy), যিনি টলেমী নামে বহুল পরিচিত; গ্রীক গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ এপোলোনিয়াস অফ পারগা (Apollonius of Perga) ; গ্রীক জ্যোতির্বিদ প্লেটো ও এরিস্টটল, অনেকে প্লেটো ও এরিস্টটলকে শুধু দার্শনিক হিসেবে জানলেও তারা উভয়েই জ্যোতির্বিদ ছিলেন এবং মহাকাশ নিয়ে বিভিন্ন থিওরী দিয়েছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর "On the heavens" নামে এরিস্টটলের একটি বিখ্যাত বই আছে। প্লেটোর একাডেমীতে জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হত। এই একাডেমীতে বিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ Eudoxus of Cnidus এর

অধীনে লেখাপড়া করেছেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ Callippus। Eudoxus of Cnidus প্লেটো এর সরাসরি ছাত্র ছিলেন। আমরা বর্তমানে যে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার ব্যাবহার করছি যাতে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা কে ১ বছর ধরে বছর হিসাব করা হয়েছে – এই সময়ের প্রস্তাব খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ সালে Callippus –ই প্রথম করেছেন। দেখা যাচ্ছে, প্রাচীনকালে বা প্রাচীন গ্রিসে যত বিজ্ঞানী, গণিতবিদের নামই আমরা বলি না কেন তাদের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তারা সবাই জ্যোতির্বিদ ছিলেন। যেমনঃ প্রাচীন গ্রিসের এবং প্রাচীনত্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসও একজন জ্যোতির্বিদ ছিলেন।

১৪৫৩ সালে জুলকারনাইনের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবার পর মহাকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের নতুন দ্বার উম্মোচন হয়েছিল কারণ ১৪৫৩ সালের পরই বিজ্ঞানীরা অর্থাৎ যাদুকররা মহাকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য টেলিস্কোপ আবিষ্কার করে। ১৪৫৩ সালের পর মহাকাশকে আরও কাছ থেকে দেখার সুযোগ জ্যোতির্বিদ বা বিজ্ঞানীরা পায় যখন ১৬০৮ সালে প্রথম টেলিসকোপ আবিষ্কার হয়; পরবর্তীতে জ্যোতির্বিদ ও বিজ্ঞানী গালিলিও ও জ্যোতির্বিদ কেপ্লারের হাত ধরে টেলিসকোপের আরও উন্নত সংস্করণ মানুষের হাতে আসে। বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ আইজ্যাক নিউটনও টেলিস্কপের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। এভাবে ধীরে ধীরে বর্তমানের আধুনিক টেলিস্কপ এসেছে। দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন, বিজ্ঞানী গালিলিও, বিজ্ঞানী জোনাস কেপলার থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ও বিজ্ঞানী স্তীফেন হ্কিং পর্যন্ত সকল বিজ্ঞানীই জ্যোতির্বিদা বা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং বিভিন্ন থিওরি বা মতবাদ দিয়েছেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর বিভিন্ন বই লিখেছেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী জোহাননেস কেপলার (Johannes Kepler) একই সাথে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং জ্যোতিষী ছিলেন। বিখ্যাত আলকেমিবিদ (রসায়ন ও ধাতু বিদ্যা) টয়কো ব্রাহে (Tycho Brahe) একজন জ্যোতির্বিদ ছিলেন। দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা বা প্রাচীনত্ব (Classical Antiquity) থেকে সপ্তাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আমরা যতজন বিজ্ঞানীর নাম-ই বলি না কেন তারা সবাই মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং মহাকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাহলে, হাদিস অনুযায়ী তারা যাদু বিদ্যা অর্জন করেছেন। হাদিস অনুযায়ী, এই সকল বিজ্ঞানী হচ্ছে যাদুকর। আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) বলেছেন, যে যত বেশি জ্যোতির্বিদ্যা (মহাকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান) অর্জন করল সে আসলে তত বেশি জাদু বিদ্যাই অর্জন করল। [বিশুদ্ধ হাদিস] - [আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও আহমদ কর্তৃক বর্ণিত] - [সুনান আবু দাউদ - ৩৯০৫]

আজকে যে কমপিউটার আমরা ব্যাবহার করছি তার গোড়াপত্তন হয়েছিল প্রাচীন গ্রিসে। Antikythera mechanism নামের একটি অ্যানালগ কম্পিউটার প্রাচীন গ্রিসের বিজ্ঞানীরা ব্যাবহার করতেন যা দিয়ে সোলার সিস্টেমের গ্রহগুলোর ভবিষ্যৎ অবস্থান সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যৎবানী করতে পারতেন। এই ভবিষ্যতবাণী এখনো চলছে কিন্তু ভবিষ্যৎবানীর পরিমাণ এত বেশি ছড়িয়ে পড়েছে যে, আমরা এই সকল ভবিষ্যতবাণীকে শিরক না ভেবে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা হিসেবে গ্রহন করে ফেলেছি।

বর্তমান বিজ্ঞান থেকে যদি জ্যোতির্বিজ্ঞানকে বাদ দেন তাহলে বিজ্ঞান বলতে তেমন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

বিজ্ঞানের সাধারণ একটি মতবাদ নিয়ে আলোচনা করলে বুঝা যাবে যে, বিজ্ঞান আল্লাহকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ এর ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে।

আল্লাহ বলেন,"আল্লাহই স্তম্ভ ছাড়াই আকাশমন্ডলীকে ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছেন, যা তোমরা দেখছ, অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মের বন্ধনে বশীভূত রেখেছেন, প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গতিশীল আছে। যাবতীয় বিষয় তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে পার। " (সূরা রা'দ-২)
বিজ্ঞান বলে যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে পৃথিবীসহ সকল গ্রহ ও নক্ষত্র যার যার জায়গায় আছে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকলে গ্রহ ও নক্ষত্রগুলো নিজ কক্ষপথ ছেড়ে এদিক-সেদিক চলে যেত। এই বিষয়গুলো ক্লাস ৮,৯ ১০ এ-ই পড়ানো হয়। এখানে আল্লাহ যে সকল কিছুকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে রেখেছেন তা বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা। এভাবে আল্লাহকে বিজ্ঞান অস্বীকার করছে। আল্লাহ কিভাবে গ্রহ নক্ষত্রগুলোকে নিজ নিজ জায়গায় রেখেছেন – এটা তো গায়েবের বিষয়। জাদুকররা গায়েবের বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ ও বিশ্বাস মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিত যা বর্তমানে বিজ্ঞানীরা করছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান আল্লাহকে অস্বীকার করে নাস্তিকতাকে প্রতিষ্ঠা করছে।
এখন এটা নিশ্চিত যে, আমরা বিজ্ঞান/টেকনোলজি বলতে যা এতদিন শিখেছি, জেনেছি তার অনেক কিছুই ইসলামের পরিভাষায় যাদু এবং যাদু থেকেই বর্তমান বিজ্ঞান ও টেকনোলজির বেশিরভাগ জিনিসের উৎপত্তি হয়েছে। যারা যাদু তথা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে তারাই হচ্ছে মাজুজ।
এই সকল কিছুই শুরু হয়েছে ১৪৫৩ সালে জুলকারনাইনের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবার পর। ১৪৫৩ সালে ইয়াজুজ-মাজুজ আল্লাহ বিরোধিতার নতুন ধাপে অবতীর্ণ হয়েছে। যতদিন কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর ছিল ততদিন অর্থাৎ তৃতীয় শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীতে তেমন কোন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হয়নি। এ কারণে আধুনিক ইতিহাসবিদরা এ সময়কালকে মানবজাতির জন্য (মধ্যযুগকে) অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করেন। ১৪৫৩ সালে জুলকারনাইনের প্রাচীর (কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর) ভেঙ্গে যায়। ১৪৫৩ সাল থেকে ১৬৫০ সাল পর্যন্ত সময়কালকে রেনেসাঁর সময়কাল বলা হয় যার অর্থ পুনঃ জাগরণের যুগ। অর্থাৎ ১৪৫৩ সাল জুলকারনাইনের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবার পর জ্ঞান- বিজ্ঞান পুনরায় অগ্রসর হয়।
দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ- মাজুজের বর্তমান দুনিয়া সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারব যদি আমরা অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত বিজ্ঞানীদের দাবীকৃত AI (Artificial Intelligence/ কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা) ব্যাপারটি বুঝি। Open AI এর সাথে আমরা সবাই কম-বেশি পরিচিত। তাদের মতে, "কৃত্রিম অর্থ হল প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে না হয়ে মানুষের দ্বারা তৈরি বা উৎপাদিত, বিশেষ করে প্রাকৃতিক কিছুর অনুলিপি/ প্রতিকৃতি হিসেবে" ("Artificial means made or produced by human beings rather than occurring naturally, especially as a copy of

something natural”.)। অর্থাৎ আল্লাহ যে Intelligence (বুদ্ধিমত্তা) সৃষ্টি করেছেন তা কৃত্তিমভাবে তৈরি করার দাবী করছেন বিজ্ঞানীরা। এই দাবীটি হচ্ছে একটি শিরকি দাবী, কুফরি দাবী। তারা আল্লাহ এর সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তারা বলতে চাইছে, আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন - তারা তা তৈরি করতে পারে বা তার কাছাকাছি তৈরি করতে পারে। আর এটাই হচ্ছে যাদু। কিন্তু যাদু হচ্ছে ধোঁকা। বিজ্ঞানীরা আসলে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা তৈরি করেনি- তারা একটি প্রোগ্রাম তৈরি করেছে যা বাহির থেকে মনে হয় যে, এর নিজের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আছে কিন্তু আসলে মানুষ আগে থেকেই এই ব্যাপারে instruction Code এর ভিতরে দিয়ে রেখেছে। যেমনঃ একটি সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিলে চেইন ঘুরবে, সাইকেল চলবে। এখন আপনি কি বলবেন যে, চেইনের কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা আছে? আপনি কি দাবী করবেন যে, প্যাডেলে চাপ দিলে চেইন ঘুরতে হবে এটা চেইন বুঝল কিভাবে - যদি চেইনের কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা না থাকে? সাইকেলের ক্ষেত্রে আপনি মেকানিজমটি (mechanism) দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু AI (Artificial Intelligence) এর ক্ষেত্রে আপনি মেকানিজমটি (Mechanism) দেখতে পাচ্ছেন না। পার্থক্য এতটুকু-ই। কিন্তু এই প্রোগ্রামটিকে Artificial Intelligence বলে ডাকার কারণে বা এটা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বলে বিশ্বাস করার কারণে আপনার ঈমান চলে যাবে কারণ বুদ্ধিমত্তা আল্লাহ এর সৃষ্টি। আল্লাহ সকল প্রাণীকে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। বুদ্ধিমত্তা তৈরি করার দাবী বা এতে বিশ্বাস করা শিরক বা কুফর হবে। এখন আমরা চলে যাবো সেখানে, যেখানে এই সকল কিছুর শুরু হয়েছিল। আমরা জানি, কম্পিউটার/ CPU কাজ করে bit এর ভিত্তিতে। বিদ্যুতের সঞ্চালন হলে তাকে 1 ধরা হয়েছে আর বিদ্যুতের সঞ্চালন না হলে ০ ধরা হয়েছে তারপর ৮ ডিজিটের এই বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিরত থাকার উপর ভিত্তি করে সংকেত তৈরি করা হয়েছে। যেমনঃ A এর মান মেশিনের ভাষায় 01000001 যেখানে ০ হচ্ছে বিদ্যুৎ বন্ধ থাকা আর 1 হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়া।

এতবার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়া ও বন্ধ হবার পর মেশিন বুঝতে পারে যে, এটা A. তখন সে মনিটরে A দেখায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যুত-ই এখানে মূল বিষয়।

তাই, আমরা জানতে চাই বিদ্যুৎ কিভাবে আবিস্কার হয়েছিল?

- খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সালঃ থ্যালিস নামে একজন গ্রীক আবিষ্কার করেছিলেন যে অ্যাম্বার যখন রেশমের সাথে ঘষা হয়, তখন পালক এবং অন্যান্য হালকা বস্তু আকর্ষণ করে। এটি হল স্থির বিদ্যুৎ। অ্যাম্বারের গ্রীক শব্দ হল 'ইলেকট্রন', যেখান থেকে 'বিদ্যুৎ' এবং 'ইলেকট্রন' শব্দের উৎপত্তি। থেলিস ছিলেন একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী যিনি আবহাওয়া পূর্বাভাস এবং সূর্যগ্রহণের সঠিক সময় নির্ণয় করেছিলেন বলে জানা গেছে। উর্সা মেজর নক্ষত্রপুঞ্জের (Ursa Major) অবস্থান আবিষ্কারের করেছিলেন থেলিস, সেইসাথে অয়নকাল (solstices)এবং বিষুবের (equinox) সময় তিনিই নির্ণয় করেছিলেন। তিনি একজন প্রকৌশলীও ছিলেন, যিনি হ্যালিস নদীর গতিপথ পরিবর্তনের জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি রোমান ধর্মের অনুসারী ছিলেন। দেখা যাচ্ছে, বিদ্যুতের প্রথম হাতেখড়ি মানুষ পেয়েছিল একজন যাদুকরের

(জ্যোতির্বিদের) হাত ধরে যিনি বেবিলনে ভ্রমন করেছিলেন জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করার জন্য। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে বেবিলনে হারুত-মারুত মানুষকে যাদু কি এবং যাদু নষ্ট করার প্রক্রিয়া শিক্ষা দিত।

১৬০০ সালঃ রানী প্রথম এলিজাবেথের একজন বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসক উইলিয়াম গিলবার্ট 'বিদ্যুৎ' শব্দটি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি চুম্বকত্ব এবং বিদ্যুতের মধ্যে সংযোগ রয়েছে তা স্বীকার করেছিলেন এবং পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র বর্ণনা করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সাল থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যুৎ নিয়ে আর কেউ কিছু তেমন উল্লেখযোগ্য পায়নি – এর কারণ কি জুলকারনাইনের প্রাচীর (কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর) – যার মাধ্যমে গ্রীকদের যাদু ও মতাদর্শকে আল্লাহ দমন করে রেখেছিলেন? ১৪৫৩ সালে জুলকারনাইনের প্রাচীর (কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর) ভেঙ্গে যাবার পর আবার বিদ্যুৎ এর গবেষণায় অগ্রগতি ! আর ১৪৫৩ সালে জুলকারনাইনের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবার পর যে জ্ঞান – বিজ্ঞানের, শিল্প – সংস্কৃতির উত্থান হয়েছিল সেই যুগকে তারা বলে রেনেসাঁর যুগ যার অর্থ হচ্ছে ‘পুনর্জন্ম’ বা ‘পুনর্জাগরণ’ বা ‘নবজাগরণ’ !

- পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র, চুম্বকত্ব এই বিষয়গুলো মহাকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান। অর্থাৎ উইলিয়াম গিলবার্ট ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন।
- ১৭৫২ সালঃ বিখ্যাত মার্কিন রাজনীতিবিদ বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, বজ্রপাতের মধ্যে ধাতব ডগা/তার দিয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে বজ্রপাত বিদ্যুতেরই একটি রূপ। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনকে আমেরিকানরা জাতির প্রতিষ্ঠাতা জনকদের মধ্যে একজন বলে মানে যিনি ছিলেন একজন Grand Master of Freemason. Freemason দের প্রতীক (symbol) হচ্ছে G (G for Geometry, God,)
  Geometry জ্যামিতি: "G" প্রায়শই জ্যামিতিকে বোঝায়, যা ম্যাসোনিক শিক্ষার একটি মৌলিক উপাদান। ফ্রিম্যাসনরি জ্যামিতিকে মহাবিশ্বের শৃঙ্খলা এবং নির্মাণের নীতির প্রতিনিধিত্বের প্রতীক হিসাবে মূল্য দেয়, যা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের গুরুত্ব প্রতিফলিত করে। ফ্রিম্যাসনরিতে ঈশ্বর: "G" শব্দটিকে ঈশ্বরের প্রতীক হিসেবেও ব্যাখ্যা করা হয়, যা ফ্রিম্যাসনরির আধ্যাত্মিক দিকটির উপর জোর দেয়। তাদের মতে, এটি একজন পরম সত্তার প্রতি ম্যাসোনিক বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ভ্রাতৃত্বের শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। ফ্রিম্যাসনরি কোন ধর্ম নয় কিন্তু তারা সবাই একটি সত্ত্বাকে বিশ্বাস করে যাকে তারা বলে "Grand Architect of the Universe.” তাদের গোপন আচার- অনুষ্ঠানের কারণে ক্যাথোলিক চার্চ খ্রিষ্টানদেরকে এই গ্রুপে যোগ দেয়া নিষিদ্ধ করেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন, জেরাল্ড ফোড, ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, চাঁদে ভ্রমণকারী ‘বাজ অলড্রিন’ ফ্রিম্যাসন (Freemason) ছিলেন।

এখন আমরা জানতে চাই যে, বজ্রপাত বা মেঘের বিজলী জিনিসটা আসলে কি এবং কিভাবে হয়?

মেঘে বিপরীত চার্জ এমনিতেই থাকে, এবং বজ্রপাত কেবল তাদের আলাদা হবার কারণে হয়। সমস্ত পদার্থ ভারসাম্যে বিপরীত চার্জ, প্রোটন এবং ইলেকট্রন, সমান পরিমাণে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক দ্বারা গঠিত। বেশিরভাগ দৈনন্দিন পদার্থে থাকা বিপরীত চার্জ সাধারণত বাতিল (neutrilize) হয়ে যায়। পদার্থ সাধারণত বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ আচরণ করে, যদিও এটি আক্ষরিক অর্থেই বৈদ্যুতিক চার্জ দিয়ে তৈরি। পদার্থ বিপরীতমুখী, নিরপেক্ষ (neutralized) বিদ্যুৎ দিয়ে তৈরি। তাই, মেঘের কোনও চার্জ পাওয়ার প্রয়োজন হয় না। পরিবর্তে, বজ্রপাতের জন্য মেঘে ইতিমধ্যেই বিদ্যমান চার্জের ভারসাম্যহীনতা পেতে হয়। মেঘ চার্জ-বিভাজন পায়। তারা "চার্জ-অনক্যান্সেলিং" পায়। তাই, এখানে একটি ভাল প্রশ্ন: বজ্রপাতের সময়, পানির নিজস্ব ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক চার্জ কীভাবে পৃথক হতে পারে? বজ্রপাতের বিদ্যুতায়নের বেশ কিছু ভালো তত্ত্ব আছে, কিন্তু এগুলোর কোনোটিই বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর দেয় না, অথবা বজ্রপাতের সমস্ত প্রভাবের পূর্বাভাস দেয় না। বর্তমানের সেরা ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে রয়েছে বরফ (ice) এবং হিমায়িত বৃষ্টির ফোঁটা (freezing raindrops)। (বৃষ্টির সময় খুব কমই বজ্রপাত বা উচ্চ ভোল্টেজ উৎপন্ন হয় যদি না তাদের জলকণার তাপমাত্রা হিমাঙ্কের (freezing point) নিচে চলে যায়।) এখানে মূল তত্ত্বটি দেওয়া হল: ঝড়ো মেঘের মধ্যে হিমাঙ্কের (freezing point) পরিস্থিতিতে, আমরা আংশিকভাবে হিমায়িত বৃষ্টির (freezing raindrops) ফোঁটা শুকিয়ে যাওয়া বরফের স্ফটিকের (dried-out ice crystals) সাথে মিশতে দেখতে পাই। দ্রুততর গলনরত তুষারের মত পানির ফোঁটা (slush-blobs) বরফের টুকরোগুলিকে (ice flakes) আঘাত করে যখন তারা নিচের দিকে পড়ে ।

যখন পানি বরফের সাথে আঘাত করে, তখন পানির ফোঁটা (slush-blobs) এবং বরফের স্ফটিকগুলি (ice flakes) বিপরীতভাবে চার্জিত হয়ে যায়। (এটি এক ধরণের ঘর্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুতায়ন, বা "ঘর্ষণমূলক" বিদ্যুতায়ন।) অবশেষে সমস্ত ভেজা তুষারের মত ফোঁটাগুলি সামান্য ঋণাত্মক চার্জিত হয়ে যায় এবং বরফের ফোঁটাগুলি সামান্য ধনাত্মক হয়ে যায়। তারপর, ভারী ফোঁটাগুলি তুষারের মত ফোঁটার চেয়ে দ্রুত পড়ে যায়। ধনাত্মক চার্জের মেঘ অনেক পিছনে পড়ে যায় মানে আকাশে থেকে যায়। এর ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই নীচের দিকে বৃষ্টিপাতের একটি ঋণাত্মক চার্জযুক্ত অঞ্চল এবং উপরের দিকে বরফের স্ফটিকের প্রচুর বিপরীত চার্জযুক্ত অঞ্চল থাকবে। মাধ্যাকর্ষণ চার্জগুলিকে পৃথক করার কাজটি সম্পাদন করে। বিপরীত চার্জগুলি একে অপরকে আকর্ষণ করে এবং একসাথে থাকার জন্য প্রবল চেষ্টা করে কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ বল এর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করছে ফলে এটি তাদের অনেক দূরে টেনে নিয়ে যায়।

তাই আবার, প্রথমে কিছু পানি/বরফের সংঘর্ষের ফলে একটি ক্ষুদ্র চার্জ পৃথকীকরণ তৈরি হয়, তারপর মাধ্যাকর্ষণ হালকা কণা থেকে ভারী বৃষ্টির ফোঁটাগুলিকে আলাদা করে দেয়। পুরো বজ্রপাতটি চার্জ হয়ে যায়, ভ্যান্ডেগ্রাফ ইলেকট্রস্ট্যাটিক মেশিনের মতো শক্তিশালী "বিপরীত খুঁটি" তৈরি করে। (যন্ত্রের "বেল্ট" হল বৃষ্টিপাত, এবং মাধ্যাকর্ষণ এটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।) বিপরীতমুখী ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের দুটি বিপরীত অঞ্চল একে অপরের থেকে দূরে সরে যাওয়ার সাথে সাথে, একটি বিশাল ভোল্টেজ তৈরি হয় এবং অবশেষে

তাদের মধ্যে একটি বিশাল স্ফুলিঙ্গ লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। বজ্রপাত নিজেই একটি পরিবাহী (Conductor), এবং এটি বিপরীত চার্জগুলিকে একসাথে প্রবাহিত হতে দেয়, তাই উচ্চ-ভোল্টেজের কিছু অংশ সাময়িকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু তারপর এটি আবার তৈরি হয়, আগের মতোই, এবং আমরা আরেকটি স্ফুলিঙ্গ (বজ্রপাত) দেখতে পাই। তারপর আরেকটি, যতক্ষণ পর্যন্ত ঝড়ের/মেঘের কেন্দ্রে গলনরত তুষারের মত পানির ফোঁটা (slush-blobs) এবং বরফ (ice flakes) তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বজ্রপাতের পুনরাবৃত্তি হয়। বেশিরভাগ বজ্রপাত মেঘের ভিতরে, বিপরীত চার্জের অঞ্চলের মধ্যে থাকে। একটি ছোট শতাংশ ঋণাত্মক-চার্জযুক্ত বৃষ্টি এবং নীচের পৃথিবীর মধ্যে থাকে। বজ্রপাতের সামান্য অংশ বজ্রপাতের উপরের ধনাত্মক অঞ্চল থেকে আসে এবং দূরবর্তী ভূমিতে আঘাত করার জন্য, এমনকি আয়নোস্ফিয়ারের দিকে অর্থাৎ উপরের দিকে ছুটে যায়।

এখন প্রশ্ন আসে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সালে থ্যালিস নামে একজন গ্রীক জানল কিভাবে যে ২ টি বস্তু ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়? এবং ঘষাঘষি করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে ফেলল? এবং সে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করল সেটি বজ্রপাতের মত একই বিদ্যুৎ (স্থির /static বিদ্যুৎ) ?! আমার মতে এর উত্তর আছে, কোরআনে বর্ণিত হারুত-মারুতের ঘটনার মধ্যে।

"এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়ত্বানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত, সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়ত্বানরাই কুফুরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের (বেবিলনের) দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর পৌঁছানো হয়েছিল এবং ফেরেশতাদ্বয় কাউকেও (তা) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না,এতদসত্ত্বেও তারা উভয়ের নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করতো, যা দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করতো, কিন্তু তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহর বিনা অনুমতিতে কারও ক্ষতি করতে পারত না, বস্তুতঃ এরা এমন বিদ্যা শিখত, যা দ্বারা তাদের নিজেদের ক্ষতি সাধিত হত আর তাদের কোন লাভ হত না এবং অবশ্যই তারা জানত যে, যে ব্যক্তি যাদুবিদ্যা শিখবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না, আর যার পরিবর্তে তারা স্বীয় আত্মাগুলোকে বিক্রয় করেছে, তা কতই না জঘন্য, যদি তারা জানত"। (সূরা বাকারাহঃ ১০২)

আপনারা জেনে অবাক হবেন যে, থ্যালিস একবার জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করতে বেবিলনে গিয়েছিল, যাওয়ার পর সে একটি কুয়ায় পরে যায় – এটা একটি বিখ্যাত কাহিনী। হারুত-মারুতের ঘটনা বেবিলনেই ঘটেছিল।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন বজ্রপাতের সময় ধাতব ডগা/তার দিয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে প্রমাণ করেন যে, বজ্রপাতের বিদ্যুৎ হচ্ছে স্থির বিদ্যুৎ (Static electricity), তাকে বিদ্যুত আবিস্কারের জনক বলা হয়। বজ্রপাতের সময় ঘুড়ি উড়ানোর বুদ্ধি তার-ই আসবে যে আগে থেকেই জানে যে, বজ্রপাতের মধ্যে কিছু একটা আছে যার নাম তারা দিয়েছে স্থির বিদ্যুৎ। মনে হচ্ছে, থেলিস এবং বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনকে কেউ বলে দিয়েছে ব্জ্রপাত কিভাবে হয়। বজ্রপাতে বিদ্যুৎ কিভাবে উৎপন্ন হয়? ঘর্ষণের মাধ্যমে। তারপর থেলিস বাড়িতে এসে বিভিন্ন পদার্থ নিয়ে ঘষাঘষি শুরু

করলেন এবং লক্ষ্য রাখলেন যে, কিছু হয় কি না? এবং শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ আবিস্কার করলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সালে বিজ্ঞানী থ্যালিস ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ, জ্যামিতিবিদ এবং দার্শনিক। সুতরাং হাদিস অনুযায়ী বিজ্ঞানী থ্যালিস ছিলেন একজন যাদুকর। যাদুকরদের সাথে জীনদের যোগাযোগ খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সালে খুব জোরালোভাবেই ছিল কারণ তখন ছিল মুসা আঃ এর যুগ আর সেই যুগে যাদুকরদের জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে কদর করা হত।

এখন আমরা দেখব, বিদ্যুতের সর্বশেষ উন্নত আবিস্কার কমপিউটার কিভাবে কাজ করে?
কম্পিউটারের কী-বোর্ডে A চাপলে CPU তে 01000001 এইভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালন হয়, ০ মানে বিদ্যুৎ বন্ধ, 1 মানে বিদ্যুৎ প্রবাহ। 01000001 সিগনাল পেলে CPU বুঝতে পারে যেটা এটা A এর জন্য একটি সিগনাল, তখন সে এই সিগনাল আবার মনিটরে পাঠায়, মনিটর আবার এই সিগনাল পেয়ে পর্দায় A দেখায় – মোটামুটি সরলভাবে এই ভাবে কমপিউটার কাজ করে। এখন CPU কিভাবে বুঝল যে 01000001 এর জন্য A এর সিগনাল দিতে হবে? এটা Machine Language দ্বারা set করা হয়েছে, কিন্তু Machine Language ও তো একটি signal সেটা CPU বুঝল কিভাবে? CPU তো Semi Conductor Transistor দিয়ে তৈরি। (ট্রানজিস্টর হল একটি ক্ষুদ্রাকৃতির অর্ধপরিবাহী যা কারেন্ট বা ভোল্টেজ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, পাশাপাশি এই বৈদ্যুতিক সংকেতগুলিকে প্রশস্ত ও উৎপন্ন করে এবং তাদের জন্য একটি সুইচ বা গেট হিসেবে কাজ করে।) 'বৈদ্যুতিক সংকেতকে' আবার A হিসাবে দেখাতে আবার আরেক মেশিন আছে তারও অদেখা, অজানা সংকেত আছে – এটা এভাবেই কাজ করে –দেখা যায় না, বুঝা যায় না কিন্তু আকাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীদের এভাবে কিছু প্রশ্ন করলে আর কোন উত্তর পাওয়া যাবে না। তারা বলবে, "এটা এভাবেই কাজ করে যেমনিভাবে বস্তুকে ঘষলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়- কেন হয়? এর যৌক্তিক কাল্পনিক উত্তর (negative, positive charge flow, etc) দেয়া ছাড়া উপায় নেই। তবে এই সব প্রশ্নের উত্তর আমরা পাবো যদি আমরা জানি, "Oracle" এবং "Apollo" নামের ২ টি প্রাচীন গ্রীক মতবাদ কি ছিল?

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, Oracle নামে একটি programming Language আছে আর Apollo নামে মহাকাশযান আছে যা দিয়ে মানুষ চাঁদে গিয়েছে। প্রাচীন গ্রীকে অর্থাৎ রোমান ধর্মে (পৈত্তলিক ধর্মে) Apollo নামে একটি God আছে বলে তারা বিশ্বাস করত। তাদের মতে, এই Apollo কথা বলত যে পুরোহিতের মাধ্যমে তাকে তারা বলত Oracle। Oracle রা সাধারণত ভবিষ্যতবাণী করত এজন্য রাজা, সম্রাটদের কাছে তাদের খুবই কদর ছিল – আসলে এই সবকিছু ছিল যাদুবিদ্যা। এরা আসলে জীনের উপাসনা করত বিনিময়ে জীনেরা আকাশ থেকে যা শুনত তা তাদের বলত। তখনো কোরআন নাযিল হয়নি অর্থাৎ তখন জীনেরা ইচ্ছামত তথ্য সংগ্রহ করতে পারত। গ্রীকদের এই ধর্মের প্রচার, প্রসার, প্রভাব চরমরূপে ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৭০০-৬০০ থেকে খ্রিস্টাব্দ ৩১৩ সাল পর্যন্ত, তারপর সম্রাট কনস্টান্টিন (জুলকারনাইন) এসে এই সব বন্ধ করেন এবং প্রাচীর নির্মাণ করে ধর্ম ও

জ্ঞানের নামে যাদুর প্রচার, প্রসার বন্ধ করেন। এখন জুলকারনাইনের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবার পর আবার প্রাচীন গ্রীকদের যাদু/ বিশ্বাস সব ফিরে এসেছে আরও ভয়াবহ রূপে। এজন্যই আধুনিক ইতিহাসবিদরা, দার্শনিকরা তৃতীয় শতাব্দী থেকে ১৪ তম শতাব্দীর মধ্যযুগকে জ্ঞান- বিজ্ঞান ও শিল্প- সংস্কৃতির জন্য অন্ধকার যুগ বলে; অর্থাৎ যতদিন জুলকারনাইনের প্রাচীর ছিল ততদিন জ্যোতির্বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সংস্কৃতি অগ্রসর হয়নি তাই এই সময়ের (যুগের) নাম তারা দিয়েছে অন্ধকার যুগ।

আপনি যদি একজন যাদুকরকে জিজ্ঞেশ করেন যে, তোমরা স্বামী-স্ত্রীর অমিল কিভাবে কর? তারা হয়তো কোন মন্ত্র বলবে যার অর্থ তারা জানে না অথবা বলবে যে, স্বামী –স্ত্রীর কাপড় এনে মুরগীর রক্তে ভিজিয়ে পুতুলের সাথে জোড়া দিয়ে পুড়ে দেই – এতেই কাজ হয় – কিন্তু এটা কিভাবে কাজ করে – তা তারা বলতে পারে না – যত যাদুকর ধরা পড়েছে – কেউই যাদুর মেকানিজম (mechanism) বলতে পারেনি। ঠিক বিদ্যুতের মত, কম্পিউটারের মত – এই রকম করলে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় বা মনিটরে A দেখায় – কিন্তু কিভাবে এটা হয় তার কোন গ্রহণযোগ্য উত্তর তাদের জানা নেই। শুধু আছে কাল্পনিক যৌক্তিক গল্প (Electron flow; 01000001=A). ফাইবার অপটিক কেবল দিয়ে আলোর মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও তারা একই রকম যৌক্তিক কাল্পনিক উত্তর-ই দিবে।
বর্তমানে, জ্যোতিষীদের দাবী হচ্ছে, চাঁদের প্রভাবে যদি পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটা হয় তাহলে চাঁদের প্রভাব পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের জীবনের উপরেও থাকবে।

দাব্বাতুল আরদ বা ভূমি থেকে বের হওয়া জন্তু

উবাদাহ ইবনে আস-সামিত থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এত কিছু বলেছি যে আমার ভয় হচ্ছে তোমরা (হয়তো) বুঝতে পারবে না। দাজ্জাল খাটো, মুরগীর/পাখির মত পায়ের আঙ্গুল বিশিষ্ট (Hen toed), পশমের/কোঁকড়ানো মত কেশবিশিষ্ট, একচোখা, এক চোখ দৃষ্টি শক্তিহীন, এবং বাহিরের দিকে প্রসারিত বা ভিতরের দিকে গভীরভাবে উপবিষ্ট নয়। যদি তোমরা তাকে নিয়ে বিভ্রান্ত হও, তাহলে জেনে রাখো যে তোমাদের রব একচোখা নন। আবু দাউদ বলেন: 'আমর বিন আল আসওয়াদকে বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছিল।' (সুনান আবি দাউদ ৪৩২০) (মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৪৮৫)
দাজ্জালের পায়ের আঙ্গুল হবে - মুরগীর বা পাখির মত আঙ্গুল বিশিষ্ট। বর্তমানে এই ধরণের কোন term বাস্তবে খুজে পাওয়া যায় না। pigeon-toes নামে একটি রোগ আছে যেটি মূলত পায়ের হাঁটুর রোগ – পায়ের হাঁটু ভিতরের বা বাহিরের দিকে বেকে যাওয়া থেকে এই রোগ হয় – অনেকে এই হাদিসের ব্যাখ্যায় Hen- Toed কে pigeon-toes রোগ বলেই ধরে নিয়েছে কিন্তু আমি এটা মনে করি না। কারণ pigeon-toes হচ্ছে হাটুর রোগ যার সাথে পায়ের পাতার (আঙ্গুলের) কোন সম্পর্ক নেই। যদি হাদিসটি আক্ষরিক অর্থে বিশ্লেষণ করি, তাহলে

যতজন দাজ্জাল আবির্ভূত হবে তাদের মধ্যে অন্তত একজন দাজ্জালের পায়ের আঙ্গুল পাখির আঙ্গুলের মতই হবে। আর যদি হাদিসটি রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করি, তাহলে বুঝা যাচ্ছে, দাজ্জালের জমানা হবে এমন জমানা যে জমানায় প্রাণী – প্রাণী সংকর (animal- animal hybrid) , মানব – প্রাণীর সংকর (human–animal hybrid) অথবা মানব-প্রাণী কাইমেরা (human-animal chimera) থাকবে।

মানব-প্রাণীর সংকর (human–animal hybrid) অথবা মানব-প্রাণী কাইমেরা (human-animal chimera) কিভাবে সম্ভব ? মানুষ এবং অন্য প্রাণীর বা পাখির DNA বিশিষ্ট কোন মানুষ। একটি মানব কাইমেরা (human chimera) হল এমন একজন মানুষ যার শরীরের কোষের একটি উপসেটে অন্যান্য কোষের তুলনায় একটি স্বতন্ত্র জিনোটাইপ থাকে, অর্থাৎ জেনেটিক কাইমেরিজম (genetic chimerism) থাকে। বিপরীতে, যে জীবের প্রতিটি কোষে একটি মানুষ এবং একটি প্রাণীর বা পাখির জিনগত উপাদান থাকে তাকে মানব-প্রাণী সংকর (human–animal hybrid) বলা হয়, অন্যদিকে যে জীবে মানব এবং অ-মানব (প্রানি/পাখির) কোষের মিশ্রণ থাকে তাকে মানব-প্রাণী কাইমেরা (human-animal chimera) বলা হয়।

২০২১ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সালক ইনস্টিটিউট (Salk Institute) এবং চীনের কুনমিং বিশ্ববিদ্যালয়ের (Kunming University) যৌথ প্রকল্প হিসেবে একটি মানব-বানর কাইমেরা (human-monkey chimera) তৈরি করা হয়েছিল যা সেল জার্নালে (journal Cell) প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে বানরের ভ্রূণে মানব স্টেম কোষ ইনজেকশন করা হয়েছিল। ভ্রূণগুলিকে মাত্র কয়েক দিনের জন্য বৃদ্ধি পেতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে যে, পরীক্ষার শেষে এই ভ্রূণগুলির মধ্যে কতগুলোতে মানব স্টেম কোষ তখনো বেঁচে ছিল। যেহেতু মানুষ অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় বানরের সাথে বেশি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, এর অর্থ হল কাইমেরিক ভ্রূণগুলি (Chimeric embryos) দীর্ঘ সময় ধরে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি যাতে বিভিন্ন অঙ্গ বিকশিত হতে পারে। এই প্রকল্পটি অঙ্গ প্রতিস্থাপনের (Organ transplantation) সম্ভাবনার পাশাপাশি বিশেষ করে প্রাইমেটদের (বানর জাতীয় প্রাণীদের) মধ্যে মানব মস্তিষ্কের বিকাশ সম্পর্কিত নীতিগত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়ায়। অর্থাৎ মানব-বানর কাইমেরা (human-monkey chimera) থেকে এ রকম প্রাণীর উদ্ভব হতে পারে, যার শরীর হবে বানরের মত কিন্তু মস্তিষ্ক হবে মানুষের মত ফলে সে মানুষের মতই কথা বলবে, কম্পিউটারে কাজ করবে। কি ভয়াবহ অবস্থা ! এছাড়া ইদুর-মানুষ সংকর (Rat- Human Hybrid) গবেষণার কাজে নিয়মিতই করা হচ্ছে। আকৃতির দিক থেকে ইঁদুরের পায়ের আঙ্গুল আর পাখির (মুরগীর) পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়।

ইঁদুর-মানব সংকর (mouse-human hybrid) হল একটি জিনগতভাবে পরিবর্তিত ইঁদুর যার জিনোমে ইঁদুর এবং মানুষ উভয়ের জিন থাকে, তাই এটি মানব-প্রাণী সংকরের একটি মুরাইন রূপ (murine form)। উদাহরণস্বরূপ, জিনগতভাবে পরিবর্তিত ইঁদুরগুলি মানব লিউকোসাইট অ্যান্টিজেন জিন (leukocyte antigen genes) নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে যাতে মানব শ্বেত রক্তকণিকা তাদের মধ্যে প্রবেশ করানোর সময় আরও বাস্তবসম্মত

পরিবেশ প্রদান করা যায় এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া বুঝা যায়। এরকম একটি প্রয়োগ হল হেপাটাইটিস সি ভাইরাসের (HCV) পেপটাইড সনাক্তকরণ যা HLA-এর সাথে আবদ্ধ হয় এবং যা মানব প্রতিরোধ ব্যবস্থা দ্বারা শনাক্ত করা যেতে পারে, যার ফলে ভবিষ্যতে HCV-এর বিরুদ্ধে টিকা তৈরির লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। হাদিসে, দাজ্জালের জমানা হবে যাদুর (বিজ্ঞানের) জমানা - এদিকেই বেশি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যাদু যে জমানায় এই রকম পর্যায়ে এসে পৌঁছাবে সেই জমানায়-ই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। আমরা সম্ভবত সর্বশেষ দাজ্জাল, যাকে ইসা আঃ হত্যা করবেন, তার আবির্ভাবের খুব কাছাকাছি সময়ে আছি। ২০০৫ সালে এবং ২০১৬ সালে দুইবার মানব-প্রাণী সংকর (human–animal hybrid) নিষিদ্ধ করে আইন করার জন্য মার্কিন সংসদে উত্থাপন করা হয় কিন্তু ২ বার-ই বিলটি পাস হয়নি। বিলে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, বর্তমান বিজ্ঞান/ প্রযুক্তি এতটাই উন্নত হয়েছে যে, মানব-প্রানি সংকর (human–animal hybrid) করার মত সামর্থ্য বিজ্ঞানীদের হয়েছে কিন্তু এটি অনৈতিক – তাই নিষিদ্ধ করা জরুরী। কিন্তু এই বিলটি পাস হয় নি। ফলে, যে কেউ চাইলেই এখন মানব-প্রাণী সংকর (human–animal hybrid) করতে পারবে।

Liger এর নাম তো আপনারা শুনেছেন। বাঘ এবং সিংহের মিলনে ফলে নতুন জাতের প্রাণী পৃথিবীতে এসেছে যার নাম হচ্ছে Liger (পুরুষ বাঘ x মহিলা সিংহ=Liger) । এমনিভাবে পুরুষ সিংহ x মাদী বাঘ = Tigon; জেব্রা x গাধা = Zonkey (zebroid); পুরুষ জাগুয়ার x মাদী সিংহ = Jaglion; male killer whale x female bottled-nose dolphin = Wholphin; male leopard x female lion = Leopon; American bison female x domestic bull; polar bear x grizzly bear = Grolar Bear, Llamas x camel = Cama; zebra x horse = Zebroids;

এই রকম হাজার হাজার উদাহরণ দেয়া যাবে হাইব্রিড প্রাণীর (HYBRID ANIMALS)। এই হাইব্রিড প্রাণীগুলো বনে স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে না বরং গবেষণাগারে মানুষ এসব প্রাণীর মধ্যে মিলন ঘটাচ্ছে। মানুষ এবং অন্য প্রাণীর ভিতরে হাইব্রিডও হয়তো করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা যখন কোন নতুন কিছু আবিষ্কার করার সূত্র পেয়ে যান তখন সাধারণত তারা সেটা করেই ফেলেন কারণ আবিষ্কার করাটা হচ্ছে বিজ্ঞানীদের কাছে গভীর আসক্তির বিষয়। আল্লাহ-ই জানেন, এরিয়া – ৫১ (Area-51) এ আমেরিকা কি করছে। এরিয়া-৫১ এ চাকরী করা কেউ কেউ বলেছেন যে, তারা সেখানে দেখতে মানুষের মতই এলিয়েন (Alien) দেখেছেন অর্থাৎ তারা মানুষের মত এমন প্রাণী দেখেছেন যা অন্য কোথাও দেখা যায় না। আমার মতে তারা Alien দেখেন নি, তারা হয়তো দেখেছেন মানব-প্রাণী সংকর (Human–animal hybrid).

প্রানী-প্রানী হাইব্রিডঃ Liger এবং Zebroids;

এই হাইব্রিড প্রাণীর (HYBRID ANIMALS/ Human-Animal Hybrid) ধারণা মানুষ কোথা থেকে পেয়েছে? প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, প্রাচীনত্ব, গ্রেকো রোমান সভ্যতা এই সকল গল্পে ভরপুর। তাছাড়া যাদুর (বিজ্ঞানের) তথ্যে ভরপুর মিশরের পিরামিডের Sphinx of Giza নামের মূর্তিটির মাথা মানুষের মত আর দেহ সিংহের মত। এটির চেহারা ইতিহাসবিদদের মতে ফারাও রাজা 'কাফির/খাফির' (pharaoh Khafre) এর মত।

"তাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি যখন এসে যাবে, আমি তখন ভূমি থেকে তাদের জন্য একটি জন্তু বের করব যা তাদের এ কথা বলবে যে, মানুষ আমার আয়াতসমূহে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করত না" । (সূরা আন-নামলঃ৮২)

আবু দাউদ আত-তায়ালিসী আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "পৃথিবী থেকে একটি জন্তু বের হবে, যার সাথে থাকবে মুসার লাঠি এবং সুলাইমানের আংটি, তাদের উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটি (জন্তুটি) লাঠি দিয়ে কাফেরদের নাকে আঘাত করবে এবং আংটি দিয়ে মুমিনের মুখ উজ্জ্বল করবে, এমনকি যখন লোকেরা খেতে জড়ো হবে, তখন তারা মুমিনদের কাফেরদের থেকে (আলাদা করে) চিনতে পারবে।"

আমি মনে করি, যে জন্তুর কথা আল্লাহ সূরা আন-নামলের ৮২ নাম্বার আয়াতে উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে এই হাইব্রিড প্রাণী। এটি মানুষ – প্রাণীর সংকর বা প্রাণী- প্রাণীর সংকর হতে পারে। যুক্তি হচ্ছে, আল্লাহ বলছেন যে, প্রাণীটি পৃথিবী থেকে আল্লাহ বের করে আনবেন, অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় এই প্রাণীকে আল্লাহ বের করে আনবেন তার পৃথিবীতে আসার প্রক্রিয়া আসমান থেকে আসেনি, এই প্রক্রিয়া পৃথিবী বা জমিন বা মাটি থেকে এসেছে। মানুষ – প্রাণীর সংকর (Human-Animal Hybrid) বা প্রাণী- প্রাণীর সংকর (Animal-Animal Hybrid) আল্লাহ প্রদত্ত আসমানি কোন প্রক্রিয়া নয়, এই প্রক্রিয়া আল্লাহ এর হুকুমে/অনুমতিক্রমে পৃথিবীর (মানুষ) থেকে এসেছে। সুতরাং এটাই হচ্ছে সেই জন্তু যাকে আল্লাহ বলেছেন যে, ভূমি (জমিন/পৃথিবী) থেকে বের করে আনবেন। এই জন্তুর হাতে থাকবে মুসা আঃ এর লাঠি – যেই লাঠি দিয়ে মুসা আঃ ফেরায়ুনের যাদুকরদের যাদুকে মানুষের সামনে উম্মোচন করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে, তারা যাদুর ধোঁকায় পড়েছে। ঠিক তেমনিভাবে এই (হাইব্রিড) জন্তু আসার পর বিজ্ঞান যে যাদু এই বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ থাকবে না, তখন শুধু মাত্র অবিশ্বাসীরাই বিজ্ঞানে বিশ্বাস করবে। হাইব্রিড এই জন্তু বিজ্ঞানের যাদুকে মানুষের সামনে

উম্মোচিত করবে। বিজ্ঞান যে আল্লাহ বিরোধী একটি জ্ঞান তা মানুষ পরিষ্কার বুঝতে পারবে – তারপর ও যারা বিজ্ঞানের গুণগান করবে তারাই হচ্ছে ইসলামে অবিশ্বাসী এবং বিজ্ঞানে (যাদুতে) বিশ্বাসী যাদেরকে আল্লাহ ‘মাজুজ’ নামে অভিহিত করেছেন।
সোলাইমান আঃ এর আংটি দিয়ে বিশ্বাসীদের মুখ উজ্জ্বল করার অর্থ হচ্ছে, সোলাইমান আঃ কে আল্লাহ জীনদের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন, জীনদের যাদু সোলাইমান আঃ কে স্পর্শ করতে পারত না। তেমনিভাবে এই হাইব্রিড জন্তু বের হবার পর বিজ্ঞানের (জীনদের) যাদুবিদ্যায় আর কোন বিশ্বাসী বিশ্বাস করবে না – বিশ্বাসীরা আরও নিশ্চিত হবে যে, বিজ্ঞান হচ্ছে আল্লাহ বিরোধী শয়তান জীনদের জ্ঞান (যাদু) এবং কোরআন-ই হচ্ছে সত্য এবং সঠিক। প্রাণী- প্রাণীর সংকরগুলো (Animal-Animal Hybrid) হচ্ছে ইয়াজুজ-মাজুজের পোষা প্রাণীর মত। যেমনঃ যারা এই সব Liger/ Leopon/ Cama পুষে তারা আদর করে এদের নাম রাখে, এদেরকে ডাক দিলে এরা চলে আসে ঠিক যেমন আমরা বাসায় বিড়াল, কুকুর পুষি এবং এদের সাথে কথা বলি - সেরকম। কিয়ামত হওয়ার আরেকটি শর্ত বাস্তবায়ন হয়েছে আমাদের সামনে সেটি হচ্ছে – ভূমি/জমিন/ পৃথিবী থেকে বের হওয়া জন্তু যার সাথে লোকেরা কথা বলে।

(*** পিরামিডে যে এক চোখের চিহ্ন পাওয়া গেছে তার সাথে দাজ্জালের কোন সম্পর্ক নেই। অনেকে যে কোন জায়গায় এক চোখের চিহ্ন দেখলেই বলেন যে, এটা দাজ্জালের চিহ্ন - কিন্তু এটা ভুল ধারণা।
ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত: একবার আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর প্রাপ্য প্রশংসা করলেন। তারপর দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বললেন, "আমি তোমাদেরকে তার (অর্থাৎ দাজ্জালের) বিরুদ্ধে সতর্ক করছি। এমন কোন নবী নেই যিনি তার জাতিকে তার বিরুদ্ধে সতর্ক করেননি। নিঃসন্দেহে নূহ তার জাতিকে তার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে এমন কিছু বলছি যা আমার আগে কোন নবী তার জাতিকে বলেননি। তোমরা জেনে রাখো যে সে একচোখা, আর আল্লাহ একচোখা নন।" (সহীহ বুখারী ৩৩৩৭)
আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, দাজ্জাল একচোখা এবং এই কথাটি উনার আগে অন্য কোন নবী বলেন নি আর পিরামিড নির্মিত হয়েছে মুহাম্মাদ সাঃ এর জন্মের বহু আগে, সুতরাং পিরামিডের নির্মাতাদের এটা জানা অসম্ভব যে দাজ্জাল এক চোখা বা কানা হবে। পিরামিডে যে এক চোখের চিহ্ন পাওয়া গেছে তা প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে ফেরায়ুনরা যে হরুস নামের এক দেবতাকে বিশ্বাস করত তার চোখের চিহ্ন বা ছবি। একে ‘হরুসের চোখ’ বা 'Eye of Horus' বলা হয়ে থাকে।)

মানুষ মহাকাশ নিয়ে যত গবেষণা করেছে ততই তারা বিজ্ঞানে অগ্রসর হয়েছে। ১৯৩০-১৯৪০ এর দশকে মানুষ মহাকাশ গবেষণা নিয়ে অনেকটা অগ্রসর হয়। ১৯৬১ সালে রাশিয়া এবং আমেরিকা প্রথম - মানুষ মহাকাশে

পাঠায়। ইতিহাসবিদদের মতে, ১৯২৫ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিগত ১০০ বছরে মানুষ বিজ্ঞান ও টেকনোলজিতে যতটা অগ্রসর হয়েছে ততটা তারা ১৯০০ সালের আগের পাঁচ হাজার (৫০০০) বছরেও অগ্রসর হতে পারেনি। তাহলে হটাৎ করে মানবজাতির মস্তিষ্কে বা বুদ্ধিমত্তায় এমন কি পরিবর্তন হল যে, তারা মাত্র ১০০ বছরে এত বিজ্ঞান ও টেকনোলজি অর্জন করে ফেলল? বিগত ১০০ বছরে মানুষ মহাকাশ সংক্রান্ত অভূতপূর্ব জ্ঞান অর্জন করেছে যা তাদেরকে অভূতপূর্ব বিজ্ঞান ও টেকনোলজির জ্ঞান দিয়েছে। আমার মতে, এ জন্যই মানবজাতির বিগত ১০০ বছরে বিজ্ঞানে ও টেকনোলজিতে এত উন্নতি। মহাকাশ সংক্রান্ত সকল জ্ঞানই হচ্ছে যাদুবিদ্যা। আজকের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ গবেষণাই হচ্ছে যাদুবিদ্যা যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন। যারা বিজ্ঞানে বা যাদুতে বিশ্বাসী তারাই হচ্ছে কোরআনে বর্ণিত মাজুজ।

ইসা (আঃ) এর প্রতি অসম্মানের প্রতিবাদ

আমরা মুসলিমরা সারা বিশ্বের কোথাও কেউ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে অসম্মান করে কথা বললে তার প্রতিবাদ করি। কিন্তু ইসা আঃ (Jesus) কে অসম্মান করে কথা বললে আমরা তার কোন প্রতিবাদ করি না। পশ্চিমা বিশ্বে ইসা আঃ (Jesus) কে অবমাননা করে প্রচুর কথা বলা হয়, কৌতুক করা হয় কিন্তু আমরা মুসলিমরা এটা ভেবে কোন প্রতিবাদ করি না যে, Jesus (ইসা আঃ) তো আমাদের কেউ নয় Jesus হচ্ছে খ্রিষ্টানদের অথচ Jesus (ইসা আঃ) হচ্ছেন আল্লাহ এর একজন নবী এবং রসূল।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন,"দুনিয়া ও আখেরাতে আমি সকল মানুষের মধ্যে মরিয়ম পুত্র ঈসার নিকটতম। নবীগণ হলেন চাচাতো ভাই (paternal brothers) ;তাদের মাতা ভিন্ন,কিন্তু তাদের ধর্ম এক।" (সাহিহ বুখারি ৩৪৪৩)

আমাদের তো দায়িত্ব সকল নবীর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা। মুহাম্মাদ সাঃ কে অসম্মান করে কেউ কোন কথা বললে তার প্রতিবাদ করা আর ইসা আঃ (Jesus) কে অসম্মান করে কথা বললে তার প্রতিবাদ না করা হচ্ছে দাজ্জালের একচোখা নীতি। আমরা মুসলিমরা এই বিষয়ে দাজ্জালের এক চোখা নীতির মধ্যে পরে গেছি। আল্লাহ যখন কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করবেন যে, আমার প্রেরিত নবী ও রসূল ইসাকে গালি-গালাজ করা হয়েছে, অপমান করে উনার সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে, উনাকে নিয়ে কৌতুক করা হয়েছে, তখন তোমরা প্রতিবাদ করো নি কেন? কি জবাব দিবো আমরা? আমি ইসা আঃ (Jesus) কে নিয়ে বিশ্বে যে অসম্মানসূচক ও অপমানজনক কথা-বার্তা বলা হচ্ছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

দাজ্জাল কি? দাজ্জাল কে?

দাজ্জাল (আরবি: الدَّجَّال) হল "দাজ্জাল" শব্দের একটি রূপ যার অর্থ "মিথ্যা" বা "প্রতারণা"। এর অর্থ "প্রতারক" এবং সিরিয়াক ভাষায়ও এটি দেখা যায় (daggāl ܕܓܠܐ, "মিথ্যা, প্রতারক; জাল")। "আল-মাসিহ আদ-দাজ্জাল" শব্দটি, যার নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ "আল-" ("the") রয়েছে, "প্রতারক মসীহ" কে বোঝায়, যা শেষ সময়ের প্রতারক। "দাজ্জাল" শব্দটি "দাজ্জালা আল-বা'ইর" ("Dajjala al-ba'eer) (সে উটকে লেপটে দিয়েছিল) অভিব্যক্তি থেকে নেওয়া হয়েছে, যা বোঝায়, যখন তারা (কোন কিছুকে) আলকাতরা দিয়ে ঢেকে দেয়।

দাজ্জাল (Dajjal) শব্দের মূল (root) "দাজালা" (dajala) শব্দের অর্থ 'মিশ্রিত করা'। "দাজালা" শব্দটি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিষয়কে জটিল ও বিভ্রান্ত করা এবং অস্পষ্ট (ধোঁকা) ও দুর্বোধ্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। "দাজ্জাল" হল সেই ব্যক্তি যে অস্পষ্টভাবে কথা বলে, যে অনেক মিথ্যা বলে এবং অনেক লোককে প্রতারিত করে।

"দাজ্জাল" শব্দটি মিথ্যাবাদী, একচোখা, মিথ্যা মসীহকে দেওয়া একটি উপাধি। দাজ্জালকে এই নামে ডাকা হয় কারণ সে মানুষের কাছে মিথ্যা বলে, প্রতারণা করে এবং বিভ্রান্ত করে এবং তার নিজের ভিতরের কুফরকে গোপন করে।

নবী (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দাজ্জালের খবর শুনবে, সে যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। কারণ আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, একজন ব্যক্তি তার কাছে আসবে এবং সে নিজেকে মুমিন মনে করবে এবং তার (দাজ্জাল) দ্বারা অদ্‌ভূত বিভ্রান্তিকর ধারণার কারণে তাকে অনুসরণ করবে।" (সুনানে আবু দাউদ ৪৩১৯; সহীহ) আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেননি যে, "দাজ্জাল অনেক অত্যাচার করবে বা জোর করে তোমাকে ঈমানহারা করে দিবে বা জোর করে শিরক করাবে - তাই তুমি দাজ্জালের কথা শুনলে সেখান থেকে দূরে সরে যাবে"। কিন্তু তিনি বলেছেন দাজ্জাল এমন অদ্‌ভুত বিভ্রান্তিকর ধারণা (মতাদর্শ) নিয়ে আসবে যার ফলে তুমি, আল্লাহ এর রসূল সাঃ কে অনুসরণ না করে, তাকে অনুসরণ করবে। তাহলে, দাজ্জাল নিজে কে – সেটা জানার চেয়ে বরং সে যেই অদ্‌ভূত বিভ্রান্তিকর ধারণা নিয়ে আসবে – সেই ধারণাটা কি – সেটা জানাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাহলেই দাজ্জাল থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। আমাদের মূলত জানতে হবে, দাজ্জাল কি? আল্লাহ এর রসূল সাঃ দাজ্জাল কি – সেটাই আমাদের বুঝাতে চেয়েছেন কিন্তু আমরা সেটা উপলব্ধি করতে পারিনি।

দাজ্জাল হয়তো অনেক অত্যাচার করবে কিন্তু সেটা তার মূল শক্তি নয়, অত্যাচার তো নবী সাঃ এর মক্কার জীবনের সময়েও ছিল কিন্তু সেটা মুসলিমদের ঈমান ধ্বংস করতে পারেনি। তাহলে দাজ্জাল নিয়ে আমরা চিন্তিত হব এই কারণে যে, দাজ্জাল নতুন এমন কিছু বিশ্বাস বা মতাদর্শ নিয়ে আসবে যা অতীতে মানবজাতি আগে কখনো শুনেনি - যার ফলে মানবজাতি এবং অনেক মুসলিমরা দাজ্জালের মতাদর্শে যে শিরক, কুফর

আছে সেটা ধরতে পারবে না ফলে নিজের অজান্তেই আল্লাহকে (সৃষ্টিকর্তাকে) অস্বীকার করবে। দাজ্জালের মূল শক্তি হচ্ছে, সে মিথ্যা ও প্রতারণায় খুবই পটু।

'ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, "আদম সৃষ্টির সময় থেকে কিয়ামতের দিনের মধ্যে, দাজ্জালের ফিতনার/ পরীক্ষার চেয়ে বড় আর কিছু নেই।" (রিয়াদ আস-সালিহিন ১৮১৪)

দাজ্জালের নামের অর্থই হচ্ছে 'প্রতারক' অর্থাৎ সে আপনাকে দিয়ে শিরক করাবে, তাকে আপনি 'নবী' বা 'রব' বলে মেনে নিবেন কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না যে, আপনি শিরক করছেন এবং দাজ্জালকে রব বলে মেনে নিয়েছেন। দাজ্জাল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা যার ব্যাপারে নবী রসূলগণ নিজের উম্মতদেরকে সতর্ক করে গেছেন।

শিরক, কুফরকে দাজ্জাল এমন সুন্দর আবরণে ঢেকে দিবে - মানুষ মনে করবে যে, সে ইসলামের কাজ করছে অথচ সে করছে শিরক, কুফর ফলে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে কিন্তু মানুষ সেটা বুঝতে পারবে না। মানুষের জন্য বা মুসলিমদের জন্য দাজ্জালের মতাদর্শকে চেনাটাই হচ্ছে আসল পরীক্ষা কারণ আমরা যদি দাজ্জালের মতাদর্শ ও বিশ্বাসকে চিনতে পারি তাহলে আমরা তার ফাঁদে পা দিবো না এবং নিজের ঈমানকে রক্ষা করতে পারব।

আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেননি যে, দাজ্জাল একজন হবে। তিনি অনেকগুলো দাজ্জালের মধ্যে একজনের বা কয়েকজনের শারীরিক গঠনের বর্ণনা দিয়েছেন।

সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সাথে একত্রিত হবে এবং তারা মূর্তিপূজা করবে। আর আমার উম্মাতে ত্রিশজন ভণ্ড/প্রতারক (দাজ্জাল) থাকবে, যাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবি করবে। কিন্তু আমি নবীদের মধ্যে শেষ, আমার পরে আর কোন নবী নেই।" (জামে আত-তিরমিযী ২২১৯)

দাজ্জালের মধ্যে ৩০ জন থাকবে যারা নিজেদের নবী বলে দাবী করবে – এরা সবাই নবী সাঃ এর উম্মতের ভিতর থেকে হবে অর্থাৎ তারা সমাজে মুসলিম বলে পরিচিত থাকবে। উপরের হাদিসে নবী সাঃ নিজের উম্মতের মধ্যে ৩০ জন দাজ্জালের কথা বলেছেন যারা নিজেদেরকে নবী দাবী করবে কিন্তু তিনি এই কথা বলেন নি যে, দাজ্জালের মোট সংখ্যা ৩০ জন। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, নবী সাঃ এর উম্মতের বাহির থেকেও অর্থাৎ অমুসলিমদের মধ্যে থেকেও দাজ্জাল আসতে পারে। নবী সাঃ এর উম্মতের মধ্যে নিজেকে রব বলে দাবী করবে এমন দাজ্জালের সংখ্যা ৩০ জন হতে পারে বা তার চেয়ে কম বা বেশীও হতে পারে। দাজ্জালের মধ্যে অনেকে যে নিজেকে 'রব' বলে দাবী করবে তার প্রমাণ এই হাদিসটিঃ

আবু উমামা আল-বাহিলী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য দিলেন যার বেশিরভাগ অংশ ছিল দাজ্জাল সম্পর্কিত। তিনি তার সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন এবং তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে ছিল: 'আল্লাহ আদমের বংশধর সৃষ্টি করার পর থেকে পৃথিবীতে দাজ্জালের চেয়ে বড় কোনও ফিতনা (পরীক্ষা) আসবে না। আল্লাহ এমন কোনও নবী প্রেরণ করেননি যিনি তার (দাজ্জাল) সম্পর্কে তাঁর জাতিকে সতর্ক করেন নি। আমি নবীদের শেষ নবী, এবং তোমরা সকল জাতির শেষ জাতি। সে (দাজ্জাল) নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবে। যদি সে আমার উপস্থিতিতে আবির্ভূত হয়, তবে আমি তোমাদের মধ্যে থাকাকালীন প্রতিটি মুসলিমের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে লড়াই/ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব, এবং যদি সে আমার অনুপস্থিতিতে আবির্ভূত হয়, তবে প্রতিটি মানুষকে নিজের প্রতিরক্ষা/ আত্মরক্ষা করতে হবে এবং আল্লাহ আমার অবর্তমানে প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব নেবেন। সে শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী আল-খাল্লা থেকে আবির্ভূত হবে এবং ডানে ও বামে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। হে আল্লাহর বান্দারা, অবিচল থাকো। আমি তোমাদের কাছে তার বর্ণনা এমনভাবে দেব যা আমার আগে কোনও নবী তাকে বর্ণনা করেননি। সে (দাজ্জাল) এই বলে শুরু করবে "আমি একজন নবী," কিন্তু আমার (মুহাম্মাদ সাঃ) পরে আর কোন নবী নেই। তারপর দ্বিতীয়বার সে বলবে: "আমি তোমাদের রব।" কিন্তু তুমি তোমার রবকে তোমার মৃত্যুর আগে দেখতে পাবে না। ……………………………। (সুনান ইবনে মাজাহ ৪০৭৭)

সুনান ইবনে মাজাহের ৪০৭৭ হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে দাজ্জাল নিজেকে নবী বলে দাবী করার পর রব বলে দাবী করবে। প্রথমবার যারা নিজেদেরকে নবী বলে দাবী করবে তারাই কি দ্বিতীয়বার নিজেদেরকে রব বলে দাবী করবে? আমাদের এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে হলে বুঝতে হবে যে, দাজ্জাল কারো নাম নয়; দাজ্জাল হচ্ছে একটি টাইটেল বা পদবী বা পদের নাম। যেমনঃ ইবনে সাইদের নাম দাজ্জাল ছিল না; তার নাম হচ্ছে ইবনে সাইদ (সাফ ইবনে সাইয়্যাদ/ আব্দুল্লাহ ইবনে সাইদ), সমাজে সে এই নামেই পরিচিত ছিল। তার ভিতরে দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য ছিল বিধায় তাকে সাহাবীরা দাজ্জাল বলেছেন। যেই ৩০ জন দাজ্জাল নিজেকে নবী দাবী করবে তাদের মত বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরে যারা আসবে তারা নিজেদের 'রব' দাবী করবে- ব্যাপারটা এমন হবে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। আল্লাহ এর রসূল সাঃ উনার উম্মতের মধ্য থেকে ৩০ জন দাজ্জালের কথা বলেছেন কিন্তু অমুসলিমদের মধ্য থেকে দাজ্জাল আসবে না - এমন কিছু বলেন নি। বুঝা গেলো, অমুসলিমদের মধ্য থেকেও অনেক দাজ্জাল আসতে পারে।

নবী সাঃ এর দাজ্জাল বিষয়ক এবং শেষ জমানা সম্পর্কিত হাদিসগুলোতে ইউরোপ বা আমেরিকার বা অস্ট্রেলিয়া, ইত্যাদি দেশের/ভূখণ্ডের লোকদের ব্যাপারে কোনো কথা আছে – এমন কিছু আমি পাইনি, তবে এই সব ভূখণ্ডের অমুসলিম লোকদের ব্যাপারে বলা আছে – এরা হচ্ছে সাধারণভাবে ইয়াজুজ-মাজুজের দল। তারা সবাই হচ্ছে ইয়াজুজ –মাজুজের দল কারণ তারা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী হলেও মূলত তারা পৈত্তলিকতায় বিশ্বাসী

এবং যাদুতে (বিজ্ঞানে) বিশ্বাসী। যে সকল মুসলিম দাজ্জালের অনুসারী হবে তারাও ইয়াজুজ-মাজুজের অন্তর্ভুক্ত হবে কারণ তারাও হয় পৈত্তলিকতাতে অথবা যাদুতে (বিজ্ঞানে) বিশ্বাসী হবে। নবী সাঃ এর হাদিসে দাজ্জাল, ইমাম মাহদি, ইসা ইবনে মরিয়ম এবং শেষ জমানা সম্পর্কিত হাদিসগুলোতে আরব উপদ্বীপ (মধ্য প্রাচ্য), তুরস্ক, ভারতীয় উপমহাদেশ নিয়েই বেশি আলোচনা আছে।

(*) পৈত্তলিকতায় বিশ্বাসী কারা? সাধারণভাবে যারা মূর্তি নির্মাণ করে, মূর্তি পুজা করে, আগুনের পুজা করে, মূর্তি বা আগুনকে বা কোন স্তম্ভকে বা দেয়ালকে সম্মান দেখায়। খ্রিষ্টানরা মূর্তি নির্মাণ করে, ইহুদীরা দেয়ালকে সম্মান দেখায়, হিন্দু, বৌদ্ধরা মূর্তি নির্মাণ করে। বর্তমানে ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পৈত্তলিকতা দেখা যায় – তাই এরা সবাই ইয়াজুজ। এছাড়া প্রকৃত মুসলিম বা মুমিন ছাড়া বর্তমানে সকলেই যাদুতে (বিজ্ঞানে) বিশ্বাসী অর্থাৎ এরা হচ্ছে মাজুজ। কিভাবে তারা যাদুতে বিশ্বাসী তা এই বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রতিটি দাজ্জাল-ই কি দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হবে? না, প্রতিটি দাজ্জাল-ই দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হবে না। ইবনে সাইদ দাজ্জাল হলেও সে দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়নি। দাজ্জাল আবির্ভূত হবে অতিরিক্ত রাগের বা ক্রোধের সময়।

“নাফি' বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে উমর মদীনার একটি পথে ইবনে সাইদের সাথে দেখা করেন এবং তিনি তাকে এমন একটি কথা বলেন যা তাকে (ইবনে সাইদকে) ক্রোধে ভরে দেয় এবং সে এতটাই ক্রোধে ফুলে ওঠে যে পথ বন্ধ হয়ে যায়। ইবনে উমর (বিশ্বাসীদের মাতা) হাফসার (রাঃ) কাছে যান এবং তাকে এ কথা জানান। তখন তিনি (হাফসা রাঃ) বলেন:

‘আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, তুমি কেন ইবনে সাইয়াদকে উত্তেজিত করেছ, যদিও তুমি জানতে যে দাজ্জালের আবির্ভাব চরম ক্রোধের কারণে হবে’?” (সহীহ মুসলিম ২৯৩২এ)

সুতরাং আল্লাহ এর রসূল সাঃ যে বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে খুব শীঘ্রই ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর (দাজ্জালের) আবির্ভাব হবে (তিরমিজি-২২১৯) – এই কথার অর্থ হচ্ছে নবী সাঃ উম্মতের মধ্যে নবী সাঃ এর সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত ৩০ জন দাজ্জাল এমন হবে যারা দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হবে। এখন কারা এই দাজ্জাল – এদের নাম, পিতার নাম কি – এই বিষয়গুলো ইতিহাস থেকে বুঝা মুশকিল। তাই, আমাদের দাজ্জালের অদ্ভুত বিভ্রান্তিকর ধারণা বা মতাদর্শ বা বিশ্বাস সম্পর্কে জানা জরুরী। যদি দাজ্জালের অদ্ভুত বিভ্রান্তিকর ধারণা বা মতাদর্শ বা বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা জানতে পারি তাহলে যে বা যারাই আমাদের কাছে সেই অদ্ভুত বিভ্রান্তিকর ধারণা বা মতাদর্শ নিয়ে আসবে তাকে এবং তার দাজ্জালের বিভ্রান্তিকর ধারণা বা মতাদর্শকে আমরা অস্বীকার করব। আল্লাহ চাইলে, এভাবে আমরা দাজ্জালের পরীক্ষায়/ধোঁকায় পতিত হব না।

আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন, ".................আল্লাহর শত্রু (দাজ্জাল) তাকে (ইসা আঃ কে) দেখামাত্রই বিগলিত হয়ে যাবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। আর যদি তিনি (ঈসা আঃ) তাদের মুখোমুখি না হন, তবুও তারা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ তাঁর হাতে (ইসা আঃ এর হাতে) তাদের হত্যা করবেন এবং তিনি তাদের রক্ত তাঁর বর্শায় (ঈসা আঃ এর বর্শায়) দেখাবেন"। (সাহিহ মুসলিম ২৮৯৭)
একটি তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসা আঃ কে দেখা মাত্রই দাজ্জাল এমনভাবে বিগলিত হয়ে যাবে যেমনিভাবে লবণ পানিতে গলে যায় ! এ রকম উপমা দেয়ার কারণ কি?
পানি হচ্ছে পবিত্রকারী উপাদান, এখানে পানি বলতে বিশুদ্ধ জ্ঞান বুঝাচ্ছে বলে মনে করি। লবণ হচ্ছে একটি তিতা/কটা জিনিস যার নিজের স্বাদ ভালো নয় কিন্তু অন্য খাবারের সাথে মিশে গিয়ে এটি নিজেকে সুস্বাদু হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে এবং নিজের তিতা স্বাদের উপস্থিতিকে লুকাতে পারে। দাজ্জাল এত বছর, যত ভালো কিছু আছে সবকিছুতে এই লবণের মত কাজ করেছে –অর্থাৎ মন্দ (লবণ যা তিতা) জিনিসকে মানুষের কাছে সুস্বাদু করে উপস্থাপন করেছে। ধোঁকা দিয়েছে। যদি এই লবণ বা দাজ্জালের ধোঁকা না থাকত তবে মানুষ সহজেই শিরক,কুফর চিনতে পারত। এখন লবণ যদি পানিতে ফেলে দেন তাহলে লবণের আর অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু সেই পানি মানুষ পান করলে বুঝতে পারে যে, এতে লবণ মিশানো হয়েছে অর্থাৎ পানিতে লবণ দিলে লবণ তার অস্তিত্ব (তিতা স্বাদ) আর লুকাতে পারে না বরং পানি তিতা মনে হয় এবং খেতে সুস্বাদু লাগে না।। অর্থাৎ, দাজ্জাল ইসলামের মধ্যে শিরক, কুফর, বিদআত ঢুকিয়ে সেটাকে ইসলাম বলে প্রচার করে এত বছর মানুষকে ধোঁকা দিয়েছিল এবং মানুষের সামনে সেই বিকৃত ইসলামকে মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম হিসেবে প্রচার করেছিল এবং মানুষ তা ইসলাম মনে করে গ্রহনও করেছিল; কিন্তু যখন ইসা আঃ আসবেন তখন তিনি পানি নিয়ে আসবেন অর্থাৎ ইসা (আঃ) ইসলামের তথা কোরআনের সঠিক জ্ঞান প্রচার করবেন ফলে মানুষ দাজ্জালের প্রচার করা বিকৃত ইসলামের ভিতরে থাকা শিরক,কুফর ও বিদআতগুলোকে চিনতে পারবে এবং তাকে বর্জন করবে ফলে তারা ইসা আঃ এর প্রচার করা মুহাম্মাদ সাঃ এর আনীত দ্বীন ইসলামকে গ্রহন করে সঠিক পথে ফিরে আসবে। আবার এটাও সঠিক যে, ইসা আঃ দাজ্জালকে শারীরিকভাবেও হত্যা করবেন। অর্থাৎ ইসা আঃ দাজ্জালের অদ্ভুত বিভ্রান্তিকর ধারণাকে বা মতাদর্শকে ধ্বংস করবেন এবং সেই সাথে সাথে দাজ্জালকে হত্যাও করবেন। এটা আমার ব্যাখ্যা; আমার ব্যাখ্যা সঠিক হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে। ভবিষ্যতে কি হবে জানেন একমাত্র আল্লাহ।

হাদিসে বলা আছে যে, যদি দাজ্জাল ইসা আঃ এর মুখোমুখি নাও হন তবু দাজ্জাল বিলুপ্ত হয়ে যাবে – এই কথার অর্থ কি? আমি মনে করি, এই কথার অর্থ হচ্ছে ইসা আঃ এর আগমনের পর এমন পরিস্থিতি বা ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে যে, দাজ্জাল সেই পরিস্থিতিতে টিকতে পারবে না। দাজ্জাল বিষয়ক যে বিষয়গুলো এখনো ঘটেনি সেগুলো

নিয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ এই সকল ক্ষেত্রে আমার ব্যাখ্যা ভুল হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাই, আমি শুধু অতীতে দাজ্জাল সম্পর্কিত যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে সেখানেই মনোযোগ দিতে চাই।

আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে মানো এবং রসূলকে মানো এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের; যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ এবং রসূলের (নির্দেশের) দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক; এটাই উত্তম এবং সুন্দরতম মর্মকথা" । (সূরা আন–নিসাঃ ৫৯)

ইসলামে আনুগত্য পাওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ এর। আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ এর (আইন/হুকুম) মানো, নবীর (কথা) মানো। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, নবী সাঃ তাই বলেন যা উনাকে আল্লাহ বলতে বলেন, মুহাম্মাদ সাঃ নিজের ইচ্ছামত কোন কথাই বলেননি।

"আর সে (মুহাম্মাদ সাঃ) মনগড়া কথা বলে না। (৩) এটাতো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। "(৪) (সূরা আন-নাজম ৩-৪)

আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহকে মানতে, তার রসূলকে মানতে কিন্তু দাজ্জাল বলে, তাকে মানতে। দাজ্জাল যখন বলে, আমাকে মানো - আমার কথা মানো। অর্থাৎ রসূল সাঃ এর সুন্নতের বিরুদ্ধে গিয়ে দাজ্জাল যখন বলে বা বলবে আমার সুন্নত বা আমার পদ্ধতি অনুসরণ করো তখন সে নিজেকে নবী দাবী করছে। আর যখন সে বলে বা বলবে, আমার আইন/হুকুম মানো – তখন সে নিজেকে রব বলে দাবী করছে। আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন কমপক্ষে ৩০ জন দাজ্জাল আসবে এবং প্রত্যেকেই নিজেকে নবী দাবী করবে। আল্লাহ এর রসূলের সময়ে ইবনে সাইদ (*) নামে একজনকে আল্লাহ এর রসূল সাঃ দাজ্জাল বলে সন্দেহ করতেন। তিনি ইবনে সাইদকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করতেন। আল্লাহ এর রসূল সাঃ ইবনে সাইদকে দাজ্জাল বলে অভিহিত করেছেন এমন হাদিস পাওয়া যায় না। কয়েকজন সাহাবী ইবনে সাইদকে দাজ্জাল বলে অভিহিত করেছেন। ইবনে সাইদ পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহন করেছিল; সে মদিনায় ও প্রবেশ করেছিল। কিছু সুত্রমতে, রিদ্দার যুদ্ধের পরে ইবনে সাইদের আর কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি; অন্য একটি হাদিস মোতাবেক তার মৃত্যু হয়েছে – এই মর্মে তথ্য পাওয়া যায়।

আল্লাহ মুহাম্মাদ সাঃ কে দাজ্জাল সম্পর্কে যতটুকু বলতে বলেছেন, তিনি আমাদেরকে ততটুকুই বলেছেন। দাজ্জাল একটি পরীক্ষা। পরীক্ষার সবকিছু তো আগে থেকেই বলে দেয়া হয় না, তাহলে তো সেটা আর পরীক্ষা থাকবে না। মুহাম্মাদ সাঃ দাজ্জাল সম্পর্কে আমাদেরকে যতটুকু বলেছেন তা থেকে বর্তমান জমানার এবং দাজ্জালের জমানার মানুষ দাজ্জালকে চিনতে পারবে –যদি সেই ব্যক্তি মুমিন হয়।

(*) ইবনে সাইদকে কেউ 'ইবনে সাইদ', কেউ 'ইবনে সাইয়্যাদ', কেউ 'আবদুল্লাহ ইবনে সাইদ' বলে উল্লেখ করেন। তার প্রকৃত নাম 'সাফ ইবনে সাইয়্যাদ' (Saf ibn Sayyad); আমি উচ্চারণের সুবিধার জন্য তাকে এই বইয়ে 'ইবনে সাইদ' নামেই উল্লেখ করেছি)

আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ইবনে সাঈদকে জান্নাতের জমিন/মাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সে বলল: আবুল কাসিম, এটি একটি সূক্ষ্ম সাদা কস্তুরীর (Fine white Musk) মতো। তখন তিনি (সাঃ) বললেন: 'তুমি সত্য বলেছ।' (সহীহ মুসলিম ৬৯৯৭)

আল্লাহ এর রসূল সাঃ ইবনে সাইদ দাজ্জাল কি না – সেটা জানার চেষ্টা করতেন এবং এজন্য তিনি বিভিন্ন সময় ইবনে সাইদকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) ইবনে সাইদের সাথে কথোপকথন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ, আল্লাহ চাইলে, এখান থেকেই আমরা দাজ্জালের বিভ্রান্তিকর ধারণা বা মতাদর্শ চিহ্নিত করার সূত্র (Clue) পাবো এবং দাজ্জাল কারা সেটাও বুঝতে পারব। উপরের হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ইবনে সাইদ অন্তত মাঝে মাঝে সত্য কথা বলত। এখান থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, দাজ্জাল অন্তত কিছু কথা সত্য বলবে।

আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হাঁটছিলাম, এমন সময় ইবনে সাইয়াদ (ইবনে সাইদ) তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন, আমি তোমার জন্য কিছু গোপন করেছি (তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য, তাই আমাকে বলো)। সে বলল, এটা দুখ। তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, "চলে যাও। তুমি তোমার পদমর্যাদার চেয়ে বেশি দূরে যেতে পারবে না।" তখন উমর (রাঃ) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে তার ঘাড়ে আঘাত করার অনুমতি দিন।" তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, "তাকে ছেড়ে দাও; যদি সে সেই (দাজ্জাল) হয় যাকে তুমি ধরছো, তাহলে তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না।" (সহীহ মুসলিম: ৬৯৯১)

এই হাদিস থেকে বুঝা গেলো যে, দাজ্জাল মানুষের মনের কথা বুঝতে পারার দাবী করবে কিন্তু এর মাধ্যমে সে ঈমানদার ব্যাক্তিকে ধোঁকা দিতে পারবে না। ঈমানদার ব্যাক্তি ঠিকই বুঝতে পারবে যে, সে দাজ্জাল। অন্য হাদিস থেকে আমরা জানি, ইবনে সাইদ আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) কাছে নিজেকে রসূল বলে দাবী করেছিল; এই হাদিসে সে নিজেকে রসূল বলে প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ এর রসূল মুহাম্মাদ সাঃ এর মনের কথা বুঝতে পারার দাবী করেছে। উত্তরে আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, ইবনে সাইদ তার পদমর্যাদার চেয়ে উপরে উঠতে পারবে না। আমি মনে করি, এই কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে, সে (ইবনে সাইদ) কখনোই নবী বা রসূল হতে পারবে না। এখান থেকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলাম যে, দাজ্জাল সরাসরি নিজেকে নবী দাবী না করে - নবীদের গুণ তার ভিতরে থাকার দাবী করতে পারে এবং এই ভাবে সে নিজেকে নবী দাবী করতে পারে। যেমনঃ ইবনে সাইদ অন্যের মনের কথা বুঝার দাবী করেছে।

ওমর রা. ইবনে সাইদকে হত্যা করতে চাইলে নবী সাঃ বলেছেন যে, ইবনে সাইদ যদি দাজ্জাল হয় তাহলে ওমর রা. তাকে হত্যা করতে পারবেন না। অন্য হাদিসে আছে, যতদিন ইসা আঃ পৃথিবীতে এসে দাজ্জালকে হত্যা না করবেন ততদিন পর্যন্ত দাজ্জালকে কেউ হত্যা করতে পারবে না।

কিন্তু ওমর (রাঃ) তো তরবারি দিয়ে ইবনে সাইদকে হত্যা করতে পারতেন। তাহলে ইসা আঃ না আসা পর্যন্ত কেন কেউ দাজ্জালকে হত্যা করতে পারবে না? এর কারণ হচ্ছে দাজ্জাল হচ্ছে একটি মতাদর্শ বা বিশ্বাস যা নবী সাঃ এর উম্মতের মধ্যেই অন্তত ৩০ জনের ভিতরে থাকবে। শারীরিকভাবে ইবনে সাইদকে হত্যা করা হলেও দাজ্জালের মতাদর্শ পৃথিবীতে থেকেই যাবে ফলে ইবনে সাইদকে হত্যা করে দাজ্জালকে হত্যা করা সম্ভব নয়। ইসা আঃ দাজ্জালকে হত্যা করবেন; এখানে হত্যা করার অর্থ শুধু শারীরিকভাবে হত্যা করা নয়; ইসা আঃ দাজ্জালের মতাদর্শেরও বিনাশ করবেন। আর এটাই হচ্ছে দাজ্জালের প্রকৃত মৃত্যু। যেহেতু দাজ্জাল একটি পদবী বা পদের নাম তাই, দাজ্জালের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যেই পদবী তৈরি হবে সেই পদবীকে ধ্বংস করতে হলে সেই মতাদর্শ বা বিশ্বাসকে ধ্বংস করতে হবে। তাই, ওমর রাঃ এর পক্ষে দাজ্জালকে হত্যা করা সম্ভব নয়। ওমর রাঃ ইবনে সাইদকে হত্যা করতে পারতেন কিন্তু ইবনে সাইদকে হত্যা করলেও দাজ্জালের মতাদর্শের বিনাশ বা মৃত্যু হত না।

আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন: ইবনে সাঈদ আমাকে এমন কিছু বলেছিল, যার জন্য আমি লজ্জিত বোধ করেছি। সে (ইবনে সাইদ) বলেছিল: আমি অন্যদের ক্ষমা করতে পারি; কিন্তু হে মুহাম্মদের সাহাবীগণ, তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আমাকে দাজ্জাল হিসেবে গ্রহণ করছো? আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি বলেননি যে সে ইহুদি হবে অথচ আমি মুসলিম এবং তিনি আরও বলেন যে, তার কোন সন্তান হবে না, অথচ আমার সন্তান আছে, এবং তিনি আরও বলেন: অবশ্যই, আল্লাহ তার মক্কায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন অথচ আমি হজ্জ করেছি। তিনি (আবু সাইদ খুদরি) আরও বলেন যে, আমি তার লম্বা চেহারা দেখে মুগ্ধ হতে যাচ্ছিলাম। সে (ইবনে সাইদ) আরও বলে: আমি জানি সে (দাজ্জাল) কোথায় আছে এবং আমি তার বাবা এবং মাকে চিনি, এবং তাকে বলা হয়েছিল: তুমি কি একই ব্যক্তি (দাজ্জাল) হলে খুশি হবে না? তখন সে (ইবনে সাইদ) বলল: যদি এই প্রস্তাব (দাজ্জাল হবার প্রস্তাব) আমাকে দেওয়া হয়, আমি এতে বিরক্ত হব না। (সাহিহ মুসলিম ৬৯৯৫)

আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মদীনার কিছু রাস্তায় আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার (ইবনে সাইয়্যাদ) সাথে এবং আবু বকর (রাঃ) ও উমরের সাথে দেখা করেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, "তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহর রাসূল?" তখন সে (ইবনে সাইদ) বলল, "তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহর রাসূল?" তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, "আমি আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর এবং তাঁর কিতাবসমূহের উপর ঈমান এনেছি, আর তুমি কী দেখতে পাও?" সে বলল, "আমি পানির উপর আরশ দেখতে পাচ্ছি।" তখন আল্লাহর

রাসূল (সাঃ) বললেন, “তুমি পানির উপর ইবলিসের সিংহাসন দেখতে পাচ্ছ, তুমি আর কী দেখতে পাচ্ছ?” সে বলল, “আমি দুজন সত্যবাদী এবং একজন মিথ্যাবাদী অথবা দুজন মিথ্যাবাদী এবং একজন সত্যবাদী দেখতে পাচ্ছি।”
তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তাকে ছেড়ে দাও, সে বিভ্রান্ত/ সন্দেহগ্রস্থ হয়ে গেছে।" (সহীহ মুসলিম ২৯২৫)

দাজ্জালের মতাদর্শ মানুষকে বিভ্রান্ত বা সন্দেহগ্রস্থ করবে। ইবনে সাইদের কাছে এমন কিছুর দাওয়াত আসত বা সে এমন কিছু দেখতে পেত বা তার কাছে এমন কিছু তথ্য আসত যা তাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। হাদিসে দেখা যাচ্ছে, দাজ্জালের মতাদর্শ ইবনে সাইদের কাছে আসত। ইবনে সাইদের দুই জন সত্যবাদী এবং একজন মিথ্যাবাদী দেখতে পাওয়া অথবা দুজন মিথ্যাবাদী এবং একজন সত্যবাদী দেখতে পাওয়ার অর্থ হচ্ছে দাজ্জালের বিভ্রান্তিকর ধারণাতে সত্য মিথ্যার সংমিশ্রণ থাকবে। আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, "তাকে (ইবনে সাইদকে) ছেড়ে দাও, সে বিভ্রান্ত/ সন্দেহগ্রস্থ হয়ে গেছে।" অন্য হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, দাজ্জাল মানুষের কাছে বিভ্রান্তিকর ধারণা ছড়িয়ে দেবে। বিভ্রান্তিকর ধারণাটি কি – সেটা এই হাদিস থেকে স্পষ্ট। বিভ্রান্তিকর এই ধারণাটি হচ্ছে সত্য মিথ্যার সংমিশ্রণ। ইসলাম হচ্ছে সত্য। তাহলে বুঝা যাচ্ছে, দাজ্জাল ইসলামের ভিতরে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটাবে। দাজ্জাল সেই মিথ্যা মিশ্রিত বিকৃত ইসলামকে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ইসলাম বলে প্রচার করবে। এই কাজ করতে হলে দাজ্জালকে অবশ্যই সমাজে মুসলিম বলে পরিচিত হতে হবে কারণ কাফির ব্যক্তি ইসলাম নিয়ে ভুল কথা বললে মুসলিমরা তা সহজে গ্রহন করার কথা নয়। আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, উনার উম্মতের মধ্য হতে ৩০ জন দাজ্জাল আবির্ভূত হবে যারা নিজেদের নবী বলে দাবী করবে। সবকিছুই তো মিলে যাচ্ছে। মুহাম্মাদ সাঃ এর এই হাদিসে আমরা দাজ্জালের বিভ্রান্তিকর ধারণাটা কি, সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম।
নাফি (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রাঃ) বলতেন, ইবনে সাঈদই যে মাসিহ দাজ্জাল এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। (আবু দাউদঃ ৪৩৩০)
ওমর রাঃ ইবনে সাইদকে দাজ্জাল বলে অভিহিত করেছেন।
মুহাম্মদ বিন মুনকাদির বর্ণনা করেন: যখন আমি জাবির বিন আব্দুল্লাহকে আল্লাহর নামে শপথ করতে দেখলাম যে, ইবনে সাঈদই দাজ্জাল, তখন আমি বললাম: তুমি কি আল্লাহর নামে শপথ করছো? তখন তিনি বললেন: আমি উমরকে আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর সামনে এই শপথ করতে শুনেছি, কিন্তু আল্লাহর রসূল (সাঃ) এতে অসম্মতি জানাননি। (সহীহ মুসলিম ৬৯৯৯ এবং আবু দাউদ ৪৩৩১)
"জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল (সাঃ) একদিন মিম্বর থেকে বললেন: যখন কিছু লোক সমুদ্রে নৌকা চালাচ্ছিল, তখন তাদের খাবার শেষ হয়ে গেল। তাদের সামনে একটি দ্বীপ দেখা দিল। তারা রুটি

খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। জাসসাসা (দাজ্জালের গুপ্তচর) তাদের সাথে দেখা করল। আমি আবু সালামাকে (রাঃ) বললাম: জাসসাসা কি? তিনি উত্তর দিলেন: একজন মহিলা যে তার ত্বক/চামড়া এবং মাথার থেকে বের হওয়া চুল টেনে নিয়ে চলে। তিনি বললেন: এই দুর্গে। এরপর তিনি (আবু দাউদ-৪৩১১) হাদীসের বাকি অংশ বর্ণনা করলেন। সে (দাজ্জাল) বাইসানের খেজুর গাছ এবং যুগারের ঝর্ণা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। সে বলল: সেই দাজ্জাল।
ইবনে সালামা আমাকে বললেন: এই হাদীসে আরও কিছু আছে, যা আমি মনে করতে পারিনি। তিনি বললেন: জাবির (রাঃ) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে সেই ব্যক্তিই ইবনে সাইয়াদ। আমি বললাম: তিনি (ইবনে সাইয়াদ) মারা গেছেন। তিনি বললেন: তাকে মৃত্যুবরণ করতে দিন। আমি বললাম: তিনি (ইবনে সাইয়াদ) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি বললেন: তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে দিন। আমি বললাম: তিনি (ইবনে সাইয়াদ) মদিনায় প্রবেশ করেছেন। তিনি বললেন: তাকে মদিনায় প্রবেশ করতে দিন।" (আবু দাউদ বই ৩২, হাদিস নম্বর ৪৩১৪)

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিত হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, মুহাম্মাদ সাঃ দাজ্জাল সম্পর্কে যতকিছু কিছু বলেছেন তার সকল কিছু বা বৈশিষ্ট্য - সকল দাজ্জালের ক্ষেত্রে একই হবে না। মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন যে, দাজ্জাল মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না কিন্তু ইবনে সাইদ মদিনায় প্রবেশ করা সত্ত্বেও জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ), ইবনে সাইদকে দাজ্জাল বলেছেন। মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন যে, দাজ্জালকে হত্যা করবেন ইসা আঃ, কিন্তু ইবনে সাইদ তো মারা গেছেন। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাঃ সকল ক্ষেত্রেই এই বিষয়গুলো জানার পরেও বলেছেন যে, ইবনে সাইদ-ই দাজ্জাল। বুঝা গেলো, মুহাম্মাদ সাঃ দাজ্জাল সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তার সকল কিছু সকল দাজ্জালের জন্য প্রযোজ্য হবে না। বিশেষ করে বাহ্যিক গঠন এবং দাজ্জাল সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা। দাজ্জালের সংখ্যা অনেক। একেকজন দাজ্জালের ক্ষেত্রে একেক রকম ঘটনা ঘটবে, যা আল্লাহ এর রসূল সাঃ এর বর্ণনায় আমরা বিভিন্ন হাদিসে পাই।

নবী সাঃ এর উম্মত থেকে আবির্ভূত দাজ্জালের সংখ্যা ৩০ জন। নবী সাঃ দাজ্জালের ব্যাপারে যা কিছু বলেছেন তা অন্তত কোন একটি দাজ্জালের ব্যাপারে সত্য হবেই – এটা নিশ্চিত কিন্তু সকল দাজ্জাল একই রকম হবে এই রকম বর্ণনা মুহাম্মাদ (সাঃ) দেন নি – এটা জাবির বিন আবদুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সকল দাজ্জাল-ই কানা হবে না, তবে কমপক্ষে একটি দাজ্জাল আক্ষরিক অর্থেই কানা হবে। সকল দাজ্জালের চুল কোঁকড়ানো হবে না তবে কমপক্ষে একটি দাজ্জালের চুল নিশ্চিতভাবেই কোঁকড়ানো হবে। ইবনে সাইদ মদিনায় প্রবেশ করেছে এবং সে মুসলিম ছিল, অন্য হাদিস মোতাবেক দাজ্জাল মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। তাহলে ইবনে সাইদ দাজ্জাল হল কিভাবে? সে দাজ্জাল এই কারণে যে, দাজ্জালের যেই নীতি আদর্শ/ মতাদর্শ/ অদ্‌ভুত বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রচার করবে ইবনে সাইদের ভিতরে সেগুলো ছিল, সেগুলোতে

ইবনে সাইদ বিশ্বাসী ছিল এবং সে এটা প্রচ্ছন্নভাবে প্রচার ও করত। উপরের হাদিসগুলো (সহীহ মুসলিম ৬৯৯৭, ৬৯৯১,৬৯৯৫, ২৯২৫) পর্যালোচনা করলে এবং চিন্তা –ভাবনা করলে বুঝা যায় যে, ইবনে সাইদের ভিতরে ২ টি বিপরীত ধরণের বিশ্বাস বা মতাদর্শের মিশ্রণ একই সাথে বিদ্যমান ছিল। সে নিজেকে রসূল বলে দাবী করেছিল আবার সে ইসলাম গ্রহন করেছিল; সে নিজেকে দাজ্জাল নয় বলে প্রমাণ করতে চাইত আবার একই সাথে বলত যে তাকে দাজ্জাল হবার প্রস্তাব দিলে সে অখুশি হবে না। ইবনে সাইদের ভিতরে সত্য এবং মিথ্যার সংমিশ্রণ দেখা যাচ্ছে। এজন্যই ইবনে সাইদ দাজ্জাল ছিল। কিন্তু দাজ্জাল হিসেবে সে আবির্ভূত হয়নি। কোন ব্যক্তি দাজ্জাল হওয়া আর দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। ইবনে সাইদ দাজ্জাল ছিল কিন্তু সে দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়নি।

দাজ্জাল মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হবে কি?

"হায়ওয়া ইব্‌ন শুরায়হ (রহঃ) .... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেনঃ আমি তোমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছি, এতসত্ত্বেও আমার ভয় হয়, তোমরা তাকে চিনতে পারবে না। (জেনে রাখ!) মাসীহ দাজ্জাল হবে বেঁটে, তার পদক্ষেপ হবে দীর্ঘ, মাথার চুল হবে কুঞ্চিত, আর সে হবে কানা। তার চোখ হবে সমতল, যা উপরে উঠে থাকবে না এবং নীচে থাকবে না। এরপরও যদি তোমরা সন্দীহান হও, তবে জেনে রাখ! তোমাদের রব কানা নন। (সুনান আবু দাউদঃ ৪৩২০)

আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন উনার উম্মতের মধ্য থেকে ৩০ জন দাজ্জাল আসবে। কমপক্ষে ৩০ জন দাজ্জাল যে আসবে তার মধ্যে এমন একজন দাজ্জাল আসবে যার শারীরিক গঠন হাদিসে বর্ণিত লোকেটির মতই হবে। আমি মনে করি, আল্লাহ এর রসূল সাঃ এই হাদিস দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে, দাজ্জাল আমাদের মতই একজন মানুষ, তাকে তার বিশ্বাস ও মতাদর্শ দাজ্জাল বানিয়েছে। অন্য হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, দাজ্জাল বাতাসে ভর করে মেঘ যেমন চলে তেমনভাবে চলবে, মাটিকে বলবে ফসল দিতে, মাটি তাকে ফসল দিবে, ইত্যাদি; যার ফলে আমাদের মনে এমন চিন্তাভাবনা আসতে পারে যে, দাজ্জাল হয়তো কোন দানব বা জীন বা বিশাল আকৃতির কিছু হবে বা আমাদের অজানা কোন প্রাণী হবে – এই ধরণের ভুল যেন আমরা না করি তাই আল্লাহ এর রসূল সাঃ উপরের হাদিস সহ বিভিন্ন হাদিসে বুঝাতে চেয়েছেন যে, দাজ্জাল আমাদের মতই মানুষ; সে আমাদের মধ্যে অদ্‌ভূত বিভ্রান্তিকর ধারণা ছড়াবে যার কারণে তাকে দাজ্জাল নামে অভিহিত করা হয়েছে।

মূলত অদ্‌ভূত বিভ্রান্তিকর ধারণাটিই হচ্ছে দাজ্জালের বিশ্বাস/ মতাদর্শ আর যে এই মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে গঠিত দলের/ প্রতিষ্ঠানের/ সংগঠনের / রাষ্ট্রের প্রধান হবে বা রাষ্ট্রপ্রধান বা সংগঠনের প্রধান হয়ে সেই বিভ্রান্তিকর ধারনাকে স্বীকৃতি দিবে, প্রচার –প্রসারের সুযোগ করে দিবে বা নিজেই প্রচার প্রসার করবে, সেই হচ্ছে

দাজ্জাল। এই অদ্ভুত বিভ্রান্তিকর ধারণাটি প্রতিষ্ঠায় ও রক্ষায় যারা কাজ করবে তারা সবাই দাজ্জালের সহযোগী বা দাজ্জালের বাহিনী। আর যারা এই ধারণাটি গ্রহন করবে বা মেনে নেবে তারা হচ্ছে দাজ্জালের অনুসারী।

প্রথমবার দাজ্জালের আবির্ভাব

ফাতিমা বিনতে কায়েস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর আহবানকারীর আওয়াজ শুনতে পেলাম, যিনি বললেন: "আল-সালাতু জামিয়া" (নামাজ শুরু হতে চলেছে), তাই আমি মসজিদে গেলাম এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সাথে সালাত আদায় করলাম। আমি মহিলাদের কাতারে ছিলাম যা মানুষের সবচেয়ে কাছে ছিল। যখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সালাত শেষ করলেন, তখন তিনি মিম্বরে বসে পড়লেন এবং তিনি হাসছিলেন। তিনি বললেন: "প্রত্যেকে সেই স্থানেই থাকুক যেখানে সে সালাত আদায় করেছে।" তারপর তিনি বললেন: "তোমরা কি জানো কেন আমি তোমাদের একত্রিত করেছি?"

তারা বলল: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) ভাল জানেন।

তিনি বললেন: "আল্লাহর কসম, আমি তোমাদেরকে উপদেশ বা সতর্কীকরণের জন্য একত্রিত করিনি।" আমি তোমাদের একত্রিত করেছি কারণ তামিম আল-দারি একজন খ্রিস্টান ছিলেন এবং তিনি এসে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং মুসলিম হয়েছিলেন, এবং আমাকে এমন কিছু বলেছিলেন যা আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের যা বলছিলাম তার সাথে মিলে যায়। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি লাখাম ও জুদামের ত্রিশ জন লোকের সাথে একটি জাহাজে ভ্রমণ করেছিলেন এবং এক মাস ধরে সমুদ্রের ঢেউয়ে তাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। তারপর তারা সূর্যাস্তের সময় একটি দ্বীপে এসেছিলেন। তারা একটি ছোট নৌকায় বসেছিলেন এবং সেই দ্বীপে অবতরণ করেছিলেন। তাদের সাথে প্রচুর লোমযুক্ত একটি জন্তু দেখা করেছিল এবং তারা তার মুখটি তার পিঠ থেকে আলাদা করতে পারেনি কারণ সে খুব লোমশ ছিল। তারা বলল: 'তোমাদের জন্য দুর্ভাগ্য, তুমি কে?' বলল: 'আমি আল-জাসসাসা।' তারা বলল: 'আল-জাসসাসা কি?' বলল: 'হে লোকেরা, মঠে এই ব্যক্তির কাছে যাও কারণ সে তোমাদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিল।' তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন: তার মুখে এই লোকের কথা শুনে আমরা ভয়ে শঙ্কিত হলাম যে, সে আবার শাইতান (শয়তান) তো নয়! তারপর আমরা দ্রুত চললাম, যতক্ষণ না আমরা সেই মঠে পৌঁছালাম, সেখানে আমরা আমাদের দেখা সবচেয়ে বিশাল মানুষটিকে দেখতে পেলাম, যার হাত গলায় বাঁধা এবং পা হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা। আমরা বললাম: 'তোমাকে ধিক্, তুমি কে?' সে বলল: 'তোমরা শীঘ্রই আমার সম্পর্কে জানতে পারবে; আমাকে বলো তোমরা কারা?' তারা বলল: 'আমরা আরবের লোক যারা একটি জাহাজে উঠেছিলাম, কিন্তু সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে এবং ঢেউ এক মাস ধরে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যায়, তারপর ঝড়ে আমাদেরকে তোমাদের এই দ্বীপে নিয়ে আসে। আমরা নৌকায় চড়ে এই দ্বীপে অবতরণ করি। আমাদের সাথে প্রচুর লোমযুক্ত একটি জন্তুর দেখা হয় এবং আমরা তার সামনের দিক থেকে পিছনের দিকটি (আলাদা) চিনতে পারিনি কারণ সে খুব লোমশ ছিল। আমরা

বললাম: 'তোমাকে ধিক্, তুমি কে?' সে বলল: 'আমি আল-জাসসাসা।' আমরা বললাম: 'আল-জাসসাসা' কী? সে বলল: 'মঠে এই লোকটির কাছে যাও কারণ সে তোমার সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।' তাই আমরা দ্রুত তোমার কাছে এসে গেছি। আমরা তার কথায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি না জানি এ আবার কোন জিন/ শয়তান কিনা? সে (সেই শৃঙ্খলিত ব্যক্তি) বলল: 'আমাকে বাইসানের খেজুর গাছ সম্পর্কে বলো।' আমরা বললাম: 'তুমি এগুলো সম্পর্কে কী জানতে চাও?' সে বলল: 'আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি এই গাছগুলিতে ফল ধরে কিনা।' আমরা বললাম: 'হ্যাঁ।' সে বলল: 'শীঘ্রই এগুলোতে ফল ধরবে না।' সে বলল: 'তাবারিয়ার হ্রদ সম্পর্কে বলো।' আমরা বললাম: 'তুমি এর সম্পর্কে কী জানতে চাও?' সে বলল: 'এতে কি পানি আছে?' তারা বলল: 'এতে প্রচুর পানি আছে।' সে বলল: 'শীঘ্রই এটি শুকিয়ে যাবে।' তারপর সে বলল: 'আমাকে যুগারের ঝর্ণা (যা সিরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত) সম্পর্কে বলো।' তারা বলল: 'তুমি এর সম্পর্কে কী জানতে চাও?' সে বলল: 'ঝর্ণায় কি পানি আছে এবং লোকেরা কি ঝর্ণার পানি দিয়ে ফসল ফলায়?' আমরা তাকে বললাম: 'হ্যাঁ, আছে' "এখানে প্রচুর পানি আছে এবং মানুষ এর পানি দিয়ে ফসল ফলায়।" তিনি বললেন: "আমাকে নিরক্ষর নবী সম্পর্কে বলো; তিনি কী করেছেন?" আমরা বললাম: "তিনি মক্কা ছেড়ে ইয়াসরিবে (মদীনা) বসতি স্থাপন করেছেন।" সে বললেন: "আরবরা কি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে?" আমরা বললাম: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "তিনি তাদের সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন?" আমরা তাকে বললাম যে তিনি তার আশেপাশের আরবদের উপর জয়লাভ করেছেন এবং তারা তার আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। তিনি আমাদের বললেন: "এটা কি সত্যিই ঘটেছে?" আমরা বললাম: "হ্যাঁ।" সে বলল: "যদি তাই হয় তবে তাদের জন্য তার আনুগত্য প্রকাশ করাই ভালো। এখন আমি তোমাদের আমার সম্পর্কে বলব। আমি দাজ্জাল এবং শীঘ্রই আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। তাই আমি বেরিয়ে আসব এবং জমিনে ভ্রমণ করব, এবং চল্লিশ রাত অবস্থান করব, মক্কা এবং তাইবা (মদীনা) ছাড়া। উভয়ই আমার জন্য নিষিদ্ধ; যখনই আমি তাদের মধ্যে কোন একটিতে প্রবেশ করার চেষ্টা করব, তখনই একজন ফেরেশতা আমার সামনে আসবেন যার হাতে তরবারি থাকবে, যিনি আমার পথ আটকে রাখবেন এবং প্রতিটি পথে ফেরেশতারা এটি পাহারা দেবেন।' তিনি বললেন: তারপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁর লাঠি দিয়ে মিম্বরে আঘাত করলেন এবং বললেন: "এটি তাইবা, এটি তাইবা, এটি তাইবা," অর্থাৎ মদীনা। "আমি কি তোমাদের আগে এই কথাটি বলিনি?" লোকেরা বলল: হ্যাঁ। [রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন:] "আমি তামীমের গল্পটি পছন্দ করেছি কারণ এটি আমি তোমাদেরকে তার (দাজ্জাল) সম্পর্কে এবং মক্কা ও মদীনা সম্পর্কে যা বলতাম তার সাথে মিলে যায়। কিন্তু সে (দাজ্জাল) সিরিয়ার সাগর (ভূমধ্যসাগর) অথবা ইয়েমেনী সাগর (আরব সাগর) -এ আছে। না, বরং সে পূর্ব দিকে আছে, সে পূর্ব দিকে আছে, সে পূর্ব দিকে আছে," এবং তিনি তার হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইশারা করলেন। তিনি বললেন: আমি এটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে মুখস্থ করেছি। (সাহিহ মুসলিম ২৯৪২)

এই হাদিসটি ব্যাখ্যা করতে আমাদেরকে একটু গভীরে যেতে হবে। তামিম আদ দারি (রাঃ) স্বেচ্ছায় দাজ্জালের সাথে দেখা করতে যাননি। তামিম আদ দারিকে (রাঃ) আল্লাহ ঝড়ের কবলে ফেলে ঐ দ্বীপে নিয়ে গেছেন যাতে তামিম আদ দারি দাজ্জালের সাথে দেখা করতে পারেন এবং কথা বলতে পারেন। উনার মাধ্যমে আমরা যেন দাজ্জাল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারি। এখানে অনেক কিছুই প্রতীকী অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। এই হাদিসে তামিম আদ দারি রাঃ যা কিছু বলেছেন তার সম্পর্কে আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, "আমি তামীমের গল্পটি পছন্দ করেছি কারণ এটি আমি তোমাদেরকে তার (দাজ্জাল) সম্পর্কে এবং মক্কা ও মদীনা সম্পর্কে যা বলতাম তার সাথে মিলে যায়" । তামিম আদ দারি রাঃ যেই দাজ্জালের সাথে কথা বলেছেন সেই দাজ্জাল যা বলেছে তা সব সত্য – এই কথা আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) বলেন নি। এখন আমাদেরকে আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) দাজ্জাল সম্পর্কে কি কি বলেছেন তার সাথে এই হাদিসটি মিলাতে হবে কারণ আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে যা যা বলেছেন তার সাথে তামিম আদ দারির গল্প মিলে যায়। আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, দাজ্জাল হচ্ছে একচোখা বা কানা, দাজ্জাল মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল প্রতারক, দাজ্জালের কপালে কাফির শব্দটি লিখা থাকবে যা প্রতিটি মুমিন পড়তে পারবে।

দাজ্জাল মানুষকে তার প্রতি ঈমান আনতে অর্থাৎ তাকে বিশ্বাস করতে বলবে। কিন্তু আমরা তো দাজ্জালের প্রতি ঈমান আনব না। তাহলে, এই হাদিসে দাজ্জাল যা কিছু বলেছে তা নিয়ে আমাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। দাজ্জাল এই খানেও আমাদেরকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করেছে। যেমনঃ বাইসানের খেজুর গাছ সম্পর্কে সে বলেছে যে, 'শীঘ্রই এই গাছগুলোতে ফল ধরবে না'। প্রশ্ন হচ্ছে সে কিভাবে জানল যে, এই গাছগুলোতে অদূর ভবিষ্যতে ফল ধরবে না? সে তো নবী নয় যে - তাকে আল্লাহ এই বিষয়ে জানাবেন। ভবিষ্যতে কি হবে জানেন একমাত্র আল্লাহ। তাহলে, দাজ্জাল এখানে মানুষকে তার প্রতি ঈমান আনতে বলছে , তাকে বিশ্বাস করতে বলছে কিন্তু তার কথা মিথ্যা। আমরা তাকে বিশ্বাস করি না।

তাবারিয়ার হ্রদ সম্পর্কে দাজ্জাল বলেছে যে, শীঘ্রই এটি শুকিয়ে যাবে; দাজ্জাল আবারো ভবিষ্যৎবাণী করেছে – যেটা করা তার অধিকারে নেই কারণ ভবিষ্যৎ জানেন একমাত্র আল্লাহ। তারপর সে যুগারের ঝর্ণা সম্পর্কে জানতে চেয়েছে কিন্তু এই ব্যাপারে সে কিছু বলেনি। তারপর সে মুহাম্মাদ সাঃ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল এবং বলেছে যে, মুহাম্মাদ সাঃ এর আনুগত্য করাই লোকদের জন্য ভালো। এটা একটা অবাক করার মত বিষয় কারণ দাজ্জাল আবির্ভূত হবে মানুষের ঈমান নষ্ট করতে কিন্তু সে বলছে যে, মুহাম্মাদ সাঃ এর আনুগত্য করাই লোকদের জন্য ভালো। এটা হয়তো সে এই কারণে বলেছে যেন মানুষ বা মুসলিমরা তাকে বিশ্বাস করে, তার প্রতি ঈমান আনে। তারপর সে বলেছে যে, সে শীঘ্রই বের হবে। দাজ্জালের এই কথাটিও মিথ্যা হতে পারে। আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, দাজ্জালের এক চোখ কানা হবে। তামিম আদ দারি যে দাজ্জালের সাথে কথা

বলেছেন তার চোখ কানা ছিল –এমন কথা তিনি বলেন নি। ইবনে সাইদ ও কানা ছিল না – এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, সকল দাজ্জাল শারীরিকভাবে কানা হবে না। কিন্তু প্রতীক অর্থে কানা হবে। কানা শব্দটির প্রতীক অর্থ কি? সে এক চোখে দেখে, তার অন্য চোখটি কানা অর্থাৎ একটি চোখ অপরটির বিপরীত। দাজ্জাল যে মতাদর্শ নিয়ে আসবে তার একটি অংশ অপরটির বিপরীত হবে। তামিম আদ দারি বর্ণিত দাজ্জাল এক দিকে ভবিষ্যৎ বাণী করছে অপরদিকে সে বলছে লোকদের উচিত আল্লাহ এর রসূল সাঃ এর আনুগত্য করা। তার একটি কথা তার অপর কথার বিপরীত কারণ আল্লাহ এর রসূল সাঃ লোকদের ভবিষ্যৎবাণী করতে এবং তাতে বিশ্বাস করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এভাবে তামিম আদ দারি বর্ণিত দাজ্জালটির এক চোখ কানা। এভাবে আল্লাহ এর রসূল সাঃ দাজ্জাল সম্পর্কে সাহাবীদেরকে যা বলেছিলেন তার সাথে তামিম আদ দারির গল্প মিলে যায়। ঠিক এমনি ভাবে ইবনে সাইদ ও এক চোখ কানা ছিল। ইবনে সাইদ নিজে দাজ্জাল নয় প্রমাণ করার জন্য কত যুক্তি দিয়েছিল তারপর সেই আবার বলেছিল যে, দাজ্জাল হবার প্রস্তাব দিলে সে বিরক্ত হবে না। অর্থাৎ ইবনে সাইদের একটি কথা তার অপর কথার বিপরীত।

তামিম আদ দারির হাদিস থেকে দাজ্জালের ব্যাপারে আরও কিছু জিনিস আমাদের কাছে পরিষ্কার হচ্ছে। দাজ্জাল প্রথমে তামিম আদ দারির কাছে বাইসানের খেজুর গাছের খেজুর এবং তাবারিয়ার হ্রদের পানির সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করেছে যা যাদুকরের কাজ আর যে এটি করবে সে কাফির হয়ে যায়। সুতরাং দাজ্জালের ব্যাপারে নবী সাঃ যে বলেছেন, দাজ্জালের কপালে কাফির লিখা থাকবে – এটা তামিম আদ দারির গল্পের দাজ্জালের সাথে মিলে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে, দাজ্জালের কপালে কাফির লিখা থাকবে – এটা প্রতীকী অর্থে; অর্থাৎ যে কেউ তাঁর কথা শুনলেই বুঝতে পারবে যে, সে কাফির। তারপর দাজ্জাল তামিম আদ দারিকে (রাঃ) বলেছে নবী সাঃ এর আনুগত্য করাই লোকদের জন্য ভালো – এটা হচ্ছে শিরকের উপর ইসলামের প্রলেপ দেয়া যাতে মানুষ দাজ্জালকে বিশ্বাস করে অর্থাৎ দাজ্জাল ইসলামের সাথে শিরক, কুফরকে মিশ্রিত করে দিবে – এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। দাজ্জালের ভবিষ্যৎবানীকে বিশ্বাস করার পর নবী সাঃ কে আংশিকভাবে অনুসরণ করে কোন লাভ নেই কারণ আপনি তখন দাজ্জালের অনুসারী হয়ে গেছেন। বুঝা গেলো, পৃথিবীতে দাজ্জাল তাঁর যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে তাতে সে ইসলামের প্রলেপ দিয়ে মানুষকে শিরকের দিকে আহবান করবে।

এই হাদিসটি বুঝতে না পারার কারণে অনেক মুসলিম-ই দাজ্জালের ধোঁকায় পরে গেছেন এবং তারা বাইসানের খেজুর গাছে ফল ধরে কি না? তাবারিয়ার হ্রদে পানি আছে কি না? এই সব জিনিস জানতে চায় কারণ তারা মনে করে যে, এই ঘটনাগুলো ঘটলে দাজ্জাল আবির্ভূত হবে –এর আগে হবে না। তামিম আদ দারি রাঃ বর্ণিত দাজ্জালকে তারা বিশ্বাস করে ফেলেছে যে, সে যা বলেছে সত্যই বলেছে কিন্তু আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) বলেন নি যে, তামিম আদ দারি রাঃ বর্ণিত দাজ্জাল সত্য বলেছে। আল্লাহ এর রসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন যে, "আমি

তামীমের গল্পটি পছন্দ করেছি কারণ এটি আমি তোমাদেরকে তার (দাজ্জাল) সম্পর্কে এবং মক্কা ও মদীনা সম্পর্কে যা বলতাম তার সাথে মিলে যায়" । মুহাম্মাদ সাঃ দাজ্জাল সম্পর্কে কি বলেছেন? তিনি (সাঃ) বলেছেন যে, দাজ্জাল প্রতারক, মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ। তামিম আদ দারি (রাঃ) যেই দাজ্জালের সাথে কথা বলেছেন সেই দাজ্জালও মিথ্যাবাদী এবং ধোঁকাবাজ – যে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এই দাজ্জাল সহ কোন দাজ্জালকেই বিশ্বাস করি না। আল্লাহ আমাদেরকে দাজ্জাল থেকে হেফাজত করুক। তামিম আদ দারির রাঃ থেকে বর্ণিত দাজ্জাল ((সাহিহ মুসলিম ২৯৪২) এবং ইবনে সাইদের মধ্যে আমরা যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পেয়েছি সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরবর্তীতে এই সকল বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই আমরা দাজ্জালের বিভ্রান্তিকর ধারণা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করব এবং দাজ্জাল কারা সেটাও খুঁজে বের করতে চেষ্টা করব।

মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন: জেরুজালেমের সমৃদ্ধ অবস্থা তখনই হবে যখন ইয়াসরিবের গুরুত্ব কমে যাবে, ইয়াসরিবের গুরুত্ব কমে যাওয়ার অবস্থা তখনই হবে যখন বড় যুদ্ধ আসবে, বড় যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব হবে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সময় এবং যখন কনস্টান্টিনোপল বিজয় হবে তখন দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। তিনি তাঁর উরুতে অথবা কাঁধে হাত দিয়ে আঘাত করে বললেন: এটা ততটাই সত্য যতটা তুমি এখানে আছো অথবা যতটা তুমি বসে আছো (অর্থাৎ মু'আয ইবনে জাবাল)।(সুনান আবি দাউদঃ ৪২৯৪)

১০৯৫ সাল থেকে জেরুজালেমের গুরুত্ব মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, জেরুজালেমকে নিজেদের হাতে রাখতে ৭ টির ও বেশি ক্রুসেড (Crusade) পরিচালনা করেছে খ্রিষ্টানরা। মুসলিমরাও জেরুজালেমকে রক্ষায় অকাতরে প্রান দিয়েছিল। অপরদিকে মদিনার দিকে মানুষের তখন আগ্রহ ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছিল। ইসলামি খেলাফতে বা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মদিনার গুরুত্ব তখন ছিল না বললেই চলে। মদিনা তখন আর ইসলামি খেলাফতের প্রশাসনিক রাজধানী ছিল না। আইয়ুবিদ এবং মামলুক শাসনামলে মক্কা ও মদিনা, মক্কার শরিফের (Sharif of Mecca) মাধ্যমে পরিচালিত হত। আইয়ুবিদ ও মামলুকদের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োজিত ব্যাক্তি মক্কার শরীফ হতেন। নবী সাঃ এর যুগের বিপরীতে মুসলিম সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনায় মদিনার তখন আর কোন ভূমিকাই ছিল না। অর্থাৎ একদিকে জেরুজালেম বিশ্ব সম্রাটদের মূল আকর্ষণ বিন্দু হয়ে উঠেছিল অন্যদিকে মদিনা শুধু বিশ্ব রাজনীতি নয় বরং মুসলিম সাম্রাজ্যেও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছিল। হাদিস অনুসারে, এই অবস্থা যখন চলবে তখন মানুষ বড় বড় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। বড় যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব হবে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সময়। এই সব যুদ্ধ আগেকার জমানার যুদ্ধের চেয়ে ব্যাপকতায় অনেক বড় হবে। বড় যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব বলতে আমি বুঝছি যে, যুদ্ধের ধরণ পাল্টে যাবে। অর্থাৎ যুদ্ধের অস্র ও কলা কৌশলে পরিবর্তন হবে যা যুদ্ধের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা বৃদ্ধি করবে। বড় যুদ্ধ হচ্ছে এমন যুদ্ধ যার ফলে পরবর্তী যুদ্ধগুলোর কলা-কৌশল, অস্রের পরিবর্তন হয়ে যায়। নতুন যুদ্ধ কৌশল বা অস্রের প্রচলন যে যুদ্ধের মাধ্যমে

প্রথম শুরু হয় – সেই যুদ্ধই হচ্ছে বড় যুদ্ধ। এই তথ্যটি অবশ্যই মনে রাখবেন –কারণ এই তথ্যটি আমাদেরকে অন্য আরও অনেক দাজ্জালকে খুঁজে পেতে কাজে লাগবে।

বড় যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব হবে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সময় --- আমরা ইতিহাস থেকে দেখতে পাই যে, ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধের পর সারা বিশ্বে যুদ্ধের অস্র ও কলা কৌশল পালটে যায়। সকল রাজা ও সম্রাটরা কামান, গোলা, বারুদের উৎকর্ষতা অর্জনেই বেশি মনোযোগী হন কারণ আগেকার তরবারি – ঢাল, তীর-ধনুক ও প্রাচীর নির্মাণের যুদ্ধ, কামান- গোলা – বারুদের যুদ্ধের কাছে অকার্যকর হয়ে পড়ে আর এটি হয় কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে সুলতান মাহমুদের কামানের গোলায় কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবার পর থেকে। বিভিন্ন দেশের সম্রাটগণ বুঝতে পারেন যে, তীর –ধনুক, তরবারি- ঢাল, প্রাচীর নির্মাণের যুদ্ধ আর কার্যকরী নয় কারণ কামান- গোলা – বারুদের যুদ্ধে অনেক শক্তিশালী প্রাচীরও ধ্বংস হয়ে যায়, যেমনঃ কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর । অর্থাৎ, কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সময়-ই পৃথিবীতে বড় যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল – যেটা ইতিহাসবিদরাও বলেছেন যে, ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর ধ্বংসের পর আর কোন সম্রাট-ই নিজের রাজ্য বাচাতে প্রাচীর নির্মাণে তেমন গুরুত্ব দেননি বরং তারা উন্নত কামান- গোলা- বারুদ তৈরিতে মনোযোগী হন। অর্থাৎ কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধ মানবজাতির যুদ্ধ করার ধরণ-ই পালটে দিয়েছিল যা এখন সাধারণ জনগন পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে কারণ বোমার আঘাতে শহরের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত আক্রান্ত হচ্ছে। ১৪৫৩ সালের পরের যুদ্ধগুলো আগের চেয়ে অনেক বড় হয়েছে এবং হচ্ছে কারণ এসব যুদ্ধে কামান-গোলা-বারুদের ব্যাবহার হচ্ছে; বর্তমানে শুধু টেকনোলজি উন্নত হয়েছে কিন্তু কামান-গোলা-বারুদ মূলনীতিই এখনো পৃথিবীতে চলছে। ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের ৭ মাসের মধ্যে দাজ্জাল আবির্ভূত হয়েছিল।

মুআয ইবনে জাবাল থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "মহাযুদ্ধ বা বড় যুদ্ধ, কনস্টান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব, সবই সাত মাসের মধ্যে সংঘটিত হবে।" (হাদিস নং: ৪০৯২ সুনান ইবনে মাজাহ। অধ্যায় ৩৯, ফিতনা সম্পর্কিত অধ্যায়; সুনানে আবু দাউদ ৪২৯৫; মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৪২৫)

“যুহায়র ইবনে হারব (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষন পর্যন্ত না রোমান সেনাবাহিনী 'আমাক' অথবা 'দাবিক' নগরীতে অবতরণ করবে। তখন তাদের মুকাবিলায় মদীনা হতে এ পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষের এক দল সৈন্য বের হবে। অতঃপর উভয় দল সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান হবার পর রোমানরা বলবে, তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের (মুসলিমদের) পৃথক করে দাও, যারা আমাদের লোকদের (থেকে কিছু লোককে) বন্দী করেছে। আমরা তাদের সাথে লড়াই করবো। তখন মুসলিমগণ বলবে, আল্লাহর শপথ! আমরা আমাদের ভাইদের থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হবো না। অবশেষে তাদের পরস্পর যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে মুসলিমদের এক তৃতীয়াংশ সৈন্য পালিয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের তাওবা কবুল করবেন না। সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ নিহত হবে এবং তারা হবে আল্লাহর

নিকট শহীদানের মাঝে সর্বোত্তম শহীদ। আর সৈন্যদের অপর তৃতীয়াংশ বিজিয়ী হবে। জীবনে আর কখনো তারা ফিতনায় আক্রান্ত হবে না। তারাই কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে। তারা নিজেদের তরবারী যায়তুন বৃক্ষে লটকিয়ে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ বন্টন করতে থাকবে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে শয়তান চিৎকার করে বলতে থাকবে- দাজ্জাল তোমাদের পরিবারে তোমাদের অবস্থান নিয়ে নিয়েছে।

এ কথা শুনে মুসলিমরা সেখান থেকে বের হবে। কিন্তু এতে কোন লাভ হবে না। আর যখন তারা সিরিয়া পৌছবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে (সারিবদ্ধ হতে) থাকবে তখন সেখানে দাজ্জাল আসবে। নিশ্চয়ই নামাজের সময় আসবে এবং তখন মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন এবং ইমাম হিসেবে তাদের নামাজ পড়াবেন এবং তখন ঈসা (আলাইহিস সালাম) অবতরণ করবেন এবং সালাতে তাদের ইমামত করবেন। আল্লাহর শত্রু (দাজ্জাল) তাকে (ইসা আঃ কে) দেখামাত্রই বিগলিত হয়ে যাবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। আর যদি তিনি (ঈসা আঃ) তাদের মুখোমুখি না হন, তবুও তারা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ তাঁর হাতে (ইসা আঃ এর হাতে) তাদের হত্যা করবেন এবং তিনি তাদের রক্ত তাঁর বর্শায় (ঈসা আঃ এর বর্শায়) দেখাবেন"। (সাহিহ মুসলিম ২৮৯৭)

আমরা যদি মনে করি, উপরের ঘটনাগুলো ঘটার সময়কাল ১০০-১৫০ বছরের কম তাহলে আমরা উপরের হাদিসটি বুঝতে পারব না । উক্ত হাদিসে আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) মুসলিমদের ১৪০০ বছরেরও বেশি সময়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

হাদিসটিতে যেহেতু মুসলিমদের ১৪০০ বছরেরও বেশি সময়ের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তাই সহজে হাদিসটি বুঝার জন্য আমরা সুপরিচিত ঘটনা কনস্টান্টিনোপল বিজয় থেকে শুরু করব। নবী সাঃ বলেছেন, "তারাই কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে"। কারা কনস্টান্টিনোপল বিজয় করেছিল? সুলতান মাহমুদ- ২ এর বাহিনী। এখন আমাদেরকে সুলতান মাহমুদ-২ এর বাহিনী সম্পর্কে জানতে হবে। সুলতান মাহমুদ-২ এর বাহিনীতে খ্রিষ্টান ছিল, মুসলিম ছিল, ইয়াজুজ-মাজুজের দলও ছিল। সুলতান মাহমুদ-২ এর বাহিনীতে একটি এলিট ডিভিশন ছিল যাদেরকে বলা হত জেনিসারি যোদ্ধা (Janissary)। এরা হচ্ছে 'মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধা'। অর্থাৎ এদেরকে অটোম্যানরা ক্রীতদাস হিসেবে কিনে নিয়ে আসত তারপর যুদ্ধ শিখাত তারপর এদেরকে ক্রীতদাস থেকে আযাদ (মুক্ত) করে দিয়ে নিজেদের সেনাবাহিনীর এলিট ডিভিশনে অর্থাৎ জেনিসারি যোদ্ধা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করত। অনেক ইতিহাসবিদরা বলেছেন যে, অটোম্যানরা খ্রিষ্টান কিশোরদের জোরপূর্বক ক্রীতদাস হিসেবে নিয়ে এসে ইসলাম গ্রহনে বাধ্য করত এবং যুদ্ধ শিখিয়ে যোদ্ধা বানাত – এরাই হচ্ছে জেনিসারি যোদ্ধা। এদের কথা যদি সত্য বলে ধরে নেই তারপরও দেখা যায় যে, এই সকল জেনিসারি যোদ্ধারা কখনো ইসলাম ত্যাগ করেননি বরং তারা মুক্ত হয়ে জেনিসারি যোদ্ধা হবার পর ইসলামের পক্ষে আন্তরিকভাবেই যুদ্ধ করেছেন। বুঝা যাচ্ছে যে, অটোম্যান সম্রাটরা খ্রিষ্টান কিশোরদের জোর করে ক্রীতদাস হিসাবে নিয়ে এসে

ইসলাম গ্রহনে বাধ্য করলেও এই সকল খ্রিষ্টান কিশোররা পরবর্তীতে আন্তরিকভাবেই ইসলাম গ্রহন করেছিল। বেলাল (রাঃ) ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহন করেন এবং ক্রীতদাস থেকে মুক্ত হন এবং ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করেন। নবী সাঃ এর সময় থেকেই মুসলিমদের মধ্যে এমন প্রচুর ক্রীতদাস ছিলেন যারা ক্রীতদাস থেকে মুক্ত হবার পর ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। এখন আমরা দেখব, মদিনা থেকে কোন দলটি বের হয়েছিল?

নবী সাঃ বলেছেন, "কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষন পর্যন্ত না রোমান সেনাবাহিনী 'আমাক' অথবা 'দাবিক' নগরীতে অবতরণ করবে।" নবী সাঃ এর সময়ে 'আমাক' ও 'দাবিক' অঞ্চল কোনটি ছিল তা এখন বলা মুশকিল কারণ ইয়াজুজ-মাজুজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গার নাম পাল্টে ফেলেছে। তবে জায়গাটি জেরুজালেম, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, জর্ডানের (লেভানট/Levant অঞ্চল) কাছাকাছি কোন জায়গা হবে বলেই মনে হচ্ছে। নবী সাঃ এর জন্মের পূর্ব থেকেই রোমানরা অর্থাৎ বাইজেন্তাইনরা (ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ার) আমাক, দাবিক অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তখনকার সময়ে বর্তমানকালের সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, জর্ডান অঞ্চলের কিছু অংশ রোমানদের (অর্থাৎ বাইজেন্তাইনদের) দখলেই ছিল। রোমান সেনাবাহিনী 'আমাক' অথবা 'দাবিক' নগরীতে অবতরণ করবে বলতে বুঝা যাচ্ছে ইউরোপ থেকে আরও রোমান যোদ্ধা লেভানট অঞ্চলে আসবে। বাস্তবে তাই হত। প্রচুর রোমান যোদ্ধা ইউরোপ থেকে বার বার-ই লেভানট অঞ্চলে এসেছিল যা মামলুক সালতানাতের (মিশর) সময় পর্যন্ত চলেছিল। রোমানদের সাথে মুসলিমদের প্রথম মুকাবিলা হয় মু'তার যুদ্ধে। এ যুদ্ধে মুসলিমরা বিজয়ী হতে পারেনি। এই যুদ্ধে মুসলিমদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। "তখন তাদের (অর্থাৎ রোমানদের/বাইজেন্তাইনদের) মুকাবিলায় মদীনা হতে এ পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষের এক দল সৈন্য বের হবে।" হাদিসে এ কথার ব্যাখ্যা আমাদের করতে হবে। নবী সাঃ এর যুগ থেকে এখন পর্যন্ত "পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষ" হচ্ছেন সাহাবীরা। রোমানদের বিরুদ্ধে এরপর যার নেতৃত্বে পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষের এক দল সৈন্য মদিনা থেকে বের হয়েছিল তিনি হচ্ছেন ওসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারিসা আল কালবি (রাঃ) (Usama ibn Zayd ibn Haritha al-Kalbi) । নবী সাঃ জীবিত থাকতেই ওসামা ইবনে যায়েদকে (রাঃ) দলনেতা করে একটি দল রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণের নির্দেশ দেন। তখন ওসামা ইবনে যায়েদ রাঃ এর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। কিন্তু ইতিমধ্যে নবী সাঃ এর মৃত্যু হলে আবু বকর রাঃ খলিফা হন এবং ওসামা ইবনে যায়েদকে রাঃ প্রধান করেই একটি দলকে রোমানদের (বাইজেন্তাইন) বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠান। আল্লাহ এর ইচ্ছায়, ওসামা ইবনে যায়েদ রাঃ সফল হন। মুসলিম ইতিহাসবিদরা বলেন যে, ওসামা ইবনে যায়েদের রাঃ অভিযান পরবর্তীতে মুসলিমদের জেরুজালেমসহ অন্যান্য বাইজেন্তাইন এলাকা নিজেদের অধীনে আনার পটভূমি হিসাবে কাজ করে। আল্লাহ এর রসূলের সাঃ মৃত্যুর পর এটি-ই রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের প্রথম অভিযান। ওসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) এর এই অভিযান প্রসঙ্গে হাদিসে তথ্য রয়েছে,

আবদুল্লাহ বিন 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উসামা বিন যায়েদকে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। লোকেরা তার নেতৃত্বের সমালোচনা করে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে

বলেন, "তোমরা যদি তার (অর্থাৎ উসামার) নেতৃত্বের সমালোচনা করো, তাহলে তোমরা আগে তার পিতার নেতৃত্বের সমালোচনা করতে। আল্লাহর কসম, তিনি (অর্থাৎ যায়েদ) সত্যিই নেতৃত্বের যোগ্য ছিলেন, এবং তিনি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিদের একজন ছিলেন, এবং এখন এই (অর্থাৎ তার পুত্র, উসামা) তার পরে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিদের একজন।" (সাহিহ বুখারি, ৫ম খণ্ড, বই ৫৯, ৭৪৫ নম্বর হাদিস)

এখন আমরা জানব উসামা বিন যায়েদ রাঃ কে ছিলেন? উনার পিতা ছিলেন আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) পালকপুত্র যায়েদ ইবনে হারিসা এবং মাতা ছিলেন উম্মে আয়মান। উসামা রাঃ এর মাতা উম্মে আয়মান ছিলেন মুহাম্মাদ সাঃ এর পিতা-মাতার ক্রীতদাস এবং উনাদের মৃত্যুর পর উম্মে আয়মান মুহাম্মাদ সাঃ এর ক্রীতদাস হিসাবে কাজ করতেন। পরবর্তীতে মুহাম্মাদ সাঃ উম্মে আয়মানকে মুক্ত করে দেন এবং উনার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। উসামা বিন যায়েদ রাঃ এর পিতা যায়েদ ইবনে হারিসাও (রাঃ) একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি মা খাদিজার রাঃ ক্রীতদাস ছিলেন, পরবর্তীতে মুহাম্মাদ সাঃ তাকে ক্রীতদাস থেকে মুক্ত করেন এবং তাকে পালকপুত্র হিসাবে গ্রহন করেন। যায়েদ ইবনে হারিসা রাঃ রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের প্রথম বড় যুদ্ধ অর্থাৎ মু'তার যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন এবং শহীদ হন। তার সন্তান উসামা বিন যায়েদকেই রাঃ আল্লাহ এর রসূল সাঃ রোমানদের বিরুদ্ধে পরবর্তী যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে নির্দেশ দেন। উসামা বিন যায়েদের (রাঃ) রোমানদের বিরুদ্ধে এই অভিযান ইতিহাসে ওসামা বিন যায়েদের অভিযান (Expedition of Usama bin Zayd) হিসাবে পরিচিত। বুঝা যাচ্ছে, হাদিসে উল্লেখিত, "তখন তাদের মুকাবিলায় মদীনা হতে এ পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষের এক দল সৈন্য বের হবে"- এই সেনাদলের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের মধ্যে 'মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধাদের' ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সাহিহ মুসলিমের ২৮৯৭ নাম্বার হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মদিনা থেকে যে দলটি বের হবে তারা রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে এবং তারাই কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে এবং তাদেরকেই শয়তান বলবে যে তোমাদের পরিবারে তোমাদের জায়গা দাজ্জাল নিয়ে নিয়েছে এবং তারাই যখন সিরিয়াতে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবে তখন সেখানে দাজ্জাল আসবে।

সুতরাং মদিনা থেকে যে দলটি প্রথম রোমানদের মোকাবিলায় বের হয়েছিল তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের জানা দরকার কারণ এই দলটির মত বৈশিষ্ট্যের অধিকারীরা-ই উপরোক্ত সকল ঘটনার ভিতর দিয়ে যাবে। আল্লাহ এর রসূলের(সাঃ) মৃত্যুর পর প্রথম পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষের যে দলটি রোমানদের মোকাবিলা করার জন্য মদিনা থেকে বের হয়েছিল এবং অভিযানে সফল হয়েছিল তাদের নেতা ছিলেন, ওসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারিসা আল কালবি (রাঃ) (Usama ibn Zayd ibn Haritha al-Kalbi)। তাই, উনার ভিতরে কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল এটা জানা জরুরী। নিম্নে ওসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারিসা আল কালবির (রাঃ) কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল। পরবর্তীতে আমরা দেখব, এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী লোকেরা কি উপরে উল্লেখিত ঘটনাগুলোর মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন কি না।

ওসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারিসা আল কালবির (রাঃ) কিছু বৈশিষ্ট্যঃ

১) ওসামা ইবনে যায়েদের রাঃ পিতা-মাতা উভয়েই ছিলেন মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস। উনার পিতা যায়েদ ইবনে হারিসা রাঃ ছিলেন মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধা যিনি রোমানদের বিরুদ্ধে মু'তার যুদ্ধে শহীদ হন। অর্থাৎ ওসামা ইবনে যায়েদ রাঃ হচ্ছেন মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধার সন্তান।

২) ওসামা বিন যায়েদ রাঃ নবী সাঃ এর খুব কাছের লোক ছিলেন। উনার পিতা যায়েদ ইবনে হারিসা রাঃ ছিলেন নবী সাঃ এর পালকপুত্র। ওসামা বিন যায়েদের রাঃ মাতা উম্মে আয়মান রাঃ আল্লাহ এর রসুলকে সাঃ ছোটবেলায় দেখাশোনা করতেন। আল্লাহ এর রসূল সাঃ উম্মে আয়মানকে রাঃ ক্রীতদাস থেকে মুক্ত করে দেন এবং উনার সাথে দেখা করতে উনার বাসায় যেতেন। ওসামা বিন যায়েদ রাঃ এবং উনার পিতা-মাতা উভয়েই নবী সাঃ খুবই কাছের লোক ছিলেন।

৩) যে দলটি মদিনা থেকে বের হয়েছিল তাতে মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধা ছাড়াও কখনো ক্রীতদাস ছিল না - এমন যোদ্ধাও ছিল। এই অভিযানে বিখ্যাত অনেক সাহাবী অংশগ্রহন করেছিলেন; যেমনঃ ওমর রাঃ , সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাঃ , সাইদ ইবনে যায়েদ রাঃ ,আবু উবাইদাহ ইবনে আল জাররাহ রাঃ, কাতাদাহ ইবনে আল নুমান রাঃ।

৪) ওসামা বিন যায়েদ রাঃ এবং উনার পিতা যায়েদ ইবনে হারিসা রাঃ ছিলেন কালব গোত্রের। কালব গোত্রের লোকেরা ছিল খ্রিষ্টান। ইসলাম গ্রহনের পূর্বে যায়েদ ইবনে হারিসা কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন তার কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য আমি খুঁজে পাইনি। ওসামা বিন যায়েদের রাঃ মাতা উম্মে আয়মান ছিলেন আবিসিনিয়ার অধিবাসী। তখনকার সময়ে আবিসিনিয়ার লোকেদের মধ্যে খ্রিষ্টান ধর্মের ব্যাপক প্রচলন ছিল কিন্তু ইসলাম গ্রহনের পূর্বে উম্মে আয়মান কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন তার কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য আমি খুঁজে পাইনি।

সাহিহ মুসলিমের ২৮৯৭ নাম্বার হাদিসে উল্লেখিত, মদিনা থেকে যে দলটি বের হবে তারা রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে এবং তারাই কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে এবং তাদেরকেই শয়তান বলবে যে তোমাদের পরিবারে তোমাদের জায়গা দাজ্জাল নিয়ে নিয়েছে এবং তারাই যখন সিরিয়াতে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবে তখন সেখানে দাজ্জাল আসবে - উক্ত ঘটনাগুলো ঘটেছে কি না এবং উক্ত ঘটনাগুলোতে এই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন লোকদের পাওয়া যায় কি না - সেটা আমরা মিলিয়ে দেখব।

ওসামা বিন যায়েদের রাঃ অভিযান সফল হবার পর আরও অনেক যুদ্ধে মুসলিমরা বিজয়ী হয় এবং সম্পূর্ণ জেরুজালেম এবং সিরিয়া অঞ্চল মুসলিমদের অধীনে আসে। (* আল্লাহ এর রসূলের সাঃ সময় বর্তমান সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন, প্যালেস্টাইন অঞ্চলকে সিরিয়া নামে অভিহিত করা হত)

কিন্তু কালক্রমে, রোমানরা পুনরায় জেরুজালেমসহ বর্তমান প্যালেস্টাইন, লেবানন, জর্ডান ও সিরিয়ার কিছু অঞ্চল দখল করে নেয়। এই সকল যুদ্ধকে ক্রুসেড (Crusade war) যুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়। এরপর সালাহউদ্দিন আইউবী ১১৮৭ সালে হাতিনের যুদ্ধে (Battle of Hattin) রোমানদের পরাজিত করে জেরুজালেমকে মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আনেন। সম্ভবত, এই যুদ্ধেই রোমানরা মুসলিমদের হাদিসে উল্লেখিত কথাগুলো বলেছিল যে, "তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের (মুসলিমদের) পৃথক করে দাও, যারা আমাদের লোকদের (থেকে কিছু লোককে) বন্দী করেছে। আমরা তাদের সাথে লড়াই করবো"। কারণ সালাহ উদ্দিন ১১৮৭ সালের ২ জুলাই তাইবেরিয়াস শহরের দুর্গ (Tiberias) দখল করে কিছু রোমান যোদ্ধাকে বন্দি করেন যাদের মধ্যে এন্তিয়কের প্রিন্স রেনালড দি চাতিলনের (Raynald of Chatillon) স্ত্রীও ছিলেন। তাদেরকে মুক্ত করার জন্যই রোমান রাজা 'গী' (king Guy) অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পরাজিত হন এবং জেরুজালেম মুসলিমদের অধীনে আসে। সালাহউদ্দিন জেরুজালেমকে মুক্ত করলেও সম্পূর্ণ লেভানট অঞ্চলকে (Levant অঞ্চল, বর্তমানে প্যালেস্টাইন,জর্ডান, লেবানন ও সিরিয়ার কিছু অঞ্চল) রোমানদের থেকে মুক্ত করতে পারেন নি। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ২ বছর ধরে চলা 'এক্রের অবরোধ' (Siege of Acre, 1189 – 1191); আরসুফের যুদ্ধ (Battle of Arsuf, 1191); জাফার যুদ্ধে (Battle of Jaffa, 1192) সফল হতে পারেননি। এই তিনটি দুর্গ রোমানদের দখলেই থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত রোমানদের নেতৃত্ব দানকারী ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড দি লায়ন হার্টের সাথে সালাহউদ্দিন সন্ধি করে যুদ্ধের সাময়িক সমাপ্তি টানেন। তবে জেরুজালেম মুসলিমদের অধীনেই থেকে যায়। এতে বুঝা যায় যে, সালাহউদ্দিন তার মূল উদ্দেশ্য জেরুজালেমকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

সালাহউদ্দিন ছিলেন আইয়ুবিদ সম্রাট। আইয়ুবিদ সম্রাটরা ইউরেশিয়ান স্টেপ্প * (Eurasian Steppe) অঞ্চল থেকে ক্রীতদাস সংগ্রহ করত।

* ইউরেশিয়ান স্টেপ্প অঞ্চল (Eurasian Steppe): যা বর্তমানে হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, মলদোভা, ইউক্রেন, দক্ষিণ রাশিয়া (তাতার মুসলিম), কাজাখস্তান, জিনজিয়াং (উইঘুর মুসলিম, চীন), মঙ্গোলিয়া এবং মাঞ্চুরিয়া, একটি প্রধান এক্সক্লেভ সহ, প্যানোনিয়ান স্টেপ্প যার বেশিরভাগ হাঙ্গেরিতে অবস্থিত। আর্মেনিয়ান সেইসাথে বলকান অঞ্চলের মানুষ যেমন আলবেনিয়ান ও গ্রীকরা অন্তর্ভুক্ত।

এই অঞ্চল থেকে আইয়ুবিদ সম্রাটরা প্রথমে ক্রীতদাস কিনে আনত – পরে এই ক্রীতদাসরা ইসলাম গ্রহন করে এবং যোদ্ধা হয়ে উঠে। আইয়ুবিদ সম্রাটরা এই সকল মুসলিম ক্রীতদাস যোদ্ধাদের ক্রীতদাস অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে নিজেদের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করত। এদেরকে মামলুক যোদ্ধা নামে অভিহিত করা হয়। পরবর্তীতে এই মামলুক যোদ্ধারাই আইয়ুবিদ সাম্রাজ্য নিজেরা শাসন করে এবং এই সাম্রাজ্যের নাম হয় মামলুক সালতানাত (মিশর) (Mamluk Sultanate of Egypt)। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী রোমানদের

বিরুদ্ধে যে যুদ্ধগুলো করেছিলেন তাতে মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধাদের (মামলুক যোদ্ধাদের) বড় ভূমিকা ছিল, আইয়ুবীদ সেনাবাহিনীর একটি বড় অংশ মামলুক যোদ্ধাদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল।

তারপর আসে মামলুক (মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধা) সাম্রাজ্য। মামলুকরা রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে এবং তারাই পরিপূর্ণরূপে সিরিয়া ও লেভানট (syria and Levant) অঞ্চলকে রোমানদের থেকে মুক্ত করে। ১২৯১ সালের 'এক্রের অবরোধে' (siege of Acre 1291 also called the fall of Acre) মামলুকরা রোমানদের পরাজিত করে। অন্য সকল ছোট-খাট দুর্গ ও শহর (১২৬৫ সালের সেইসারিয়া, হাইফা, আরসুফের যুদ্ধ; Caesarea, Haifa, and Arsuf war in 1265) থেকেও মামলুকরা রোমানদের পরাজিত ও বিতাড়িত করে ফলে আরব মূল ভূখণ্ড (লেভানট অঞ্চল) ছেড়ে রোমানরা সাইপ্রাসে তাদের ঘাঁটি সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ১৩০২ সালে রুয়াদের অবরোধেও (Fall of Ruad in 1302) মামলুকরা রোমানদের পরাজিত করে। এভাবে রোমানদের মোকাবিলা করতে যে দলটি মদিনা থেকে বের হয়েছিল তাদের মতই বৈশিষ্ট্যের অধিকারীরা প্রায় ৮০০ বছর ধরে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে এবং হাদিস মোতাবেক যুদ্ধে বিজয়ীও হয়েছিল। তাদের মধ্যে যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি ছিল তা হচ্ছে এই সেনাদলগুলোতে প্রচুর পরিমাণে মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধা ও তাদের সন্তানরা যোদ্ধা হিসেবে ছিল। এত বছরের যুদ্ধে কতজন পালিয়ে গেছে এবং কতজন শহীদ হয়েছে আর বিজয়ের সময় কতজন ছিল তা হিসাব করা মুশকিল। এরাই কনস্টান্টিনোপল বিজয় করেছে। অর্থাৎ অটোম্যানদের মধ্যে থাকা জেনিসারি (Janissary) যোদ্ধা যারা হচ্ছে 'মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধা' – তারাই ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল বিজয় করেছে। এখানে মদিনা থেকে বের হওয়া দল থেকে শুরু করে কনস্টান্টিনোপল বিজয় পর্যন্ত সকল মুসলিম দলের ভিতরে সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে আর তা হচ্ছে, এদের ভিতরে ছিল 'মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধা' ও তাদের সন্তানরা - যারা যুদ্ধগুলোতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হাদিসে আল্লাহ আর রসূল সাঃ এদের দিকেই আলোকপাত করেছেন বলে মনে হচ্ছে।

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই, তোমরা কনস্টান্টিনোপল জয় করবে। তাদের নেতা কত চমৎকার একজন নেতা (**Commander**) , আর সেই সেনাবাহিনী কত চমৎকার সেনাবাহিনী! ("You will conquer Constantinople. Its **commander** is the best and its army (that will conquer it) is the best." " (মুসনাদে আহমাদ: ১৮১৮৯, সহীহ আল-জামি': ২৯৫২)

এই হাদিসটিতে মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধা - অটোম্যান জেনিসারি যোদ্ধাদের কথা বলা হয়েছে বলে মনে করি। কারণ জেনিসারি যোদ্ধারা ছিল বেতন-ভাতার শর্তাধীনে থাকা যোদ্ধা। অটোম্যানরাই প্রথম তাদের সেনাবাহিনীকে বেতন –ভাতার অধীনে নিয়ে আসে। এদের নেতা অটোম্যান সম্রাট নন, এদের নেতা (কমান্ডার) হচ্ছে এদের সেনাপতি বা সেনাপ্রধান। বেতন-ভাতা না দিলে এরা অটোম্যানদের পক্ষে যুদ্ধ করত না। তাই অটোম্যান সম্রাটদের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রশ্নবিদ্ধ। যে সকল সেনাদল বেতন-ভাতা নেয় তারা সরকার

প্রধানকে তাদের নেতা বলে মানে না – তারা তাদের সেনাপতি বা সেনা প্রধানকে তাদের নেতা বলে মানে এবং সেনাপতি বা সেনাপ্রধানের কথাই মেনে চলে। যেমনঃ বাংলাদেশ, পাকিস্থানে বহুবার সেনাপ্রধান সামরিক ক্যু করে সরকারের পতন ঘটিয়েছে এবং সেনাপ্রধান নিজে সরকার প্রধান হয়ে গিয়েছে। যেমনঃ পাকিস্থানে জেনারেল পারভেজ মুশাররফ; বাংলাদেশে হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ। ১৫ই জুন ১৮২৬ সালে জেনিসারি যোদ্ধারা অটোম্যান সুলতান মাহমুদ-২ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (Auspicious Incident) ঘোষণা করলে তাদেরকে (প্রায় ৬ হাজার জনকে) হত্যা করা হয়, বন্দি করা হয়, কেউ কেউ পালিয়ে যায়। এভাবে অটোম্যান সাম্রাজ্যে জেনিসারি যোদ্ধাদের পরিসমাপ্তি ঘটে। জেনিসারি যোদ্ধাদের আলাদা নেতা বা সেনাপতি বা কমান্ডার ছিল। তাদের নেতা বা কমান্ডারকে বলা হত 'আগহা' (Agha of the Janissaries) । তিনি সমগ্র জেনিসারি দলের কমান্ডিং নেতা বা সেনাপতি ছিলেন। বুঝা যাচ্ছে যে, কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সময় সুলতান মাহমুদ-২ অটোম্যান সম্রাট থাকলেও উক্ত হাদিসে (মুসনাদে আহমাদ: ১৮১৮৯) জেনিসারি যোদ্ধাদের (মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধাদের) দিকে এবং তাদের দলনেতা বা সেনাপতি 'আগহার' (Agha of the Janissaries) দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সাহিহ মুসলিম ২৮৯৭ নাম্বার হাদিসের বাকি অংশের ইতিহাস অনুযায়ী ব্যাখ্যাঃ

তারপর তারা যখন মুসলিমদের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে চালাচ্ছিল তখন 'শয়তান' অর্থাৎ ব্রিটেন এবং ব্রিটিশ গুপ্তচররা আরব ও তুর্কিদের মধ্যে বিভেদ বাধিয়ে দিল ১৯১৬ সালের দিকে - এই কথা বলে যে, খেলাফত থাকবে আরবদের হাতে /কোরাইশের হাতে (পরিবারের মধ্যে) , সেটা তুর্কিদের হাতে আছে –এটা তো -পরিবারের প্রধানের জায়গা অন্য কেউ (দাজ্জাল) নিয়ে নিয়েছে; তারা আরও বলতে লাগল যে, আরবরা আলাদা জাতি আর তুর্কিরা আলাদা জাতি – এইভাবে বিভেদ তৈরি করে ও পরবর্তীতে বিশ্বাসঘাতকতা করে শয়তান (ব্রিটেন, ব্রিটিশ গুপ্তচররা) খেলাফত নষ্ট করে দিল। (বিখ্যাত 'Lawrence of Arabia' আরব রিভোল্টের একজন প্রধান ব্রিটিশ গুপ্তচর। তার প্রকৃত নাম টমাস এডওয়ার্ড লরেন্স। তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা, প্রত্নতাত্ত্বিক, কূটনীতিক এবং লেখক। যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহ এবং সিনাই, ফিলিস্তিনে অভিযানের সময় তার ভূমিকার জন্য পরিচিত।)

("এ কথা শুনে মুসলিমরা সেখান থেকে বের হবে। কিন্তু এতে কোন লাভ হবে না") । আরবরা মক্কার আমীর হুসেইন ইবনে আলীর নেতৃত্বে তুর্কিদের থেকে হেজাজকে মুক্ত করলেও বেশী দিন খেলাফত রক্ষা করতে পারল না। হুসেইন বিন আলী নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন এবং মুসলিমরা তাকে বায়াতও দিয়েছিল কিন্তু ব্রিটেনের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ইবনে সউদের ক্ষমতার লোভের কারণে সেই খেলাফত মাত্র ৭ বছর স্থায়ী হয় (১৯২৪-১৯৩১)। যদিও এই সময়ে খলিফা হুসেইন বিন আলী আল হাশেমি, ইবনে সাউদের কারণে ১৯২৫ সালেই দেশান্তরে বাধ্য হয়েছিলেন। (আমি মনে করি, নবী সাঃ এর এই কথার এটাই ব্যাখ্যা ("এমতাবস্থায় তাদের

মধ্যে শয়তান চিৎকার করে বলতে থাকবে- দাজ্জাল তোমাদের পরিবারে তোমাদের অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। এ কথা শুনে মুসলিমরা সেখান থেকে বের হবে। কিন্তু এতে কোন লাভ হবে না।)

অটোম্যান সম্রাট ও তার বাহিনীর মধ্যে খ্রিষ্টান যোদ্ধা, মামলুক যোদ্ধা /জেনিসারি (janissary) যোদ্ধা ও বিজ্ঞানী অরবান এবং তার দল ছিল। আল্লাহ এর রসূল সাঃ যখন বলেছেন যে, এরাই কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে – তখন তিনি জেনিসারি যোদ্ধা দলের কথা বুঝিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। আর যখন বলেছেন যে, ("এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে শয়তান চিৎকার করে বলতে থাকবে- দাজ্জাল তোমাদের পরিবারে তোমাদের অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। ") তখন তিনি অটোম্যান সম্রাটদের দাজ্জাল বলেছেন। সুলতান মাহমুদ-২ কে আল্লাহ এর রসূল সাঃ সরাসরি ইয়াজুজ-মাজুজ বলেন নি; তিনি বলেছেন, "…………… তখন তাদের (ইয়াজুজ-মাজুজের) নিয়ন্ত্রক/ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি বলবে: "ফিরে যাও, আমরা আগামীকাল মাটি খুঁড়বো, ইনশা-আল্লাহ (যদি আল্লাহ চান)।" তখন তারা বলবে: " ইনশা-আল্লাহ (যদি আল্লাহ চান)।………।" (তিরমিযিঃ ৩১৫৩) অর্থাৎ সুলতান মাহমুদের দলে ইয়াজুজ-মাজুজ ছিল। তারা কারা? তারা হচ্ছে খ্রিষ্টান হিসেবে পরিচিত কিন্তু বিশ্বাসের দিক থেকে মূলত পৈত্তলিকরা (ইয়াজুজ) এবং যাদুকর বা মাজুজ হচ্ছে বিজ্ঞানী অরবান এবং তার দল যারা কামান ও গোলা আবিস্কার করেছিল মূলত যার আঘাতেই কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর ধসে পড়ে। অর্থাৎ, সুলতান মাহমুদ নিজে দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের ৭ মাসের মধ্যে আর সে এমন একটি দলকে নিয়ে কনস্টান্টিনোপল বিজয় করেছিল যাদের ভিতরে মুসলিম জেনিসারি যোদ্ধারা (মামলুক যোদ্ধারা) ছিল এবং ইয়াজুজ –মাজুজের দলও ছিল।

এই প্রসঙ্গে এই হাদিসটিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়, উম্মে সালামা রাঃ থেকে বর্ণিত: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি সেনাবাহিনীকে মাটি দ্বারা গ্রাস করার বিষয়ে বলেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যে ব্যক্তি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আসে (তাকেও কি মাটি দ্বারা গ্রাস করা হবে), হে আল্লাহর রাসূল! তিনি (সাঃ) উত্তর দিলেন: সবাইকে গ্রাস করা হবে, কিন্তু প্রত্যেককে কিয়ামতের দিন তার নিয়ত অনুসারে পুনরুত্থিত করা হবে। (সুনান আবু দাউদঃ বই ৩১, সংখ্যা ৪২৭৬)

অর্থাৎ একই সেনাদলে বিভিন্ন বিশ্বাসের ও আদর্শের সেনা থাকতে পারে। এভাবেই সুলতান মেহমুদ - ২ এর বাহিনীতে বিভিন্ন বিশ্বাসের ও আদর্শের সেনা ছিল।

১৫১৬-১৫১৭ সালে এই অটোম্যানরা মামলুক সালতানাতের (মিশর) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মামলুক সাম্রাজ্য এবং সেই সাথে মক্কা, মদিনা দখল করে নেয়। তারপরও মামলুকরা অটোম্যান সাম্রাজ্যে অনেক উচ্চ সরকারী পদে আসীন ছিল কিন্তু ১৮১১ সালে অটোম্যান ভাইসরয় (viceroy) মুহাম্মাদ আলী ধোঁকার মাধ্যমে ৫০০ মামলুক নেতাকে হত্যা করে এবং পুরো কায়রো ব্যাপী গণহত্যা চালিয়ে প্রায় ৩০০০ মামলুককে হত্যা করে। সময়ের সাথে

সাথে মামলুকদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে। তবে তাদের রক্ত কাদের ভিতরে আছে সেটা মোটামুটি বুঝতে পারা যায়।

উপমহাদেশে মুসলিমদের বিজয় এসেছে এই রকম মামলুকদের হাত ধরে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝার আছে। আল্লাহ রসূল (সাঃ) রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়া মামলুকদের কথা বলেন নি – তিনি বলেছেন মদিনা থেকে বের হবে এমন – একটি দলের কথা। নবী সাঃ এর মৃত্যুর পর মদিনা থেকে রোমানদের বিরুদ্ধে বের হওয়া সর্ব প্রথম দলের প্রধান ওসামা ইবনে যায়েদের (রাঃ) পিতা ছিলেন মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধা, ওসামা ইবনে যায়েদের (রাঃ) মাতা উম্মে আয়মানও (রাঃ) ছিলেন মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস। ওসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) ছিলেন মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধার সন্তান। এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে, মামলুকদের যোদ্ধা হবার ধরনটা (মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধা) গুরুত্বপূর্ণ। তাই, মামলুকদের আইন জালুতের (Battle of Ain Jalut, 1260 CE) যুদ্ধের পর থেকে সকল 'মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধাদেরকে' সাধারণভাবে মামলুক যোদ্ধা বলা যেতে পারে। সেই অর্থে অটোম্যান এম্পায়ারের জেনিসারি যোদ্ধারাও ছিল মামলুক যোদ্ধা।

মামলুকদের আদি আবাসস্থল হচ্ছে ইউরেশিয়ান স্টেপ্পে (Eurasian Steppe) যা বর্তমানে হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, মলদোভা, ইউক্রেন, দক্ষিণ রাশিয়া (তাতার মুসলিম), কাজাখস্তান, চিনের জিনজিয়াং (উইঘুর মুসলিম), মঙ্গোলিয়া এবং মাঞ্চুরিয়া জুড়ে বিস্তৃত, যার একটি প্রধান এক্সক্লেভ, প্যানোনিয়ান স্টেপ, যা বেশিরভাগই হাঙ্গেরিতে অবস্থিত। এছাড়া তুর্কিভাষীদের প্রধান বসবাস বর্তমানে উপরের অঞ্চল ছাড়াও তুরস্ক, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্থান, আজারবাইজান, আফগানিস্থান, ইরান, ইরাক, তাজিকিস্থান, ইত্যাদি।

উপমহাদেশে গজনীর সুলতান মাহমুদের পিতা একজন মুসলিম তুর্কি ক্রীতদাস যোদ্ধা (Turkic slave commander) ছিলেন যিনি ৯৭৭ সালে গজনভী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাম্মাদ ঘড়ী (Muhammad Ghori) যিনি তাড়াইনের ২য় যুদ্ধে (Second Battle of Tarain) কমপক্ষে ১২,০০০ মামলুক যোদ্ধার (মুসলিম তুর্কি মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধা) সমাবেশ ঘটান যাদেরকে ‘গুলাম লেন্সার’ নামে অভিহিত করা হয় - এদের হাতে আল্লাহ বিজয় দেন এবং রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান পরাজিত হন। ১২০৬ সালে, ঘড়ী সাম্রাজ্যের সুলতান মুহাম্মদ ঘড়ীকে হত্যা করা হয়। যেহেতু তার কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী ছিল না, তাই তার সাম্রাজ্য তার প্রাক্তন মামলুক সেনাপতিদের নেতৃত্বে ছোট ছোট রাজ্যে/ প্রদেশে বিভক্ত হয়ে যায়। তাজ-উদ-দিন ইলদোজ (Taj-ud-Din Yildoz) গজনীর শাসক হন, মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি (Muhammad bin Bakhtiyar Khilji) বাংলার শাসক হন এবং নাসির-উদ-দিন কাবাচা (Nasir-ud-Din Qabacha) মুলতানের সুলতান হন। কুতুবউদ্দিন আইবক (Qutb ud-Din Aibak) দিল্লির সুলতান হন এবং মামলুক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন যা ১২০৬-১২৯০ সাল

পর্যন্ত দিল্লিকে শাসন করে। এরা সবাই ছিলেন মামলুক যোদ্ধা (মুসলিম তুর্কি মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধা)। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে মামলুক (মুসলিম তুর্কি মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধা) যোদ্ধাদের দ্বারাই ভারত বিজয় হয়েছিল।

উপরোক্ত হাদিস এবং জুলকারনাইনের প্রাচীর নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও সকল আলোচনা শেষে আমি বুঝতে পেরেছি যে, মদিনা থেকে বের হওয়া সাধারণ মুসলিম যোদ্ধা ও 'মুসলিম মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধারা' মুসলিমদের জন্য আল্লাহ এর রহমত স্বরূপ। আল্লাহ চাইলে, এরা যখন একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করবে তখন তারা রোমান বা মঙ্গোলদের মত বাহিনী যারা অর্ধেক পৃথিবীর শাসক ছিল –তাদেরকেও পরাজিত করতে পারবে। বর্তমানে যদি আফগানিস্থানের কথা বিবেচনা করি, তাহলেও আমরা দেখতে পাই যে, আফগানিস্থানের তালিবান সেনাবাহিনীতে আছে মদিনা থেকে বের হওয়া দলের মুসলিম বংশধররা যারা 'পশতুন বা পাঠান' নামে পরিচিত। সেই সাথে সাথে তাদের সেনাবাহিনীতে আইন-জালুতের যুদ্ধে অংশ নেওয়া তুর্কি মামলুক যোদ্ধাদের মুসলিম বংশধররাও আছে; এরা হচ্ছে আফগানিস্থানের তুর্কম্যান,তাজিক, উজবেক এবং কাজাক উপজাতি গোষ্ঠী। আল্লাহ এর রহমতে, মঙ্গোল ও রোমানদের যৌথ বাহিনীর মত সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা, NATO, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, জাপানের যৌথ বাহিনীও মদিনা থেকে বের হওয়া দলের মুসলিম বংশধর (পশতুন) এবং তুর্কি মামলুক যোদ্ধাদের বংশধরদের যৌথ বাহিনীকে পরাজিত করতে পারেনি বরং নিজেরাই আইন-জালুতের যুদ্ধে মঙ্গোলদের মত পরাজিত হয়ে আফগানিস্থান থেকে ফেরত এসেছে। আল্লাহ চাইলে, পরবর্তী আলোচনায় এই বিষয়গুলো আপনাদের কাছে আরও পরিষ্কার হবে।

এখন আমরা এরপরের ইতিহাস হাদিস অনুযায়ী জানতে চেষ্টা করবো। নবী (সাঃ) বলেছেন, "এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে শয়তান চিৎকার করে বলতে থাকবে- দাজ্জাল তোমাদের পরিবারে তোমাদের অবস্থান নিয়ে নিয়েছে" ।

শয়তান (ব্রিটেন) কাদেরকে বলেছিল যে, "দাজ্জাল তোমাদের পরিবারে তোমাদের অবস্থান নিয়ে নিয়েছে"? কোরাইশদেরকে (হাশেমিদেরকে) (Hashemites)। বর্তমানে এই বংশের উত্তরসূরিরাই হচ্ছে জর্ডানের রাজপরিবার। এটি আওন ইবনে জাফর রা. এর পরিবার থেকে যা হাসান রা. এর উত্তরসূরিদের (Sharif of Mecca) মধ্য থেকে এসেছে। তাদের পূর্বপুরুষকে ঐতিহ্যগতভাবে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যিনি নবী মুহাম্মদের সাঃ এর প্রপিতামহ। মক্কার হাসানী শরীফ (যাদের কাছ থেকে জর্ডানের হাশেমী রাজপরিবার সরাসরি বংশধর), হাশেমীদের পূর্বপুরুষ, কাতাদা ইবনে ইদ্রিস (Qatadah ibn Idris) সহ জায়েদী শিয়া ছিলেন। মামলুক সাম্রাজ্যের শেষের দিকে বা অটোমান যুগের প্রথম দিকে, তারা সুন্নি ইসলামের শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হয়ে ওঠেন।

মুআয ইবনে জাবাল থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "মহাযুদ্ধ/বড় যুদ্ধ, কনস্টান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব, সবই সাত মাসের মধ্যে সংঘটিত হবে।" (হাদিস নং: ৪০৯২ সূরা: সুনান ইবনে মাজাহ। অধ্যায় ৩৯, ফিতনা সম্পর্কিত অধ্যায়)

খুব ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) বলেছেন যে, দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। আবির্ভূত হবার অর্থ কি? আমরা যখন বলি, অমুকে আবির্ভূত হয়েছে তখন সেটা বলতে আমরা কি বুঝাই? সে তার চিন্তাভাবনা, মতাদর্শ, বিশ্বাস, চরিত্র নিয়ে এসেছে।

("এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে শয়তান চিৎকার করে বলতে থাকবে- দাজ্জাল তোমাদের পরিবারে তোমাদের অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। ") এই হাদিসে শয়তান যে বলবে দাজ্জাল তোমাদের পরিবারে তোমাদের অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। এই দাজ্জাল কে বা কারা? এই দাজ্জাল হচ্ছে অটোম্যান এম্পায়ারের সম্রাটরা (উসমানীয় খেলাফতের সুলতানরা)। অটোম্যান এম্পায়ারের সম্রাটরা (উসমানীয় খেলাফতের সুলতানরা) দাজ্জাল কেন? ((*) উসমানীয় খেলাফতকে ইংলিশে অটোম্যান এম্পায়ার বলে)

আলোচিত বিভিন্ন হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, দাজ্জাল আল্লাহ এর রসূলের উম্মতের মধ্য থেকে আসবে – অর্থাৎ দাজ্জাল সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হবে। যতটুকু জানা যায় অষ্টম শতাব্দী থেকেই ইসলামের ভিতরে সুফিজমের মিশ্রণ ঘটছিল। সুফিজম বা পীরতন্ত্র হচ্ছে শিরক, কুফরে পরিপূর্ণ। ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর সুলতান মাহমুদ-২ (Mehmed II) সুফিজমকে ইসলামের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেন। আর এটাই হচ্ছে দাজ্জালের আবির্ভাব। যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম খলিফা বা শাসক কর্তৃক ইসলামের ভিতরে শিরক, কুফরের মিশ্রণকে ইসলাম বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি ততক্ষণ সেই শাসক বা খলিফা দাজ্জাল বলে গণ্য হয়নি এবং দাজ্জাল আবির্ভূত হয়নি কিন্তু যখনই মুসলিম শাসক বা খলিফা ইসলামের সাথে শিরক, কুফরের (সুফিজমের) মিশ্রণকে ইসলাম বলে স্বীকৃতি দিয়েছে তখন-ই সেই খলিফা বা মুসলিম শাসক দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, দাজ্জাল (Dajjal) শব্দের মূল (root) - "দাজালা" (dajala) শব্দের অর্থ হচ্ছে 'মিশ্রিত করা'। সুলতান মাহমুদ-II (Sultan Mehmed-II) এর সময় কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর থেকেই রাষ্ট্রীয়ভাবে সুফিজম বা পীরতন্ত্রকে প্রচার, প্রসারে এবং প্রতিষ্ঠিত করায় উদ্যোগ নেয়া হয়।

সুলতান মাহমুদ – ২ হচ্ছে মানবজাতির ইতিহাসে আবির্ভূত হওয়া প্রথম দাজ্জাল। যেহেতু আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, উনার উম্মতের মধ্য থেকে ৩০ জন দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। এখন এই ত্রিশ জনের মধ্যে অটোম্যান খেলাফতের ভিতরে কারা কারা দাজ্জাল ছিল তা খুঁজে বের করা মুশকিল। তবে এই অটোম্যান সম্রাটদের মধ্যেই যে অনেকে দাজ্জাল ছিল এটা নিশ্চিত। সুলতান মুরাদ-III (Murad III) নিজেই একজন সুফি (পীর) ছিলেন। ওসমান গাজী যিনি ওসমানীয় খেলাফতের (অটোম্যান এম্পায়ার) প্রথম সুলতান ছিলেন তিনি শেখ এদেবালি (Sheikh Edebali) নামের একজন সুফির মুরিদ ছিলেন। ওসমান গাজি, শেখ এদেবালি সুফির (পীরের) মেয়ে রাবিয়া বালা খাতুনকে (Rabia Bala Hatun) কে বিবাহ করেন। এরপর প্রত্যেক অটোম্যান সম্রাট-ই কোন না কোন সুফির / পীরের হাতে বায়াত নেন। সুলতান মাহমুদ-২ (Sultan Mehmed-II) কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর প্রথমেই কনস্টান্টিনোপলে একটি সুফি খানকাহ (পীরের খানকাহ) নির্মাণ করেন। এটিই

কনস্টান্টিনোপলে নির্মিত প্রথম সুফি খানকাহ বা পীরের খানকাহ। সুফি খানকাহকে ইংলিশে 'Sufi Lodge'; আরবিতে zāwiya , উর্দু বা ফারসিতে khānqa এবং তুর্কি ভাষায় 'tekke' বলা হয়। ধীরে ধীরে অটোম্যান সাম্রাজ্যে ৭০০ মতান্তরে ১৬০০ সুফি খানকাহ গড়ে উঠে; এমন কি এসব সুফি খানকাহ ভারত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। খেলাফতের পৃষ্ঠপোষকতায় সুফিবাদের (পীরতন্ত্রের) এমন প্রসার, প্রচার এর আগে কোন সময়-ই দেখা যায়নি।

সুফিজম অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কাজে, সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে যেহেতু প্রায় সকল অটোম্যান সম্রাট-ই কোন না কোন সুফির মুরিদ ছিল। যে সকল সুফি তরিকা অটোম্যান সাম্রাজ্যে (উসমানীয় খেলাফতে) প্রসিদ্ধ ছিল তার মধ্যে শাহদালি সুফি তরিকা (Shadhili Sufi Order), নকশবন্দি সুফি তরিকা (Naqshbandi Sufi Order), কাদেরিয়া সুফি তরিকা (Qadiriyya/Qadiri order), রিফাই তরিকা (The Rifa'I Sufi order); খালওয়াতি তরিকা (The Khalwati Sufi order), বাক্তাশিবাদ বা বাক্তাশিয়া (Bektashism), মৌলাভিয়া (Mawlawīyah) তরিকা যেটি জালাল উদ্দিন রুমি প্রতিষ্ঠা করেন – এগুলোর নাম উল্লেখযোগ্য।। সুফিজম সারা পৃথিবীব্যাপী এত –ই জনপ্রিয় হয় যে, শিয়াদের মধ্যে এর ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং সুন্নিদের মধ্যে সকল মাজহাবের (হানাফি, শাফি, হাম্বলি, মালেকি) মধ্যেই এর প্রভাব কম-বেশি বিদ্যমান। দেওবন্দি ও ব্রেলভি আকিদার মধ্যেও সুফিবাদের / পীরতন্ত্রের বিশ্বাস ও মতাদর্শ প্রবলভাবে দেখা যায়। বর্তমানে সারা বিশ্বে হাজারো সুফি তরিকা দেখা যায়। প্রতিটি সুফি তরিকার প্রধান হচ্ছেন একজন সুফি বা পীর। বাংলাদেশে কওমী মাদ্রাসা হচ্ছে দেওবন্দি মতাদর্শের মাদ্রাসা।

সুফিজমের (পীরতন্ত্রের) কিছু মতাদর্শঃ

১) সুফি ভ্রাতৃত্বঃ একটি নির্দিষ্ট তরিকার পীরের মুরিদদের মধ্যে আলাদা একটি ভ্রাতৃত্ব দেখা যায়। মুহাম্মাদ সাঃ এর উম্মত সকলে পরস্পর ভাই-ভাই হওয়া সত্ত্বেও পীরের/ সুফিদের মুরিদদের মাঝে আলাদা একটি ভ্রাতৃত্ব লক্ষণীয়।

২) কাশফ (Kashf): কাশফ আরবি শব্দ এর অর্থ - "আবরণ উন্মোচন"। এটি একটি সুফি / পীরদের ধারণা বা বিশ্বাস যা বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে হৃদয়ের জ্ঞান নিয়ে বেশি কাজ করে। তাদের মতে, 'কাশফ' আধ্যাত্মিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি পর্যায়ে আরোহণের পরে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বর্গীয় অনুভূতির অবস্থা যা অদেখা, বাতেনি, পর্দার আড়ালে থাকা সত্যগুলিকে হৃদয়ে ঢেলে দেওয়ার জন্য হৃদয়কে (একটি আধ্যাত্মিক ক্ষমতা) উন্মোচিত করে। কাশফ ব্যুৎপত্তিগতভাবে মুকাশাফা যার অর্থ "প্রকাশ"/"আসমানি বিকিরণের সারসংক্ষেপ" এর সাথে সম্পর্কিত, যার অর্থ "পর্দার আড়ালে অদৃশ্য জিনিসগুলির সাথে পরিচিতি অর্জন"। সুফিদের মতে, যারা তাদের হৃদয়কে পবিত্র করেছেন এবং যারা তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতার পূর্ণ ব্যাবহার করে ঐশ্বরিক নাম এবং গুণাবলী সম্পর্কে জানতে পেরেছেন, তাদের জন্য বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক জগতের সামনের পর্দাগুলি কিছুটা খুলে যায় এবং তারা অদৃশ্যের সাথে পরিচিত হতে শুরু করে অর্থাৎ তারা অদৃশ্যের বিশয়বস্তু সম্পর্কে জানতে পারে।

সুফিবাদে আরও একটি উদ্ঘাটন ক্ষমতা বিদ্যমান যার মাধ্যমে আল্লাহ এর জ্ঞানের আলোর মাধ্যমে আসমানি রহস্যগুলি অন্বেষণকারী সুফিদের কাছে সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একে তাজাল্লি "প্রকাশ" বলা হয়। কাশফের মাধ্যমে যে গোপন আসমানি জ্ঞান অর্জিত হয় তা যে ব্যক্তির কাশফ খোলা হয়নি তাকে বলা নিষেধ। কাশফের মাধ্যমে সুফিরা পর্দার আড়ালে থাকা অর্থাৎ অদেখা, অজানা বাতেনি জ্ঞান অর্জনের দাবী করে। উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, নবীদের আল্লাহ বাতেনি জ্ঞান বা অদৃশ্যের জ্ঞান দিতেন। সুফিরা দাবী করছে যে, তাদেরকেও আল্লাহ বাতেনি জ্ঞান বা অদৃশ্যের জ্ঞান দেন। অর্থাৎ সুফিরা এই ক্ষেত্রে নিজেদের নবী বলেই দাবী করছে।

৩) সূফীরা / পীররা অলৌকিক কাজ (miracle) করতে পারার দাবী করে যাকে তারা 'কারামত' বলে থাকে। নবী, রসুলগণ আল্লাহ এর অনুমতিক্রমে অলৌকিক কাজ করেছেন – যাকে 'আলেমরা' বা সূফীরা 'মোজেজা' বলে থাকে। 'কারামত' ও 'মোজেজা' নাম দুটি আলাদা কিন্তু দু'টির বিষয়বস্তু একই – আল্লাহ এর অনুমতিক্রমে অলৌকিক কাজ (miracle) করে দেখানো। এভাবে সূফীরা বা পীররা নিজেদের নবী বলে দাবী করছে। সুফি বা পীরদের বিভিন্ন বইয়ে এবং চিল্লা ভিত্তিক তবলীগ জামাতের বিভিন্ন বইয়ে এই রূপ প্রচুর কাহনী আপনারা পাবেন যাতে সুফি বা পীর বা ওলীদের কারামতের অলৌকিক কাজের (miracle) গল্প রয়েছে । এগুলো যে দাজ্জালের দাবী সেটা আমরা হাদিস থেকে জানতে পারি।

মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন," …………………………………… আমি তোমাদের কাছে তার (দাজ্জালের) বর্ণনা এমনভাবে দেব যা আমার আগে কোনও নবী তাকে বর্ণনা করেননি। সে (দাজ্জাল) এই বলে শুরু করবে "আমি একজন নবী," কিন্তু আমার (মুহাম্মাদ সাঃ) পরে আর কোন নবী নেই। তারপর দ্বিতীয়বার সে বলবে: "আমি তোমাদের রব।" কিন্তু তুমি তোমার রবকে তোমার মৃত্যুর আগে দেখতে পাবে না। ………………………………। (সুনান ইবনে মাজাহ ৪০৭৭)

মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন, দাজ্জাল যখন প্রথমবার আবির্ভূত হবে, তখন সে নিজেকে নবী বলে দাবী করবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সূফীরা (পীররা) নিজেদেরকে নবী বলেই দাবী করছে। তারা দাবী করছে কাশফের মাধ্যমে তাদের কাছে এমন জ্ঞান আসে যা পর্দার আড়ালের অদৃশ্য জ্ঞান। এই বিষয়টা ইবনে সাইদের সাথেও মিলে যায়। আল্লাহ এর রসূল সাঃ জিজ্ঞেশ করেছিলেন, সে কি দেখতে পায়? উত্তরে ইবনে সাইদ বলেছিল, সে পানির উপর আরশ দেখতে পায়। অন্য হাদিসে আছে ইবনে সাইদ বলেছিল, তার কাছে কিছু সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী লোক আসে। অর্থাৎ পর্দার আড়ালের অদৃশ্যের জ্ঞান তার কাছে আসার দাবী সে করেছিল। ইবনে সাইদ দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়নি এবং সুফিজম ১৪৫৩ সালের আগে মুসলিমদের মাঝে থাকলেও তা দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়নি কারণ দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হতে হলে মুসলিম খেলাফতের খলিফার বা মুসলিম শাসকের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাগবে কারণ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি হচ্ছে দাজ্জাল আবির্ভাবের একটি পূর্বশর্ত। ১৪৫৩ সালে

সুফিজম ইসলামের অংশ হিসেবে উসমানীয় খেলাফতের খলিফা বা শাসক সুলতান মেহমুদ-২ এর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করে ফলে সুলতান মাহমুদ -২ দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হন। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, প্রথমবার দাজ্জাল আবির্ভূত হয়ে গেছে এবং নিজেকে নবী বলে দাবীও করে ফেলেছে। কোটি কোটি মানুষ বা মুসলিমরা এই দাজ্জালের ধোঁকায় পড়ে ঈমান হারা হয়েছে; তারা মুহাম্মাদ সাঃ এর আনীত ইসলামের মধ্যে শিরক, কুফরযুক্ত সুফিজমের বা পীরতন্ত্রের মিশ্রণ ঢুকিয়ে সেই বিকৃত ইসলামকে, মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম হিসেবে নিজেরা অনুসরণ করেছে এবং অন্যদের মাঝেও প্রচার করেছে।

শিয়া ও সুন্নি মতাদর্শের ভিতরে সুফিবাদ বা পীরতন্ত্রের বিভিন্ন বিশ্বাসের স্বীকৃতি রয়েছে। ইউরোপ, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্থান, মিশর, আফ্রিকা, আরব অঞ্চল সহ সারা পৃথিবীতে পীর তথা সুফিদের ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান এবং তাদের কোটি কোটি মুরিদ রয়েছে। যারা কোন সুফির বা পীরের মুরিদ নয় তারাও সুফিদের বা পীরদের সম্মান করে এবং তাদের বিভিন্ন মতবাদ ও কিচ্ছা –কাহিনী বিশ্বাস করে। বাংলাদেশে তো প্রচুর সুফি বা পীর ও তাদের কোটি কোটি মুরিদ রয়েছেই, সেই সাথে সাথে তবলীগ জামাতের মধ্যেও সুফিজমের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এভাবে মানুষ তথা মুসলিমরা সুফিদের বা পীরদের নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং তাদের কথিত আধ্যাত্মিক বানোয়াট গল্প বিশ্বাস করে ঈমানহারা হচ্ছে।

হানাফি মাজহাবের ভিতরে ব্রেরলভি যারা বাংলাদেশে রেজভি নামেও পরিচিত তারা প্রধানত কাদেরী, চিশতী, সোহরাওয়ার্দিয়া সূফী তরিকা অনুসরণ করেন।
দেওবন্দি (কওমি মাদ্রাসার) আলেমরা সুফিযমের অনেক নিয়ম নীতিকে অস্বীকার করলেও সুফিজমকে পুরোপুরি অস্বীকার করে না। এই প্রসঙ্গে হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত আলেম খলিল আহমাদ আল-সাহারানপুরী (Khalil Ahmad al-Saharanpuri) তার আল-মুহান্নাদ আলা আল-মুফান্নাদে দেওবন্দীদের আকীদাগত বিশ্বাসের রূপরেখা দিয়েছেন যেখানে তিনি বলেছেন যে,
“আমাদের পথ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম আবু হানিফা আল-নু'মান (হানাফি মাজহাব) কে অনুসরণ করা -আধ্যাত্মিক দিক থেকে; এবং আকীদা ও মৌলিক বিষয়গুলিতে মহান ইমাম আবু আল-হাসান আল-আশ'আরী এবং মহান ইমাম আবু মনসুর আল-মাতুরিদী এর অনুসারী; এবং আমরা নিম্নলিখিত সুফি পথের অনুসারী: নকশবন্দী শিক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট পথ, চিশতী শিক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ পথ, কাদিরি শিক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে মহিমান্বিত পথ এবং সোহরাওয়ার্দী শিক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল পথ (আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)”। —আল-মুহান্নাদ 'আলা আল-মুফান্নাদ (প্রশ্ন এক এবং দুই)
বিখ্যাত দেওবন্দি আলেমগণের মধ্যে ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (Imdadullah Muhajir Makki) চিশতিয়া সুফি তরিকার একজন সুফি ছিলেন। তার ছাত্রদের মধ্যে রয়েছে মুহাম্মাদ কাশিম নানুতুবি (Muhammad Qasim

Nanautawi), রশীদ আহমদ গঙ্গোহী (Rashid Ahmad Gangohi), আশরাফ আলী থানভি (Ashraf Ali Thanwi). বিখ্যাত দেওবন্দি আলেমগণের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন সুফি তরিকার সুফি বা পীর ছিলেন। বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসা হচ্ছে দেওবন্দি মতাদর্শের মাদ্রাসা।
সারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের ভিতরে সুফিজম বা পিরতন্ত্র এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন। বর্তমানকালে হানাফি, শাফি, মালেকি, হাম্বলি মাজহাবের অনুসারী সহ সুন্নি ও শিয়াদের মাঝে সুফিজম বা পিরতন্ত্রের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই সকল কিছুর ভিতর থেকে সুফিজমের বা পিরতন্ত্রের প্রভাবমুক্ত ইসলাম খুঁজে বের করা অনেক কঠিন হয়ে উঠেছে। সুন্নিদের ভিতরে হানাফি মাজহাবের অনুসারীদের মধ্যেই সুফিজম বা পিরতন্ত্রের অনুপ্রবেশ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। যারা 'সুফি' কি - জানেন না; তাদের জন্য বলছি,'সুফি' হচ্ছে 'পীর' আর 'সুফিজম' হচ্ছে 'পীরতন্ত্র'।

এখন প্রশ্ন আসে উসমানীয় খেলাফতের প্রথম সুলতান ওসমান গাজি নিজেই তো একজন সুফির (পীরের) মুরিদ ছিলেন এবং সুফিজমে বিশ্বাসী ছিলেন তাহলে তার সময় থেকে কেন দাজ্জাল আবির্ভূত হয়নি? কেনো কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর সুলতান মাহমুদ-॥ দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন? এর কারণ হচ্ছে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের আগ পর্যন্ত অটোম্যানদের (উসমানীয়) মুসলিমরা খেলাফত হিসেবে হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের আগে পর্যন্ত অটোম্যানরা আনাতলিয়া কেন্দ্রিক ছোট একটি রাজ্য (petty kingdom) শাসন করত যাকে রাজত্ব বা সাম্রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যায় না। তাই, তখন উসমানীয় খেলাফতকে, খেলাফত হিসেবে বা অটোম্যান এম্পায়ারকে কেউ এম্পায়ার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। সেই সময় তারা (ওসমান গাজি) সুফিজমকে স্বীকৃতি দিলেও তা মুসলিমদের মাঝে সুফিজমের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত হত না। যখন অটোম্যানরা কনস্টান্টিনোপল বিজয় করেছে তখন-ই তারা মুসলিম বিশ্বে খেলাফতের দাবীদার হতে পেরেছে। তাদেরকে মুসলিমরা নিজেদের খলিফা বা সুলতান হিসেবে মেনে নিয়েছে। এজন্য কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পড়ে তারা যখন সুফিজমকে তাদের খলিফার বা সুলতানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়েছে তখন-ই সেই শাসক বা খলিফা দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ইসলামে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বা রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের নিয়ম নীতি প্রতিষ্ঠা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সুফিজম বা পীরতন্ত্র (শিরক,কুফর) ও ইসলামের মিশ্রণকে যখন মুসলিমদের শাসক বা সুলতান বা খলিফা - ইসলাম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে তখন-ই দাজ্জাল আবির্ভূত হয়েছে। আর যেই খলিফা বা মুসলিম শাসক বা সুলতান এই স্বীকৃতি দিয়েছে - সেই মুসলিম শাসক বা সুলতান বা খলিফা হচ্ছেন দাজ্জাল।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে, **দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হবার কিছু পূর্ব শর্ত আমরা বুঝতে পারলামঃ**

১) সমাজে দাজ্জাল মুহাম্মাদ সাঃ এর উম্মত হবে, অর্থাৎ সমাজে দাজ্জাল মুসলিম হিসেবে পরিচিত হবে। তবে মুহাম্মাদ সাঃ এর উম্মতের বাহির থেকেও দাজ্জাল আবির্ভূত হতে পারে কারণ মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন উনার উম্মতের ভিতর থেকে ৩০ জন দাজ্জাল আসবে কিন্তু উনার উম্মতের বাহির থেকে দাজ্জাল আসবে না –এমন কথা তিনি বলেননি। অমুসলিমদের মধ্য থেকে এসে ইসলামকে বিকৃত করে তা মুসলিমদের মাঝে ইসলাম হিসেবে প্রচার করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। মুসলিম পরিচয় থাকলে, বিশেষ করে, আলেম হিসেবে সমাজে স্বীকৃতি থাকলে বিকৃত ইসলামকে সমাজের মানুষের কাছে বা মুসলিমদের কাছে ইসলাম বলে প্রচার করা ও প্রতিষ্ঠা করা সহজ। তাই, দাজ্জাল যারা হবে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমাজে মুসলিম বলে স্বীকৃতি পাবে।

২) দাজ্জাল মুসলিমদের শাসক বা সুলতান বা খলিফা হিসেবে সমাজে বা রাষ্ট্রে স্বীকৃত থাকবে।

৩) দাজ্জাল ইসলামের ভিতরে অন্য কিছুর (শিরক, কুফর, বিদআত) মিশ্রণ ঘটিয়ে সেটাকেই 'ইসলাম' বলে প্রচার করবে। অর্থাৎ দাজ্জাল মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলামকে বিকৃত করে সেই 'বিকৃত ইসলামকে' ইসলাম বলে প্রচার করবে এবং মানুষকে ধোঁকা দিবে।

৪) ইবনে সাইদ দাজ্জাল হলেও সে দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়নি কারণ সে মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক বা খলিফা বা সুলতান ছিল না।

৫) সেই দাজ্জালই দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হবে যার হাতে এমন ক্ষমতা (রাষ্ট্র ক্ষমতা) থাকবে যেটা ব্যাবহার করে সে মানুষকে বা মুসলিমদেরকে জোর করে বা শাস্তি দিয়ে তার মতাদর্শ (বিকৃত ইসলাম) গ্রহনে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে পারবে। যেমনঃ জেল, জুলুম, নির্যাতন, হত্যা।

৬) পৃথিবীতে প্রচুর দাজ্জাল ছিল, আছে এবং থাকবে; তারা দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত না হলেও অর্থাৎ মুসলিম দেশের রাষ্ট্র প্রধান না হলেও শিরক, কুফর, বিদআত মিশ্রিত বিকৃত ইসলামকে – মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম বলে মানুষের কাছে প্রচার করবে এবং প্রচুর মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দিবে।

যেমনঃ ইবনে সাইদ; দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হবার পূর্বে সুফিজম এবং চিল্লা ভিত্তিক তবলীগ জামাত, বর্তমানকালের সুফিজম বা পিরতন্ত্র, ইত্যাদি।

৭) দাজ্জাল যে শুধু ইসলামের ভিতরে শিরক, কুফরের মিশ্রণ ঘটাবে তাই নয়; সে ইসলামের মূল কিছু বিষয়কে (যেমনঃ খিলাফত) বাদ দিয়ে সেই বিকৃত ইসলামকে মানুষের কাছে মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম বলে প্রচার করবে, যেমনঃ ছয় নাম্বার ও চিল্লা ভিত্তিক তাবলীগ জামাত; বাংলাদেশ জামাতে ইসলামি।

৮) অমুসলিম যে সকল শাসক বা সরকার প্রধান মুসলিমদের ভূমি জোর করে দখল করে নিয়ে মুসলিমদের উপর শাসন করবে তারা দাজ্জাল। যেমনঃ ইসরায়েল; উপমহাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে ব্রিটিশ শাসন (উপমহাদেশে ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন)।

দাজ্জাল আবির্ভূত হবার এই শর্তগুলো বা বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখলে আমাদের জন্য দাজ্জাল কে বা কারা -তা খুঁজে পেতে সহজ হবে।

"...............এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে শয়তান চিৎকার করে বলতে থাকবে- দাজ্জাল তোমাদের পরিবারে তোমাদের অবস্থান নিয়ে নিয়েছে।

এ কথা শুনে মুসলিমরা সেখান থেকে বের হবে। কিন্তু এতে কোন লাভ হবে না। আর যখন তারা সিরিয়া পৌছবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে (সারিবদ্ধ হতে) থাকবে তখন সেখানে দাজ্জাল আসবে।…………." (সাহিহ মুসলিম ২৮৯৭)

আরব রিভোল্টের পর ১৯২৪ সালে বা ১৯৩১ সালে মুসলিমদের খেলাফত নষ্ট হয়ে যায়। আমার মতে, ১৯৩১ সালে মক্কার প্রাক্তন আমীর এবং খলিফা হুসেইন বিন আলী আল হাশেমির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুসলিমদের সর্বশেষ খলিফার মৃত্যু হয় এবং সেই সাথে সাথে খেলাফত-ও নষ্ট হয়ে যায়। আপনারা জানেন, খলিফা হুসেইন বিন আলী আল হাশেমি ছিলেন মুহাম্মাদ সাঃ এর সরাসরি বংশধর। তিনি হাসান রাঃ এর বংশধারা থেকে এসেছেন। তারা যখন সিরিয়া পৌঁছুবে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকবে তখন সেখানে দাজ্জাল আসবে।

*** আল্লাহ এর রসূলের সাঃ সময় বর্তমান কালের সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন, প্যালেস্টাইন অঞ্চলকে একত্রে সিরিয়া অঞ্চল বলা হত। খলিফা হুসেইন বিন আলী আল হাশেমির এক ছেলে আবদুল্লাহ বিন হুসেইন (Abdullah bin Hussein / Abdullah-1 of Jordan) সিরিয়া অঞ্চলে পৌঁছে ছিলেন। তিনি ১৯২১ সাল থেকে ট্রান্স জর্ডান এবং পরবর্তীতে জর্ডানের শাসক ছিলেন। তিনি আল্লাহ এর রসূলের সাঃ সরাসরি বংশধর। আমি এখানে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে ইতিহাস বলছি যাতে বই অনেক বেশি বড় না হয় – তাহলে মানুষ পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

ব্রিটিশ সরকার এক দিকে হুসেইন বিন আলী আল হাশেমিকে কথা দিয়েছিল যে সিরিয়া অঞ্চলে একটি স্বাধীন আরব রাষ্ট্র হবে অন্য দিকে বেলফোর ডেকলারেশন করে প্যালেস্টাইনে একটি 'জাতীয় ইহুদী বসতি' ("national home for the Jewish people" in Palestine) করার ঘোষণা দিয়েছিল। ফলে ইহুদীরা দলে দলে প্যালেস্টাইনে আসা শুরু করে। এটা প্যালেস্টাইনের মুসলিমরা মেনে নেয়নি। এতে মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যে সহিংসতা, দাঙ্গা ও ছোট-খাট সংঘর্ষ শুরু হয়। যার ফলাফল হিসাবে ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত প্যালেস্টাইন রিভোল্ট (Great Palestinian Revolt**/** 1936–1939 Arab revolt in Palestine**)** অনুষ্ঠিত হয়। এই রিভোল্ট ছিল ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে। ব্রিটেন থেকে স্বাধীনতা, ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে অভিবাসন এবং ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে জমি কিনার বিরুদ্ধে ছিল এই রিভোল্ট। এতে প্রায় ৫০০০ আরব (মুসলিম) মারা যান যার মধ্যে ১০৮ জনকে ব্রিটিশ সরকার ফাঁসি দিয়েছিল। ব্যাপক আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সরকার নতুন একটি পলিসি গ্রহনে বাধ্য হন যা ওয়াইট পেপার ১৯৩৯ (White Paper of 1939) নামে পরিচিত।

১৯৩৯ সালের মে মাসের ম্যাকডোনাল্ড শ্বেতপত্রে (ওয়াইট পেপার ১৯৩৯ / White Paper of 1939) ঘোষণা করা হয়েছিল যে " এটা (ব্রিটিশ সরকারের) নীতির অংশ নয় যে ফিলিস্তিনকে ইহুদি রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে"। ওয়াইট পেপার ১৯৩৯ পলিসি ফিলিস্তিনে ইহুদি অভিবাসন সীমিত করার চেষ্টা করেছিল এবং ইহুদিদের কাছে আরব জমি বিক্রি সীমিত করেছিল। (The MacDonald White Paper of May 1939 declared that it was "not part of [the British government's] policy that Palestine should become a Jewish State", sought to limit Jewish immigration to Palestine and restricted Arab land sales to Jews.) ওয়াইট পেপার ১৯৩৯ এর বিরুদ্ধে ইহুদীরা সারা বিশ্বব্যাপী আন্দোলন শুরু করে। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে প্যালেস্টাইন নিয়ে আর কোন আলোচনা আগায় নি।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস. ট্রম্যান (President Truman) সর্ব প্রথম ১ লাখ ইহুদীকে প্যালেস্টাইনে অভিবাসনের কথা বলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তার কথা মেনে নেয় নি। ব্রিটিশ সরকার ওয়াইট পেপার ১৯৩৯ পলিসিতেই অনড় থাকতে চেয়েছিল। এতে ইহুদীরা প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের বিরুদ্ধে সামরিক যুদ্ধে অবতীর্ণ (Jewish Resistance Movement; October, 1945) হবার পথ বেছে নেয়। ইহুদীদের এই পদক্ষেপ এবং আমেরিকার চাপে পড়ে ব্রিটিশরা আমেরিকার সাথে একটি যৌথ কমিটি করতে বাধ্য হয় যার নাম অ্যাংলো আমেরিকান কমিটি ফর ইনকোয়ারি (Anglo-American Committee of Inquiry)। এই কমিটি আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে মিটিং -এ বসে এবং সিদ্ধান্ত দেয় যে, ব্রিটিশদের ওয়াইট পেপার ১৯৩৯ / White Paper of 1939 থাকা 'ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে অভিবাসন নিষিদ্ধ' করার নিয়ম বাতিল করতে হবে এবং ওয়াইট পেপার ১৯৩৯ পলিসিতে থাকা 'ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে জমি কেনা নিষিদ্ধ' - নিয়মটিও বাতিল করতে হবে। ব্রিটিশরা এক শর্তে অ্যাংলো আমেরিকান কমিটি ফর ইনকোয়ারির সিদ্ধান্তগুলো মেনে নেয় যে, যদি আরব রিভোল্ট শুরু হয় তাহলে আমেরিকা ব্রিটেনের পক্ষে থাকবে। কিন্তু তারপরও ব্রিটেন নিজেদের ওয়াইট পেপার ১৯৩৯ পলিসি-ই মেনে চলতে থাকে। অনেকেই মনে করেন যে, ব্রিটেন প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র গঠনে বড় ভূমিকা রেখেছে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ব্রিটেন নয় - প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র মূলত গঠন করেছে আমেরিকা এবং একমাত্র আমেরিকাই দায়ী। আমেরিকা ব্রিটেনের অনুমতি না নিয়ে হাজার হাজার অবৈধ ইহুদী অভিবাসীদের প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসে। যাদের মোট সংখ্যা ১৯৪৭ সালের আগেই ১ লাখ ছাড়িয়ে যায়। এতে আমেরিকা তাদের SS Exodus যুদ্ধ জাহাজটি ব্যাবহার করে। United Nations Partition Plan for Palestine (UNSCOP) এর সদস্যরা যখন প্যালেস্টাইনে তথ্য সংগ্রহের জন্য যায় তখন তারা ইহুদী মিলিশিয়া সংগঠন লেহি (Lehi) এবং ইরগুনের (Irgun) বর্বরতা দেখে হতবাক হয়ে যায় এবং SS Exodus এর মত যুদ্ধ জাহাজে করে হাজার হাজার ইহুদী প্যালেস্টাইনে যে আমেরিকা নিয়ে এসেছে সেটা দেখেও তারা আশ্চর্য হয়ে যায়। এ সব পর্যবেক্ষণের পর তারা প্যালেস্টাইনে আরব (মুসলিম) ও ইহুদীদের জন্য দুটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেয়।

(আল্লাহ চাইলে, এই বইয়ের " দাজ্জাল কতদিন পৃথিবীতে থাকবে" অধ্যায়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান (President Truman) সম্পর্কে ও আমেরিকা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন।)

১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ সভায় একটি র‍্যাসুলোশন Resolution 181 (II) (United Nations Partition Plan for Palestine) পাস হয়। এতে বলা হয়, আরব এবং ইহুদীদের জন্য আলাদা দুটি রাষ্ট্র প্যালেস্টাইনে হবে। ১১,৫৯২ বর্গকিলোমিটার (মোট ভুমির ৪২.৮৮%) নিয়ে আরব (মুসলিম) একটি রাষ্ট্র হবে এবং ১৫,২২৬ বর্গকিলোমিটার (মোট ভুমির ৫৬. ৪৭%) নিয়ে ইহুদী রাষ্ট্র হবে। জেরুজালেম, বেথলেহেমসহ ১৭৬ বর্গকিলোমিটার আন্তর্জাতিক জায়গা হবে অর্থাৎ এই অংশটুকু আরব বা ইহুদী রাষ্ট্র কেউই পাবে না বরং এই জায়গা বা অঞ্চলটিতে আরব, মুসলিম, ইহুদী, খ্রিষ্টান, ইত্যাদি সকল মানুষ যাতায়াত করতে পারবে। এই র‍্যাসুলোশনটি ইহুদীরা প্রথমে মেনে নেয় কিন্তু আরব লীগ নেতারা মেনে নেয়নি। ১৯১৮ সালের ব্রিটিশ আদম শুমারির তথ্য মতে, তখন প্যালেস্টাইনে ৭ লাখ আরব ছিল আর মাত্র ৫৬ হাজার ইহুদী ছিল। কিন্তু ইহুদীরা আরবদের চেয়ে বেশি জায়গা পাচ্ছে - এটা আরব নেতারা মেনে নেয়নি। এই র‍্যাসুলোশন পাসে আমেরিকা যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে তা সহজেই বুঝা যায় কারণ ব্রিটেন এই র‍্যাসুলোশন Resolution 181 (II) পাসের ভোটাভুটিতে ভোট দানে বিরত ছিল। UNSCOP এর প্ল্যান থেকে আনিত বিল বা প্যালেস্টাইনকে ভেঙ্গে ২ টি আলাদা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব পাস করানোর জন্য আমেরিকা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে কঠিন চাপ দেয়। আমেরিকার ২৬ জন সিনেটর ভোট দানকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রে চিঠি দেয় এবং সেই সব দেশে সাহায্য (Aid) বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেয়। ফলে বিলটি পাস হয়। মুলত এই র‍্যাসুলোশনটি Resolution 181 (II) পাসের মধ্য দিয়ে ইসরায়েল নামের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিল আমেরিকার মূল উদ্দেশ্য। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমি ব্রিটেনের তেমন কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা দেখতে পাইনি বরং ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠন করেছে একা আমেরিকা ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান।

১৯৪৭-১৯৪৮ সালেই মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যে বড় আকারের সংঘর্ষ (1947–1948 civil war in Mandatory Palestine) ছড়িয়ে পড়ে। যেদিন Resolution 181 (II) জাতিসংঘে পাস হয় তারপরের দিন-ই এ সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে মুসলিমরা প্রচুর পরিমাণে নিহত হয়। ইহুদীদের প্রচুর আধুনিক অস্ত্র ছিল যার সামনে প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের তেমন কিছু করার ছিল না। ইহুদীরা অনেক জায়গায় গণহত্যা চালায়। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ শাসন শেষ হবার দিন-ই ইহুদীরা স্বাধীন ইসরায়েল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয় এবং আরব মুসলিমদের সাথে ইসরায়েলের যুদ্ধ (1948 Palestine war) শুরু হয়। এই যুদ্ধে ইরাক, সিরিয়া, মিশর, ট্রান্সজর্ডান (জর্ডান) রাষ্ট্রীয়ভাবে অংশ গ্রহন করে। সৌদি আরব, লেবানন, ইয়েমেন এই যুদ্ধে রাষ্ট্রীয়ভাবে বা সরকারীভাবে অংশ গ্রহন করেনি। লেবানন, ইয়েমেন, সৌদি আরব থেকে স্বেচ্ছাসেবকরা যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিল। আল সউদ রাজপরিবারের প্রকৃত চেহারা এখান থেকেও উম্মোচিত হয়।

………………...আর যখন তারা সিরিয়া পৌছবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকবে তখন সেখানে দাজ্জাল আসবে।………….” (সাহিহ মুসলিম ২৮৯৭)

ট্রান্সজর্ডান বা জর্ডানের শাসক তখন ছিলেন আবদুল্লাহ বিন হুসেইন (Abdullah I of Jordan)। তিনি ছিলেন আরবদের মধ্যে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবচেয়ে বড় দল আরব লিজনের প্রধান (Arab Legion)। এই দলে প্রায় ১০ হাজার প্রশিক্ষিত যোদ্ধা ছিল। তার নেতৃত্বেই মুসলিমদের বাহিনী ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আরব লিজনের যোদ্ধারা ইসরায়েল স্বাধীনতা ঘোষণা করার পূর্বেই অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে এর আগেই প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অঞ্চলে গিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, ওসামা বিন যায়েদের রাঃ নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া যুদ্ধের নেতা ছিলেন আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) খুব কাছের লোক - ওসামা বিন যায়েদ (রাঃ) ; আবার সিরিয়ায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া দলের প্রধান আবদুল্লাহ বিন হুসেইন হচ্ছেন আল্লাহ এর রসূলের সাঃ সরাসরি বংশধর। যখন তারা (আরব লিজন ও অন্য মুসলিম যোদ্ধারা) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ইহুদীরা ইসরায়েলকে নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করার মাধ্যমে প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের ভূমি আনুষ্ঠানিকভাবে দখল করে নেয় এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রটি দাজ্জাল রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। ইসরায়েলের সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রীর পদটি হচ্ছে দাজ্জাল। যে ব্যাক্তি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর পদে বসবে সেই দাজ্জাল হবে। আল্লাহ চাইলে, এই বইয়ের "দাজ্জাল কতদিন পৃথিবীতে থাকবে" অধ্যায়ে এই ব্যাপারে আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাবেন।

আবদুল্লাহ বিন হুসেইন ‘পিল কমিশনের’ (Peel Commission 1937) প্যালেস্টাইন ভেঙ্গে ২০% জায়গা নিয়ে ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন যেখানে বলা ছিল যে, প্যালেস্টাইনের বাকি অংশ জর্ডানের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু এই কমিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ যখন প্যালেস্টাইন ভেঙ্গে আলাদা দুটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব (UNSCOP) দেয় তখন আবদুল্লাহ বিন হুসেইন -ই একমাত্র আরব নেতা যিনি এই প্রস্তাব মেনে নেন। এজন্য তাকে অনেক সমালোচনার মধ্যে পড়তে হয়। খেয়াল করে দেখুন, অন্য আরব নেতারা প্যালেস্টাইন ভাঙ্গার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের বিরুদ্ধে ছিলেন কিন্তু যখন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয় তখন সৌদি আরব, ইয়েমেন, লেবানন যুদ্ধে অংশ গ্রহনই করেনি। আর যিনি পিল কমিশন ও প্যালেস্টাইন ভেঙ্গে আলাদা দুটি রাষ্ট্র গঠনের জাতিসংঘের প্রস্তাব (UNSCOP) মেনে নিয়েছিলেন – তিনি অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন হুসেইন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। যুদ্ধের ফলাফল দেখলে বুঝা যায় যে, আবদুল্লাহ বিন হুসেইন-ই সঠিক ছিলেন। তিনি সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইহুদী বা ইসরায়েলের পিছনে আছে আমেরিকা। সুতরাং জাতিসংঘ যে প্রস্তাব দিয়েছে তা মেনে নিলে মুসলিমরা যতটুকু ভূমি বা জমি পাবে এবং নিরাপদে থাকতে পারবে - জাতিসংঘের প্রস্তাব মেনে না নিলে মুসলিমদের সমস্যা আরও বেশি হবে। ১৯৪৮ সালের আরব – ইসরায়েল যুদ্ধের ফলাফল হচ্ছে সাত লাখ মুসলিম গৃহহীন হয়েছিল।

অসংখ্য মুসলিম নিহত হয়েছিল। ইসরায়েল জাতিসংঘের নির্ধারিত ভূমির চেয়ে আরও বেশি প্যালেস্টাইনী ভূমি দখল করে নিয়েছিল। যুদ্ধে মুসলিম আরবরা পরাজিত হয়েছিল।

১৯৪৯ সালে আরমিসটিস চুক্তির (1949 Armistice Agreements) মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়। চুক্তি মোতাবেক, ইসরায়েল অর্থাৎ ইহুদীরা প্যালেস্টাইনের ৭৮% ভূমি বা ২১ হাজার বর্গ কিলোমিটার ভূমির মালিক হয়। অথচ জাতিসংঘের পিল কমিশনে ইসরায়েলকে মাত্র ২০% ভূমি দেয়া হয়েছিল। জাতিসংঘের ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বরের Resolution 181 (II) বিলে ইসরায়েলকে ১৫,২৬৪ বর্গ কিলোমিটার (৫৬.২৭%) ভূমি দেয়া হয়েছিল। উভয় প্রস্তাব-ই আবদুল্লাহ বিন হুসেইন (আব্দুল্লাহ-১) মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে ইসরায়েল ৭৮% (২১ হাজার বর্গ কিলোমিটার) ভূমি নিয়ে নিয়েছিল অর্থাৎ ইসরায়েল যুদ্ধের পর জাতিসংঘের প্রস্তাবের চেয়ে প্রায় ২২% ভূমি বেশি দখল করে নিয়েছিল। তখন আরব নেতারা যারা আবদুল্লাহ বিন হুসেইনের সমালোচনা করেছিলেন তারা কি করছিলেন? সৌদি আরবের আল সউদ রাজপরিবার-তো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহন-ই করেনি। বর্তমানে প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের অবস্থা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন।

বর্তমানে, জর্ডানের রাজা হচ্ছেন আবদুল্লাহ বিন হুসেইন যিনি আবদুল্লাহ -২ (Abdullah-2) নামে পরিচিত। তিনি আল্লাহ এর রসূলের সাঃ সরাসরি বংশধর। উনাকে অসম্মান করে কেউ কেউ কথা বলেন। খুব সাবধান। উনাদের পায়ের ধূলার যোগ্য আমরা নই। উনাদের দোষ ধরার কোন যোগ্যতাই আমাদের নেই। যার শরীরে আল্লাহ এর রসূলের সাঃ রক্ত বইছে তার মেধা, জ্ঞান, যোগ্যতা আমাদের অনেক উপরে যা আবদুল্লাহ বিন হুসেইনের (আবদুল্লাহ-১) প্যালেস্টাইন ও ইসরায়েল নিয়ে নেয়া সিদ্ধান্তগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি।

"...............।আর যখন তারা সিরিয়া পৌছবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকবে তখন সেখানে দাজ্জাল আসবে। নিশ্চয়ই নামাজের সময় আসবে এবং তখন মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন এবং ইমাম হিসেবে তাদের নামাজ পড়াবেন এবং তখন ঈসা (আলাইহিস সালাম) অবতরণ করবেন এবং সালাতে তাদের ইমামত করবেন...............।" (সাহিহ মুসলিম-২৮৯৭)

অনেকে মনে করছেন – এই ঘটনা ঘটেনি কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তারা সিরিয়ায় পৌঁছে গেছে এবং দাজ্জাল-ও সেখানে এসে পড়েছে। এরপর আসবেন ইসা আঃ। আমরা ইসা আঃ এর আগমনের ঠিক পূর্বের সময়ে আছি। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে ৭৭ বছর হয়ে গেছে। আমাদের বর্তমান সময়টি হচ্ছে আদম আঃ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত মানব ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সময়। আপনি, আমি এই কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছি। ইসা আঃ আসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ভারতীয় উপমহাদেশে একটি যুদ্ধ হবার কথা হাদিসে আছে যাকে গাজওয়াতুল হিন্দ বলা হয়। ভারত তথা বিজেপি ও মোদীর কর্মকাণ্ডে বুঝা যাচ্ছে যে, আমরা গাজওয়াতুল হিন্দের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি।

অমুসলিম সমাজে জরথুস্ত্রবাদের দ্বৈতবাদের উত্থান এবং প্রভাব

১৪৫৩ সালে জুলকারনাইনের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবার পর ইয়াজুজ-মাজুজের বিশ্বাস, যাদু (বিজ্ঞান) ও মতাদর্শ সারা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সাত মাসের মধ্যে দাজ্জাল আবির্ভূত হয়েছে। ১৪৫৩ সালে জরাথুস্ট্রবাদের দ্বৈতবাদ ও সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

দাজ্জাল (Dajjal) শব্দের মূল (root) "দাজালা" (dajala) শব্দের অর্থ 'মিশ্রিত করা'। "দাজালা" শব্দটি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিষয়কে জটিল ও বিভ্রান্ত করা এবং অস্পষ্ট (ধোঁকা) ও দুর্বোধ্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। দাজ্জাল (Dajjal) শব্দের মূল (root) "দাজালা" (dajala) শব্দের সাথে জরাথুস্ট্রবাদের দ্বৈতবাদের মিল খুঁজে পাচ্ছি। 'দাজালা' শব্দের অর্থ হচ্ছে মিশ্রিত করা। জরাথুস্ট্রবাদের দ্বৈতবাদ হচ্ছে ভালো ও মন্দের মিশ্রণ; সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ; বিপরীতমুখী ২টি পক্ষকে বা মতাদর্শকে মিশ্রিত করে একত্রে সহাবস্থানে রাখা। যদিও সকল অমুসলিম শাসকদেরকে দাজ্জাল হিসেবে চিহ্নিত করবো না তারপরও ১৪৫৩ সালের পরে তাদের মতাদর্শ ও অবস্থার কি রূপ পরিবর্তন হয়েছিল তা জেনে নেয়া দরকার। ১৪৫৩ সালের পর অমুসলিমরা সাধারণভাবে ইয়াজুজ-মাজুজ হিসেবে অভিহিত হবে কারণ ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ হলেও তখন তারা মূলত পৈত্তলিক এবং যাদুতে (জ্যোতির্বিজ্ঞানে) বিশ্বাসী হয়েছে। এখন আমরা দেখব, ১৪৫৩ সালের পর জরাথুস্ট্রবাদের দ্বৈতবাদ মতাদর্শ অমুসলিম সমাজে এবং রাষ্ট্রে কেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল? যাদুতে বিশ্বাসী তথা মাজুজদের অবস্থা কেমন হয়েছিল?

১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের ৭ মাসের ভিতরে যখন দাজ্জাল মুসলিমদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছিল সেই বছর-ই ইউরোপে একটি বড় যুদ্ধ শেষ হয়েছিল যার নাম 'HUNDRED YEARS WAR'

Hundred Years War: শত বছরের যুদ্ধ (১৩৩৭–১৪৫৩) ছিল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স রাজ্যের মধ্যে সংঘটিত একটি সংঘাত এবং মধ্যযুগের শেষভাগে ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ। এটি অ্যাকুইটাইনের ডাচি নিয়ে সামন্ততান্ত্রিক বিরোধ থেকে উদ্‌ভূত হয়েছিল এবং ইংল্যান্ডের তৃতীয় এডওয়ার্ডের ফরাসি সিংহাসনের দাবির ফলে এটি শুরু হয়েছিল। যুদ্ধটি পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে বিভিন্ন উপদলের সাথে জড়িত একটি বৃহত্তর সামরিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল, উভয় পক্ষের উদীয়মান জাতীয়তাবাদের দ্বারা ইন্ধন জোগায়। যুদ্ধের সময়কাল (১৩৩৭ সাল থেকে ১৪৫৩ সাল) সাধারণত এটিকে ১১৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে সংঘটিত বলে চিহ্নিত করে। এটি ইউরোপের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলা যুদ্ধ। তিনটি পর্যায়ে এই যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ Edwardian War (1337–1360), The Caroline War (1369–1389), The Lancastrian War (1415–1453). ১৪৫৩ সালেই মুসলিমরা সুলতান মাহমুদ- ২ এর নেতৃত্বে কনস্টান্টিনোপল বিজয় করে। অর্থাৎ শত বছরের যুদ্ধের সমাপ্তি (শত বছরের যুদ্ধ/Hundred year war) এবং কনস্টান্টিনোপল বিজয় একই বছর, ১৪৫৩ সালে হয়েছিল। শত বছরের যুদ্ধ হয়েছিল ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে। শত বছরের যুদ্ধের পটভূমি তৈরি হয় যখন ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ড- ২ (Edward II) এর সাথে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ-৪ (Philip IV) এর মেয়ে ইসাবেলার

(Isabella of France) বিবাহ হয়। তাদের সন্তান এডওয়ার্ড -৩ (Edward III) ১৩২৭ সালে ইংল্যান্ডের রাজা হন। ১৩২৮ সালে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ-৪ (Philip IV) এর মৃত্যু হলে ফ্রান্সের সিংহাসনের সবচেয়ে কাছের পুরুষ দাবীদার ছিলেন ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ড-৩। তিনি তাঁর মায়ের দিক থেকে এই অধিকার পান। কিন্তু ফরাসি অভিজাতদের একটি সমাবেশ সিদ্ধান্ত নেয় যে পুরুষ বংশের মাধ্যমে নিকটতম উত্তরাধিকারী হলেন চার্লস চতুর্থের (Charles IV) প্রথম চাচাতো ভাই ফিলিপ(Philip), ভ্যালোইসের কাউন্ট, এবং তাকে ষষ্ঠ ফিলিপ (Philip VI) হিসেবে ফ্রান্সের মুকুট পরানো উচিত। কিন্তু এটা ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ড -৩ মেনে নেন নি। ইংল্যান্ডের রাজাদের ফ্রান্সের সিংহাসনের প্রতি এই দাবী থেকেই শত বছরের যুদ্ধ (Hundred year War) অনুষ্ঠিত হয়। ১৪৫৩ সালে ইংল্যান্ড এই যুদ্ধে হেরে গেলেও ১৮০২ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের রাজারা নিজেদেরকে ফ্রান্সের রাজা হিসেবেও ঘোষণা করত। শতবর্ষী যুদ্ধের থেকেই সর্ব প্রথম দ্বৈত রাজতন্ত্রের (Dual Monarchy) উদ্ভব হয়।

শতবর্ষী যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের দ্বৈত রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল, যখন ফ্রান্সের সপ্তম চার্লস (Charles VII) এবং ইংল্যান্ডের ষষ্ঠ হেনরি (Henry VI) ফ্রান্সের সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ করেছিলেন। ১৪২২ সালের ২১ অক্টোবর ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুর পর এটি শুরু হয়, যিনি ট্রয়েসের চুক্তিতে (Treaty of Troyes) স্বাক্ষর করেছিলেন, যার ফলে তার জামাতা ইংল্যান্ডের পঞ্চম হেনরি (Henry V of England) এবং হেনরির উত্তরাধিকারীদের ফরাসি মুকুটের দাবীদার করে দেওয়া হয়েছিল। এতে রাজা চার্লসের পুত্র ডাউফিন চার্লসকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, যিনি অতীত নিয়ম অনুযায়ী বংশের ধারার ক্রমানুসারের অধিকারে ফ্রান্স রাজ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন। চুক্তিটি ফ্রান্সের এস্টেট-জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত হলেও, এই আইনটি ফরাসি উত্তরাধিকার আইনের লঙঘন ছিল যা আদেশ দিয়েছিল যে, ফরাসি মুকুটকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। ১৪৩৫ সাল পর্যন্ত পঞ্চম হেনরির (Henry V) পুত্র ষষ্ঠ হেনরি (Henry VI) ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স উভয়েরই রাজা ছিলেন, যদিও কেবল ইংরেজ এবং বারগুন্ডিয়ানরাই ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় হেনরি হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দেয়। ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত এই দ্বৈত রাজতন্ত্র (Dual Monachy) ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে চালু ছিল।

দ্বৈত রাজতন্ত্র (Dual Monarchy) তখনই ঘটে যখন দুটি পৃথক রাজ্য একই রাজা বা রাজবংশ দ্বারা শাসিত হয়, একই বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে, একে অপরের সাথে একটি কাস্টমস ইউনিয়নে বিদ্যমান থাকে এবং একটি সম্মিলিত সামরিক বাহিনী থাকে কিন্তু অন্যথায় স্ব-শাসিত হয়। যে দ্বৈতবাদের কথা আমরা পারস্যের জরথুস্ত্রবাদে পড়েছিলাম সেই মতাদর্শের ভিত্তি করে এখন আমরা একটি রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান পেলাম যার নাম দ্বৈত রাজতন্ত্র (Dual Monachy). দুইটি রাজ্যের জনগণের স্বার্থ আলাদা হওয়া সত্ত্বেও একই রাজবংশ দ্বারা পরিচালিত হলে তারা উভয়ে একই সাথে সহাবস্থান করতে বাধ্য হবে – এটাই তো দ্বৈতবাদ (Dualism).

ইংল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ হেনরি (Henry VI) এবং তাঁর স্ত্রী মারগারেটের (Margaret of Anjou) সন্তান এডওয়ার্ড (Edward of Westminster) এর জন্ম হয় ১৩ই অক্টোবর, ১৪৫৩ সালে। এডওয়ার্ড তাঁর মায়ের দিক থেকে ফ্রান্সের রাজা হবার দাবীদার ছিল কারণ তাঁর মা মারগারেট ১৪৪৫-১৪৬১ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের রানী ছিল -

ইংল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ হেনরিকে বিয়ের মাধ্যমে আর ১৪৪৫- ১৪৫৩ পর্যন্ত ফ্রান্সের রানী ছিল। তাছাড়া এডওয়ার্ড এমনিতেই তাঁর পিতা ইংল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ হেনরির সন্তান হিসেবে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের রাজা হবার দাবীদার ছিল। কিন্তু সে ইংল্যান্ডের না না রকম গৃহযুদ্ধ ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কারণে রাজা হতে পারেনি। এডওয়ার্ডের (Edward of Westminster) স্ত্রী ছিল অ্যান নেভিল (Anne Neville)। ১৪৭১ সালে এডওয়ার্ড (Edward of Westminster) নিহত হন।

আমরা ইংল্যান্ডের আরেকজন রাজার কথা জানব যার জন্ম হয়েছিল ২রা অক্টোবর ,১৪৫২ সালে। এই রাজার নাম তৃতীয় রিচার্ড (Richard III of England) যিনি ১৪৮৩ থেকে ১৪৮৫ পর্যন্ত ইংল্যান্ডকে শাসন করেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন এডওয়ার্ডের (Edward of Westminster) বিধবা স্ত্রী অ্যান নেভিলকে (Anne Neville) । এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত হচ্ছে অ্যান নেভিল (Anne Neville) এডওয়ার্ডের (Edward of Westminster) স্ত্রী থাকা অবস্থায় স্বামীর দিক থেকে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের রানী হবার দাবীদার ছিলেন। অর্থাৎ বিবাহের জটিল সমীকরণে ব্রিটিশ রাজবংশ এবং ফরাসি রাজবংশের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য আর ছিল না ফলে দুইটি রাজবংশ মূলত একটি রাজবংশে পরিণত হয় এবং এটি তাত্ত্বিকভাবে দ্বৈত রাজতন্ত্র (Dual Monarchy) হয়ে উঠে।

এছাড়া এ সময়ে ইংল্যান্ডের শাসন ব্যবস্থায় নতুন একটি পদের তৈরি হয় যার নাম লর্ড প্রটেক্টর (Lord Protector) । লর্ড প্রোটেক্টর হল একটি উপাধি যা ব্রিটিশ সাংবিধানিক আইনে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটি প্রতিষ্ঠিত গির্জার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য একটি বিশেষ উপাধি হিসেবেও ছিল। এটি কখনও কখনও অন্যান্য অস্থায়ী পদের ধারকদের বোঝাতে ব্যবহৃত হত; উদাহরণস্বরূপ, অনুপস্থিত রাজার পক্ষে দায়িত্ব পালনকারী একজন রিজেন্ট (Regent)। এই রিজেন্টরা রাজকীয় ব্যবস্থায় রাজার রাজ্য পরিচালনায় অপারগতায় তাদের পক্ষে রাজ্য পরিচালনা করত। বলতে পারেন, একই রাজ্যে ২ জন রাজার মত কাজ করত। একজন সামনে থেকে রাজা হিসেবে সবার কাছে পরিচিত ছিল, আরেকজন পিছন থেকে রাজ্য পরিচালনা করত। এটিও জরথুস্ত্রবাদের দ্বৈতবাদ (Dualism) ধারণার সাথে মিলে যায়।

১) বেডফোর্ডের ডিউক জন এবং গ্লুচেস্টারের ডিউক হামফ্রে (৫ ডিসেম্বর ১৪২২ - ৬ নভেম্বর ১৪২৯) হেনরি ষষ্ঠের (১৪২১-১৪৭১) যৌথভাবে লর্ডস প্রটেক্টর ছিলেন।

২) ইয়র্কের ডিউক রিচার্ড প্ল্যান্টাজেনেট তিনবার (৩ এপ্রিল ১৪৫৪ - ফেব্রুয়ারি ১৪৫৫ এবং ১৯ নভেম্বর ১৪৫৫ - ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৪৫৬; এবং ৩১ অক্টোবর - ৩০ ডিসেম্বর ১৪৬০) হেনরি ষষ্ঠের লর্ড প্রোটেক্টর ছিলেন।

এভাবে ১৫৫৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় এই লর্ড প্রটেক্টর ('Lord Protector') পদটি ব্রিটিশ রাজতন্ত্রে আসে এবং বিভিন্ন জন এই সময়ে লর্ড প্রটেক্টর ('Lord Protector') হিসেবে কাজ করে। এখান থেকে আমরা একই দেশে দুইটি রাজা বা সরকার থাকার ধারণা পাচ্ছি।

দ্য ইউনিয়ন অফ দ্য ক্রাউনস (Union of the Crowns) বা ক্রাউনদের ইউনিয়ন ছিল স্কটল্যান্ডের জেমস ষষ্ঠের (James VI of Scotland) ইংল্যান্ড রাজ্যের সিংহাসনে জেমস প্রথম (James I) হিসেবে আরোহণ এবং একজন ব্যক্তির অধীনে দুটি পৃথক রাজ্যের কিছু কার্যাবলীর (যেমন বিদেশী কূটনীতি) বাস্তব একীকরণ। এটি জেমসের চাচাতো ভাই, ইংল্যান্ডের এলিজাবেথ প্রথম (Elizabeth I of England), টিউডর রাজবংশের শেষ রাজার মৃত্যুর পর ঘটে।

এই ইউনিয়নটি ব্যক্তিগত বা রাজবংশীয় ছিল , জেমসের নতুন সাম্রাজ্যবাদী সিংহাসন তৈরির সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের ক্রাউন এবং স্কটল্যান্ডের ক্রাউন উভয়ই স্বতন্ত্র এবং পৃথক ছিল। শেষ স্টুয়ার্ট রাজা অ্যানের রাজত্বকালে 1707 সালের ইউনিয়ন আইন প্রণয়নের আগ পর্যন্ত, ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড দুটি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে অব্যাহত ছিল যার মধ্যে একজন রাজা ছিলেন, যিনি আয়ারল্যান্ডের সাথে তাদের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করতেন । যাইহোক, ১৬৫০ এর দশকে একটি প্রজাতন্ত্রের অন্তর্বর্তীকালীন শাসনব্যবস্থা ছিল, যে সময় অলিভার ক্রমওয়েলের ইউনিয়নের টেন্ডার (Tender of Union) ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের মধ্যে কমনওয়েলথ তৈরি করে যা Stuart Restoration মাধ্যমে শেষ হয়। সংজ্ঞার দিক থেকে এটি যদিও একটি দ্বৈত রাজতন্ত্রের (Dual Monachy) মতই ব্যবস্থা ছিল কিন্তু সেভাবে এটিকে কেউ উল্লেখ করেনি। এখানে মূল সূত্র দ্বৈতবাদ। জরাথুস্ট্রবাদের দ্বৈতবাদ থেকে আমরা এখন দ্য ইউনিয়ন অফ দ্য ক্রাউনস (Union of the Crowns) পেলাম। এরপর পৃথিবীতে যত সংগঠন এসেছে যাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী বা আইন আছে তাঁর সবকিছুর-ই সূত্র হচ্ছে জরাথুস্ট্রবাদের দ্বৈতবাদ (Dualism). যেমনঃ কিংডম অফ গ্রেট ব্রিটেন (Kingdom of Great Britain); জাতিসংঘ (United Nations); NATO, ইত্যাদি। গণতান্ত্রিক প্রতিটি দেশ ও এখন জরাথুস্ট্রবাদের দ্বৈতবাদ দিয়েই পরিচালিত হচ্ছে কারণ গনতন্ত্র হচ্ছে দ্বৈতবাদের (Dualism) পরিশীলিত একটি রূপ (গণতন্ত্রে দ্বৈতবাদ – সরকারি দল, বিরোধী দল) ।

কিংডম অফ গ্রেট ব্রিটেন (Kingdom of Great Britain) (১৭০৬-১৮০০) - গ্রেট ব্রিটেন, যা গ্রেট ব্রিটেনের রাজ্য নামেও পরিচিত যা ছিল পশ্চিম ইউরোপের একটি রাষ্ট্র যা ১৭০৭ থেকে ১৮০০ সালের শেষ পর্যন্ত ছিল। এই রাজ্যটি ১৭০৬ সালের ইউনিয়ন চুক্তি দ্বারা তৈরি হয়েছিল এবং ১৭০৭ সালের ইউনিয়ন আইন দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল, যা ইংল্যান্ড রাজ্য (ওয়েলস সহ) এবং স্কটল্যান্ড রাজ্যকে একত্রিত করে একটি একক রাজ্য গঠন করে যা সমগ্র গ্রেট ব্রিটেন দ্বীপ এবং এর বাইরের দ্বীপপুঞ্জগুলিকে ঘিরে ছিল, আইল অফ ম্যান এবং চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ বাদে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রটি ওয়েস্টমিনস্টার প্রাসাদে (Palace of Westminster) একই সংসদ দ্বারা পরিচালিত হত, তবে স্বতন্ত্র আইনি ব্যবস্থা - ইংরেজ আইন এবং স্কটিস আইন - আলাদাভাবে ব্যবহৃত হত, তাছাড়া স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান - যথাক্রমে ইংল্যান্ডের চার্চ এবং স্কটল্যান্ডের চার্চ যথাক্রমে ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের জাতীয় গির্জা হিসাবে রয়ে গিয়েছিল। এটি সেই দ্বৈত রাজতন্ত্রের- ই একটি আধুনিক রূপ যা দ্বৈতবাদের সুত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যুক্তরাজ্য (United Kingdom): ১৭০৭ সালের ইউনিয়ন আইন (Acts of Union 1707) ঘোষণা করে যে, ইংল্যান্ড রাজ্য এবং স্কটল্যান্ড রাজ্য "গ্রেট ব্রিটেনের নামে এক রাজ্যে একত্রিত"। "যুক্তরাজ্য" শব্দটি মাঝে মাঝে গ্রেট ব্রিটেনের প্রাক্তন রাজ্যের বর্ণনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও ১৭০৭ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত এর সরকারী নাম ছিল কেবল "গ্রেট ব্রিটেন"। ১৮০০ সালের ইউনিয়ন আইন (Acts of Union 1800) গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ডকে একত্রিত করে যুক্তরাজ্য গঠন করে। ১৯২২ সালে আয়ারল্যান্ডের বিভাজন এবং আইরিশ ফ্রি স্টেটের স্বাধীনতার পর, যার ফলে উত্তর আয়ারল্যান্ড যুক্তরাজ্যের মধ্যে আয়ারল্যান্ড দ্বীপের একমাত্র অংশ হিসেবে থেকে যায়, ১৯২৭ সালে নামটি "গ্রেট ব্রিটেন এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের যুক্তরাজ্য" হিসেবে পরিবর্তন করা হয়।

যদিও যুক্তরাজ্য একটি আলাদা দেশ; ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডকেও ব্যাপকভাবে দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর ওয়েবসাইটে যুক্তরাজ্যকে বর্ণনা করার জন্য "একটি দেশের মধ্যে দেশ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু পরিসংখ্যানগত সারসংক্ষেপ, যেমন বারোটি NUTS 1 অঞ্চলের জন্য, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডকে "অঞ্চল" হিসাবে উল্লেখ করে। উত্তর আয়ারল্যান্ডকে "প্রদেশ" হিসাবেও উল্লেখ করা হয়।

যুক্তরাজ্য বা United Kingdom মূলত একটি দ্বৈতবাদ ভিত্তিক রাষ্ট্র যার সুত্রপাত হয় অন্তত ইংল্যান্ডের Tudor Dynasty (House of Tudor) এর সময় থেকেই বা তারও আগে থেকে। ১৪৫৩ সালে শতবর্ষের যুদ্ধ (Hundred Years' War) শেষ হবার পর ইংল্যান্ডে রাজা হওয়া নিয়ে দুইটি প্রভাবশালি পরিবারের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় যা Wars of the Roses (1455–1487) নামে পরিচিত। আমি অতি সংক্ষেপে বলছি, এই যুদ্ধ শেষে Henry Tudor (Henry VII) যার জন্ম হয় ২৮ জানুয়ারী ১৪৫৭ সালে, (অর্থাৎ জুলকারনাইনের প্রাচীর ভাঙ্গার বেশি দিন পরে তার জন্ম নয়) তিনি ইংল্যান্ডের রাজা এবং আয়ারল্যান্ডের 'লর্ড' ('Lord' of Ireland) হন।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য হচ্ছে, প্রাচীনকালে আয়ারল্যান্ড শাসিত হত 'হাই কিং অফ আয়ারল্যান্ড' (High King of Ireland) দের দ্বারা। আয়ারল্যান্ডের 'হাই কিং অফ আয়ারল্যান্ড' ছিল গ্যালিক আয়ারল্যান্ডের একটি রাজকীয় উপাধি যা তাদের দ্বারা অধিষ্ঠিত ছিল যাদের সমগ্র আয়ারল্যান্ডের উপর কর্তৃত্ব ছিল, অথবা যাদের দাবি করা হয় যে তারা এই উপাধি ধারণ করতেন। এই উপাধি ঐতিহাসিক রাজাদের দ্বারা অধিষ্ঠিত ছিল এবং পরবর্তীতে কখনও কখনও এটি কালানুক্রমিকভাবে বা কিংবদন্তি ব্যক্তিত্বদের দ্বারা অর্পণ করা হত। এই ধারা ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১তম শতাব্দী পর্যন্ত জারি ছিল; অর্থাৎ এই সময়ে এই রাজাদের দ্বারা আয়ারল্যান্ড ইংল্যান্ড থেকে স্বাধীনভাবে শাসিত হত অর্থাৎ এই সময়ে আয়ারল্যান্ড বা ইংল্যান্ডে দ্বৈতবাদ (Duallism) ছিল না। রোমান ক্যাথলিক চার্চের ইংরেজ পোপ Pope Adrian IV ১১৫৫ সালে Laudabiliter নামে একটি অধ্যাদেশ (papal bull) জারি করেন যাতে আইন (Holy See) দেয়া হয় যে, ইংল্যান্ডের রাজা হেনরি-2 (Henry II of England) এর

আয়ারল্যান্ড শাসন করার অধিকার রয়েছে এবং তিনি যেন আয়ারল্যান্ডে অভিযান পরিচালনা করে আয়ারল্যান্ডের আধা-স্বায়ত্তশাসিত চার্চগুলোতে গ্রেগরিয়ান সংস্কার (Gregorian Reforms) কে বাস্তবায়ন করেন। গ্রেগরিয়ান সংস্কারের (Gregorian Reforms) মূলনীতি হচ্ছে ক্যাথোলিক চার্চের পোপের শ্রেষ্ঠত্বকে (Papal supremacy) প্রতিষ্ঠিত করা।

পোপের শ্রেষ্ঠত্ব (Papal Supremacy): পোপের শ্রেষ্ঠত্ব হল রোম ভিত্তিক ক্যাথলিক চার্চের মতবাদ যে, পোপ, খ্রীষ্টের ভাইসার (Vicar of Christ) হিসেবে তার পদের কারণে, বিশপ এবং বিশ্বস্তদের সমগ্র সংস্থার ঐক্যের দৃশ্যমান উৎস এবং ভিত্তি, এবং সমগ্র ক্যাথলিক চার্চের যাজক হিসেবে, সমগ্র গির্জার উপর পূর্ণ, সর্বোচ্চ এবং সর্বজনীন ক্ষমতা রাখেন, এমন একটি ক্ষমতা যা তিনি সর্বদা বাধা ছাড়াই প্রয়োগ করতে পারেন: সংক্ষেপে, "পোপ ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মার যত্নে সর্বোচ্চ, পূর্ণ, তাৎক্ষণিক এবং সর্বজনীন ক্ষমতা উপভোগ করেন।" গির্জা এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধা, রাজাদের কর্মকাণ্ড এবং এমনকি রাজাদের উত্তরাধিকারের মতো বিষয়গুলিতে এই মতবাদের তাৎপর্য ছিল।

এই পোপের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই রোমান ক্যাথলিক চার্চের ইংরেজ পোপ Pope Adrian IV ১১৫৫ সালে Laudabiliter নামে একটি অধ্যাদেশ (papal bull) জারি করেন যার উপর ভিত্তি করে ইংল্যান্ডের রাজারা আয়ারল্যান্ডে অভিযান পরিচালনা করেন এবং ‘Lordship’ of Ireland লাভ করেন। ফলে দ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় Papal State, Suzerainty, Suzerain State, Vassal State.

কনস্টানটাইনের মৃত্যুর পর থেকেই রোমান ক্যাথোলিক চার্চ ইতালিতে Papal State (পোপের রাজ্য) এর মালিক হতে থাকে। ১৪৫৩ সালে জুলকারনাইনের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবার পর Renaissance এর সময়, পোপের অঞ্চল (papal State) ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয় এবং পোপ ইতালির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাসকদের একজন এবং পশ্চিমা খ্রিস্টধর্মের প্রধান হয়ে ওঠেন। পোপের রাজ্যগুলির মধ্যে ছিল আধুনিক ইতালীয় অঞ্চল ল্যাজিও (যার মধ্যে রোম অন্তর্ভুক্ত), মার্চে, উম্ব্রিয়া, রোমাগনা এবং এমিলিয়ার কিছু অংশ জুড়ে ছিল। এই ভূখণ্ডগুলিতে পোপদের রাজত্ব ধর্মের ভিত্তিতে ছিল না বরং তা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ শাসক হিসেবে। ইতিহাসে প্রথম পোপের রাজ্য (Papal State) প্রতিষ্ঠিত হয় যখন ফ্রাঙ্ক রাজা পেপিন দি শর্ট (Pepin the Short) আরিয়ানিসমে (Arian) বিশ্বাসী খ্রিষ্টান লোমবার্ডদের (Lombards) জায়গা-জমি রোমান ক্যাথোলিক পোপ স্তিফেন -২ (Stephen-II) কে উপহার হিসেবে দান করেন এবং স্বাধীনভাবে পরিচালনার অধিকার দেন। এরপর থেকেই রোমান ক্যাথোলিক চার্চ, কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ার থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ক্যাথোলিক চার্চের সাথে অর্থোডক্স চার্চের ব্যাপক দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। সবশেষে ১০৫৪ সালে "গ্রেট স্কিজম" (East–West Schism / Great Schism) পশ্চিম ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের পূর্ব অর্থোডক্স চার্চ থেকে আলাদা করে দিয়েছিল। ১০৫৪ সাল থেকে রোমান ক্যাথোলিক চার্চের সাথে অর্থোডক্স চার্চের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপরেই ১১৬৯-১১৭১

সালে অ্যাংলো-নরমেনরা (Anglo-Norman invasion of Ireland) ক্যাথোলিক চার্চের ইংরেজ পোপ Pope Adrian IV এর ১১৫৫ সালে Laudabiliter নামে জারি করা অধ্যাদেশটির *(*papal bull) উপর ভিত্তি করে আয়ারল্যান্ডে অভিযান পরিচালনা করেন। ১১৭১ সালে ক্যাথোলিক পোপ আয়ারল্যান্ডের 'হাই কিং অফ আয়ারল্যান্ড' (High Kingship of Ireland) কে বিলুপ্ত করেন এবং আয়ারল্যান্ডের প্রাচীন রাজ্যগুলির অবমূল্যায়ন করেন। ১১৭১ সালে ইংল্যান্ডের হেনরি- ২ (Henry VIII) থেকে ১৫৪২ সালে হেনরি -৮ (Henry VIII) পর্যন্ত সকল ইংল্যান্ডের রাজারাই ''Lord' of Ireland' উপাধি গ্রহন করেন। এই সময়ে আয়ারল্যান্ড একটি Vassal রাষ্ট্রে পরিণত হয় আর ইংল্যান্ড পরিণত হয় Suzerain রাষ্ট্রে। বলা যায়, আয়ারল্যান্ড ইংল্যান্ডের অধীনে একটি উপরাষ্ট্রে পরিণত হয় যার শাসনকর্তা ইংল্যান্ডের রাজা নির্ধারণ করে দিতেন যার অধীনে আয়ারল্যান্ড স্বায়ত্তশাসন ভোগ করেছে। এই বইয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছিল যে, পোপের শ্রেষ্ঠত্ব (Papal Supremacy) এর বিরোধিতা করেই খ্রিষ্টান অর্থোডক্স চার্চ, ক্যাথোলিক চার্চ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, পোপের এই ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে ইতিহাসে প্রথম দ্বৈতবাদ ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের মধ্যে।

ক্যাথোলিক চার্চ থেকে উদ্‌ভূত কিছু কারণে ১৫৪২ সালে আয়ারল্যান্ডের পার্লামেন্ট "আয়ারল্যান্ডের রাজা (King of Ireland)" নামে একটি উপাধি তৈরি করেন যাতে ইংল্যান্ডের রাজবংশ যারা আগে ''Lord' of Ireland' উপাধিতে আয়ারল্যান্ডকে শাসন করে আসছিলেন তারা যেন আয়ারল্যান্ডকে শাসন করতে পারেন। এভাবে ১৫৪২ সালে ইংল্যান্ডের রাজা হেনরি-৮ (Henry VIII of England) ছিলেন জরাথুস্ট্রবাদের দ্বৈতবাদ (Dualism) ভিত্তিক এই অঘোষিত দ্বৈত রাজতন্ত্রের (Dual Monarchy) প্রথম রাজা। এটি মূলত ১১৭১ সাল থেকেই শুরু হয়। আমি আগে বলেছিলাম যে, কনস্টানটাইন/ জুলকারনাইন কনস্টান্টিনোপলে একটি জ্ঞানের প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন যা ইয়াজুজ-মাজুজকে অর্থাৎ তাদের জ্ঞানকে মানুষের মধ্যে প্রচার হবার পথে বাধা দিচ্ছিল। কনস্টান্টিনোপলে ছিল খ্রিস্টান অর্থোডক্স চার্চ যা ক্যাথোলিক চার্চের দ্বৈতবাদের মতাদর্শের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত। জাইনাব বিনতে জাহাস রাঃ থেকে বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যায় আমরা জেনেছিলাম, জুলকারনাইনের প্রাচীর ভেদ করে ধীরে ধীরে ইয়াজুজ-মাজুজের জ্ঞান সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ১৪৫৩ সালে জুলকারনাইনের প্রাচীর পুরোপুরি ভেঙ্গে যাবার আগেই ইয়াজুজ-মাজুজের জ্ঞান পৃথিবীতে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল যার শুরু হয় জাইনাব বিনতে জাহাসকে যেদিন আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছিলেন যে আজকে জুলকারনাইনের প্রাচীর এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। তারপর তিনি সাঃ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েও দিয়েছিলেন যে কতটুকু ছিদ্র হয়েছে। সেই ছিদ্র দিয়ে ইয়াজুজ-মাজুজের আল্লাহ বিরোধী জ্ঞান বের হতে হতে প্রতি শতাব্দীতে পৃথিবীতে জরাথুস্ট্রবাদের দ্বৈতবাদ (Dualism) ও যাদুর (বিজ্ঞানের) জ্ঞান ধীরে ধীরে পৃথিবীকে গ্রাস করে নিচ্ছিল। যার প্রমাণ আমরা Papal State, Suzerain State (England) , Vassal State (Ireland) এর মধ্যে পাই। ১৪৫৩ সালে জুলকারনাইনের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবার পর ১৫৪২ সালে Crown of Ireland Act 1542 এর মাধ্যমে দ্বৈতবাদ ভিত্তিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় যার

রাজবংশ এবং রাজা একই কিন্তু তিনি ২ টি পদবী গ্রহন করে ২ টি আলাদা রাজ্য (Monarch of England এবং King of Ireland) শাসন করতেন। এদিকে ১৬০৩ সাল থেকে Union of the Crowns এর মাধ্যমে একই রাজা James VI of Scotland যিনি ইংল্যান্ডের রাজবংশে James I নামে পরিচিত ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডকে শাসন শুরু করেন যেখানে উভয় রাজ্যের কিছু কার্যাবলী (যেমনঃ বৈদেশিক কূটনীতি) একত্রে করা হলেও অন্যান্য কাজগুলো আলাদাভাবে করা হত। এভাবে দ্বৈতবাদের উপর ভিত্তি করে British Empire প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আপনারা হয়তো দ্বৈতবাদ কি তা ভুলে গেছেন। দ্বৈতবাদ হচ্ছে ব্যক্তি বা সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানে বা সমাজে বা রাষ্ট্রে বা অনেকগুলো রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধী স্বার্থ বা মতাদর্শ বা বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তারা একত্রে সহাবস্থান করে। ব্রিটিশ এম্পায়ার বা ইউনাইটেড কিংডম সারা বিশ্বের বহু জায়গা দখল করে নিয়ে শোষণ, নির্যাতন যা করেছে তা সবার-ই জানা কারণ উপমহাদেশে তারা কি করেছে তা আমরা খুব ভালোভাবে জানি। বর্তমান বিশ্বতেও দ্বৈতবাদ ভিত্তিক এই রাষ্ট্র বিদ্যমান যার নাম ইউনাইটেড কিংডম (United Kigdom)। এছাড়া ভারত ও ভুটানের মধ্যে suzerainty, suzerain State and vassal state সম্পর্ক বিদ্যমান আছে। যেখানে ভারত ভুটানের সামরিক প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সরবরাহ এবং আকাশ প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে।

দ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আরও কিছু রাষ্ট্র কাঠামোর মতবাদঃ

Princely State: ভারতীয় উপমহাদেশে স্থানীয় রাজ্য যা ব্রিটিশ রাজ দ্বারা সরাসরি শাসিত না হয়ে স্থানীয় রাজা/ শাসক দ্বারা শাসিত হত। এদের ভিতরে suzerainty, suzerain State and vassal state এর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। পাকিস্তানের সাথে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভাওয়াল্‌পুর, খায়েরপুর, বালুচিস্থানের suzerain State and vassal state সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

অটোম্যান এম্পায়ারঃ অটোম্যান সাম্রাজ্যের সাথে নিম্নের রাজ্যগুলোর suzerain State and vassal state সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। যেমনঃ ১)সার্বিয়ার রাজত্ব; ২) সামোসের রাজত্ব ৩) ক্রিটান রাজ্য ৪) ক্রিমিয়ান খানাতে ৪) সেপ্টিনসুলার প্রজাতন্ত্র ৫) বুলগেরিয়ার রাজত্ব ৬) মলদোভা প্রজাতন্ত্র ৭) রাগুসা প্রজাতন্ত্র ৮) রোমানিয়ার রাজত্ব ৯) সার্বিয়ান স্বৈরশাসক ১০) ট্রান্সিলভেনিয়ার রাজত্ব ১১) উচ্চ হাঙ্গেরির রাজত্ব ১২) ওয়ালাচিয়ার রাজত্ব ১৩) মিশরের খেদিভেট ১৪) ত্রিপোলিটানিয়ার ভিলায়েত ১৫) তিউনিসিয়ার আইলেট ১৬) আলজিয়ার্সের রাজত্ব ১৭) মাউন্ট লেবাননের আমিরাত। জুলকারনাইনের প্রাচীর ভাঙ্গার পর অটোম্যান সম্রাটরা দ্বৈতবাদ (Dualism) গ্রহন করেছিল; suzerain State and vassal state – হচ্ছে দ্বৈতবাদ বা Dualism এর মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ।

দ্বিতীয়বার দাজ্জালের আবির্ভাব

আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন, দাজ্জাল যখন দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হবে তখন সে নিজেকে রব বলে দাবী করবে। এখন আমরা দাজ্জালের দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হবার ব্যাপারে জানব।

আবদুল্লাহ ইবনে বুসর থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "ভয়াবহ যুদ্ধ এবং মদীনা বিজয়ের মধ্যে ছয় বছর থাকবে এবং সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।" (হাদিস নং: ৪০৯৩, সুনান ইবনে মাজাহ। অধ্যায় ৩৯, ফিতনা সম্পর্কিত অধ্যায়)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে আমরা ভয়াবহ যুদ্ধ হিসেবে ধরতে পারি। কিন্তু বহু ইতিহাসবিদের মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়েছে বলকান যুদ্ধের মাধ্যমে। তাছাড়া প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে মুসলিমরা যুদ্ধের প্রথম সারিতে ছিল না বা তারা এই যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা রাখেনি। বলকান যুদ্ধ- ই হচ্ছে মুসলিমদের জন্য ভয়াবহ যুদ্ধ কারণ এই যুদ্ধে বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, গ্রিস, মনটিনিগ্রো একত্রে অটোম্যান এম্পায়ারের (উসমানীয় খেলাফতের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে অটোম্যানরা পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে অটোম্যানরা তাদের অধীনে থাকা ইউরোপের ৮৩ % জায়গা হারায়। এই যুদ্ধটি ৩০শে মে ১৯১৩ সালে শেষ হয়। অটোম্যানদের থেকে শরীফ হুসেইন বিন আলী আল হাশেমি মদিনা বিজয় করেন ৯ জানুয়ারী ১৯১৯ সালে। মাঝে সময় প্রায় ৫ বছর ৭ মাস ১ দিন। বলকানের প্রথম যুদ্ধে মনটিনিগ্রো একটি তারিখে, বুলগেরিয়া আরেক তারিখে, গ্রিস আরেক তারিখে এবং সার্বিয়া আরেক তারিখে প্রবেশ করে। ফলে এই যুদ্ধের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে যুদ্ধ শুরুর তারিখ বলা সম্ভব নয় তাই যুদ্ধ শেষের তারিখ ধরা হয়েছে। চিন্তা করে দেখুন, মুহাম্মাদ সাঃ ১৪০০ বছর আগে বলে গেছেন যে, ভয়াবহ যুদ্ধ ও মদিনা বিজয়ের মধ্যে ৬ বছর থাকবে, অর্থাৎ তিনি নির্দিষ্ট করে একটি তারিখ বা বছর উল্লেখ করেন নি। তিনি বলেছেন যে, বড় যুদ্ধ ও মদিনা বিজয়ের মধ্যে ৬ টি বছর থাকবে অর্থাৎ সময় ৬ বছরের বেশি হবে না। বলকানের প্রথম যুদ্ধ ও মদিনা বিজয়ের মধ্যে সময় ৫ বছর ৭ মাস ১ দিন। সপ্তম বছরে দাজ্জাল আবির্ভূত হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন মিত্র শক্তির (মূলত ব্রিটেনের) কাছে অটোম্যান এম্পায়ারের (ওসমানীয় খেলাফত) পরাজয় যখন নিশ্চিত হয়ে গেলো এবং তুরস্ককে ব্রিটেন নিজেদের অধীনস্ত করার সম্ভাবনা দেখা দিল তখন মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক (Mustafa Kemal Ataturk) যিনি কামাল পাশা নামেও পরিচিত তিনি অটোম্যান সুলতান এবং ব্রিটিশসহ মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীন তুরস্ক রক্ষায় অগ্রণী ভুমিকা রাখেন। তিনি সেকুলার (secular), ধর্ম নিরপেক্ষ অটোম্যান খেলাফত মুক্ত, জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তুরস্কের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন যার পটভূমি বা সূচনা হয় ২২ শে জুন,১৯১৯ সালের আমাশা সার্কুলারের (Amasya Circular) মাধ্যমে যাতে বলা হয় যে, 'জাতির স্বাধীনতা হুমকির মুখে'। বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা যেন Erzurum নামের একটি শহরে ১০ জুলাই, ১৯১৯ সালে মিলিত হন এবং Erzurum Congress এ যোগদান করেন। ২৩ জুলাই, ১৯১৯ থেকে ৪ অগাস্ট,১৯১৯ পর্যন্ত Erzurum Congress অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৭ই অগাস্ট, ১৯১৯ সালে বিভিন্ন বিষয়ে একটি

খসড়া জাতীয় চুক্তি (National Pact) সম্পাদিত হয় এবং কামাল আতাতুর্ককে প্রেসিডেন্ট করে একটি প্রতিনিধি কমিটি ("representative committee") করা হয়।

Erzurum Congress হচ্ছে তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের (Turkish War of Independence) প্রতিনিধিদের প্রথম সভা। এই সভা থেকে যে খসড়া জাতীয় চুক্তি (National Pact) সম্পাদিত হয় তা ছিল মূলত উসমানীয় খেলাফত (অটোম্যান এম্পায়ার) থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা। এই কংগ্রেস থেকেই এটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, ধর্মনিরপেক্ষ নতুন রাষ্ট্র তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হবেন মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক।

এই কংগ্রেস থেকেই তুর্কি জাতীয়তাবাদকে স্বীকৃতি এবং প্রতিষ্ঠা দেয়া হয় এবং এর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তিতে রিপাবলিক অফ টার্কি (Republic of Turkey) নামে জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, একটি সেকুলার, ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জন্ম হয় যার প্রেসিডেন্ট হন মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক।

Erzurum Congress এ খসড়া জাতীয় চুক্তি (National Pact) এর রেসুলুশেনের বা ইশতিহারের ধারা তিনে বলা হয়েছে, “(আমাদের) লক্ষ্য হলো জাতীয় শক্তিগুলিকে একটি শাসক উপাদানে একত্রিত করা এবং জাতির ইচ্ছাকে সার্বভৌম শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা” (ইস্তিহারের ধারা ৩) ।

বলকানের প্রথম যুদ্ধ শেষ হয় ৩০ মে, ১৯১৩ সালে আর Erzurum Congress এ খসড়া জাতীয় চুক্তি (National Pact) সম্পাদন করার পর কামাল আতাতুর্ককে প্রেসিডেন্ট করে ১৭ অগাস্ট,১৯১৯ সালে একটি প্রতিনিধি কমিটি ("representative committee") করা হয়। মাঝে সময় ৬ বছর ২ মাস ১৮ দিন। অর্থাৎ সপ্তম বছরে মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক তার জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম নিরপেক্ষ সেকুলার মতাদর্শ নিয়ে দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়। বর্তমানে এই ভাবধারার অর্থাৎ যে সকল মুসলিম দেশের সংবিধানে জাতির ইচ্ছাকে সার্বভৌম শক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বা জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে বা আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষকে আইনদাতা (সংসদ সদস্যদেরকে আইনদাতা) বলে মেনে নেয়া হয়েছে – এই সব দেশের সরকার প্রধানরা সবাই দাজ্জাল যারা নিজেদেরকে ‘আইনদাতা’ বা ‘আইন প্রণেতা’ বলে দাবী করার মাধ্যমে নিজেদেরকে আসলে ‘রব’ বলেই দাবী করছে। কারণ ইসলামের মূল একটি কথা হচ্ছে, আইন দেয়ার ক্ষমতা এবং অধিকার একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এর। যে কেউ নিজেকে ‘আইনদাতা’ বলে দাবী করবে সে আসলে নিজেকে ‘রব’ বলেই দাবী করছে।

মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন, “………………হে আল্লাহর বান্দারা, অবিচল থাকো। আমি তোমাদের কাছে তার (দাজ্জালের) বর্ণনা এমনভাবে দেব যা আমার আগে কোনো নবী তাকে বর্ণনা করেননি। সে (দাজ্জাল) এই বলে শুরু করবে "আমি একজন নবী," কিন্তু আমার (মুহাম্মাদ সাঃ) পরে আর কোন নবী নেই। তারপর দ্বিতীয়বার সে

বলবে: "আমি তোমাদের রব।" কিন্তু তুমি তোমার রবকে তোমার মৃত্যুর আগে দেখতে পাবে না। ……………………………….।” (সুনান ইবনে মাজাহ ৪০৭৭)

দাজ্জাল প্রথমবার আবির্ভূত হয়ে নিজেকে নবী বলে দাবী করেছে এবং দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হয়ে দাজ্জাল নিজেকে ‘রব’ বলে দাবী করেছে এবং এই ধারা এখনো চলমান আছে। ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ; আইন দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। যদি কেউ নিজেকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে দাবী করে বা নিজেকে ‘আইনদাতা’ বা ‘আইন প্রণেতা’ বলে দাবী করে বা আইন দেয় তাহলে ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী সে নিজেকে ‘রব’ বলেই দাবী করছে। এটি একটি বড় শিরক। এই কাজ যে করবে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে কাফির হয়ে যাবে।

সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে কি বুঝায়? সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে বুঝায়, যে কারো মুখাপেক্ষী নয়, যে কারো অধীন নয়। সূরা ইখলাসের ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, আল্লাহ কারো অধীন নন। এখন যে বা যারা দাবী করবে যে, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ বা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক রাষ্ট্র তাহলে সে বা তারা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হবার ক্ষেত্রে জনগণকে বা রাষ্ট্রকে আল্লাহ এর সমান বলে দাবী করল। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে বা জনগণকে ‘রব’ বলে দাবী করল। এটি একটি বড় শিরক। এই কাজ যে করবে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে মুশরিক (কাফির) হয়ে যাবে।

যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আইনদাতা বলে মানবে বা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে মানবে সে আল্লাহ এর সাথে বড় শিরক করল। তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে কাফির হয়ে যাবে। সমাজে তারা নামায পড়ে, রোজা রাখে, ঈদ উদযাপন করে এবং সমাজ তাদেরকে মুসলিম বলে স্বীকৃতি দেয় কিন্তু প্রকৃত অর্থে সে মুশরিক। এরাই হচ্ছে দাজ্জালের অনুসারী। এদের মধ্যে সত্য মিথ্যার সংমিশ্রণ আছে। এরা একদিকে শিরক করছে, শিরককে প্রতিষ্ঠিত করতে কাজ করছে অপরদিকে নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করছে এবং নামায পড়ছে, রোজা রাখছে, হাজ্জ করছে। এখন চিন্তা করে দেখুন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন করলে বা ভোট দিলে আপনার ঈমান কি থাকবে?

এখন আমরা জানতে চেষ্টা করি, মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক আসলে কে?

কামাল আতাতুর্কের পূর্বপুরুষ ইহুদী ‘দোন্মে’ (Dönme/Donmeh) ছিল বলে অনেকে দাবী করেছেন। ‘দোন্মে’ হচ্ছে সাব্বাতীয় ক্রিপ্টো-ইহুদি (Sabbatean Crypto-Jews)। এর মানে হচ্ছে এরা বাহিরে ইসলাম গ্রহন করে মুসলিম হলেও অন্তরের দিক থেকে এবং গোপনে তারা ইহুদী ধর্মই পালন করত। তারা নিজেদের মধ্যেই বিয়ে-শাদি এবং অন্যান্য সামাজিক মেলা-মেশা করত। দোন্মে (Dōnme) ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের সাব্বাতীয় ক্রিপ্টো-ইহুদিদের একটি দল যাদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল, কিন্তু গোপনে তারা তাদের ইহুদি বিশ্বাস

এবং কাব্বালিস্টিক বিশ্বাস (Kabbalistic beliefs) ধরে রেখেছিল। এই আন্দোলনটি মূলত থেসালোনিকি শহরকে (Thessaloniki) কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এই শহরে প্রচুর ইহুদীরা বসবাস করত। এটি ১৭ শতকের সেফার্ডিক ইহুদি রাব্বি (Sephardic Jewish Rabbi) এবং কাব্বালিস্ট 'সাব্বাতাই জেভির' (Sabbatai Zevi) যুগে এবং তারপরেই উদ্‌ভূত হয়েছিল, যে নিজেকে 'ইহুদি মাসিহ' বলে দাবি করেছিল এবং অবশেষে সুলতান চতুর্থ মেহমেদের হত্যার হুমকির মুখে ইসলামে ধর্মান্তরের ভান করেছিল। জেভির জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণের পর, বেশ কয়েকজন সাব্বাতীয় ইহুদি কথিতভাবে ইসলাম গ্রহণ করে এবং দোন্মেতে পরিণত হয়। কিছু সাব্বাতীয় একবিংশ শতাব্দীর তুরস্কে দোন্মের বংশধর হিসেবে বসবাস করত। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক বাহিরে মুসলিম হলেও হয়তো সে গোপনে ও অন্তরের দিক থেকে ইহুদী ছিল। ইতিপূর্বে বুঝেছিলাম যে, দাজ্জাল সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হবে এবং সে মুসলিমদের শাসক বা সরকার প্রধান বা খলিফা হবে। দাজ্জাল ইসলামের ভিতরে শিরককে মিশ্রিত করে সেটাকেই মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম বলে প্রচার করবে। যেমনঃ গণত্রান্ত্রিক ইসলাম বা ইসলামিক গনতন্ত্র। পৃথিবীতে দাজ্জাল এখন সেকুলার বা ধর্মহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে বিচরণ করছে। পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রের গনত্রান্ত্রিক, সমাজত্রান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক , একনায়কত্রান্ত্রিক সরকারের সরকার প্রধান হচ্ছেন দাজ্জাল অর্থাৎ মুসলিম প্রধান দেশগুলোকে যদি কোন সরকার প্রধান মুহাম্মাদ সাঃ এর আনিত ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন করে তাহলে সেই সরকার প্রধান হচ্ছেন দাজ্জাল।

দাজ্জাল প্রথমবার যে সুফিজম বা পীরতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে আবির্ভূত হয়ে নিজেকে নবী বলে দাবী করেছিল তা কিন্তু এখনো মুসলিম সমাজে রয়ে গেছে তবে মুসলিম সরকারের মধ্যে এখন আর সুফিবাদের বা পীরতন্ত্রের আগের মত প্রভাব নেই; কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রের সরকারগুলো এখনো সুফিবাদকে বা পীরতন্ত্রকে ইসলাম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই হিসাবে বিবেচনা করলে, ১৪৫৩ সালে যেই দাজ্জাল আবির্ভূত হয়েছিল তারচেয়ে বর্তমানে দাজ্জাল আরও বেশি বিভ্রান্তিকর ধারণা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে কারণ এখন দাজ্জাল সুফিবাদ বা পিরতন্ত্র এবং গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ,বহুত্ববাদ, ইত্যাদি মতাদর্শ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে; এই সকল শিরক এবং কুফর মিশ্রিত বিকৃত ইসলামকে এখন ইসলাম বলে প্রচার করা হচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে এই শিরক ও কুফর মিশ্রিত ইসলামকে ইসলাম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে – এজন্যই এই মুসলিম সরকারগুলোর সরকার প্রধান হচ্ছেন দাজ্জাল এবং তার সহযোগিরা (সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তার দলের লোক) হচ্ছে দাজ্জালের বাহিনী আর যারা তাকে মেনে নিচ্ছে তারা হচ্ছে দাজ্জালের অনুসারী; যেমনঃ জনগণের মধ্যে যারা সুফিজম বা গণতন্ত্র মানে।

এখন দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিজেকে রক্ষা করা আগের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে সুফিজম বা পীরতন্ত্রের সাথে সেকুলার বা গনত্রান্ত্রিক মুসলিম দেশগুলোর প্রশাসন ও সরকার প্রধানের

মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব দেখা যায়। এরা একে অপরের সিস্টেমের বিরুদ্ধে কখনো কিছু বলে না বরং একে অপরকে সহযোগিতা করে।

আরব অঞ্চলে দাজ্জালের আবির্ভাব

এখন আমরা একই হাদিস বিশ্লেষণ করে অন্য একটি দাজ্জাল সম্পর্কে জানব।

আবদুল্লাহ ইবনে বুসর থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "ভয়াবহ যুদ্ধ এবং মদীনা বিজয়ের মধ্যে ছয় বছর থাকবে এবং সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।" (হাদিস নং: ৪০৯৩, সুনান ইবনে মাজাহ। অধ্যায় ৩৯, ফিতনা সম্পর্কিত অধ্যায়)

পশ্চিমা ইতিহাসবিদদের মতে, আরব রিভল্ট (Arab Revolt) ১৯১৬ সালে শুরু হয়ে ১৯১৮ সালে শেষ হলেও ১৯১৮ সালের শুরু থেকে চরম যুদ্ধ শুরু হয়। এই সময়ে আরব অঞ্চলে যতগুলো খণ্ড-খণ্ড যুদ্ধ হয় সেগুলোর প্রায় প্রতিটিতে ব্রিটিশ এবং আরবদের যৌথ বাহিনীর সাথে অটোম্যানদের যুদ্ধ হয়। কিন্তু একটি যুদ্ধ ছাড়া যেটাতে ব্রিটিশদের কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না। এই যুদ্ধটি হচ্ছে ১৯১৮ সালের এপ্রিলে হওয়া অটোম্যান গ্যারিসন 'মান' (Ottoman garrison at Ma'an) দখলের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আরব মুসলিমদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন জাফার আল আসকারি (Ja'far Pasha al-Askari) এবং নুরী আল সাইদ (Nuri Pasha al-Said Al-Qaraghuli). যুদ্ধে অটোম্যানরা পরাজিত হয় এবং সেপ্টেম্বর, ১৯১৮ পর্যন্ত আরবরা তাদের অবস্থান ধরে রাখে। আমরা যদি ধরে নেই যে, মদিনা ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে অটোম্যান মুক্ত হলেও ১৯২৪ সালের মার্চ মাসের আগে তা খেলাফতের অধীনে আসেনি কারণ তখন কোন খলিফা ছিল না; তাই মদিনা পরিপূর্ণভাবে বিজয় হয় সেদিন যেদিন মদিনা খেলাফতের অধীনে আসে। হুসেইন বিন আলী আল হাশেমি ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে খলিফা হিসেবে দায়িত্ব নেন। তাহলে ভয়াবহ যুদ্ধ (arab revolt) এবং মদিনা বিজয়ের মাঝে সময় দাড়ায় - এপ্রিল,১৯১৮ থেকে মার্চ, ১৯২৪ = ৫ বছর ১১ মাসের মত। অর্থাৎ ভয়াবহ যুদ্ধ এবং মদিনা বিজয়ের মধ্যে ৬ বছর আছে। সপ্তম বছরে দাজ্জাল আবির্ভূত হয়েছে।

৫ই জুন,১৯২৪ সালে রিয়াদে (বর্তমান সৌদি আরবের রাজধানী) সেই অঞ্চলের ইবনে সউদের সমর্থক প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ইবনে সউদকে, হুসেইন বিন আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বলেন। হুসেইন বিন আলী কেন নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং বায়াত নিয়েছেন এই অপরাধে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ! অথচ আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি যে, সারা বিশ্বের সকল কোনার মুসলিমরা হুসেইন বিন আলী আল হাশিমিকে খলিফা হিসেবে বায়াত দিয়েছিল। শুধু ইবনে সউদ এবং তার সমর্থকরা হুসেইন বিন আলীকে বায়াত দেয়নি। সম্ভবত, যুদ্ধ ঘোষণার এই সংবাদ হুসেইন বিন আলীর নিকট চলে গিয়েছিল ফলে সেই বছর ইবনে সাউদের সমর্থক নজদের কাউকেই হাজ্জ করতে হেজাজে ঢুকতে দেয়া হয়নি। ইবনে সউদের মূল সমর্থক ছিল

'ওয়াহাবি' মতাদর্শের অনুসারীরা ('Wahhabism') এবং তাদের মিলিশিয়া গ্রুপ 'ইখওয়ান' (Ikhwan)। এদের কেউই হুসেইন বিন আলীকে খলিফা হিসেবে বায়াত দেয়নি। ১৯২৪ সালের ২৯ শে অগাস্ট, ইবনে সউদ এবং ইখওয়ানরা হেজাজে আক্রমণের প্রথম ধাপে তায়েফ বিজয় করেন। ১৩ই অক্টোবর, ১৯২৪ সালে ইবনে সউদ, ইখওয়ানদের সহযোগিতায় মক্কা বিজয় করে। খলিফা হুসেইন বিন আলী নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করায় এবং বায়াত নেয়ায় এবং ব্রিটিশদের বার বার অনুরোধ ও অর্থের প্রলোভন সত্ত্বেও বেলফোর ডেক্লারেশন (Balfour Declaration) মেনে না নেয়ায় ব্রিটিশরা ইবনে সউদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য না করে বরং ইবনে সউদকে অস্ত্র, অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে; ফলে প্রায় বিনা বাঁধায় ইবনে সউদ তায়েফ এবং মক্কা বিজয় করে নেন এবং পরবর্তীতে Kingdom of Najd and Hejaz প্রতিষ্ঠা করে। তাহলে ভয়াবহ যুদ্ধ (arab revolt) এবং ইবনে সউদের হেজাজ আক্রমণ করে মক্কা বিজয়ের মাঝে সময় দাড়ায় - এপ্রিল,১৯১৮ থেকে ১৩ অক্টোবর, ১৯২৪ = ৬ বছর ৫ মাসের মত। অর্থাৎ বড় যুদ্ধের সপ্তম বছরে দাজ্জাল হিসেবে ইবনে সউদ আবির্ভূত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, মদিনা, জেদ্দা এবং ইয়ানবুর মুসলিমরা নিজেরা সেনাদল গঠন করে 'ওয়াহাবি' মতাদর্শ ভিত্তিক ইবনে সউদ এবং ইখওয়ানকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করলেও তারা ব্যর্থ হয়। ইবনে সউদ –ই হচ্ছে বর্তমান সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা এবং আল-সউদ রাজবংশের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই রাজবংশ- ই সৌদি আরবকে ১৯২৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত শাসন করে আসছে। যতটুকু বুঝা যায়, ইবনে সউদকে ব্রিটিশদের সহযোগিতা করার পিছনে মূল কারণ এটা হতে পারে যে, ইবনে সউদ কখনো নিজেকে খলিফা দাবী করবে না বা খেলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করবে না এবং প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিয়েও বেশি মাথা ঘামাবে না – প্রকারন্তরে ইবনে সউদ হয়তো গোপনে বেলফোর ডেক্লারেশন (Balfour Declaration) মেনেই নিয়েছিল। এর আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায়, ১৯৪৮ সালের আরব- ইসরায়েল যুদ্ধে (1948 Arab–Israeli War); এই যুদ্ধটি ইসরায়েল নামক ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মিশর, জর্ডান, ইত্যাদি দেশ হাজার হাজার সৈন্য পাঠালেও সৌদি আরব মাত্র কয়েক'শ যোদ্ধা পাঠায় তাও আবার এরা ছিল ভলান্টিয়ার যোদ্ধা ! অর্থাৎ এই যুদ্ধে সৌদি আরব অংশগ্রহন করেনি বললেই চলে।

১৯২৫ সাল থেকেই ইখওয়ানদের সাথে ইবনে সউদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ইখওয়ানরা পশ্চিমা টেকনোলজি ও পশ্চিমাদের আরব অঞ্চলে আধিপত্য মানছিল না। তারা ফ্রেঞ্চ এবং ব্রিটিশদের অধীনে থাকা আরব ভূখণ্ড বিজয় করতে চাচ্ছিল কিন্তু ইবনে সউদ কোনভাবেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যেতে চাইছিল না। ইবনে সউদ তার অর্জিত ভূখণ্ড ও রাজত্ব নিয়েই খুশি ছিল। ওয়াহাবি ওলামা ও আলেমরা ইবনে সউদের পক্ষে মতামত দেয় যে, সরকার প্রধানের অনুমতি ছাড়া যুদ্ধ করা যাবে না। এভাবে 'ওয়াহাবি' আলেম-ওলামারাও তাদেরই যোদ্ধা বাহিনী ইখওয়ানদের থেকে সরে যায়। ১৯২৯ সালে Battle of Sabilla এবং Battle of Jabal Shammar এ ইবনে সউদ ব্রিটিশদের সহযোগিতায় ইখওয়ানদের পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন করে এবং অবশিষ্ট ইখওয়ানদের নিজের সেনাবাহিনীতে নিয়ে নেয়।

যেহেতু পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, দাজ্জাল যখন আসবে তখন সে ইসলামের ভিতরে নতুন কিছুকে মিশ্রিত করে ইসলামকে বিকৃত করবে এবং সেই বিকৃত ইসলামকে মানুষের কাছে মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম বলে প্রচার করে মুসলিমদেরকে এবং মানুষকে ধোঁকা দিবে। সুতরাং, ইবনে সউদ যখন দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল সেও ইসলামকে বিকৃত করেছে। ইবনে সউদ ইসলামের ভিতরে 'ওয়াহাবি' মতাদর্শ নিয়ে এসেছে। এখন আমরা 'ওয়াহাবি' মতাদর্শ সম্পর্কে জানব।

মুওয়াহহিদুন (Muwahhidun) / 'ওয়াহাবি' ('Wahhabism') / সালাফি (Salafi) / আহলে হাদিস (Ahl-e-Hadith): ১৮ শতকের দিকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল আল –ওয়াহাব (Muhammad ibn Abd al-Wahhab) নামের একজন হাম্বলি মাজহাবের অনুসারী আলেম মুসলিমদের মধ্যে ইসলামের মূলধারা থেকে বিচ্যুতদেরকে কোরআন ও হাদিসের বর্ণিত পথে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তারা সকল ধরণের পীর তন্ত্র, সুফিবাদ মুক্ত ইসলামের দিকে মানুষকে আহবান করেন। তারা মাজার ধ্বংস করেন। কোরআন এবং সাহিহ হাদিসের উপর ভিত্তি করে তারা ইযতিহাদকে (Ijtihad) প্রাধান্য দেন এবং হানাফি মাজহাবের অন্যতম ভিত্তি তাকলিদকে (Taqlid) অস্বীকার করেন। তারা নিজেদেরকে মুওয়াহহিদুন (Muwahhidun) নামে অভিহিত করলেও, যারা তাদের বিরোধিতা করতেন তারা এই দলটিকে 'ওয়াহাবি' নামে অভিহিত করেন। যেহেতু তারা নিজেদেরকে মুসলিমদের প্রথম ৩ টি যুগের মুসলিমদের অনুসারী বলে দাবী করেন তাই তাদের অনেকে নিজেদেরকে সালাফি নামেও অভিহিত করেন। উপমহাদেশে 'আহলে হাদিস' নামের দলটিকে মুওয়াহহিদুন (Muwahhidun) এর উপমহাদেশীয় সংস্করণ বা উপমহাদেশীয় শাখা বলা যেতে পারে।

১৭৪৪ সালে, ইবনে আব্দুল আল- ওয়াহাব স্থানীয় নেতা মুহাম্মদ বিন সৌদের (Muhammad bin Saud Al Muqrin Al Saud, বর্তমান সৌদি রাজপরিবারের পূর্বপুরুষ) সাথে একটি চুক্তি করেন, যার মাধ্যমে সৌদি রাজতন্ত্রের সাথে একটি রাজনৈতিক-ধর্মীয় জোট প্রতিষ্ঠা করা হয় যা ২৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে স্থায়ী হচ্ছে। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল আল –ওয়াহাবের এই মতাদর্শটি মূলত সুন্নি মতাদর্শ থেকে আলাদা নতুন কিছু ছিল না বরং এটি ছিল একটি রাজনৈতিক আন্দোলন বা উদ্যোগ যাকে কাজে লাগিয়ে আল –সউদ রাজপরিবার আরব ভূখণ্ডে নিজেদের স্থান পাকা করেছে। হুসেইন বিন আলীকে ইবনে সউদের পরাজিত করার পিছনে বড় ভুমিকা রেখেছে সালাফি/ মুওয়াহহিদুনদের যোদ্ধা দল ইখওয়ান। তারপর এই সালাফি/ মুওয়াহহিদুনদের আলেমদের কাজে লাগিয়ে ইবনে সউদ ইখওয়ানদের দমন করেছে এবং যুদ্ধ করে নিশ্চিহ্ন করেছে। সালাফি/ মুওয়াহহিদুনদের আলেমরা কখনো খেলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠার দাবী জানায়নি বরং তারা সৌদি রাজপরিবারের কর্মকাণ্ডকে না না ভাবে সহযোগিতা ও সমর্থন করেছে; বিনিময়ে সৌদি রাজপরিবার তাদেরকে প্রচুর টাকা-পয়সা, বিলাসী জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এভাবে ইসলাম থেকে খেলাফতকে বাদ দিয়ে তার জায়গায় রাজতন্ত্রকে ঢুকিয়েছে সালাফি ও ইবনে সউদ রাজপরিবার। গত ১০০ বছর ধরে মক্কা, মদিনা সহ পুরো সৌদি আরবে খেলাফতের বদলে রাজতন্ত্র দ্বারা মুসলিমরা শাসিত হচ্ছে। মুওয়াহহিদুন বা সালাফি আলেমদের ধর্মীয়

ভিত্তি ও সমর্থন পাওয়ার কারণে আল- সউদ রাজপরিবার খেলাফত ছাড়াই মুসলিমদের উপর শাসন করতে পারছে। এভাবে মুওয়াহহিদুন আলেমদের সহযোগিতায় ইবনে সউদ বিকৃত ইসলামকে ইসলাম বলে মানুষের কাছে প্রচার করেছে।
উপমহাদেশে আহলে হাদিস দলটিকে প্রতিষ্ঠার জন্য আল সউদ রাজপরিবার প্রচুর অর্থ সম্পদ ব্যয় করেছে। আহলে হাদিস নামের দলটিকে এখনো আল সউদ রাজ পরিবার থেকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা হয় – এই দলটির কার্যক্রম দেখলেই বুঝা যায় যে, এরা পরিপূর্ণ ইসলাম প্রচার করে না- বরং ইসলামকে কাটছাঁট করে বিকৃত ইসলামকে প্রচার করে। সালাফি/ মুওয়াহহিদুনদের একটি বড় ত্রুটি হচ্ছে এরা এদের সাথে মতের অমিল হলেই একজন মুসলিমকে কাফির ফতোয়া দিয়ে দিত। ১৯২৪ সালে যখন ইবনে সাউদের পক্ষে ইখওয়ান যখন হুসেইন ইবনে আলীকে উৎখাত করে তখন হুসেইন ইবনে আলী চলে যাবার পরও মদিনার মুসলিমরা নিজেরা সৈন্য বাহিনী তৈরি করে সালাফি/ মুওয়াহহিদুনদের প্রতিহত করতে চেষ্টা করেছিল কারণ তাদের মতে সালাফি/ মুওয়াহহিদুন হচ্ছে কট্টর, চরমপন্থী যারা খুব সহজেই একজন মুসলিমকে কাফির (তাকফির/ Takfir) ঘোষণা করে দেয়। সালাফি/ মুওয়াহহিদুনদের আরেকটি সমালোচনা হচ্ছে, তারা কোরআন এবং হাদিসকে আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করে এবং গ্রহন করে কিন্তু কোরআন, হাদিসের প্রতীকী অর্থকে বর্জন করে। এ জন্যই হয়তো তাদের আলেমরা দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ ও শেষ জমানা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ হাদিসগুলোকে যইফ হাদিস বলে তালিকাভুক্ত করেছে এবং শেষ জমানা সম্পর্কিত হাদিসগুলোকে মোটেই ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

অন্যদিকে হানাফি মাজহাবসহ সুন্নিদের একটি বড় ত্রুটি হচ্ছে এরা তাকলিদে বিশ্বাসী – অর্থাৎ কোন আলেমের মতামতকে তারা অন্ধভাবে মেনে চলে এবং তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইসলামের নিয়ম- কানুন মেনে চলে বলে দাবী করে।
যাই হোক, সালাফি/ মুওয়াহহিদুন আলেমরা গত ১০০ বছর ধরে সৌদি রাজপরিবারের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে বেবহ্রিত হয়েছে। সৌদি সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের (বর্তমান রাশিয়া) বিরোধিতা করলে সালাফি/ মুওয়াহহিদুন আলেমরাও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করেছে আবার সৌদি সরকার আমেরিকার পক্ষে থাকলে সালাফি/ মুওয়াহহিদুন আলেমরাও আমেরিকার পক্ষে কথা বলেছে। তাদের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে এরা হচ্ছে সুবিধাবাদী 'আলেম'। তারা কখনো খেলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠার দাবী তোলেনি।

আমি এই বইয়ে পূর্বে বলেছি যে, ভয়াবহ যুদ্ধ বা বড় যুদ্ধ হচ্ছে সেই সব যুদ্ধ যে যুদ্ধের পর থেকে যুদ্ধের ধরণ পাল্টে যায়। আরব রিভোল্ট যদিও মানব ইতিহাসে অন্যান্য অনেক বড় যুদ্ধের তুলনায় ছোট যুদ্ধ বলে মনে হতে পারে কিন্তু এই যুদ্ধের পরও যুদ্ধের ধরণ বা যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম পাল্টে গিয়েছিল। ১৯১৪ সালে আরব রিভোল্ট শুরু হয়ে ১৯২৯ সালের সাবিলার যুদ্ধেই (Battle of Sabilla) আরব অঞ্চলে যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বশেষ উটের ব্যাবহার হয়। এরপর আরব অঞ্চলের যুদ্ধে আর কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে উটের ব্যবহার হয় নি। ইঞ্জিন চালিত গাড়ি, মটর

সাইকেল উটের জায়গা নিয়ে নিয়েছে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, ইসলামের ভিতরে মুওয়াহহিদুন বা সালাফি নামের রাজনৈতিক মতাদর্শের মিশ্রণ করে ইবনে সউদ খেলাফতের বদলে নিজের রাজত্বকে মজবুত করেছেন এবং গত ১০০ বছর ধরে সৌদি আরবকে শাসন করে যাচ্ছেন। তবে বর্তমান ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন সালমান 'সালাফি' বা 'মুওয়াহহিদুনকে' বাদ দিয়ে জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দিচ্ছেন ফলে ইবনে আব্দুল আল- ওয়াহাব ও সউদ পরিবারের পূর্ব পুরুষ মুহাম্মদ বিন সৌদের (Muhammad bin Saud Al Muqrin Al Saud,) মধ্যে ১৭৪৪ সালে হওয়া ধর্মীয় - রাজনৈতিক চুক্তিটি এখন কার্যকারিতা হারাচ্ছে।

মূলত সালাফি বা মুওয়াহহিদুনকে ব্যাবহার করে আল –সউদ রাজপরিবার গত ১০০ বছর ধরে তাদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করেছে। খেলাফতকে গুরুত্বহীন করে ইসলামকে বিকৃত করা হয়েছে এবং সেই বিকৃত ইসলামকে ইবনে সউদ ও তার পরিবারের অন্য সৌদি বাদশাহরা এতদিন প্রচার করেছে। এটাই হচ্ছে দাজ্জালের আবির্ভাব। আমি জানি, সালাফি বা মুওয়াহহিদুন মতাদর্শে বিশ্বাসী অনেক বিশ্ব বিখ্যাত আলেম আছেন; ঠিক তেমনিভাবে সুফিবাদে বা পীরতন্ত্রে বিশ্বাসী বিশ্ব বিখ্যাত অনেক আলেম আছেন। আমি এই বইটি সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্বহীনভাবে লিখেছি। আমি ইতিহাস, হাদিস বিশ্লেষণ করে যা পাচ্ছি, তাই লিখেছি। আমি এই দাবী করি না যে, আমার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ সঠিক; তবে আমি এই আশা করি যে, আমার বইটি শেষ জমানার বিভিন্ন অবস্থা বুঝতে পাঠকের কাজে লাগবে।

দাজ্জাল হিসেবে ইহুদীর আবির্ভাব

আবদুল্লাহ বিন বুসর বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, "মহাযুদ্ধ এবং শহর (The City) বিজয়ের মধ্যে সময়কাল হবে ছয় বছর, এবং সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।" (মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৪২৬)

(*আমার মতে, দাজ্জাল আবির্ভূত হওয়া সংক্রান্ত হাদিসগুলো আমাদের জন্য বিভিন্ন দাজ্জালকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সূত্র বা Clue হিসেবে কাজে লাগবে। দাজ্জাল আবির্ভূত হওয়া সম্পর্কিত তিনটি হাদিস আমি পেয়েছি। একবার দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সাথে, আরেকবার মদিনা বিজয়ের সাথে, আরেকবার শহর বিজয়ের সাথে।)

মিশকাত আল- মাসাবিহ ৫৪২৬ নাম্বার হাদিসে উল্লেখিত শহরটিকে অনেকেই মদিনা বলে ব্যাখ্যা করেছেন যেহেতু প্রায় অনুরূপ একটি হাদিসও আছে। কিন্তু আমি মনে করি, মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৪২৬ নাম্বার হাদিসে শহর বলতে শহর-ই বুঝানো হয়েছে –মদিনাকে নয়। আল্লাহ চাইলে, এই হাদিসটি প্রয়োগ করে আমরা দাজ্জাল হিসেবে ইহুদীর আবির্ভাব সম্পর্কে জানতে পারব। আমি মনে করি, উক্ত হাদিসে শহর বলতে কোন

সাম্রাজ্যের বা দেশের রাজধানীকে বুঝানো হয়েছে কারণ রাজধানীর পতন হলেই সেই সাম্রাজ্য বা দেশের পতন হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়।

আমার মতে হাদিসের ব্যাখ্যা এই রুপ হতে পারেঃ হাদিসের ভাষা ভালো ভাবে খেয়াল করতে হবে, বড় যুদ্ধ এবং শহর বিজয়ের মধ্যে ৬ বছর থাকবে – এর অর্থ কি? নবী সাঃ তো বলতে পারতেন যে, বড় যুদ্ধের ৬ষ্ঠ বছরে শহর বিজয় হবে কিন্তু তিনি এভাবে বলেন নি; তিনি বলেছেন যে, বড় যুদ্ধ ও মদিনা বিজয়ের মধ্যে ছয় বছর থাকবে – অর্থাৎ সময়সীমা ৬ বছরের কিছু কম হতে পারে কিন্তু ৬ বছরের বেশি হবে না অর্থাৎ সময়সীমা ৫ বছরের বেশি কিন্তু ৬ বছরের মধ্যে থাকবে। দাজ্জালের আবির্ভাবের বিষয়ে বলেছেন যে, সপ্তম বছরে দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে বলতে আমি বুঝি যে, বড় যুদ্ধ ও দাজ্জালের আবির্ভাবের মধ্যে সময় ৬ বছরের বেশি কিন্তু ৮ বছরের কম থাকবে।

ইংল্যান্ডের হিসাব মতে, ২য় বিশ্ব যুদ্ধে ইংল্যান্ড অংশগ্রহন করে ১০ জুলাই- ৩১ অক্টোবর ১৯৪০ সালে (Battle of Britain এর মাধ্যমেই কার্যত ইংল্যান্ড ২য় বিশ্ব যুদ্ধে অংশগ্রহন শুরু করে)। জর্ডান (রাজধানী 'আম্মান' শহর) ইংল্যান্ড থেকে মুক্ত হয় ২৫ মে, ১৯৪৬ সালে। ১০ জুলাই,১৯৪০ সাল থেকে ২৫ মে, ১৯৪৬ সালের মধ্যে সময় থাকে প্রায় ৫ বছর ১১ মাসের মত। ইসরায়েল (State of Israel) রাষ্ট্র কার্যত প্রতিষ্ঠা হয় জাতিসংঘের Resolution 181 গ্রহনের মাধ্যমে যা ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর হয়েছিল। ১০ জুলাই,১৯৪০ সাল থেকে ২৯ নভেম্বর ১৯৪৭ সালের মধ্যে সময় প্রায় ৭ বছর ৪ মাস। অর্থাৎ তখন-ই ইসরায়েলের সরকার প্রধান দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। প্রশ্ন আসে, দাজ্জাল না মুসলিম হবার কথা? যেহেতু ইসরায়েল মুসলিম ভূখণ্ডকে অন্যায়ভাবে জোর করে দখল করে গঠিত হয়েছিল এবং এটি মুসলিমদের উপর শাসন করছে - তাই এটি দাজ্জালের আওতাভুক্ত হবে। (জার্মানির হিসাব মতে Battle of Britain এর সময়কাল জুলাই ১৯৪০ থেকে মে ১৯৪১)।

*** এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল যা থেকে বিভিন্ন তারিখ মিলালে ইসরায়েল (State of Israel) রাষ্ট্রের জন্ম বা আবির্ভাব সপ্তম বছরের মধ্যেই পাওয়া যাবে। আমার হিসাবে এটি ৭ বছর ৪ মাস এসেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কি যুদ্ধের ধরণ পাল্টে গিয়েছিল যে, এটাকে আমরা বড় যুদ্ধ হিসেবে গ্রহন করছি? হ্যাঁ, ২য় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধের ধরণ পাল্টে গিয়েছিল। এই যুদ্ধেই প্রথম পারমাণবিক বোমা ব্যাবহার করা হয়। এই যুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীর সকল দেশ পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য মরিয়া হয়ে গিয়েছিল। খেয়াল করে দেখুন, ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর পারমাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ কোন দেশেই অন্য কোন দেশ বড় ধরণের হামলা করতে সাহস পায়নি।

দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দিন থাকবে?

নওয়াস বিন সামান আল-কিলাবী থেকে বর্ণিত, "একদিন সকালে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) দাজ্জালকে ঘৃণ্য কিন্তু ভয়াবহ হিসেবে উল্লেখ করলেন, এমনকি আমরা মনে করলাম যে সে খেজুর গাছের স্তম্ভে আছে। সন্ধ্যায় আমরা যখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর কাছে এলাম, তখন তিনি আমাদের মধ্যে সেই (ভয়) দেখতে পেলেন এবং বললেন: 'তোমাদের কী হয়েছে?' আমরা বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল! আজ সকালে আপনি দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেছেন এবং আপনি তাকে ঘৃণ্য কিন্তু ভয়াবহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, এমনকি আমরা মনে করলাম যে সে খেজুর গাছের স্তম্ভে আছে।' তিনি বললেন: 'তোমাদের জন্য দাজ্জালের চেয়েও আমি আরও কিছু জিনিসের আশঙ্কা করি। যদি সে আমার উপস্থিতিতে আবির্ভূত হয়, তবে আমি তোমাদের পক্ষ থেকে তার সাথে লড়াই/ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব, আর যদি সে আমার অনুপস্থিতিতে আবির্ভূত হয়, তবে প্রত্যেক মানুষকে নিজের প্রতিরক্ষা করতে হবে, এবং আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে প্রতিটি মুসলিমের যত্ন/ দায়িত্ব নেবেন। সে (দাজ্জাল) হবে কোঁকড়ানো চুল এবং ফোলা চোখ (protuberant eye) বিশিষ্ট এক যুবক; আমি তাকে আব্দুল-উজ্জা বিন কাতানের সাথে তুলনা করি। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাকে দেখবে, সে যেন তার উপর সূরা আল-কাহফের প্রথম আয়াতগুলি পাঠ করে। সে শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী খাল্লা থেকে বেরিয়ে আসবে এবং ডানে ও বামে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। হে আল্লাহর বান্দারা, অবিচল থাকো।' আমরা বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল, সে পৃথিবীতে কতদিন থাকবে?' তিনি বললেন: 'চল্লিশ দিন, এক দিন এক বছরের সমান, এক দিন এক মাসের সমান, এক দিন এক সপ্তাহের সমান এবং তার বাকি দিনগুলি তোমাদের দিনের মতো।' আমরা বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল, যে দিনটি এক বছরের সমান, সেই দিনে কি একদিনের নামাজ আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে?' তিনি বললেন: ‘সময়ের হিসাব করো (এবং তারপর সালাত আদায় করো) ।’ আমরা বললাম: ‘সে পৃথিবীতে কত দ্রুত গতিতে চলবে?’ তিনি বললেন: ‘বাতাস দ্বারা পরিচালিত বৃষ্টির মেঘের মতো।’ তিনি বললেন: ‘সে কিছু লোকের কাছে আসবে এবং তাদের ডাকবে, তারা সাড়া দেবে এবং তার প্রতি ঈমান আনবে। তারপর সে আকাশকে বৃষ্টির নির্দেশ দেবে, বৃষ্টি হবে, এবং সে পৃথিবীকে গাছপালা উৎপাদনের নির্দেশ দেবে, এবং তা করবে। সন্ধ্যায় তাদের পশুপাল ফিরে আসবে, তাদের কুঁজ লম্বা, তাদের দুধের থলি পূর্ণ এবং তাদের পার্শ্ব আগের চেয়ে মোটা হবে। তারপর সে (অন্য) লোকের কাছে আসবে এবং তাদের ডাকবে, তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে, তাই সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং তারা খরার কবলে পড়বে এবং কিছুই থাকবে না। তারপর সে মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাবে এবং বলবে: ‘তোমার ধন-সম্পদ বের করে আন।’ তারপর সে (সেই স্থান) চলে যাবে, এবং এটার (মরুভূমির) ধন-সম্পদ মৌমাছির ঝাঁকের মতো তার পিছনে পিছনে যাবে। তারপর সে এক যুবককে ডাকবে এবং তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করবে এবং তাকে দুই টুকরো করবে। সে তীরন্দাজ এবং তার লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে যত দূরত্ব আছে তত দূরত্বে দুটি টুকরো স্থাপন করবে। তারপর সে তাকে ডাকবে এবং সে তার মুখ উজ্জ্বল করে হাসতে হাসতে আসবে। যখন তারা এই অবস্থায় থাকতে থাকবে (অর্থাৎ যখন এই অবস্থা চলতে

থাকবে), তখন আল্লাহ ঈসা ইবনে মারিয়ামকে পাঠাবেন, যিনি দামেস্কের পূর্ব দিকে সাদা মিনারের কাছে নেমে আসবেন, দুটি মাহরুদ [ওয়ারস এবং তারপর জাফরান দিয়ে রঞ্জিত পোশাক] পরিধান করবেন এবং দুই ফেরেশতার ডানার উপর হাত রাখবেন। যখন তিনি তার মাথা নিচু করবেন, তখন তা থেকে ঘামের মালা ঝরবে। যে কাফের তার নিঃশ্বাসের সুগন্ধ পাবে সে মারা যাবে, এবং তার নিঃশ্বাস তার চোখ যতদূর দেখতে পাবে ততদূর পৌঁছাবে। তারপর তিনি বেরিয়ে পড়বেন এবং লুদের দরজায় তাকে (দাজ্জালকে) ধরবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। তারপর আল্লাহ নবী ঈসাকে এমন কিছু লোকের কাছে নিয়ে আসবেন যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন, এবং তিনি তাদের মুখ মুছে দেবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বলবেন। যখন তারা এই অবস্থায় থাকবে, তখন আল্লাহ তাকে ওহী দেবেন: "হে ঈসা, আমি আমার কিছু বান্দাকে বের করে এনেছি যাদের কেউ হত্যা করতে পারবে না, তাই আমার বান্দাদের নিরাপদে তুরে নিয়ে যাও।" তারপর ইয়াজুজ ও মাজুজ বেরিয়ে আসবে এবং তারা, যেমন আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, "প্রত্যেক টিলা থেকে নেমে আসবে।" [21:96] তাদের প্রথমজন তিবেরিয়াস হ্রদের পাশ দিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে পান করবে, তারপর তাদের শেষজন সেখান দিয়ে যাবে এবং বলবে: "এখানে একসময় পানি ছিল।" আল্লাহর নবী ঈসা এবং তার সঙ্গীদের সেখানে অবরুদ্ধ করা হবে যতক্ষণ না তাদের কারো কাছে ষাঁড়ের মাথা তোমাদের কারো কাছে আজ একশ দিনারের চেয়েও (বেশি) প্রিয় হয়ে উঠবে। তারপর, আল্লাহর নবী ঈসা এবং তার সঙ্গীরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন। তারপর আল্লাহ তাদের ঘাড়ে একটি কীট পাঠাবেন এবং পরের দিন সকালে তারা সবাই এক হয়ে মারা যাবে। আল্লাহর নবী ঈসা এবং তার সঙ্গীরা নেমে আসবেন এবং তারা তাদের (ইয়াজুজ-মাজুজের মৃত দেহের) দুর্গন্ধ, দুর্গন্ধ এবং রক্ত থেকে এক বিঘত জায়গাও পাবে না। তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, আর তিনি বাক্ট্রিয়ান উটের গলার মতো ঘাড়ওয়ালা পাখি পাঠাবেন, যারা সেগুলো তুলে নিয়ে যাবে এবং আল্লাহ এর যেখানে ইচ্ছা সেখানে ছুঁড়ে ফেলবে।

তারপর আল্লাহ বৃষ্টি পাঠাবেন যার ফলে মাটি বা লোমের কোন ঘর অবশিষ্ট থাকবে না, এবং তা পৃথিবীকে ধুয়ে ফেলবে যতক্ষণ না এটি (মাটি) আয়নার (অথবা মসৃণ পাথর) মতো হয়ে যায়। তারপর পৃথিবীকে বলা হবে: "তোমার ফল বের করো এবং তোমার বরকত ফিরিয়ে আন।" সেদিন একদল লোক একটি ডালিম খাবে এবং তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং তারা তার খোসার নীচে ছায়া নেবে। আল্লাহ একটি দুগ্ধবতী উটের উপর বরকত বর্ষণ করবেন যাতে তার (দুধ) বহু সংখ্যক মানুষের জন্য যথেষ্ট হয়, একটি দুগ্ধবতী গাভী (দুধ) একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হয় এবং একটি দুগ্ধবতী ভেড়ীর (দুধ) একটি বংশের (লোকের) জন্য যথেষ্ট হয়। যখন তারা এই অবস্থায় থাকবে, তখন আল্লাহ একটি মনোরম বাতাস পাঠাবেন যা তাদেরকে বগলের নীচ থেকে ধরে/(জব্দ করে) ফেলবে এবং প্রতিটি মুসলিমের প্রাণ হরণ করবে, বাকিরা গাধার মতো ব্যভিচার করতে থাকবে, এবং তাদের উপর কিয়ামত আসবে"। (হাদিস নং: ৪০৭৫; সুনান ইবনে মাজাহ। অধ্যায় ৩৯, ফিতনা সম্পর্কিত অধ্যায়; অনুরূপ হাদিসঃ সাহিহ মুসলিমঃ ৭১০৬; রিয়াদ আস সালেহিন ১৮০৮) আমাদের পরবর্তী আলোচনাতে

এই হাদিসটি থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো বার বার বিভিন্ন জায়গায় আসবে, তাই, এই হাদিসটি থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো মনে রাখলে বাকি বইটি বুঝতে সুবিধা হবে।

এই হাদিসে আল্লাহ এর রসূল সাঃ প্রথমে দাজ্জালের শারীরিক গঠনের বর্ণনা আমাদের কাছে দিয়েছেন এবং এখানে তিনি দাজ্জালকে কানা বা এক চোখ অন্ধ – এই কথা বলেননি। অর্থাৎ শারীরিকভাবে তার ২টি চোখই ঠিক থাকবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তবে তার চোখ হবে protuberant eye অর্থাৎ 'ফুলে ওঠা চোখ', যাকে 'এক্সোফথালমোস' বা 'প্রোপ্টোসিসও' বলা হয়, যখন এক বা উভয় চোখ তাদের স্বাভাবিক অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসে। এটি Hyperthyroidism (Over active Thyroid gland) বা graves' disease এর জন্য হয়ে থাকে যা মূলত একটি Auto immune disease. রোমান সম্রাট গ্যালেরিয়াস ভ্যালেরিয়াস ম্যাক্সিমিনাস দাজা (Galerius Valerius Maximinus Daza) এই রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি রোমান ধর্মের কট্টর অনুসারী একজন পৌত্তলিক ছিলেন, তিনি খ্রিস্টানদের (ইসা আঃ এর অনুসারীদের) উপর শেষ নির্যাতনের (persecutions of Christians) একটিতে জড়িত ছিলেন। ম্যাক্সিমিনাস দাজা হলেন সর্বশেষ ব্যক্তি যাকে 'ফেরাউন' বলে অভিহিত করা হয়।

বর্তমানে সমসাময়িক সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট (১৯৮৯-১৯৯৩ সাল) জর্জ হারবার্ট ওয়াকার বুশ (জর্জ এইচ. ডব্লিউ. বুশ; George H. W. Bush) ও তার স্ত্রী বারবারা বুশ (Barbara Bush) উভয়েই Auto-immune diease/ Hyperthyroidism (Over active Thyroid gland) বা graves' disease এ আক্রান্ত ছিল। এই রোগে আক্রান্ত হলে চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে পারে। এজন্য চশমা পড়তে হয়। জর্জ এইচ. ডব্লিউ. বুশ বাই-ফোকাল চশমা (bifocal eyeglasses) পড়তেন। জর্জ এইচ. ডব্লিউ. বুশ ১৯৯১ সালে ইরাকে হামলা করেন যা গালফ যুদ্ধ (Gulf War) নামে পরিচিত। জর্জ হারবার্ট ওয়াকার বুশ (George H. W. Bush) "New World Order" নামে একটি প্রশ্নবিদ্ধ বক্তব্য দিয়েছিলেন।

জর্জ এইচ. ডব্লিউ. বুশের সন্তান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট (২০০১-২০০৮ সাল পর্যন্ত) জর্জ ওয়াকার বুশ (George W. Bush) ২০০১ সালে আফগানিস্থানে হামলা করেন এবং ২০০৩ সালে ইরাকে হামলা করেন। তিনিও চশমা (reading glasses) পড়তেন।

দাজ্জাল খাল্লা নামক এক শহর থেকে বের হবে, বর্তমানে আল খাল্লা নামক একটি শহর জর্ডানে আছে। তারপরও বর্তমানে কোন শহর থেকে দাজ্জাল বের হয়েছে তা খুঁজে বের করা কঠিন কারণ তারা শহরগুলোর নাম পরিবর্তন করে ফেলেছে যেমন তারা কনস্টান্টিনোপলের নাম পরিবর্তন করে নাম রেখেছে ইস্তাম্বুল (তুরস্কের রাজধানী)।

দাজ্জাল ঠিক কত দিন পৃথিবীতে থাকবে - এই সম্পর্কে অনেক হাদিস আছে আর হাদিসগুলোতে দাজ্জালের পৃথিবীতে অবস্থানের সময়কাল প্রতীকী অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইয়াজিদ বিন আস-সাকানের কন্যা আসমা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন, "দাজ্জাল পৃথিবীতে চল্লিশ বছর থাকবে, এক বছর এক মাসের সমান, এক মাস এক সপ্তাহের সমান, এক সপ্তাহ এক দিনের সমান এবং এক দিন খেজুর গাছের ডাল পোড়াতে যত সময় লাগে তার সমান।" এটি শরহে সুন্নাত হিসেবে বর্ণিত। (মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৪৮৯)

হাদিস অনুসারে আমরা হিসাব করে দেখি, এই দাজ্জালটি হাদিস অনুযায়ী পৃথিবীতে কত দিন থাকবে? হিসাবটি একটু অন্যভাবে করতে হবে কারণ এই হিসাবটি রূপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

দাজ্জাল পৃথিবীতে চল্লিশ বছর থাকবে,

এক বছর এক মাসের সমান = তাহলে আমরা পাচ্ছি, ৪০ মাস।

এক মাস এক সপ্তাহের সমান= যে ৪০ মাস আমরা পেয়েছি সেগুলোর প্রতিটি মাস আবার ১ সপ্তাহের সমান; তাহলে আমরা পাচ্ছি ৪০ সপ্তাহ।

এক সপ্তাহ এক দিনের সমান = যে ৪০ সপ্তাহ আমরা পেয়েছি তার প্রতিটি সপ্তাহ আবার ১ দিনের সমান; তাহলে আমরা পাচ্ছি ৪০দিন।

যে ৪০ দিন আমরা পেয়েছি সেগুলোর প্রতিটি আবার খেজুর গাছের ডাল পোড়াতে যত সময় লাগে তার সমান= ৪০ ঘণ্টা (ধরে নিলাম যে, খেজুর গাছের একটি ডাল পোড়াতে ১ ঘণ্টা সময় লাগে)

এখন ৪০ মাস = ৪০ x ৩০ = ১২০০ দিন। (এখানে কিছু দিন কম-বেশি হতে পারে কারণ হিজরি বছরে কোন মাস ২৯ দিনের আবার কোন মাস ৩০ দিনের হয়; এখানে সূর্য মাসের হিসাব ধরা হয়েছে)

আবার, ৪০ সপ্তাহ = ৪০ x ৭ =২৮০ দিন

আবার, ৪০ দিন = ৪০ দিন

আবার, ৪০ ঘণ্টা = ৪০/২৪ =১.৬৬ দিন

তাহলে, এই দাজ্জালটি পৃথিবীতে থাকবে = ১২০০+২৮০+৪০+ ১.৬৬= ১৫২১ দিন

বছরের হিসাবে = ১৫২১/৩৬৫ = ৪ বছর ৬১ দিন (সূর্য মাসের হিসাবে) ।

তাহলে, এই দাজ্জালটি পৃথিবীতে ৪ বছর ৬১ দিন থাকবে। এই সময়কালের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন রাষ্ট্র প্রধানের মেয়াদকাল আছে কি পৃথিবীতে? আমার জানামতে, আমেরিকার সরকার প্রধান (প্রেসিডেন্ট), ইসরায়েলের সরকার প্রধানের (প্রধানমন্ত্রীর) এবং ইরাকের বর্তমান সরকার প্রধানের মেয়াদকাল হচ্ছে ৪ বছর। তাহলে এটা কি আসলে কোন নির্দিষ্ট মানুষের পৃথিবীতে অবস্থানের সময়কাল নয় বরং এটি কি একটি নির্দিষ্ট পদের সময়কাল – যে পদের নাম 'প্রেসিডেন্ট অফ আমেরিকা' এবং 'প্রাইম মিনিস্টার অফ ইসরায়েল'। এই পদটির (*) নাম বা পদবী বা উপাধি কি দাজ্জাল? এই পদটির মেয়াদকাল ৪ বছর। আর আমেরিকায় বা ইসরায়েলে বা

ইরাকে বা গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে নির্বাচন হয় সরকার প্রধানের (প্রধানমন্ত্রীর / প্রেসিডেন্টের) শপথ গ্রহনের প্রায় ২-৩মাস আগে। এই ২-৩ মাস বলতে গেলে আমেরিকায় বা ইসরায়েলে বা ইরাকে অঘোষিতভাবে ২ জন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী থাকে (President এবং President elect) । ২জন পরামর্শ করেই এই ২ মাস সিদ্ধান্ত নেয়। তাহলে, এই পদটির প্রকৃত মেয়াদ হচ্ছে ৪ বছর ২ মাস।

(*) পূর্বেই এই বইয়ে দাজ্জালের পরিচয়ে বলা হয়েছে যে, দাজ্জাল কারো নাম নয়। এটি একটি পদের নাম বা টাইটেল বা পদবী। হাদিসে সময় বর্ণনার ধরণ বা বাঁচনশৈলী (**) দেখে বুঝা যায় যে, এই সময়কাল কখনো কিছু কম বা কিছু বেশি হতে পারে। যেমনঃ কখনো ৪ বছর ২ মাস, কখনো ৪ বছর ১ মাস, কখনো ৪ বছর ২ মাস ১৫ দিন হতে পারে, ইত্যাদি।

(**) হাদিসে সময় বর্ণনার ধরণ বা বাঁচনশৈলী খেয়াল করি। খেজুর গাছের ডাল পোড়াতে যত সময় লাগে তত সময়ের কথা বলা হয়েছে। খেজুর গাছের ডাল পোড়াতে সব- সময় একই সময় লাগবে না কারণ এই সময় নির্ভর করবে ডালটি কতটুকু শুকনা ছিল বা ভেজা ছিল তার উপর। খেজুরের ডালটি যত বেশি শুকনা হবে তত দ্রুত পুড়ে যাবে আর যত বেশি ভেজা হবে তত বেশি সময় লাগবে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে দাজ্জালের এই মেয়াদকালের সময় একদম নির্দিষ্ট নয়। ঠিক আমেরিকা বা ইসরায়েলের সরকার প্রধানের মেয়াদ কালের মত কারণ নির্বাচনের পড়ে প্রতিবার একই সময় পরে শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান হয় না। হাদিসে উল্লেখিত দাজ্জালের সময়কাল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকালের সাথে প্রায় পুরোপুরি মিলে গেছে। দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য বের করার সময় আমরা দেখেছিলাম যে, এমন অমুসলিম শাসক যারা জোরপূর্বক মুসলিমদের ভূমি দখল করে মুসলিমদের শাসন করবে তারা দাজ্জাল। আমেরিকা, ইসরায়েল উভয়েই মুসলিমদের ভূমি দখল করে মুসলিমদের উপর জোরপূর্বক শাসন করেছে। বর্তমানে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদ এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর পদ – দুটি-ই দাজ্জাল। এই দু'টি পদের উপাধি বা টাইটেল হচ্ছে দাজ্জাল।

হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: 'দাজ্জাল তার বাম চোখে অন্ধ এবং তার প্রচুর চুল রয়েছে। তার সাথে জান্নাত এবং জাহান্নাম থাকবে, কিন্তু তার জাহান্নাম হচ্ছে আসলে জান্নাত এবং তার জান্নাত হচ্ছে আসলে জাহান্নাম।" (সুনান ইবনে মাজাহ ৪০৭১)

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজ্ভেল্ট আমেরিকার ২৫ এবং ২৬তম প্রেসিডেন্ট। তিনি বক্সিং খেলার সময় আঘাত পান ফলে তার বাম চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে যায়। তিনি চশমা পরিধান করতেন। তিনি ২ টার্মে ১৯০১ সাল থেকে মার্চ, ১৯০৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

আবূ বকর ইবনু আবূ শাইবাহ ও ইবনু নুমায়র (রহঃ) .... ইবনু উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে দাজ্জালের আলাপ-আলোচনা করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা অন্ধ নন কিন্তু সতর্ক হও! দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। আর তা আঙ্গুরের মতো ফোলা হবে।(সাহিহ মুসলিমঃ ৭২৫১)

আমেরিকার ২৮ তম প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্সন যিনি ২ টার্মে ১৯১৩-১৯২১ সাল পর্যন্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার ডান চোখ প্রায় অন্ধ ছিল। তিনি একদিন হটাৎ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন যে, তিনি ডান চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। ডাক্তাররা বলেন যে, high blood pressure এর রোগী হওয়াতে অতিরিক্ত রক্ত চাপে তার ডান চোখের রেটিনাতে রক্তক্ষরণ হয়েছে, তাই তিনি ডান চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। পরবর্তীতে তার ডান চোখ কিছুটা ভালো হয়েছিল বলে জানা যায়। তিনি চশমা পরিধান করতেন। আমার হিসাবে ১৯১৯ সালে দাজ্জাল হিসেবে কামাল আতাতুর্ক আবির্ভূত হয়েছিলেন তুরস্কে। ১৯১৩-১৯২১ সালের মধ্যে মুসলিম বিশ্বে অনেক জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে যা এই বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনান ইবনে মাজাহ ৪০৭১ এবং সাহিহ মুসলিমঃ ৭২৫১ হাদিস অনুসারে,

দাজ্জালের বাম চোখ ও ডান চোখ উভয়টিই যদি অন্ধ বা কানা হয় হয় তাহলে সে তো অন্ধ হবে। তাহলে, বুঝা যাচ্ছে, এখানে দুই জন আলাদা দাজ্জালের কথা বলা হচ্ছে। একজনের বাম চোখ কানা, অন্যজনের ডান চোখ কানা। আবার আমরা যদি উভয় হাদিস অনুসারে, দাজ্জালের দুইটি চোখই অন্ধ হিসেবে ধরে নেই তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, দাজ্জাল চশমা ছাড়া চোখে দেখে না অর্থাৎ দাজ্জালের উভয় চোখই চশমা ছাড়া আংশিক অন্ধ। আমেরিকার ৩৩ তম প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রম্যানের দৃষ্টি শক্তি এতই কম ছিল যে, এই কারণে তিনি ছোট বেলায় খেলাধুলা করতে পারতেন না এবং একই কারণে তিনি আমেরিকার সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে পারেন নি। সম্ভবত তিনি দুরের জিনিস দেখতে পেতেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে প্রচুর সৈন্য দরকার হয়, তখন তিনি ফ্রান্সের হয়ে যুদ্ধে যোগদান করেন। আমেরিকার ৩৩ তম প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রম্যান যিনি দুই টার্মে ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রম্যান-ই প্রথম ব্যাক্তি যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১ লাখ ইহুদীকে প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসতে বলেন। ব্রিটেন এতে রাজি না হওয়ায় তিনি ব্রিটেনের উপর চাপ প্রয়োগ করেন। এই বিষয়গুলো এই বইয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রম্যানের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ও মদদে ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনিই জাপানে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের আদেশ দেন। তিনি NATO প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেন। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যেই ইসরায়েল নামক রাষ্ট্র আবির্ভূত হয়েছে যার প্রধানমন্ত্রীর পদটি হচ্ছে দাজ্জাল। আমেরিকা ইসরায়েলের জন্ম থেকে এখন পর্যন্ত নিঃশর্ত সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

জর্জ এইচ. ডব্লিউ. বুশ যিনি ১৯৮১ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার ব্যাপারে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বাইফোকাল চশমা ব্যবহার করতেন।

এছাড়া আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন, বারাক ওবামা, জো বাইডেন সকলেই কনটাক লেন্স (contact lens) ব্যবহার করতেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রিডিং গ্লাস (reading glasses) ব্যবহার করেন।

"হায়ওয়া ইব্‌ন শুরায়হ (রহঃ) .... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এত বেশি বলেছি যে আমি আশংকা করি তোমরা বুঝতে পারবে না। দাজ্জাল হবে বেঁটে, মাথার চুল হবে কুঞ্চিত, এক চোখা, এক চোখে দেখতে পায় না এবং বাইরের দিকে ফোলাও নয়, আবার কোটরাগত-ও নয়। এরপরও যদি তোমরা সন্দীহান হও, তবে জেনে রাখ! তোমাদের রব কানা নন। (সুনান আবু দাউদঃ ৪৩২০)

এই হাদিসে দাজ্জালের চোখ সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, দাজ্জালের চোখ বাইরের দিকে ফোলা নয় আবার কোটরাগতও নয়। আমাদের সকলের চোখ বাহিরের দিকে ফোলা – চোখের দুই কোনা থেকে মনি পর্যন্ত সবার চোখই বাহিরের দিকে ফোলা থাকে। আবার আমাদের সকলের চোখ কোটরাগত - সকলের চোখই অক্ষিকোটরে অবস্থিত। প্রথমে বলা হচ্ছে দাজ্জাল কানা, তারপর বলা হচ্ছে এক চোখে দেখতে পায় না – এই কথাগুলোর প্রতীকী অর্থ আছে আবার আক্ষরিক অর্থও আছে। "বাইরের দিকে ফোলাও নয়, আবার কোটরাগতও নয়" । আমার মনে হচ্ছে, এই কথাগুলোর ব্যাখ্যা হচ্ছে চশমা। চশমা আমাদের চোখ হিসেবে কাজ করে। যারা চশমার কাজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানেন –তারা এটা বুঝতে পারবেন। আমাদের চোখের ভিতরে একটি লেন্স আছে যেটি ঠিকমত কাজ না করলে আমরা কাছের জিনিস বা দুরের জিনিস দেখতে পাই না বা ঘোলা দেখি যাকে এক ধরণের অন্ধত্ব বলা যেতে পারে কারণ চশমা ছাড়া আপনি ঐ দূরের বা কাছের জিনিসগুলো দেখতে পাবেন না। চশমার ভিতরে একটি লেন্স থাকে যা আমাদের চোখের লেন্স হিসেবে কাজ করে ফলে আমরা আবার দুরের বা কাছের জিনিস দেখতে পাই। এজন্য চশমাকে আমাদের চোখের একটি অংশ বলা যেতে পারে। এজন্যই চশমা ব্যবহার করলে আংশিক অন্ধ ব্যক্তি আবার দুরের বা কাছের জিনিস দেখতে পান। আল্লাহ এর রসূলের সাঃ সময় চশমা ছিল না – তখন এই রূপ হলে আংশিক অন্ধত্ব বরণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। আমরা জানি, চশমা হচ্ছে সমতল ফলে এই চোখ সুস্থ চোখের মত বাইরের দিকে ফোলাও নয় আবার কোটরাগত-ও নয়। আল্লাহ এর রসূলের সময় চশমা ছিল না ফলে চশমার কথা বললে তখনকার লোকেরা কিছুই বুঝত না – এজন্য-ই হয়তো এভাবে বলা হয়েছে।

সবশেষে আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, "এরপরও যদি তোমরা সন্দীহান হও, তবে জেনে রাখ! তোমাদের রব কানা নন" । আমি মনে করি, এই কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলছেন যে, দাজ্জাল সম্পর্কে

উনার কথার আক্ষরিক ব্যাখ্যা করে আমরা যদি দাজ্জালকে চিনতে না পারি তাহলে অন্তত দাজ্জাল সম্পর্কে উনার বানীগুলোর প্রতীকী বা রূপক অর্থ ব্যাখ্যা করে হলেও যেন আমরা দাজ্জালকে চিনতে পারি। এখন আমরা দেখব, আরেকটি দাজ্জাল যেটি আবির্ভূত হয়েছে বা হবে সেটি পৃথিবীতে কত দিন থাকবে? "…………………………আমরা বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল, সে পৃথিবীতে কতদিন থাকবে?' তিনি বললেন: 'চল্লিশ দিন, এক দিন এক বছরের সমান, এক দিন এক মাসের সমান, এক দিন এক সপ্তাহের সমান এবং তার বাকি দিনগুলি তোমাদের দিনের মতো।' আমরা বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল, যে দিনটি এক বছরের সমান, সেই দিনে কি একদিনের নামাজ আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে?' তিনি বললেন: 'সময়ের হিসাব করো (এবং তারপর সালাত আদায় করো) ।'………………" । (হাদিস নং: ৪০৭৫; সুনান ইবনে মাজাহ। অধ্যায় ৩৯, ফিতনা সম্পর্কিত অধ্যায়)

যেহেতু হাদিসে সময়কাল প্রতীকী অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে তাই সময়ের হিসাবটা একটু অন্যভাবে করতে হবে। 'চল্লিশ দিন, এক দিন এক বছরের সমান = প্রতিটি দিন ১ বছর ধরে, ৪০ বছর = ৪০ x ৩৬৫= ১৪৬০০ দিন চল্লিশ দিন, এক দিন এক মাসের সমান = প্রতিটি দিনকে ১ মাস ধরে, ৪০ মাস = ৪০ x ৩০ =১২০০ দিন; চল্লিশ দিন, এক দিন এক সপ্তাহের সমান = প্রতিটি দিনকে ১ সপ্তাহ ধরে, ৪০ সপ্তাহ = ৪০ x ৭ = ২৮০ দিন বাকি দিনগুলি আমাদের দিনের মতো = প্রতিটি দিনকে ১ দিন ধরে ৪০ দিন। ৪০ x ১ = ৪০ দিন তাহলে, এই দাজ্জালের আবির্ভাবের পর সে দুনিয়ায় অবস্থান করবে = ১৪৬০০+১২০০+২৮০+৪০ = ১৬১২০ দিন = ১৬১২০ দিন / ৩৬৫ = ৪৪ বছর ৬০ দিন (সূর্য মাসের হিসাবে; চান্দ্র মাসের বিবেচনায় কিছু কম-বেশি হতে পারে)

৪৪ বছর ৬০ দিন বর্তমানকালের একজন মানুষের জন্য অনেক দীর্ঘ সময়। এটা কিভাবে হতে পারে? বিভিন্ন দেশে এখনো রাজতন্ত্র আছে, যেমন সৌদি আরব, ইউনাইটেড কিংডম (UK), ইত্যাদি। তাদের রাজবংশের কোন রাজা দাজ্জাল হতে পারে। এছাড়া হিসাবটা নিম্নরূপও হতে পারে।

আমরা ইসরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার একটি পর্যালোচনা করতে পারি।

১৯৯৩-১৯৯৬ – নেতানিয়াহু ইসরায়েলের বিরোধীদলের প্রধান ছিল।

১৯৯৬-১৯৯৯ – নেতানিয়াহু ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ছিল।

২০০৩-২০০৫ – নেতানিয়াহু ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী ছিল।

২০০৬-২০০৯- নেতানিয়াহু ইসরায়েলের বিরোধীদলের প্রধান ছিল।

২০০৯-২০২১ – নেতানিয়াহু ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ছিল।

২০২১-২০২২ - নেতানিয়াহু ইসরায়েলের বিরোধীদলের প্রধান ছিল।

২০২২- ২০২৫ (চলমান) - নেতানিয়াহু ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী আছে।

তাহলে, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২৭ বছর চলছে। একটি দাজ্জাল যে, কম-বেশি ৪৪ বছর ৬০ দিন ধরে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে সেটার মেয়াদকালের হিসাব এমনভাবে -ও হতে পারে। নেতানিয়াহু চশমা (reading glasses) পড়ে।

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইসফাহানের ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) ইহুদী যারা পারস্যের শাল পরে থাকবে তারা দাজ্জালের অনুসারী হবে। (সাহিহ মুসলিম ২৯৪৪; মুসলিম, বই ৫৪, হাদিস ১৫৩)

ইসফাহান জায়গাটি ইরানে অবস্থিত। 'পারস্যের শাল পড়ে থাকবে' কথাটির রূপক অর্থ রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এর অর্থ এমন হতে পারে যে, এরা পারস্যের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, মতাদর্শ নিজেদের সাথে নিয়ে দাজ্জালের অনুসারী হবে।

ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইরানি ইহুদি, যাদের বেশিরভাগই দরিদ্র, ইসরায়েলে অভিবাসিত হয়েছিল (রেফারেন্সঃ Sanasarian (2000), p. 47) । ডেভিড লিটম্যান (David Littman) ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে ইসরায়েলে অভিবাসিত ইরানি ইহুদিদের মোট সংখ্যা ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) বলে উল্লেখ করেছেন। (রেফারেন্সঃ Littman (1979), p. 5.) এরাই হচ্ছে, হাদিসে উল্লেখিত সেই সত্তর হাজার ইহুদী যারা দাজ্জালের অনুসারী হয়েছে।

আমি এখানে দাজ্জালের পৃথিবীতে অবস্থানের যে সময় বা বছর বের করেছি তা ঠিক হতে পারে বা ভুলও হতে পারে। এটা শুধু একটা সম্ভাব্য সময় যা দাজ্জাল সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দিবে। আমার ব্যাখ্যাগুলোকেও অকাট্য সত্য বলে গ্রহন করবেন না। আমার ব্যাখ্যাগুলো মানুষের অন্তরে দাজ্জাল বিষয়ে আরও গভীর চিন্তা – ভাবনার উদ্রেক করবে- এটাই আমার প্রত্যাশা। মানুষ যেন তার চারিপাশের সমাজ, বিশ্ব, রাষ্ট্র সম্পর্কে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে চিন্তা ভাবনা করে এবং সঠিকভাবে ইসলাম বুঝতে চেষ্টা করে এবং ইসলাম মেনে চলে এটাই আমার চাওয়া। কোরআন, হাদিসে বর্ণিত ঘটনা ও বর্ণনা অনুযায়ী ইতিহাস মিলে যাবার পর এবং দাজ্জালদেরকে খুঁজে পাবার পরও দাজ্জাল আবির্ভূত হয়নি – এই কথা আমি কিভাবে বলি? আল্লাহ চাইলে, এই বইয়ের "সম্পূরক অংশ" নামের অধ্যায়ে 'কারা দাজ্জাল' এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক তথ্য পাবেন।

শেষ জমানায় উপমহাদেশঃ

শেষ জমানায় উপমহাদেশ নিয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার যেহেতু আমি উপমহাদেশের একজন বাসিন্দা। উপমহাদেশে, মদিনার মুসলিম ও মামলুকদের যে যৌথ বাহিনী রোমানদের বিরুদ্ধে এবং আইন-জালুতে যুদ্ধ করেছে তাদের বংশধর বা তাদের ভাইদের বংশধররাই - প্রথম বিজয় পতাকা উড়িয়েছে তাড়াইনের ২য় যুদ্ধে (Second Battle of Tarain 1192)। মুহাম্মাদ ঘড়ীর নেতৃত্বে এই যুদ্ধে কমপক্ষে ১২ হাজার অত্যন্ত চৌকশ

মামলুক যোদ্ধা ছিলেন যাদেরকে গুলাম লেন্সারস (Ghulam Lancers) বলা হয়ে থাকে। এছাড়াও তার বাহিনীতে আরও অনেক মামলুক যোদ্ধা থাকা স্বাভাবিক। এই যুদ্ধে বিজয়ের পরই উপমহাদেশে মামলুক শাসন প্রতিষ্ঠা হয় যা দিল্লি, মুলতান, বানারশ, গৌড় (বাংলা) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। ১২০৬ সালে ঘড়ীর মৃত্যুর পর তাজ-উদ-দিন ইলদোজ (Taj-ud-Din Yildoz) গজনীর শাসক হন, মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি (Muhammad bin Bakhtiyar Khilji) গৌড়ের/ লখনৌতির (বাংলার) শাসক এবং নাসির-উদ-দিন কাবাচা (Nasir-ud-Din Qabacha) মুলতানের শাসক হন। কুতুবউদ্দিন আইবক (Qutb ud-Din Aibak) দিল্লির সুলতান হন এবং মামলুক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন যা ১২০৬-১২৯০ পর্যন্ত দিল্লিকে (দিল্লি সালতানাত/ Delhi Sultanate) শাসন করে। এরা সবাই ছিলেন মামলুক (মুসলিম তুর্কি মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধা)। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে সেলজুক অটোম্যান নয় বরং মামলুক (মুসলিম তুর্কি মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধা) যোদ্ধাদের দ্বারাই ভারত বিজয় হয়েছিল।
১২৯০-১৩২০ সাল পর্যন্ত দিল্লি সালতানাত (Delhi Sultanate) ছিল খলজি রাজবংশের (Khalji dynasty) এর অধীনে- এরাও মূলত মামলুক বা তাদের ভাই ছিল। এরপর দিল্লি সালতানাত (Delhi Sultanate) শাসন করে তুঘলক রাজবংশ (১৩২০-১৪১৩). তুঘলক রাজবংশ ছিল মূলত তুর্কি-মঙ্গল অথবা তুর্কি রাজবংশ। এই সুত্রে এরাও মামলুকদের ভাই ছিল। দিল্লি সালতানাতে (Delhi Sultanate) এরপর শাসন করেন সাইয়্যিদ রাজবংশ (১৪১৪-১৪৫০) Sayyid dynasty). যদিও এদেরকে কেউ কেউ নবী সাঃ এর বংশধর বলেছে কিন্তু এই বিষয়ে দ্বিমত আছে। তবে এতটুকু জানা যায় যে, এই রাজবংশের পূর্ব পুরুষরা আরব ছিল। এরপর আসে লোদি রাজবংশ যা দিল্লি সালতানাত (Delhi Sultanate) শাসন করে ১৪৫১ থেকে ১৫২৬ সাল পর্যন্ত। এই লোদিরা ছিল আফগান বংশতভূত।

উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ইতিহাস সম্পর্কে ষোড়শ শতাব্দীর মুসলিম ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ কাসিম হিন্দু শাহ আস্তারাবাদী * (Muhammad Qasim Hindu Shah Astarabadi) বলেছেন:

"নবী সাঃ এর সাহাবী খালিদ বিন ওয়ালিদের (রা:) পুত্র খালিদ বিন আবদুল্লাহ ও তার পরিবার বেশ কয়েকজন আরব দাসকে নিয়ে মুলতান এবং পেশোয়ারের মাঝামাঝি অবস্থিত সুলাইমান পর্বতমালায় আসেন, যেখানে তিনি তার বাসস্থান তৈরি করেন এবং তার মেয়েকে একজন আফগান প্রধানের সাথে বিবাহ দেন, যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছিলেন। এই বিবাহ থেকে অনেক সন্তানের জন্ম হয়, যাদের মধ্যে ইতিহাসে বিখ্যাত দুটি পুত্র ছিল। একজন লোদী (Lodhi), অন্যজন সুর (Sur); যারা প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে সেই উপজাতির প্রধান হয়ে ওঠেন যা আজও তাদের নাম বহন করে। আমি একজন সম্মানিত লেখকের লেখা মুতলা-উল-আনওয়ারে পড়েছি, যা আমি দাক্ষিণাত্যের খানদেশের বুরহানপুর শহর থেকে সংগ্রহ করেছি, যে আফগানরা ফেরাউনদের বংশের কপ্ট; এবং নবী মূসা যখন লোহিত সাগরে সেই কাফেরকে পরাজিত করেছিলেন, তখন অনেক কপ্ট ইহুদি ধর্মে (মুসা আঃ এর আদর্শ) ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন; কিন্তু অন্যরা, একগুঁয়ে এবং স্বার্থপর, সত্য ধর্ম (ইসলাম) গ্রহণ

করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে, তাদের দেশ ছেড়ে ভারতে এসেছিল এবং অবশেষে সুলিমানি পাহাড়ে বসতি স্থাপন করেছিল, যেখানে তারা আফগান নাম ধারণ করেছিল।"

(* ফিরিশতা (Firishta) বা ফেরেস্তে যার পুরো নাম মুহাম্মদ কাসিম হিন্দু শাহ আস্তারাবাদী (Muhammad Qasim Hindu Shah Astarabadi) ছিলেন একজন ফার্সি ইতিহাসবিদ, যিনি পরে ভারতে বসতি স্থাপন করেন এবং দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের দরবারের ইতিহাসবিদ হিসেবে কাজ করেন। তিনি ১৫৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬১১ থেকে ১৬২৩ সালের মধ্যে মারা যান।)

মুহাম্মাদ কাসিম হিন্দু শাহ আস্তারাবাদী থেকে বর্ণিত ইতিহাস থেকে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, মুসা আঃ এর সময় যারা মিশর থেকে পালিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরে ইসলাম গ্রহন করেন এবং হয়তো তাদের-ই মত কারো একজনের সাথে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাঃ এর বংশের নাতনীর বিয়ে হয়। এই দম্পতির অনেক ছেলে সন্তান হয় যাদের মধ্যে ২ জন বিখ্যাত ২ টি রাজবংশ প্রতিষ্ঠার কারণে একটি হচ্ছে লোদী রাজবংশ এবং অন্যটি হচ্ছে সুর রাজবংশ – উভয় রাজবংশই ভারত শাসন করেছেন। অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশে যেমনিভাবে ফেরায়ুনের অনুসারীদের বংশধর আছে তেমনি মদিনার সাহাবীর (খালিদ বিন ওয়ালিদের) বংশধরও আছেন। বর্তমান পশতুন বা পাঠান নামে যে জাতিগোষ্ঠী আছে তাদের মধ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদের (রাঃ) দূর সম্পর্কীয় নাতি লোদির রক্ত আছে। এদের মধ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদের বংশধর আছে। কারণ লোদী উপজাতিটি বর্তমানে পশতুন জাতির অন্তর্ভুক্ত যারা (লোদীরা) বর্তমানে মূলত পাকিস্থানের খায়বার পাখতুনখোয়া অঞ্চলে বসবাস করে। কিন্তু সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশেই লোদী ও সুর বংশের রক্ত ছড়িয়ে গেছে যেহেতু তারা বহু বছর ভারত ও বাংলা শাসন করেছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশ,ভারত, পাকিস্থানে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ (মদিনার সাহাবী) এর বংশধরদের বংশধর আছে।

১৫২৬ সালে বাবর পানিপথের যুদ্ধে লোদী রাজবংশের শাসক ইব্রাহিম খান লোদিকে পরাজিত করলে উপমহাদেশে লোদিদের শাসন বিলুপ্ত হয় এবং মুঘল শাসন শুরু হয়। যুদ্ধে ইব্রাহিম খানের পক্ষে ১ লাখ সৈন্য ও ১ হাজার হাতি থাকলেও তিনি বাবরের মাত্র ২৪ হাজার সৈন্যের কাছে হেরে যান কারণ মুহাম্মাদ লোদীর কাছে কোন বন্দুক বা কামান-গোলা ছিল না কিন্তু বাবরের সৈন্যদের ছিল বন্দুক, কামান-গোলা। বারুদ, কামান, গোলার যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদি বারুদ, বন্দুক, কামান-গোলা ছাড়া কিছুই করতে পারেন নি। এর ফলে দিল্লিতে তথা ভারতে মুঘল শাসন শুরু হয়। এই যুদ্ধে অটোম্যানরা বাবরকে সহযোগিতা করেছিল। এই যুদ্ধের ফলে ভারতে মুঘল শাসনের নামে দাজ্জালের শাসন শুরু হয় এবং আমার মতে, প্রথমবার ভারতীয় উপমহাদেশে দাজ্জালের আবির্ভাব হয়।

অটোম্যান সম্রাটরা ছিল দাজ্জাল আর আকবর যে 'দীন – ই- এলাহি' নামে একটি ধর্ম বা মতাদর্শ শুরু করেছিল - এটা একটা অকাট্য প্রমাণ যে, এটাই ছিল উপমহাদেশে দাজ্জালের শাসনের শুরু। দীন-ই-এলাহী মূলত কোন ধর্ম ছিল না – এটি ছিল একটি মতাদর্শ।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, ১৪৫৩ সালের সাত মাসের মধ্যে দাজ্জাল আবির্ভূত হয়ে ছিল। অটোম্যানরা মুঘলদের উপর ব্যাপক প্রভাব রাখত এবং লোদী রাজবংশের শাসক ইব্রাহিম খান লোদিকে পরাজিত করার ব্যাপারে মুঘলদের অটোম্যানরা সামরিকভাবে সহযোগিতা করেছিল। মুঘলদের মধ্যেও অটোম্যানদের মতই সুফিজম বা পীরতন্ত্রের প্রতি ব্যাপক অনুরাগ ছিল।

সুলতান জাহাঙ্গীরের দরবারের সুফিদের ব্যাপক সমাদর ছিল। তিনি সুফিদের কথা শুনতেন। শাহজাহানের ছেলে দাড়াশিকোর শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত সুফি মিয়ান মির। সুতরাং এখান থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ভারতীয় উপমহাদেশে সুফিরা বা পীররা মুঘল সম্রাটদের কাছ থেকেই স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। আর এটাই হচ্ছে উপমহাদেশে দাজ্জালের প্রথমবার আবির্ভাব যখন সে নিজেকে নবী বলে দাবী করেছে।

বঙ্গ বা বাংলা অঞ্চলে দাজ্জালের শাসনের শুরু

আপনারা জানেন, বাংলা অঞ্চল অনেকদিন পর্যন্ত মুঘল শাসন মেনে নেয়নি। দিল্লি সালতানাত (Delhi Sultanate) যা মূলত ছিল মামলুক (মুসলিম তুর্কি মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধা) এবং মদিনার মুসলিম আরবদের বংশধরদের শাসন (যারা বইটি এই পর্যন্ত পড়েছেন –তারা এটি বুঝতে পারবেন।)। গউদা বা গৌড় বা লখনৌতি বা জান্নাতবাদ * ছিল তখনকার সময় বাংলার রাজধানী যা বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানার মধ্যবর্তি একটি অঞ্চল। (* বর্তমানে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মালদা এবং বাংলাদেশের রাজশাহীর চাপাইনবাবগঞ্জের সীমানার মধ্যবর্তী একটি এলাকা)

যদিও কিছু বৌদ্ধ পাঠিকাতে পাওয়া যায় যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের (৪র্থ শতাব্দী) পূর্বেও গউদা (গৌড় /বাংলা) রাজ্য ছিল তবে খুব সম্ভবত রাজা শশাঙ্ক ৭ম শতাব্দীতে সমগ্র বাংলাকে একত্রিত করে একটি বাংলা রাজ্যের সূচনা করেন যার রাজধানী তিনি করেন গউদাকে। ১২০৩ সালে মুহাম্মাদ ঘড়ীর সেনাপতি ইখতিয়ার আল-দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি (Ikhtiyār al-Dīn Muḥammad Bakhtiyār Khaljī) গৌড়কে বিজয় করে বাংলায় মামলুক শাসন শুরু করেন যা ছিল বাংলায় প্রথম মুসলিম শাসন।

১২০৬ সালে বখতিয়ার খলজিকে আলী মর্দান হত্যা করলেও ১২২৫ সাল পর্যন্ত খিলজি বংশের রাজা/ জমিদার/ গভর্নররা বাংলাকে দিল্লি সালতানাত থেকে স্বাধীনভাবে শাসন করেন। অর্থাৎ এই সময় পর্যন্ত বাংলা মামলুকদের বংশধরদের দ্বারাই শাসিত হয়েছে। ১২২৫ সালে দিল্লি সালতানাতের মামলুক সুলতান ইতুমিশ (Sultan Iltutmish)

বাংলাকে সরাসরি দিল্লি সালতানাতের অধীন একটি প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করেন কিন্তু দিল্লি থেকে বাংলার দূরত্ব অনেক বেশি হওয়ায় প্রায়ই তিনি যাদেরকেই বাংলায় গভর্নর করে পাঠাতেন তাদের মধ্যে অনেকেই তার বিরুদ্ধে বাংলায় বিদ্রোহ করে স্বাধীনভাবে বাংলাকে শাসন করা শুরু করতেন। এদের মধ্যে উজবক শাহ/ (মুগিসউদ্দিন আবু আল-মুজাফফর ১২৫৭ Yuzbak Shah), তুঘরল খান (তুগরল তুগান খান/ মুগিসউদ্দীন তুগরল) (১২৭১–১২৮২) (Tughral Khan) উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে তুঘরল খান (তুগরল তুগান খান/ মুগিসউদ্দীন তুগরল) নিজে একজন তুর্কি মামলুক যোদ্ধা (তুর্কি মুসলিম ক্রিসদাস যোদ্ধারাই হচ্ছে মামলুক যোদ্ধা) ছিলেন। ১৩০১ থেকে ১৩২২ সাল পর্যন্ত শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহ ও তার বংশধররা স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন যার রাজধানী ছিল গৌড়/ লখনউতি। অনেক ইতিহাসবিদদের মতে তিনি হচ্ছেন দিল্লি সালতানাতের ৯ম সম্রাট গিয়াস উদ্দিন বলবানের (Ghayas-ud-din Balban) নাতি। গিয়াসউদ্দিন বলবান নিজে একজন মুসলিম তুর্কি ক্রীতদাস যোদ্ধা (মামলুক যোদ্ধা) ছিলেন যাকে দিল্লির সুলতান ইতুমিশ কিনে নেন। শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহের সময় সিলেট এবং সুন্দরবন, সাতক্ষীরা, হুগলী, দিনাজপুর, রংপুর গৌড়/ লখনউতির শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ (Ghiyasuddin Bahadur Shah I) গৌড়/ লখনউতি তথা বাংলার শাসক হন। ১৩২০ সালে দিল্লি সালতানাতে তুঘলকদের সম্রাট হিসেবে আগমন ঘটে।

ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ কাসিম হিন্দু শাহ আস্তারাবাদীর (Muhammad Qasim Hindu Shah Astarabadi) মতে, গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের পিতা ছিলেন দিল্লির সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবানের একজন তুর্কি –মঙ্গল ক্রীতদাস এবং মা ছিলেন মুসলিম জাট (Jat Muslim) সম্প্রদায়ের। তিনি আরও বলেন যে, তুঘলক (Tughluq) শব্দটি আসলে ভারতে আসার পর তুর্কি কুতলুঘ (Qutlugh) শব্দের পরিবর্তিত রূপ। অর্থাৎ দিল্লি সালতানাতের তুঘলক রাজত্বের আদি পুরুষ একজন মামলুক যোদ্ধা ছিলেন।

১৩২৪ সালে গিয়াস উদ্দিন তুঘলক গৌড় /লখনউতি/বাংলার শাসক গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহকে বন্দি করে গৌড়ে নিয়ে যান ফলে বাংলা তখন সরাসরি দিল্লি সালতানাতের শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু গিয়াসউদ্দিন তুঘলক, গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহকেই সোনারগাঁ এর গভর্নর নিযুক্ত করেন। ১৩২৮ সালে গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহ পুনরায় বিদ্রোহ করলে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক সেনাপতি বাহরাম খাকে প্রেরন করে বাহাদুর শাহের পতন ঘটান এবং বাহরাম খান সোনারগাঁয়ের গভর্নর হন। দিল্লি সালতানাতে তুঘলক রাজবংশ আসার পর সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলক বাংলাকে তিনভাগে ভাগ করেন। সোনারগাঁ পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী, গৌড়/লখনউতি উত্তরবঙ্গের প্রাদেশিক রাজধানী, সপ্তগ্রাম পশ্চিম বাংলার রাজধানী যাদের গভর্নর হিসেবে তিনি নিযুক্ত করেন যথাক্রমে ফখ্রুদ্দিন মুবারক শাহ, আলাউদ্দিন আলী শাহ ও শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। ১৩৫২ সালের মধ্যে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ অন্য ২টি প্রদেশ বিজয় করে পুরো বাংলার শাসক হন।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ একজন তুর্কি ছিলেন যিনি সম্পূর্ণ বাংলাকে একত্র করে ইলিয়াস শাহী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৫২-১৪৮৭ সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ বাংলা, বিহার এবং আরও কিছু অঞ্চল শাসন করে এই রাজবংশের রাজারা। তিনি বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন বর্তমান ভারতের মালদা জেলার পুণ্ড্র বা পাণ্ডুয়া (Pandua) এলাকায় বর্তমানে ফিরোজাবাদ নামে পরিচিত যা ১৩৩৯ - ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত বাংলার রাজধানী ছিল। ১৪৫৪ সালে বাংলার রাজধানী পুনরায় গৌড়/ লকনউতিতে চলে যায়। এই ইলিয়াস শাহী শাসনের মাঝে কিছু সময় গনেশা পরিবার বাংলাকে শাসন করে। যদিও তারা ইসলাম গ্রহন করে মুসলিম হয়েছিলেন কিন্তু তারা ইলিয়াস শাহী রাজবংশের লোক ছিলেন না। এরা হলেন গনেশার (রাজা ফন্দু) ছেলে সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মাদ শাহ (১৪১৫-১৪৩৩); সুলতান শামসুদ্দিন আহমদ শাহ (১৪৩৩-১৪৩৬)। নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ পুনরায় ১৪৩৬ সালে গৌড়/বাংলায়/পুণ্ড্র ইলিয়াস শাহী রাজবংশের শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। (এসময় খুলনা, বাগেরহাট এলাকা খান জাহান আলী শাসন করেন যার প্রকৃত নাম উলুগ খান জাহান (Ulugh Khan)। তিনি একজন তুর্কি ছিলেন যার আদি বংশ উজবেক (Uzbek)। সম্ভবত তিনি দিল্লির তুঘলক সালতানাত থেকে বাগেরহাট, খুলনায় আসেন।) নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৪৩৬-১৪৫৯) পর রোকনুদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪); শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১) জলালউদ্দীন ফতেহ শাহ (১৪৮১-১৪৮৭) পুণ্ড্র/ পানডুয়া থেকে বাংলা শাসন করেন। এরা সবাই ছিলেন ইলিয়াস শাহী রাজবংশের যাদের আদি পুরুষ (শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ) তুর্কি ছিলেন। এরপর বাংলায় আসে হাবশি ক্রীতদাসদের শাসন (শাহজাদা বারবক ১৪৮৭; সাইফউদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৪৮৭-১৪৮৯)। এরা ছিলেন ইলিয়াস শাহী রাজবংশের হাবশি ক্রীতদাস যোদ্ধা যারা যোগ্যতার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদে স্থান পেয়েছিল।

বাংলার ইতিহাস আলোচনার মাঝে আমরা জনপুর সালতানাত (Jaunpur Sultanate) নিয়ে একটু আলোচনা করবো যা উত্তর প্রদেশ থেকে বিহার পর্যন্ত বিসৃত ছিল এবং এর সময়কাল ছিল ১৩৯৪- ১৪৮৬ বা ১৪৯৪ পর্যন্ত। এ সময় দিল্লিতে ছিল তুঘলক রাজবংশ ও সায়্যিদ রাজবংশ। জনপুর সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন মালিক সারওয়ার (Malik Sarwar) যিনি ছিলেন একজন ক্রীতদাস যোদ্ধা। ১৪৭৯ সাল থেকে ১৪৮৬ সাল পর্যন্ত বাহ্‌লুল লোদি জনপুরে হামলা চালান এবং শেষ পর্যন্ত ১৪৮৬ সালে জনপুর সম্পূর্ণ বিজয় করেন। এ সময় জনপুরের শেষ রাজা হুসাইন শাহ বিহারে পালিয়ে যান এবং সুলতান আলাউদ্দিন হুসেইন শাহের নিকট জীবনে শেষ সময়টুকু কাটান। হুসাইন শাহ ছিলেন সাইয়েদ মুহাম্মাদ জইনপুরি (Sayyid Muhammad Jaunpuri 1443-1505) এর একজন ভক্ত। সাইয়েদ মুহাম্মাদ জইনপুরি নিজেকে ১৪৯৬ সালে 'মাহদি' বলে দাবী করেছিলেন এবং সকল মুসলিমকে তার প্রতি ঈমান আনতে বলেছিলেন। তাহলে, বুঝা যাচ্ছে বাহ্‌লুল খান লোদি (Bahlul Khan Lodi) যিনি দিল্লি সালতানাতে লোদি রাজবংশের প্রতিস্থাতা ছিলেন - তিনি হুসাইন শাহকে বিতাড়িত করে সঠিক কাজ করেছিলেন কারণ হুসাইন শাহ একজন দাজ্জালের (সাইয়েদ মুহাম্মাদ জইনপুরি) ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৪৯৪ সালে আলাউদ্দিন হুসেইন শাহ বাংলায় হুসেইন শাহি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক ইতিহাসবিদ

হুসেইন শাহের পূর্ব পুরুষ নবী সাঃ এর নাতি হুসেইন রাঃ এর বংশধর ছিলেন বলে মনে করেন, আবার কেউ কেউ আলাউদ্দিন হুসেইন শাহের আদিপুরুষ আফগান অর্থাৎ পশতুন (Pashtuns) ছিলেন বলে ধারণা করেন। (এই পশতুনদের/ আফগানদের মধ্যে রয়েছে খালিদ বিন ওয়ালিদের বংশধররা।) উভয় ক্ষেত্রেই, মনে হচ্ছে যেন, মদিনা থেকে বের হওয়া দলের যোদ্ধাদের বংশধরদের বংশধর হচ্ছেন আলাউদ্দিন হুসেইন শাহ যিনি এবং তার বংশধররা পরবর্তীতে ঠিক আইন – জালুতের যুদ্ধের মত মঙ্গোলদের বংশধর মুঘল বাদশাহ বাবর ও তার বংশধরদের (মুঘল সম্রাটদের) বিরুদ্ধে লড়াই করেন। উপমহাদেশে অটোম্যান সমর্থিত, পারস্যের সহযোগিতা প্রাপ্ত - মঙ্গোলদের বংশধর মুঘল সম্রাট বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন মদিনা থেকে বের হওয়া দলের বংশধরদের বংশধর হুসেইন শাহ ও তার বংশধর এবং তুর্কি মামলুক যোদ্ধাদের বংশধর ও অন্য মুসলিম ক্রীতদাস যোদ্ধাদের যৌথ বাহিনী। অর্থাৎ উপমহাদেশে যেন আইন-জালুতের যুদ্ধই পুনরায় সংগঠিত হয়েছিল - একবার দিল্লি সালতানাতে আরেকবার এই বাংলায় যার রাজধানী ছিল গৌড় বা লখনৌতি, আবার কখনো পুণ্ড্রয় (পানডুয়া বা ফিরুজাবাদ) আবার কখনো সোনারগায় (ইসা খা).

আলাউদ্দিন হুসেইন শাহ কামতা-কামরূপ বিজয় করেন এবং ত্রিপুরার কিছু অংশ ও তিনি বিজয় করেন। বর্তমান মায়ানমারের আরাকান অঞ্চলেও তিনি অভিযান পরিচালনা করেন। দিল্লির সুলতান সিকান্দার লোদি ১৪৯৫ সালে বাংলার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। দিল্লীর সেনাদের বিরুদ্ধে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তার পুত্র দানিয়েলের (Shahzada Danyal) অধীনে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। দুই বাহিনী পাটনার কাছে 'বড়হ' নামক স্থানে মিলিত হয়। সিকান্দার লোদি তার সেনাদের অগ্রযাত্রা থামানোর নির্দেশ দেন এবং আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি করেন। বুঝা গেলো, উভয়েই মদিনার মুসলিমদের বংশধর (বাহ্‌লুল খান লোদি ও আলাউদ্দিন হুসেইন শাহ উভয়েই পসতুন (আফগান) – যাদের আদি পুরুষের মধ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদের রাঃ এর বংশধর ছিলেন) হওয়ায় তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়াই স্বাভাবিক। (পূর্বে আফগানদেরকে পশতুন নামেই ডাকা হত)

আলাউদ্দিন হুসেইন শাহ ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে হিন্দু- মুসলিম ভেদাভেদ করতেন না। হিন্দুরা তাদের ধর্ম প্রচার ও ধর্মীয় কাজ নির্দ্বিধায় করতে পারতেন। বিজয় গুপ্ত - আলাউদ্দিন হুসেইন শাহকে নৃপতি-তিলক (তিলক অর্থ রাজার চিহ্ন) ও জগৎ-ভূষণ (বিশ্বের সৌন্দর্য) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ১৫১৯ সালে আলাউদ্দিন হুসেইন শাহের মৃত্যুর পর নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ (Nasiruddin Nasrat Shah) গৌড় তথা বাংলার রাজা হন। মঙ্গোলদের বংশধর মুঘল সম্রাট বাবরের ভারত অভিযানের ফলে মাহমুদ লোদি বাংলায় আশ্রয় নেন। ১৫২৭ সালে বাবর বাংলা অভিযানে আসলে নুসরাত শাহ বাবরকে উপহার দেন এবং সন্ধি চুক্তি করেন। কিন্তু ১৫২৯ সালে বাবর ঘাগরার যুদ্ধে আফগান (পশতুন) সুলতান মাহমুদ লোদি ও বাংলা সালতানাতের নুসরাত শাহের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। বাবর বিহার পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেও গৌড়ে বা বাংলায় প্রবেশ করেননি ফলে নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহই বাংলা শাসন করতে থাকেন। ১৫৩৩ সালে নুসরাত শাহের ছেলে আলাউদ্দীন

ফিরোজ শাহকে হত্যার পর নুসরাত শাহের ভাই গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ বাংলার সুলতান হন(১৫৩৩-১৫৩৮)। কিন্তু শের শাহ সুর (পশতুন) ১৫৩৮ সালে গিয়াস উদ্দিন ফিরোজ শাহ ও তার সহযোগী পর্তুগীজদের পরাজিত করে গৌড় তথা বাংলার সুলতান হন। ১৫৩৭ সাল থেকেই শের শাহ সুর মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করেন এবং ১৫৪০ সালে তিনি উত্তর ভারতের সম্রাট হন। শের শাহ সুর বাংলাকে ৪৭ টি ছোট ভাগে ভাগ করেন এবং এ সময় প্রচুর আফগান (পশতুন) বাংলায় বসতি গড়েন যাদের ভিতর থেকে ২ টি রাজবংশের উদ্ভব হয় একটি মুহাম্মাদ খান সুরের (Muhammad Khan Sur also named Shamsuddin Muhammad Shah Ghazi) (১৫৫৩-১৫৬৩) অন্যটি কররানি রাজবংশ (১৫৬৩-১৫৭৬)। শের শাহ সুর খিজির খান সুরকে (১৫৩৯-১৫৪১) বাংলার গভর্নর করে পাঠান কিন্তু খিজির খানের ব্যাপারে বিদ্রোহের সন্দেহ উঠলে এবং বাংলার অতীত ইতিহাসে গভর্নরদের বিদ্রোহের কথা বিবেচনা করে শের শাহ বাংলাকে অনেকগুলো ছোট ছোট অংশে ভাগ করেন যার প্রতিটির দায়িত্ব দেয়া হয় মুক্তারদের আর সকল মুক্তারদের দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয় প্রধান মুক্তার কাজী ফজিলতকে (Qazi Fazilat Shershahi) (১৫৪১-১৫৪৫). শের শাহ সুরের মৃত্যুর পর ইসলাম শাহ সুর দিল্লির শাসক হয়ে ১৫৪৫ সালে মুহাম্মাদ খান সুরকে (Muhammad Khan Sur) গৌড়ের অর্থাৎ বাংলার গভর্নর করেন। কিন্তু ১৫৫৪ সালে দিল্লির শাসক ইসলাম শাহের মৃত্যু হলে ১৫৫৫ সালে মুহাম্মাদ খান সুর (Muhammad Khan Sur) যার রাজকীয় নাম মুহাম্মাদ শাহ (Shamsuddin Muhammad Shah Ghazi) দিল্লি থেকে বিদ্রোহ করে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলা সালতানাত পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বর্তমান মায়ানমারের আরাকান রাজ্য জয় করেন। তিনি বিহার, জনপুর জয় করে দিল্লি জয় করতে গেলে তখনকার দিল্লির সুর সম্রাট আদিল শাহের সেনাপতি হেমুর হাতে নিহত হন। এরপর বাংলা শাসন করেন গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহ-২ (Ghiyasuddin Bahadur Shah II) যার অন্য নাম খিযর খান সুরি-(১৫৫৫-১৫৬১) (Khizr Khan Suri;) তারপর বাংলা শাসন করেন গিয়াসউদ্দীন জলাল শাহ (১৫৬১-১৫৬৩); গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহ-৩ (Ghiyasuddin Bahadur Shah III) (১৫৬৩-১৫৬৪)। গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ-ই ছিলেন মুহাম্মাদ শাহী রাজবংশের শেষ সুলতান।

এই সময়ের মধ্যেই দিল্লি সালতানাতে সুর রাজবংশের পতন ঘটে। গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহ-২ দিল্লির সুর রাজবংশের শেষ দাবীদার আদিল শাহকে ১৫৫৭ সালের একটি যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করেন। ১৫৫৫ সালে সিকান্দার শাহ সুরিকে পরাজিত করে হুমায়ুন পুনরায় দিল্লিতে মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৬৪ সালের দিকে তাজ খান কররানী (Taj Khan Karrani) বাংলার মুহাম্মাদ শাহী রাজবংশের শেষ সুলতান গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহ-৩ কে হত্যা করে বাংলায় কররানী রাজবংশের সূচনা করেন। তাজ খান কররানী ছিলেন শের শাহ সুরির একজন কর্মচারী। কররানী (Karlani/ karrani) হচ্ছে মূলত পশতুনদের (Pashtun) অন্তর্গত একটি গোত্র। অনেকে বলেন, কারলান (karlan) হচ্ছেন পশতুনদের প্রতিষ্ঠাতা কায়িস আব্দুল রশিদের (Qais Abdul Rasheed) পালক পুত্র যাকে একটি রান্নার পাত্রের বিনিময়ে কায়িস আব্দুল রশিদ কিনে নেন। কারলানিদের কিছু

অংশ দাবী করে যে, তারা মুহাম্মাদ সাঃ এর বংশধর। তাজ খান কররানীর পর সুলায়মান খান কররানী (Sulaiman Khan Karrani) বাংলার শাসক হন। তিনি মুঘল বাদশা আকবরকে সমীহ করে চলতেন। তিনি ওড়িশা (Odisha), কুচ বিহার বিজয় করেন। সুলায়মান খান কররানীর পর বায়েজীদ খান কররানী (Bayazid Khan Karrani) রাজা হন এবং তিনি মুঘলদের থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বায়েজিতপুর (Bayazidpur) বর্তমানে বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ; উনার নামে নামকরণ করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রের হত্যায় তার মৃত্যু হলে তার ছোট ভাই দাউদ খান কররানী (Daud Khan Karrani) (১৫৭২-১৫৭৬) বাংলার সুলতান হন। তিনি মুঘলদের অধীনতা স্বীকার না করলে ১৫৭৩ সালে মুঘল সম্রাট আকবরের জনপুরের গভর্নর মুনিম খান (Munim Khan), তোডার মাল (Todar Mal), মান সিংহ (Man Singh) পাটনার যুদ্ধে (Battle of Patna) দাউদ খান কররানীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন যা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। ১৫৭৫ সালে তুকারোইয়ের যুদ্ধের (Battle of Tukaroi) পর মুনিম খান বাংলার রাজধানী টানডা (Tanda) থেকে পুনরায় গৌড়ে নিয়ে আসেন। এ সময় বাংলা, বিহার মুঘলদের দখলে চলে যায় আর ওড়িশা থাকে দাউদ খান কররানীর অধীনে। ১৫৭৫ সালে প্লেগের কবলে পড়লে মুঘলরা পূর্ব বাংলা থেকে পিছু হটেন, এ সময় ইসা খা এবং কালা পাহাড়ও মুঘলদের পিছু হটায় অবদান রাখেন। দাউদ খান কররানী ওড়িশা থেকে বাংলা আসেন এবং গৌড় দখল করে নেন। ১৫৭৬ সালে রাজমাহালের যুদ্ধে আকবরের সেনাপতি খান জাহান কুলি পুনরায় বাংলা আক্রমন করলে দাউদ খান কররানী পরাজিত হন এবং তাকে হত্যার মাধ্যমে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। মুঘলরা বাংলা বিভিন্ন সুবাহে ভাগ করে এবং সুবেদারদের মাধ্যমে শাসন করেন। বাংলায় মুঘলদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান ইসা খাঁ। ১৫৩৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল অঞ্চলে ইসা খাঁ জন্মগ্রহন করেন। ইতিহাসবিদ আবুল ফজলের মতে ইসা খাঁ এর পূর্ব পুরুষ আফগান (পশতুন) ছিলেন। তার মাতা সৈয়দা মোমেনা খাঁতুন (Syeda Momena Khatun) ছিলেন হুসেইন শাহী রাজবংশের গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের মেয়ে। ইসা খা এর খালা ছিলেন শের শাহ সুরের বাংলার গভর্নর খিজির খান সুরাকের স্ত্রী। অর্থাৎ মায়ের দিক থেকে ইসা খাঁ ছিলেন আফগান বংশতভূত। একটি সূত্রমতে তার দাদা ভাগিরথ ছিলেন বাইস রাজপুত যারা বাংলায় চলে আসেন। ভাগিরথের ছেলে অর্থাৎ ইসা খাঁর পিতা সুলাইমান খাঁ ইসলাম গ্রহন করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে বসবাস শুরু করেন। তাজ খান কররানীর বাংলা শাসনের সময় ইসা খাঁ সোনারগাঁয়ের জমিদারি লাভ করেন। ১৫৭৬ সালে দাউদ খান কররানী মুঘলদের কাছে রাজমহলের যুদ্ধে পরাজিত হলে বাংলায় ইসা খাঁ মুঘল বিরোধী অগ্রণী ভুমিকা রাখেন। তিনি ঢাকা, বগুড়া, পাবনা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ জয় করেন। ১৫৭৭ সালে তিনি এগারোসিন্দুর, পাকুন্দিয়া উপজেলা, কিশোরগঞ্জে তার রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক কেন্দ্র গড়ে তুলেন। ১৫৮১-১৫৮২ সালের দিকে তিনি সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সোনারগাঁয়ে প্রশাসনিক কেন্দ্র নিয়ে আসেন। ১৫৭৮ সালে মুঘল সুবেদার খান জাহান সরাইলে হামলা করলে ইসা খাঁ ত্রিপুরার মহারাজ অম্র মানিক্যের কাছে সহযোগিতার জন্য যান, কিন্তু ইসা খাঁ ফিরে আসার পূর্বেই মাজলিস প্রতাপ এবং

মাজলিস দিলায়ার মুঘল সুবেদার খান জাহানকে পরাজিত করেন। খান জাহান তানডাহে চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন।

১৫৮৩ সালে মুঘল সেনাপতি শাহবাজ খান সোনারগাঁ, কাটরাবো, এগারোসিন্দুরে হামলা করেন, তিনি মাসুম কাবুলির পাঠান ফৌজকেও পরাজিত করতে ঢাকার বিক্রমপুরের কাছাকাছি চলে আসেন। ১৫৮৪ সালে ইসা খাঁ এবং মাসুম কাবুলির যৌথ বাহিনী মুঘল সেনাপতি শাহবাজ খানকে পরাজিত করলে শাহবাজ খান টানডায় পালিয়ে যান।

১৫৮৫ বা ১৫৮৬ সালে ইসা খাঁ রাম হাজরা ও লক্ষমণ হাজরাকে পরাজিত করে জঙ্গলবাড়ি (করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ) দখল করে নেন। ১৫৮৬ সালে ইসা খাঁ মুঘলদের আক্রমণের শিকার হতে নিলে তিনি মুঘলদের অধীনতা শিকার করে নেন এবং মাসুম কাবুলিকে হজে পাঠানোর অঙ্গীকার করেন। ইসা খাঁ প্রথমে রঘুদেভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও পরবর্তীতে তিনি রঘুদেবের সাথে মুঘলদের মুকাবিলার জন্য শান্তি চুক্তি করেন। ১৫৯৫ সালে মুঘল বাদশাহ আকবরের সেনাপতি মান সিং ইসা খাঁকে পরাজিত করার জন্য অগ্রসর হলে ইসা খাঁ রঘুদেব, কেদার রাই এর সাথে মুঘলদের মোকাবিলায় সন্ধি করেন। ১৫৯৭ সালে যুদ্ধ শুরু হলে ইসা খা, মাসুম কাবুলিকে সাথে নিয়ে মুঘল নৌবাহিনী বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মুঘলদের দুর্জন সিং মারা যান এবং মুঘল ও কোচ বিহারের যৌথ বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়।

ইসা খাঁ ও মুঘল সেনাপতি মান সিং এর দৈত যুদ্ধে (Duel) মান সিং এর তলোয়ার ভেঙ্গে গেলে ইসা খাঁ তাকে হত্যা করেননি এতে মান সিং খুশি হন এবং ইসা খাঁকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন করেন। ইসা খাঁ মুঘলদের বুঝাতে সক্ষম হন যে, মুঘলদের জন্য বাংলা সম্পূর্ণরূপে দখল করে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মুঘল সম্রাট আকবর ইসা খাঁকে ২২ টি পরগণা শাসন করতে দেন। পরগণাগুলোর নামঃ ১)আতিয়া (টাঙ্গাইল) ২) কাগমারি (টাঙ্গাইল) ৩) বাড়াবাজু (টাঙ্গাইল) ৪) শেরপুর (শেরপুর) ৫) জায়ান শাহী (Jayan Shahi) (কিশোরগঞ্জ) ৬) Alapsing (টাঙ্গাইল) ৭)ময়মনসিংহ ৮) ……………… ইত্যাদি।

১৫৯৯ সালে ইসা খাঁ মৃত্যু বরণ করেন। বলতে গেলে ইসা খার মৃত্যুর পরই বাংলায় মুঘলদের শাসন শুরু হয় যদিও ইসা খাঁর ছেলে মুসা খাঁ ১৫৯৯ সাল থেকে ১৬১০ সাল পর্যন্ত মুঘলদের প্রতিরোধ করেছিলেন কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গিরের সময় মুঘল সেনাপতি ইসলাম খান চিশতী তাকে বন্দি করেন এবং চিশতী বাংলার মুঘল গভর্নর হন। মুসা খাঁ মুঘলদের আনুগত্য মেনে নিলে মুঘল গভর্নর মির্জা ইবরাহীম বেগের (Ibrahim Khan Fath-i-Jan) সময় মুসা খাঁ মুঘলদের পক্ষে যুদ্ধ করেন। মুসা খাঁর ছেলে মাসুম খাঁ ও মুঘলদের পক্ষেই যুদ্ধ করেন।

আমি আগেই বলেছি মুঘলদের বংশধারা (Blood Line) হচ্ছে মঙ্গোলদের বংশধারা (Blood Line) যেহেতু মুঘল সম্রাট বাবর ছিলেন পিতার দিক থেকে মঙ্গোল সম্রাট তইমুর লঙ্গের (Timur) বংশধর এবং মায়ের দিক থেকে

মঙ্গোল সম্রাট চেঙ্গিস খানের (Genghis Khan) বংশধর। যারা মনে করেন, মঙ্গোলরা ভারত শাসন করেনি – তাদের ধারণা ভুল। মুঘল শাসন-ই হচ্ছে ভারতে মঙ্গোলদের শাসন যদিও তারা ইসলাম গ্রহন করেছিল। এরাই হচ্ছে দাজ্জাল অটোম্যান ও দ্বৈতবাদের মতাদর্শভিত্তিক পারস্যের সমর্থনে ভারতে দাজ্জালের অনুপ্রবেশ। মুঘলদের মাধ্যমেই ভারতে প্রথম দাজ্জাল আবির্ভূত হয় যারা মামলুক তুর্কি মুসলিম (দিল্লির মামলুক রাজবংশের বংশধর, খিলজি রাজবংশের বংশধর,তুঘলক রাজবংশের বংশধর,) ও মদিনা থেকে বের হওয়া দলের (লোদি রাজবংশ এবং সুর রাজবংশ, কররানী রাজবংশ, ইসা খাঁ, (আদি পুরুষ আফগানী/পশতুন জাতির)) বংশধরদের বিরুদ্ধে উপমহাদেশে যুদ্ধ করে।

সর্বশেষ যে উপসংহারে আমরা পৌছতে পারি সেটা হচ্ছে, বাঙ্গালী বলতে আমরা যেটা বুঝি, বাঙ্গালী মুসলিমদের শরীরে এখন আর শুধু বাঙ্গালী রক্ত নয় বরং তাদের রক্তে মিশেছে আফগানি অর্থাৎ পসতুন রক্ত যাতে রয়েছে মদিনা থেকে বের হওয়া খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ এর বংশধরদের রক্ত (লোদি ও সুর রাজবংশ, হুসাইন শাহী রাজবংশ, মুহাম্মাদ শাহী রাজবংশ, কররানী রাজবংশ, ইসা খাঁ,) এবং তাদের রক্তে মিশেছে মুসলিম তুর্কি মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যোদ্ধাদের রক্ত বা মামলুক রক্ত (মামলুক রাজবংশ,খিলজি রাজবংশ, তুঘলক রাজবংশ, ইলিয়াস শাহী রাজবংশ) শুধু বাংলা নয়- সমগ্র ভারতের মুসলিমদের মধ্যেই এই রক্ত বিদ্যমান তবে দিল্লি সালতানাত ও বাংলা সালতানাত যে অঞ্চলগুলো শাসন করেছে সেখানে এরূপ মুসলিমদের সংখ্যা বেশি আছে বলে মনে করি।

এখন আমরা জানতে চাই, এই যে মদিনার মুসলিমদের বংশধারা এবং তুর্কি মামলুকদের বংশধারা; মুসলিম ভারতীয় এবং মুসলিম বাঙ্গালীদের রক্তে কতটুকু মিশেছে বা তারা কি মদিনার মুসলিম ও তুর্কি মামলুক যোদ্ধাদের দূরতম বংশধর হয়ে উঠেছে কি না? ১৫০০ সালের দিকে গৌড় তথা বাংলার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২ লাখের মত। (তথ্য সুত্রঃ "Bar chart race: the most populous cities through tim", Financial Times, 20 March 2019, archived from the original on 17 November 2021, retrieved 31 December 2019)

তাহলে, ১২০৪ সালে যখন খিলজি রাজবংশ বাংলায় শাসন শুরু করে তখন বাংলার জনসংখ্যা আরও কম হওয়াই স্বাভাবিক হবে। এরপর বাংলায় একের পর এক তুর্কি মামলুক রাজবংশ শাসন করেন, তারপর বাংলায় শুরু হয় আফগানি /পশতুনদের শাসন (মদিনা থেকে বের হওয়া মুসলিমদের বংশধরদের শাসন)। ১২০৪ সাল থেকে ১৭৫০ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ ৫৪৬ বছরে প্রচুর তুর্কি যোদ্ধা, আফগানি যোদ্ধা, শাসক, তুর্কি ও আফগানি সাধারণ মানুষ বাংলায় এসে বসবাস শুরু করে। তাদের ও তাদের সন্তানদের সাথে স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলিমদের (converted muslim) মধ্যে বিয়ে হতে থাকে। এটা বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। ইংরেজদের থেকে মামলুক ও আফগানিদের সাথে পার্থক্য হচ্ছে ইংরেজরা উপমহাদেশকে কখনো নিজের দেশ ভাবেনি এবং এই দেশে তাদের

থাকার ইচ্ছাও কখনো ছিল না কিন্তু মামলুক ও আফগানিরা এই দেশেই বসবাস শুরু করে এবং তারা আর নিজের দেশে ফিরে যায়নি।

মুসলিমদের বংশধারা পিতা-মাতা উভয় দিক থেকেই ধরা হয় যদিও কিছু লোক শুধু পিতার দিকের টাই ধরেন কিন্তু এটা ভুল। কারণ মাহদি আসবেন মুহাম্মাদ সাঃ এর বংশ (Blood Line) থেকে। মুহাম্মাদ সাঃ এর কোন ছেলে সন্তান বাঁচত না তাহলে বুঝা যাচ্ছে ফাতিমা রাঃ এর বংশধররাই হচ্ছেন নবী সাঃ এর বংশধর। আরেকটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মাহদি আসবেন ফাতিমা রাঃ এর ছেলে হাসান রাঃ এর বংশ থেকে। এখান থেকে পরিষ্কার যে, ইসলামে পিতা-মাতা উভয়ের থেকেই বংশধারা (Blood Line) ধরতে হবে। তাহলে, উপমহাদেশে এমন কোন মুসলিম বর্তমানে হয়তো নেই যিনি কোন না কোনভাবে মদিনার মুসলিম বা তুর্কি মামলুকদের দূরতম বংশধর নন; এমন কি কিছু কিছু জায়গার মুসলিমরা তো মদিনার মুসলিম ও তুর্কি মামলুক উভয়েরই বংশধর।

বাংলাদশে উভয় রক্তই পেয়েছে এই রকম মুসলিম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হবার সম্ভাবনা বেশি কারণ ইসা খাঁ ও তার পরিবার এবং আরও অনেক আফগানি/ পশতুন এই এলাকায় (সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রথম এসে বসবাস শুরু করেছিল। এছাড়া আফগানিস্থানের পসতুনদের মধ্যে উভয় রক্তই পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। গত ৫০০ বছরে আফগানিস্থানকে কোন সাম্রাজ্যই পরাধীন করতে পারেনি। আফগানিস্থানের বিভিন্ন গোত্র যদি বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখবেন এদের মধ্যে মদিনার মুসলিম ও তুর্কি মামলুক উভয় বংশধারার লোক আছে। নবী সাঃ এর হাদিস অনুযায়ী মদিনা থেকে একটি দল বের হবে যারা আমাক বা দাবিক অঞ্চলে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হবে। সাহাবীদের হাতে শুরু হওয়া সেই যুদ্ধ প্রায় ৮০০ বছর ধরে চলে ছিল। প্রথমে সাহাবীরা রোমানদের পরাজিত করার পর রোমানরা আবার জেরুজালেম দখল করে নেয় তারপর আইয়ুবীরা রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারপর মুসলিম মামলুকরা রোমানদের পরাজিত করে আরব ভূখণ্ড থেকে রোমানদের বিতাড়িত করেছিল। মামলুকরা মঙ্গোলদেরও আইন-জালুতের যুদ্ধে পরাজিত করেছিল। কিন্তু দাজ্জাল অটোম্যানরা ১৫১৭ সালে মামলুকদের (Mumluk Sultanat of Egypt) পরাজিত করে মক্কা, মদিনা সহ পুরো এলাকা দখল করে নিয়েছিল।

হাদিসের ভাষা থেকে বুঝা যায় যে, মদিনার যেই দল বের হয়েছিল তারা আর মদিনায় ফিরে যাবে না বরং তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বসবাস শুরু করবে। যাদের মধ্যে থেকে অন্তত কিছু লোক বা তাদের বংশধররা উপমহাদেশে বিশেষ করে আফগানিস্থান (পসতুন), দিল্লি সালতানাত, বাংলা সালতানাতে বসবাস করেছেন এবং তাদের রক্তই এই এলাকাগুলোর মুসলিমদের রক্তে বইছে অর্থাৎ এই এলাকাগুলোর মুসলিমরা হচ্ছেন মদিনার থেকে বের হওয়া দলের অনেক দূরের বংশধর।

উপমহাদেশে (পাকিস্থানে) ২য় বার দাজ্জালের আবির্ভাব

এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, দাজ্জাল প্রথমবার আবির্ভূত হয়েছে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সময় যখন সে নিজেকে নবী দাবী করেছে। আর দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হয়েছে মদিনা বিজয়ের পর যখন সে খিলাফতকে বাতিল করে দিয়ে, মানুষকে (জনগণকে) সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক দাবী করে, মানুষকে আইনদাতা হিসেবে দাবী করার মাধ্যমে নিজেকে 'রব' বলে দাবী করছে।

পাকিস্থানে দ্বিতীয়বার দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে। ১৯৪৬ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 'ক্লিমেন এটলীর' উদ্যোগে ভারতে 'কেবিনেট মিশন ১৯৪৬' (1946 Cabinet Mission to India) নামে একটি প্ল্যান নিয়ে ভারতের কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের সাথে আলোচনায় বসে ব্রিটিশ সরকার। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা। উক্ত পরিকল্পনায় কিছু প্রস্তাব ছিল যার মধ্যে প্রধান কিছু প্রস্তাব হচ্ছেঃ সম্পূর্ণ ভারত একটি রাষ্ট্র থাকবে; হিন্দু অধ্যুষিত প্রদেশগুলো একটি গ্রুপে থাকবে আবার মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলো আলাদা একটি গ্রুপে থাকবে। প্রত্যেক গ্রুপের আলাদা সরকার ব্যবস্থা থাকবে। মুসলিম ও হিন্দু অধ্যুষিত প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসন পাবে। প্রতিটি প্রদেশ চাইলে তার গ্রুপ থেকে বের হয়ে অন্য গ্রুপে যোগদান করতে পারবে। ভারতীয় কংগ্রেস পার্টি অখণ্ড ভারত অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভারত একটি রাষ্ট্র থাকবে এই প্রস্তাব মেনে নিলেও গ্রুপ সিস্টেম মেনে নিতে অস্বীকার করে কারণ তারা মনে করে যে, এতে মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলো বেশি শক্তিশালী হয়ে যাবে। মুসলিম লীগ 'কেবিনেট মিশন ১৯৪৬' প্রথমে মেনে নিলেও পরে যখন কংগ্রেস গ্রুপ সিস্টেম মেনে নিতে অস্বীকার করে তখন মুসলিম লীগও 'কেবিনেট মিশন ১৯৪৬' না মেনে মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবী করে।

১০ জুলাই, ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস পার্টি প্রধান জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেছিলেন যে, "কংগ্রেস কোনও গ্রুপের দ্বারা আবদ্ধ নয়"। মুসলিম লীগ প্রধান মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ, কংগ্রেস প্রধান জওহরলাল নেহরুর এই বক্তব্যে প্রচুর ক্ষিপ্ত হন। জিন্নাহ বুঝতে পারেন যে, ভারত বিভাজন করে মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র না করলে মুসলিমরা পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাবে না। মূলত, ১০ জুলাই, ১৯৪৬ সালে জওহরলাল নেহরুর বক্তব্যের ফলেই জিন্নাহ ভারত ভেঙ্গে মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র দাবী করেন। বলতে গেলে সেদিন-ই মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্থানের স্বাধীনতার সূচনা হয়।

হিন্দু প্রধান কংগ্রেস মুসলিমদের আলাদা রাষ্ট্র হতে দিতেই চাইছিল না, এমন কি তারা মুসলিম প্রদেশগুলোর জন্য আলাদা সরকার ব্যবস্থার যে গ্রুপিং সিস্টেম ব্রিটিশরা প্রস্তাব করেছিল সেটারও বিরোধিতা করেছিল। ফলে, মুসলিমদের সামনে তখন আন্দোলন করে আলাদা রাষ্ট্র আদায় করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আমরা যুদ্ধ চাই না। যদি তোমরা যুদ্ধ চাও,

তাহলে আমরা তোমাদের (যুদ্ধের) প্রস্তাব নির্দ্বিধায় গ্রহণ করব। হয় ভারত বিভক্ত হবে, নয়তো ভারত ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।" মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ১৬ই অগাস্ট, ১৯৪৬ সাল দিনটিকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' বা 'ডাইরেক অ্যাকশান ডে' (Direct Action Day) দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। এদিন মুসলিম লীগের ডাকে মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবীতে সারা ভারতে হরতাল চলবে অর্থাৎ সকল প্রতিষ্ঠান, দোকান-পাট, বিদ্যালয় ইত্যাদি বন্ধ থাকবে।

এই 'ডাইরেক অ্যাকশন ডে' কর্মসূচির সফলতার উপর মুসলিমদের আলাদা রাষ্ট্র পাবার বিষয়টি পুরোপুরি নির্ভর করছিলো। হিন্দুরা এই কর্মসূচি যেন সফল না হয় সেটাই চাইছিল। এই কর্মসূচি সফল করার জন্য সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বেশি রক্ত দেয় বাংলার মুসলিমরা যা 'কলকাতা দাঙ্গা' (Calcutta Riots 1946) নামে পরিচিত। আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলা অঞ্চলের মুসলিমদের অবদানকে ছোট করার জন্যই হয়তো এরূপ নাম ('কলকাতা দাঙ্গা') দেয়া হয়েছে। ১৬ই অগাস্ট, ১৯৪৬ দিনটিতে কলকাতা তথা বাংলা অঞ্চলের মুসলিমরা সকল দোকানপাট, প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় ইত্যাদি বন্ধ রাখার পক্ষে ছিল কিন্তু হিন্দুরা এই কর্মসূচীতে বাধা দিলে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতায় তিন দিনের মধ্যে ৪,০০০ লোক প্রান হারায় এবং প্রায় ১ লাখেরও বেশি লোক গৃহহীন হয়। এই ঘটনার পর ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে যে, ভারত ভেঙ্গে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কোন উপায় নেই কারণ মুসলিমদের আলাদা রাষ্ট্রের দাবী আদায়ের এই আন্দোলন ও তার বিপরীতে হিন্দুদের প্রতিরোধের ফলে কলকাতায় তৈরি হওয়া সংঘর্ষ পরবর্তীতে নোয়াখালী (Noakhali Riots October, 1946) , বিহার, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও পাটনা অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। এতে প্রচুর সংখ্যক মুসলিম মৃত্যু বরণ করেন। 'ডাইরেক অ্যাকশান ডে' তে আমাদের পূর্ব পুরুষ বাংলা অঞ্চলের মুসলিমরা যে অবদান রেখেছিল তা পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার অন্যতম নিয়ামক হয়ে যায়। সেদিন বাংলা অঞ্চলের মুসলিমরা 'ডাইরেক অ্যাকশন ডে' কর্মসূচি সফল করতে আন্দোলন করে, নিজেদের জীবন দিয়ে মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। কংগ্রেস এই কলকাতা দাঙ্গার জন্য তৎকালীন বাংলার মুসলিম লীগ নেতা ও চীফ মিনিস্টার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দায়ী করে।

আবদুল্লাহ বিন বুসর বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, "মহাযুদ্ধ এবং শহর (The City) বিজয়ের মধ্যে সময়কাল হবে ছয় বছর, এবং সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।" (মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৪২৬) (আমি মনে করি, উক্ত হাদিসে শহর বলতে কোন সাম্রাজ্যের বা দেশের রাজধানীকে বুঝানো হয়েছে কারণ রাজধানীর পতন হলেই সেই সাম্রাজ্য বা দেশের পতন হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়।)

ইংল্যান্ডের হিসাব মতে, ২য় বিশ্ব যুদ্ধে ইংল্যান্ড সত্যিকার অর্থে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে অংশগ্রহন শুরু করে ১০ জুলাই, ১৯৪০ সালে। ১০ জুলাই, ১৯৪০ সাল থেকে ৩১ অক্টোবর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত চলা 'Battle of Britain' এর মাধ্যমেই কার্যত ইংল্যান্ড ২য় বিশ্ব যুদ্ধে অংশগ্রহন শুরু করে। ১০ জুলাই, ১৯৪৬ সালে জওহরলাল নেহরুর

বক্তব্যে গ্রুপ সিস্টেম মেনে না নেবার মধ্য দিয়ে এবং মুসলিম লীগকে অবজ্ঞার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন ও ভারত থেকে আলাদা হয়ে একটি মুক্ত মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্থান গঠিত হবার সূচনা হয়।

১০ জুলাই, ১৯৪০ সাল থেকে ১০ জুলাই, ১৯৪৬ সালের মধ্যে সময় থাকে প্রায় ৬ বছর।

(যেহেতু ১৯৪০ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ ব্রিটেন তথা ইংল্যান্ডের অধীনে ছিল এবং ব্রিটেনের অধীনে থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশ ২য় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিল, তাই ব্রিটেন বা ইংল্যান্ডের ২য় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহন ভারতীয় উপমহাদেশেরই ২য় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহন হিসেবে বিবেচিত হবে।)

ব্রিটিশদের থেকে পাকিস্থান স্বাধীনতা লাভ করে ১৪ই অগাস্ট, ১৯৪৭ সালে। কিন্তু মূলত এই স্বাধীনতার ভিত্তি এবং ভারতীয় উপমহাদেশকে ভেঙ্গে ভারত ও পাকিস্থান নামে ২ টি আলাদা দেশ করা হবে এই পরিকল্পনা করেন মাউন্টবেটেন (Mountbatten) যা মাউন্টবেটেন প্ল্যান নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালের ৩ রা জুন ব্রিটিশ সরকার এই প্ল্যানটি ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭' (Indian Independence Act 1947) ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস হয় যার ফলে ভারতীয় উপমহাদেশকে ভেঙ্গে ভারত ও পাকিস্থান নামে দুটি আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম হয় ১৫ই অগাস্ট, ১৯৪৭ সালে। ১০ জুলাই, ১৯৪০ সাল থেকে ১৮ই জুলাই,১৯৪৭ সালের মধ্যে সময় থাকে ৭ বছর ৮ দিন অর্থাৎ ৭ বছর। মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ-ই পাকিস্থান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখেন এবং স্বাধীন পাকিস্থানের প্রথম সরকার প্রধান 'গভর্নর জেনারেল' (governor-general of Pakistan) হয়ে দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হন কারণ তিনি পাকিস্থানের সংবিধান ও ব্রিটিশ রাজপরিবারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেলের পদ গ্রহন করেন। পাকিস্থানের সংবিধান আল্লাহ এর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করলেও গণতন্ত্রকে স্বীকার করে। তাই, এটি দাজ্জালের সংবিধান। তখন থেকে এখন পর্যন্ত পাকিস্থানে দাজ্জালের শাসন-ই চলছে।

২য় বিশ্ব যুদ্ধ নিঃসন্দেহে বড় যুদ্ধ কারণ এই যুদ্ধে প্রথম পারমাণবিক বোমা বেবহ্রিত হয়েছিল। যে শহরটি ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত বা বিজয় হয়েছিল তা হচ্ছে করাচী কারণ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত করাচী ছিল পাকিস্থানের রাজধানী। আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) যে শহরের কথা বলেছেন তাকে রাজধানী শহর হিসেবে গ্রহন করেছি কারণ রাজধানীর পতন হলে একটি সাম্রাজ্যের বা রাষ্ট্রের পতন হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়।

উপমহাদেশের মুসলিমদের রক্তের বিনিময়ে মুসলিমরা আলাদা রাষ্ট্র পেলেও তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি কারণ তাদের নেতা জিন্নাহ গণতন্ত্র নামক মতাদর্শকে গ্রহন করেছিল। উপমহাদেশের মুসলিমদেরকে ইসলামি খেলাফতের দিকে ডাকবে - এমন নেতা এখনো আমরা পাইনি। বাংলা অঞ্চলের মুসলিমরা পাকিস্থান প্রতিষ্ঠায় যে অবদান রেখেছে তা কখনোই ইতিহাসবিদদের কাছে শুনিনি বরং তারা এই অঞ্চলের মুসলিমদের পাকিস্থান তৈরির পিছনে যে অবদান তাকে 'কলকাতা দাঙ্গা' বলে চালিয়ে দিয়েছে। নিজেকে জানতে হলে নিজের পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস জানতে হবে। আমি এই বইয়ে বাংলা অঞ্চলের মুসলিমদের পূর্ব পুরুষদের

ইতিহাস তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। আল্লাহ এর রহমতে, এই অঞ্চলের মুসলিমরা অস্বাভাবিক রকমের সাহসী এবং ইতিহাস তার সাক্ষী। এরা হচ্ছে মুসলিম মামলুক যোদ্ধাদের অনেক দূরের বংশধর এবং সম্ভবত মদিনা থেকে বের হওয়া দলের রক্তও এদের শরীরে ছিটে –ফোটা হলেও আছে।

এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, দাজ্জাল প্রথমবার আবির্ভূত হয়েছে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সময় যখন সে নিজেকে নবী দাবী করেছে। আর দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হয়েছে মদিনা বিজয়ের পর যখন সে খিলাফতকে বাতিল করে দিয়ে, জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক দাবী করে, নিজেকে আইনদাতা হিসেবে দাবী করে – নিজেকে সে 'রব' বলেই দাবী করেছে। মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক প্রথম সেকুলারিসম ভিত্তিক তুরস্ক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দাজ্জালের এই ধারণা পৃথিবীতে / মুসলিমদের মাঝে নিয়ে এসেছেন। মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের পর যত জন দাজ্জাল-ই আবির্ভূত হোক না কেন – তারা সবাই নিজেকে 'রব' বলেই দাবী করবে এবং করছে – এই ধারাই এখন চলছে। দ্বিতীয়বার দাজ্জাল আবির্ভূত হয়ে নিজেকে 'রব' দাবী করার পর দাজ্জালের মূল মতাদর্শের আর কোন পরিবর্তন হবে না – কামাল আতাতুর্কের পর আবির্ভূত সকল দাজ্জাল নিজেকে 'রব' বলেই দাবী করছে এবং করবে যেমনঃ ইবনে সউদ এবং মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ।

বঙ্গ বা বাংলা অঞ্চলে ২য় বার দাজ্জালের আবির্ভাব

আবদুল্লাহ বিন বুসর বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, "বড়যুদ্ধ/ভয়াবহ যুদ্ধ এবং শহর (The City) বিজয়ের মধ্যে সময়কাল হবে ছয় বছর, এবং সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।" (মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৪২৬) (আমি মনে করি, উক্ত হাদিসে শহর বলতে কোন সাম্রাজ্যের বা দেশের রাজধানীকে বুঝানো হয়েছে কারণ রাজধানীর পতন হলেই সেই সাম্রাজ্য বা দেশের পতন হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়।)

১৯৭১ সালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ পাকিস্থানের অংশ ছিল। ১৯৬৫ সালে পাকিস্থান-ভারতের মধ্যে একটি বড় যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় যা ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ (Indo-Pakistani war of 1965) নামে পরিচিত। এই যুদ্ধটি মূলত শুরু হয় অপারেশন জিব্রালটার (Operation Gibraltar) নামে যখন ১৯৬৫ সালের ৫ই অগাস্ট পাকিস্থানি বাহিনী ছদ্দবেশে ভারত শাসিত কাশ্মীরে প্রবেশ করে। যুদ্ধে উভয় পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও পরিষ্কারভাবে কাউকে বিজয়ী ঘোষণা করা যায় না। এই যুদ্ধেই মুসলিমরা প্রথম বড় আকারের সামরিক ট্যাঙ্ক (War Tank) ব্যাবহার করে অর্থাৎ মুসলিমদের যুদ্ধের অস্ত্র ও কলা- কৌশল পরিবর্তন হয় এই যুদ্ধের মাধ্যমে – সুতরাং এই যুদ্ধটিকে আমরা বড় যুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারি।

১৯৬৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের রেসুলেশন ২১১ (United Nations Security Council Resolution 211) এর মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়, ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ। মূলত এই ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ তথা রাজধানী 'ঢাকা শহর' দাজ্জাল দ্বারা শাসিত পাকিস্থান থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং 'ঢাকা শহর' পাকিস্থানের দাজ্জালের শাসন থেকে মুক্ত হয়। ১৯৬৫ সালের ৫ই অগাস্ট থেকে ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ মাঝে সময় প্রায় ৫ বছর ৮ মাস। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ তথা রাজধানী ঢাকা শহর' ছিল দাজ্জাল মুক্ত ও দাজ্জাল থেকে স্বাধীন কারণ তখন এখানে কার্যত কোন সরকার ছিল না। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ, যার রাজধানী ঢাকা শহর, একটি গনত্রান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় যার সরকার প্রধান হন শেখ মুজিবর রহমান।
শেখ মুজিবর রাহমান পাকিস্থানের কারাগার থেকে বাংলাদেশে আসেন ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী। ১৯৬৫ সালের ৫ই অগাস্ট থেকে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত, মাঝে সময় ৬ বছর ৫ মাস। অর্থাৎ সপ্তম বছরে শেখ মুজিবর রাহমান দাজ্জাল হিসেবে বাংলাদেশে আবির্ভূত হন। তিনি এমন একটি সরকারের প্রধান হন যে সরকার মানুষকে আইনদাতা হিসেবে স্বীকৃতি (গনতন্ত্র) দেয়, জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে এবং আল্লাহকে আইনদাতা হিসেবে অস্বীকার করে- ঠিক মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের মত।

যদি শেখ মুজিবর রাহমান বাংলাদেশে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করে ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতেন তাহলে তিনি দাজ্জাল হতেন না; তিনি হতেন মুসলিমদের খলিফা যেহেতু পৃথিবীতে তখন মুসলিমদের অন্য কোন খলিফা ছিলেন না, তাই তখন বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে খলিফাতুল মুসলেমিন হিসেবে ঘোষণা করতে পারতেন শেখ মুজিবর রাহমান কিন্তু তিনি সেটা না করে গণতান্ত্রিক সরকারের সরকার প্রধান হলে বাংলাদেশে তিনি দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হন।

পাকিস্থানের দাজ্জালের শাসন থেকে ২৬ মার্চ ,১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তির ঘোষণা দিলে রাজধানী ঢাকা শহর বিজয় (দাজ্জাল মুক্ত) হয় কিন্তু বাংলাদেশকে পুনরায় গনতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাওয়ায় ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকারের সরকার প্রধান হিসেবে শেখ মুজিবর রহমান দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হন।
এরপর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে দাজ্জালের শাসন- ই চলছে।

ইমাম মাহদিঃ

হাদিস এবং ইতিহাস বিশ্লেষণ করে এবং ব্যাখ্যা থেকে এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ যে ইমাম মাহদির কথা বলেছেন, তা হচ্ছে টাইটেল বা পদবী। যেমনঃ 'আসাদুল্লাহ' ছিল হামজা রাঃ এর টাইটেল বা পদবী। 'সাইফুল্লাহ' ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদের টাইটেল বা পদবী। 'আসাদুল্লাহ' বা 'সাইফুল্লাহ 'তাদের প্রকৃত নাম নয়। তেমনিভাবে 'মাহদি' হচ্ছে একটি টাইটেল বা পদবী, শেষ জমানায় যিনি বা যারা মাহদি হিসেবে আসবেন তাদের প্রকৃত নাম মাহদি হবে না। কিন্তু আল্লাহ এর রসূল সাঃ তাদের টাইটেল বা প্রতীকী নাম দিয়েছেন মাহদি। সাহিহ মুসলিম ২৮৯৭ এর হাদিসের কিছু অংশ নিচে দেয়া হলঃ

"……………………………তারা নিজেদের তরবারী যায়তুন বৃক্ষে লটকিয়ে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ বন্টন করতে থাকবে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে শয়তান চিৎকার করে বলতে থাকবে- দাজ্জাল তোমাদের পরিবারে তোমাদের অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। এ কথা শুনে মুসলিমরা সেখান থেকে বের হবে। কিন্তু এতে কোন লাভ হবে না। আর যখন তারা সিরিয়া পৌছবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে (সারিবদ্ধ হতে) থাকবে তখন সেখানে দাজ্জাল আসবে। ………………………" । (সাহিহ মুসলিম ২৮৯৭)

মদিনা থেকে যে দলটি বের হয়েছিল তারা বিজয়ী হবার পর যখন নিজেদের তরবারী যায়তুন বৃক্ষে লটকিয়ে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ বন্টন করতে থাকবে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে শয়তান চিৎকার করে বলতে থাকবে- দাজ্জাল তোমাদের পরিবারে তোমাদের অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। আর যখন তারা সিরিয়া পৌছবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে (সারিবদ্ধ হতে) থাকবে তখন সেখানে দাজ্জাল আসবে। আমি বলেছি এই শয়তান হচ্ছে ব্রিটিশ এম্পায়ার যখন তারা মক্কার শরীফ হুসেইন বিন আলী আল- হাশিমিকে (Hussein bin Ali al-Hashimi) ও মক্কা, মদিনার মুসলিম নেতাদেরকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, খেলাফত থাকতে হবে মক্কা, মদিনার আরবদের হাতে; খলিফা হতে হবে আরবদের মধ্য থেকে; সেটা তুর্কিরা নিয়ে নিয়েছে অর্থাৎ পরিবারের দায়িত্ব তোমাদের বদলে দাজ্জাল নিয়ে নিয়েছে। (অটোম্যান সম্রাটরা কেন দাজ্জাল তা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।) এ কথা শুনে মুসলিমরা সেখান থেকে বের হবে। কিন্তু এতে কোন লাভ হবে না। 'এতে কোন লাভ হবে না' এই কথার অর্থ হচ্ছে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হলেও সেই খেলাফত কার্যকরীভাবে বেশিদিন পৃথিবীতে টিকতে পারবে না। আমরা জানি, ৩ মার্চ ১৯২৪ সাল থেকে ১৪ই মার্চ ১৯২৪ সালের মধ্যে হুসেইন বিন আলী আল- হাশিমিকে (Hussein bin Ali al-Hashimi) খলিফা হিসেবে মুসলিমরা গ্রহন করেন। তিনি ১৯৩১ সালের ৪ জুন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত খলিফা ছিলেন। তাকে হেজাজের মুসলিমরা, বাগদাদের মুসলিমরা, সুন্নি ও শিয়ারা, ভারত ও পাকিস্থানের মুসলিমরা, মেসোপটেমিয়া, ট্রান্সজর্ডানের সকল মুসলিমরা খলিফা হিসেবে গ্রহন করেছিলেন। এমনকি ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ অটোম্যান খিলাফত ধ্বংসের পর অটোম্যানদের শেষ সুলতান বা খলিফা মেহমেদ-৬ (Mehmed VI Vahideddin) হুসেইন বিন আলী আল –হাশিমিকে খলিফা হিসেবে সমর্থন করেন। শিয়ারাও হুসেইন বিন আলী আল –হাশিমি খলিফা হওয়ায় খুশি হন এই চিন্তা করে যে, কুরাইশদের মধ্যে থেকে একজন খলিফা নিযুক্ত

হয়েছে। তাই, শিয়ারাও হুসেইন বিন আলী আল –হাশিমিকে খলিফা হিসেবে মেনে নেন। এক কথায়, মুসলিম বিশ্বের সবাই হুসেইন বিন আলী আল –হাশিমিকে খলিফা হিসেবে মেনে নিয়েছিল একমাত্র নজদের শাসক ইবনে সাউদ ছাড়া। আমার মতে, হুসেইন বিন আলী আল –হাশেমি ইমাম মাহদি হতে পারেন যার কথা আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলে গিয়েছেন। যে কেউ তার সম্পর্কে ইতিহাস পড়লে এবং নবী সাঃ এর হাদিসের সাথে মিলালেই বুঝতে পারবে যে, হুসেইন বিন আলী আল –হাশিমি ইমাম মাহদি হতে পারেন।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "আমার উম্মতের শেষ যুগে মাহদী আবির্ভূত হবেন। আল্লাহ তাকে বৃষ্টি দান করবেন, জমি তার ফল উৎপন্ন করবে, তিনি প্রচুর অর্থ-সম্পদ দান করবেন, গবাদি পশু বৃদ্ধি পাবে এবং উম্মত মহান হবে। তিনি সাত বা আট বছর শাসন করবেন।" (মুসতাদরাক আল-হাকিম, ৪/৫৫৭-৫৫৮; তিনি বলেন: এটি একটি হাদিস যার সনদ সহীহ, যদিও এটি আল-বুখারী এবং মুসলিম বর্ণনা করেননি। আল-যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেন এবং আল-আলবানী বলেন: এটি একটি সহীহ সনদ, এবং এর লোকেরা সিকাত (বিশ্বাসযোগ্য)। সিলসিলাত আল-হাদীছ আল-সহীহা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৬, হাদিস ৭৭১)

হাদিসে উল্লেখিত ৭ বা ৮ বছর-ই হুসেইন বিন আলী আল –হাশিমি খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকেই সম্পদ দান করেন। তার সময়ে মুসলিম উম্মাহের সম্মান এত বেশি হয়েছিল এখনো তাকে আরমেনিয়ান খ্রিষ্টানরা সম্মান করে। ১৯১৬-১৯১৮ সাল পর্যন্ত সময় যখন তুর্কিরা আর্মেনিয়ানদের উপর গণহত্যা চালায় তখন মক্কার শরীফ হুসেইন বিন আলী আল –হাশিমি তাদের প্রতি সমবেদনা জানান এবং মুসলিমদেরকে/ আরবদেরকে বলেন তারা যেন, আর্মেনিয়ানদের আশ্রয় দেয় এবং তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়। মুসলিমরা যেন আর্মেনিয়ান খ্রিষ্টানদের সাথে তাদের খাদ্য, বাসস্থান, উট, কম্বল ইত্যাদি সকল জীবনাপোকরন ভাগাভাগি করে নেয়। অর্থাৎ একজন প্রকৃত মুসলিম নেতার মত আচরণ হুসেইন বিন আলী আল –হাশিমি করেছিলেন আর্মেনিয়ান খ্রিষ্টানদের সাথে - যার জন্য এখনো আর্মেনিয়ানরা তাকে সম্মান করে এবং তার কথা স্মরণ করে।

হুসেইন বিন আলী আল –হাশিমি ১৯০৮ সাল থেকে অটোম্যানদের অধীনে মক্কার শরীফ ও আমীর (Sharif of Mecca) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। কিন্তু যখন Committee of Union and Progress তুর্কি সরকারের ছায়া (Shadow Government বা Government behind Government) দায়িত্ব নেয় তখন থেকে খেলাফতের সকল কিছুতে তুর্কিদের আধিপত্য এবং আরব মুসলিমদের হত্যা, নিপীড়ন ও বঞ্চিত করার কারণে তুর্কিদের সাথে হুসেইন বিন আলী আল –হাশিমির সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। আরবের মুসলিমরা বুঝতে পারে যে, তাদেরকে খেলাফতের দায়িত্ব নিতে হবে। এজন্য হুসেইন বিন আলী আল –হাশিমি ব্রিটিশদের সাথে গোপন চুক্তি করেন যে, অটোম্যানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরব ও ব্রিটিশরা একত্রে যুদ্ধ করবে এবং যুদ্ধে অটোম্যানদের পরাজয়

হলে আরব, সিরিয়া, আফাগানিস্থান, পাকিস্থান, বাংলাদেশ, মিশর, ইত্যাদি এলাকা নিয়ে একটি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা হবে যার খলিফা হবেন একজন আরব - হুসেইন বিন আলী আল –হাশিমি। ১৯১৬ সালে আরব রিভল্ট (Arab Revolt) অনুষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত অটোম্যানরা পরাজিত হয়। কিন্তু ব্রিটিশরা তাদের কথা রাখেনি।

ব্রিটিশরা হুসেইন বিন আলী আল –হাশিমির কাছে নতুন প্রস্তাব নিয়ে আসেন। ১৯১৭ সালে খলিফা হিসেবে নয় বরং ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া হুসেইন বিন আলীকে হেজাজের রাজা ("King of the Hejaz") হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চায়। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশরা ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বেলফোর ডেক্লারেশান (Balfour Declaration) করলে হুসেইন বিন আলী ব্রিটিশদের কাছে এর জবাবদিহিতা চান। ব্রিটিশরা তাকে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করলেও তিনি বলেন যে, প্যালেস্টাইনে থাকবে শুধু মুসলিম, খ্রিষ্টান এবং সেইখানে আগে থেকেই বসবাস করা ইহুদীরা কিন্তু বাহির থেকে অর্থাৎ অন্য কোনো দেশ থেকে নতুন করে ইহুদী প্যালেস্টাইনে আনা যাবে না। স্থানীয়, মুসলিম, খ্রিষ্টান ও ইহুদীরা তার এই মতামতকে সমর্থন করলেও ব্রিটিশরা তার কথা মেনে নেয়নি ফলে ব্রিটিশদের সাথে মক্কার শরীফ হুসেইন বিন আলীর দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। তিনি ১৯২৩ সালে পুনরায় ব্রিটিশদের অনুরোধ সত্ত্বেও ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বেলফোর ডেক্লারেশান (Balfour Declaration) মেনে নিতে অস্বীকার করেন যদিও ব্রিটিশরা এজন্য তাকে £30,000 (ত্রিশ হাজার পাউনড) দিতে চেয়েছিল। তিনি বলেন, "আমি মুসলিম, খ্রিস্টান এবং অর্থোডক্স ইহুদিদের প্রতি জায়োনিজমকে (Zionism) অন্যায় বলে মনে করি এবং ন্যায়বিচারের রক্ষক হিসেবে, আমি এই অন্যায্য জায়োনিজমকে (Zionism) প্রতিহত করব"। ৩ রা মার্চ ১৯২৪ সালে অটোম্যান খেলাফত ধ্বংস হয়ে গেলে হুসেইন বিন আলী আল –হাশিমিকে মুসলিমরা খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের তথ্য অনুসারে, ৭ মার্চ, ১৯২৪ সালে "মেসোপটেমিয়া, ট্রান্সজর্ডান এবং হেজাজ" থেকে আসা মুসলমানদের দ্বারা হুসেন বিন আলীকে খলিফা নির্বাচিত করা হয়েছিল। তিনি অটোম্যান খেলাফত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং অটোম্যান রাজবংশ যাতে নিঃশেষিত না হয়ে যায় এজন্য ২৪০০ লিরা তাদেরকে দান করেন। তিনি ১৯৩১ সালের ৪ জুন মৃত্যু বরণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিজেকে খলিফা হিসেবেই দাবী করতেন এবং জ্ঞানী মুসলিমরা তাকেই খলিফা হিসেবে মানত। তার মৃত্যুর পর ৩০,০০০ লোক লাশ দাফন করায় সমবেত হন। তাকে হারাম –আস – শরীফের (আল আকসা মসজিদ এলাকা) Madrasa al-Arghūniyy বিল্ডিঙে কবর দেয়া হয়।

“উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: একজন খলিফার মৃত্যুর সময় মতবিরোধ দেখা দেবে এবং মদীনার এক ব্যক্তি উড়ে মক্কায় আসবে। মক্কার কিছু লোক তার কাছে আসবে, তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বের করে আনবে এবং কোণা ও মাকামের মাঝামাঝি তার হাতে বাইয়াত করবে। এরপর সিরিয়া থেকে তার বিরুদ্ধে একটি অভিযান বাহিনী পাঠানো হবে কিন্তু মক্কা ও মদিনার মাঝামাঝি মরুভূমিতে তা গ্রাস করা হবে। যখন লোকেরা তা দেখবে, তখন সিরিয়ার বিশিষ্ট আলেমগণ এবং ইরাকের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা তার কাছে আসবে এবং কোণা ও মাকামের মাঝামাঝি তার হাতে বাইয়াত করবে।

অতঃপর কুরাইশদের একজন ব্যক্তি উত্থিত হবে যার মামারা কালবের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান বাহিনী পাঠাবে যা তারা পরাজিত করবে, এবং এটিই হচ্ছে কালবের অভিযান। সেই ব্যক্তি হতাশ হবে যে কালবের গনিমতের মাল পাবে না। তিনি সম্পত্তি ভাগ করে দেবেন, এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুসারে জনগণকে শাসন করবেন এবং পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি সাত বছর অবস্থান করবেন, তারপর মারা যাবেন এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযার নামাজ পড়বেন।" (সুনান আবু দাউদঃ ৪২৮৬ এবং মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৪৫৬) আবু দাউদ বলেন: হিশাম থেকে কেউ কেউ "নয় বছর" এবং কেউ কেউ "সাত বছর" বর্ণনা করেছেন।

অটোম্যান খলিফা সুলতান মেহমুদ-৫ (Mehmed V Resad) যিনি ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত অটোম্যান সুলতান/খলিফা ছিলেন। তিনি ১৯১৮ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তার মৃত্যুর সময় থেকেই অটোম্যান খেলাফতে বিরোধ চরম আকারে শুরু হয়। সুলতান মেহমুদ-৫ সময়ে তার মন্ত্রিদের উপর তার তেমন কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং তার সময় থেকেই জাতীয়তাবাদী তরুন তুর্কিদের (Young Turk) এবং Committee of Union and Progress এর আধিপত্য শুরু হয়। বুঝা যায় যে, তার মৃত্যুর সময় খেলাফত চালানো নিয়ে তরুন তুর্কিদের (Young Turk) এবং Committee of Union and Progress ও খেলাফতের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। বিশেষ করে, ১৯১৬ সালে যে Arab Revolt শুরু হয় যা আর থামানো যায়নি। এই সময়ের দিকেই আল্লাহ এর রসূল সাঃ ইঙ্গিত করেছেন বলে আমি মনে করি। মদিনা থেকে মক্কায় আসা লোক হচ্ছেন হুসেইন বিন আলী আল –হাশিমি যার কাছে লোকেরা অটোম্যানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তার কথা মানার অঙ্গীকার করেছিলেন বলেই মনে হচ্ছে। হাদিসে কিন্তু খলিফা হিসেবে বায়াত দেয়ার কথা বলা হয়নি। ইসলামে বায়াত অনেক ধরণের আছে। কোন নির্দিষ্ট কাজের ব্যাপারেও বায়াত হতে পারে। বায়াত অর্থ হচ্ছে ওয়াদা করা বা অঙ্গীকার করা; যেমনঃ বায়াতে রেদওয়ান।

আরেকটি ব্যাপার উল্লেখ করা অতি জরুরী। ১৯২৪ সালের বহু আগেই লোকেরা হুসেইন বিন আলী আল –হাশিমিকে খলিফা হিসেবে বায়াত নিতে বলেন এবং নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করতে চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজি হচ্ছিলেন না কারণ তিনি বলেছিলেন যে, মুসলিমদের একজন খলিফা (অটোম্যান খলিফা মেহমুদ VI) থাকা অবস্থায় তিনি নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করতে পারেন না বা খলিফা হিসেবে বায়াত নিতে পারেন না; এজন্য ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ অটোম্যান খেলাফত বিলুপ্ত হলে তিনি তখন খলিফা হিসেবে বায়াত নেন। এই কথাটি জানার পর হাদিসে উল্লেখিত মাহদি যে হুসেইন বিন আলী আল –হাশিমি –হতে পারেন –এই ব্যাপারে আমার চিন্তাভাবনা জাগ্রত হয়। অটোম্যানরা হুসেইন বিন আলীর বিরুদ্ধে সিরিয়ার দিক থেকেই সেনাদল পাঠিয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। অটোম্যান, জার্মান, অস্ট্রিয়ানদের যৌথ বাহিনী সিরিয়ার তাফাস (Tafas Massacre) এলাকায় আগে হামলা চালিয়ে গণহত্যা চালায়। প্রতিশোধ নিতে ব্রিটিশরা সেদিন ঘোষণা দেয় যে, আজকে কোন যুদ্ধবন্দি নেয়া হবে না ফলে যুদ্ধ শেষে অটোম্যান, জার্মান, অস্ট্রিয়ান যাদেরকে জীবিত

পাওয়া যায় তাদের সবাইকেই হত্যা করা হয় (ref: Lawrence later wrote in Seven Pillars of Wisdom থেকে)। মক্কা মদিনার মাঝামাঝি জায়গায় মাটি তাদের গ্রাস করে নিবে – মানে হচ্ছে সিরিয়া থেকে যে দল মাহদির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হবে তারা মক্কা, মদিনার মাঝামাঝি জায়গায় পরাজিত হবে এবং মৃত্যু বরণ করবে ফলে মাটি তাদের মৃতদেহকে গ্রাস করে নিবে।

এই বিজয়ের সংবাদ যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন অর্থাৎ ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ প্রথম হুসেইন বিন আলী সিরিয়াতে তার ছেলের শীতকালীন ক্যাম্প Shunah, Transjordan (নবী সাঃ এর সময়ে এই জায়গার নাম সিরিয়া ছিল) এ প্রথম খলিফা হিসেবে বায়াত নেন। অবশেষে, ১৪ মার্চ, ১৯২৪ তারিখে স্পষ্টতই হুসেইন বিন আলীকে শুক্রবারের নামাজের সময় বাগদাদে খলিফা হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। এর মাঝে তিনি কোনা ও মাকামের মধ্যবর্তী সকল মুসলিমদের কাছ থেকে বায়াত পান। কোনা মানে হচ্ছে শিয়া মুসলিম, মেসোপটেমিয়া, ভারত ও পাকিস্থানের মুসলিমরা, অটোম্যান, তুর্কি অর্থাৎ পৃথিবীর যত কোনায় যত মুসলিম আছে তাদের সকলের থেকে শুরু করে মাকাম পর্যন্ত অর্থাৎ হেজাজ পর্যন্ত সকল মুসলিমদের বায়াত লাভ করেন। এমন কি জেরুজালেমের গ্রীক অর্থোডক্স প্যাট্রিয়ার্ক চার্চও তাকে মুসলিমদের খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। শুধুমাত্র নজদের শাসক 'ইবনে সাউদ' (বর্তমান সৌদি রাজ পরিবার) ও তাদের পক্ষে থাকা মুওয়াহহিদুনরা হুসেইন বিন আলীর প্রতি বায়াত দেন নি। আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন, মাহদিকে মক্কার কিছু লোক তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বের করে আনবে এবং কোনা ও মাকামের মাঝামাঝি জায়গায় বায়াত দিবে। হুসেইন বিন আলীর ঘটনার সাথে হাদিসের এই কথাগুলোর মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

১৯১৭ সালে, আরব রাজ্যের (হেজাজের) স্বাধীনতা ঘোষণার পর, মক্কার উলামারা উসমানীয় খিলাফত কেন অবৈধ হবে এবং হুসাইন বিন আলী কেন বৈধ (খলিফা) হবে তার কয়েকটি কারণ ঘোষণা করেছিলেন:

"মুসলিম বিশ্ব বনী ওসমান (অটোম্যান খেলাফত) সম্পর্কে কী বলে, যারা ইসলামের খলিফা বলে ভান করে, যদিও বহু বছর ধরে তারা জানিসারীদের (Janissaries) হাতে পুতুলের মতো ছিল; খলিফাদের সিংহাসনচ্যুতি এবং সিংহাসনচ্যুতির বিষয়ে (ইসলাম) ধর্মীয় বইগুলিতে প্রতিষ্ঠিত আইন এবং মতবাদের বিপরীতে তাদের দ্বারা ছুঁড়ে ফেলা, সিংহাসনচ্যুত এবং হত্যা করা হয়েছিল - তাদের তথ্য কোন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে? (...) আমরা চাই যারা এখানে উপস্থিত আছেন তারা আপনাদের জানান যে, আমরা শেষ দিনে (কিয়ামতের দিনে) সর্বশক্তিমান আল্লাহ এর সামনে স্বীকার করব যে, আজ আমরা তাঁর নবীর বংশধরের (হুসেইন বিন আলী আল-হাশমি) চেয়ে ধার্মিক এবং তাকওয়াশীল আর কোনও মুসলিম শাসককে জানি না, যিনি এখন আরব দেশের সিংহাসনে বসে আছেন। ধর্মের ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি উদ্যোগী, কথায় ও কাজে আল্লাহ এর আইনের প্রতি বেশি মনোযোগী এবং আল্লাহকে খুশি করার জন্য আমাদের বিষয়গুলি পরিচালনা করতে সক্ষম আর কাউকে আমরা চিনি না। পবিত্র ভূমির লোকেরা তাকে তাদের খলিফা ঘোষণা করেছে কারণ, এটি করার মাধ্যমে তারা তাদের ধর্ম এবং দেশের সেবা করবে" ।

কিন্তু হুসেইন বিন আলী তাদের এই বায়াত নিতে রাজি হননি। তিনি তুর্কিদের Committee of Union and Progress (CUP) এর বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং তাদের সমালোচনা করেন কিন্তু আশা প্রকাশ করেন যে, অটোম্যানদের থেকে সঠিক পথের কোন খলিফা আসবেন যিনি সঠিকভাবে খেলাফত পরিচালনা করবেন। তিনি অটোম্যানদের অতীত ইতিহাস ও ত্যাগের কথা স্মরণ করতেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে খলিফা উপাধি গ্রহণের আগে, ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে, তিনি যখন জাফা (Jaffa) শহরটি স্বাধীন করেন, তখন জাফার মুসলিম বাসিন্দারা তার প্রশংসা করেছিলেন। তাদের ঘোষণায়, বাসিন্দারা নিশ্চিত করে বলেছিল: "হে মুসলিমদের খলিফা, জাফার মুসলিম বাসিন্দারা তাদের বিশাল মসজিদে সমবেত হয়ে আপনার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে। তারা আপনার আরব সিংহাসনকে সমর্থন করার জন্য দুয়া করেছিল এবং সর্বশক্তিমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল, যিনি পবিত্র খেলাফতকে তার ন্যায্য মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন।"

অথচ হুসেইন বিন আলী স্বেচ্ছায় নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে; অর্থাৎ হাদিসে বর্ণিত ইমাম মাহদির ইচ্ছার বিরুদ্ধে লোকেরা তাকে খলিফা হিসেবে বায়াত দিবে – এটা হুসেইন বিন আলী আল হাশিমির সাথে মিলে যাচ্ছে।

১৯২৪ সালে হুসেইন বিন আলী খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহন করলে ফ্রান্স এবং ব্রিটেন এর বিরোধিতা শুরু করে। ফ্রান্সের মতামত ছিল যে, অটোম্যান খেলাফত তো শরিফিয়ান খেলাফতের (Sharifian Caliphate) চেয়ে বেশি ভালো ছিল কারণ শরিফিয়ান খেলাফত তো সারা দুনিয়ার সকল মুসলিমদের জন্য একই দেশ, একই সরকারের কথা বলে (Pan-Islamism) । তাদের ইন্ধনে ১৯২৫ সালে মিশরের রাজা ফুয়াদ কায়রোর আল- আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিমদের সভা ডেকে খলিফা হতে চেষ্টা করলেও তা জনসমর্থন না পাওয়ায় ভেস্তে যায়। ফ্রান্স বৈরুত, দামেস্ক, আলেপ্পোতে মুফতি, আলেমদের টাকা দিয়ে কিনে নেয় এবং পেপার/পত্রিকায় অপ্রচার শুরু করে যে, খলিফা হুসেইন বিন আলী আল হাশিমি 'ব্রিটিশদের টাকা খাওয়া লোক' (Paid by British)। ১৯২৪-১৯২৫ সালের দিকেই ইবনে সাউদ (Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud) ও ইখওয়ানদের* (Ikhwān) আক্রমণে পরাজিত হয়ে খলিফা হুসেইন বিন আলী প্রথমে আকাবায় পরে ইবনে সাউদ আপত্তি জানালে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত সাইপ্রাসে চলে আসেন। ১৯৩১ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। (*ইখওয়ানরা হচ্ছে ছিল 'ওয়াহাবী' (Wahhabi) মতাদর্শের দলের মিলিশিয়া যোদ্ধা দল। ১৯২৯ সালে ইবনে সাউদ ইখওয়ানদের নিশ্চিহ্ন করেন।)

যদিও ইবনে সাউদ (বর্তমান সৌদি রাজ পরিবার) ও পশ্চিমা বিশ্ব খলিফা হুসেইন বিন আলীকে ১৯২৪-১৯২৫ সাল পর্যন্ত তার খেলাফতের সময়কাল দেখায় কিন্তু আমরা জানি, ইসলামে নিয়ম হচ্ছে, একজন খলিফা তিনি যদি জেলেও থাকেন কিন্তু খেলাফত না ছাড়েন তাহলে তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন তিনিই খলিফা থাকবেন। হুসেইন বিন আলী ১৯৩১ সালে মৃত্যু পর্যন্ত খলিফা ছিলেন। তিনিই হয়তো 'মাহদি' যার কথা আল্লাহ এর রসুল সাঃ বলে গেছেন।

“অতঃপর কুরাইশদের একজন ব্যক্তি উত্থিত হবে যার মামারা কালবের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান বাহিনী পাঠাবে যা তারা পরাজিত করবে, এবং এটিই কালবের অভিযান। সেই ব্যক্তি হতাশ হবে যে কালবের গণিমত পাবে না” ।

অনেক তথ্য পর্যালোচনা করে আমার মনে হচ্ছে, কুরাইশদের এই ব্যক্তি হচ্ছেন আলী হায়দার পাশা (Ali Ḥaydar Pasha ibn Jabir) । বনু কালবের কিছু লোক ইসলাম গ্রহন করলেও তাদের বেশিরভাগ লোক তাদের আগের ধর্ম খ্রিষ্টানই থেকে যায়। বনু কালবের লোকেরা সিরিয়া ও তার আশে-পাশের অঞ্চলে বসবাস করতেন। আলী হায়দার পাশা ছিলেন অ্যাংলোফাইল (Anglophile হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি ব্রিটিশদের ব্যাপক প্রশংসা করেন এবং পছন্দ করেন) । আলী হায়দার পাশা ইসাবেল ডানকান (Isobel Duncan) নামে একজন আইরিশ নারীকে বিয়ে করেন যিনি খ্রিষ্টান থেকে ইসলাম গ্রহন করেন। তার প্রথম স্ত্রী ছিলেন একজন তুর্কি নারী। আলী হায়দার পাশা নামটির শেষ অংশ ‘পাশা’ যা কোন আরব নাম নয় বরং এটি একটি তুর্কি নাম, বুঝা যাচ্ছে আলী হায়দার পাশার পরিবারে তুর্কি প্রভাব বিদ্যমান ছিল। আলী হায়দার পাশা ছিলেন মক্কার প্রাক্তন শরীফ ও আমির আব্দুল আল মুত্তালিব ইবনে গালিবের নাতি। তারা ছিল কোরাইশ বংশের বনু কাতাদাহ (Banu Qatadah) গোত্রের লোক। ১৯১৬ সালের ২ জুন, অটোম্যানরা হুসেইন ইবনে আলীকে মক্কার শরীফের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে আলী হায়দার পাশাকে মক্কার শরীফ নিযুক্ত করলে আলী হায়দার পাশা, হুসেইন ইবনে আলীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে পড়েন। আলী হায়দার পাশা তার দল নিয়ে সিরিয়ার দামেস্ক থেকে মদিনায় আসেন এবং মদিনার দখল নিয়ে নেন। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে অটোম্যান সরকার সৈন্য প্রত্যাহার করতে বললে আলী হায়দার পাশা মদিনা ছেড়ে দামেস্কে চলে আসেন। অটোম্যান খেলাফতের পতনের জন্য বড় ভুমিকা রাখে আরব রিভোল্ট; কিন্তু যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশরা ওয়াদা ভঙ্গ করে ইবনে সাউদকে সহযোগিতা করে যাতে হুসেইন ইবনে আলী খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে না পারেন এবং তাকে হেজাজ ছেড়ে সাইপ্রাসে যেতে হয়।

আলী (রাঃ) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: মাহদী আমাদেরই একজন, আমার পরিবারের একজন। আল্লাহ তাকে এক রাতেই পথ দেখাবেন।" (মুসনাদে আহমাদ, ২/৫৮, হাদিস ৬৪৫; সুনান ইবনে মাজাহ, ২/১৩৬৭)

খলিফা হুসেইন বিন আলী হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাঃ এর সরাসরি বংশধর, তিনি হাসান রাঃ এর রক্তধারা থেকে এসেছেন।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: মাহদী আমার বংশধর, তার কপাল উঁচু এবং নাক লম্বা, পাতলা, বাঁকা। তিনি পৃথিবীকে ন্যায়বিচার ও ন্যায়বিচারে পূর্ণ করবেন যেমনটি জুলুম ও অবিচারে পূর্ণ ছিল এবং তিনি সাত বছর শাসন করবেন।” (সুনান আবি দাউদ, কিতাব আল-মাহদী, ১১/৩৭৫, হাদিস ৪২৬৫; মুসতাদরাক আল-হাকিম, ৪/৫৫৭)

হুসেইন বিন আলীর খলিফা হবার পূর্ব সময়ে পৃথিবী (মুসলিম বিশ্ব) জুলুম ও অবিচারে পূর্ণ ছিল, তিনি তা ন্যায় বিচারে পরিপূর্ণ করেন। তিনি ৭ বছর খলিফা ছিলেন।
আলি ইবনে আবু তালিব থেকে বর্ণিত: আবু ইসহাক বলেন যে, আলী তার পুত্র হাসানের দিকে তাকিয়ে বললেন: আমার এই পুত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক মনোনীত একজন সাইয়্যিদ (সর্দার), এবং তার কোমর থেকে একজন ব্যক্তি আসবে যাকে তোমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামে ডাকা হবে এবং আচরণে তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে কিন্তু চেহারায় নয়। এরপর তিনি পৃথিবীকে ন্যায়বিচারে ভরে দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন। (আবু দাউদ: বই ৩১, সংখ্যা ৪২৭৬)

কোরাইশ (হাশেমি) (Hashemites) বংশের একজন উত্তরসূরি হচ্ছেন শরীফ হুসেইন বিন আলী আল হাশেমি। তার ছেলে জর্ডানের রাজপরিবার প্রতিষ্ঠা করেন যা আওন ইবনে জাফর রা. এর পরিবার থেকে যা হাসান রা. এর উত্তরসূরিদের মধ্য থেকে এসেছে। তাদের পূর্বপুরুষকে ঐতিহ্যগতভাবে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যিনি নবী মুহাম্মদের সাঃ এর প্রপিতামহ। মক্কার হাসানী শরীফ (যাদের কাছ থেকে জর্ডানের হাশেমী রাজপরিবার সরাসরি বংশধর), হাশেমীদের পূর্বপুরুষ, কাতাদা ইবনে ইদ্রিস (Qatadah ibn Idris) সহ, জায়েদী শিয়া ছিলেন; মামলুক সাম্রাজ্যের শেষের দিকে বা অটোমান যুগের প্রথম দিকে, তারা সুন্নি ইসলামের শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হয়ে ওঠেন। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, 'হুসেইন বিন আলী আল হাশেমি' হচ্ছেন নবী সাঃ এর নাতি হাসান রাঃ এর সরাসরি বংশধর।

ইমাম মাহদি একটি টাইটেল বা পদবী। বিভিন্ন হাদিসে উনার শাসনের সময়কাল বিভিন্ন রকম এসেছে। একটি হাদিস অনুসারে ইমাম মাহদির শাসনের সময়কাল ৫ বছর, ৭ বছর, ৯ বছর পাওয়া যায়। মাহদি সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিস বিশ্লেষণ করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, মাহদি একজন নয়। মাহদি পদবী দেয়া হয়েছে শেষ জমানার কয়েকজন মুসলিম খলিফাকে যারা আল্লাহ এর রসূলের আদর্শ অনুযায়ী শাসন করবেন। তাদের শাসনকাল অনেক কম সময় হবে- ৫ বছর, ৭ বছর ও ৯ বছর। অন্তত তিনজন মাহদি আসার কথা আমি এখান থেকে পেয়েছি। এই বইয়ে ২ জন ব্যাক্তির মাহদি হবার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একজন মাহদি মক্কার প্রাক্তন শরীফ এবং খলিফা 'হুসেইন বিন আলী আল হাশেমি' হতে পারেন এমন সম্ভাবনা রয়েছে।

শেষ জমানায় খোরাসান

সাহাবী সাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তিনজন তোমাদের সম্পদের জন্য একে অপরের সাথে লড়াই করবে, তাদের প্রত্যেকেই খলিফার/রাজার পুত্র, কিন্তু তাদের কেউই তা পাবে না। তারপর পূর্ব দিক থেকে কালো পতাকা আসবে এবং তারা তোমাদেরকে অভূতপূর্বভাবে হত্যা করবে।" তারপর তিনি এমন কিছু উল্লেখ করলেন যা আমার মনে নেই, তারপর তিনি বললেন: "যখন তুমি তাদেরকে দেখবে, তখন তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে, এমনকি যদি তোমাকে

তুষারপাতের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে হয়, কারণ তাদের মধ্যে আছেন আল্লাহর খলিফা, মাহদী।" (ইবনে মাজাহ আস-সুনানে (নং 4084); আল-বাজ্জার আল-মুসনাদ (2/120); আর-রুয়ানি (নং 619); আল-হাকিম আল-মুসতাদরাক (4/510) - এবং আল-বায়হাকী দালাইল আন-নুবুওয়াহ (6/515) -এ তাঁর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।)

১৯১০-১৯৩০ সাল পর্যন্ত হেজাজের শাসক বা রাজা বা খলিফা হবার জন্য তিনজন খলিফা বা রাজার পুত্র লড়াই করেছিল। যথাঃ ১) সুলতান আব্দুল মাজেদের (Abdul Mejid I) সন্তান অটোম্যান খলিফা/ সুলতান মেহমুদ-৬ (Mehmed VI) ২) খলিফা হুসেইন বিন আলী আল হাসমির ছেলে আলী ৩) নজদের সুলতান আব্দুল রাহমান বিন ফাইসাল আল সউদ (Abdul Rahman bin Faisal Al Saud) এর পুত্র আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল রাহমান আল সউদ (Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud); এরা তিনজন-ই ছিলেন খলিফা বা রাজার পুত্র। এরা তিনজনই তোমাদের সম্পদ নিয়ে একে অপরের সাথে লড়াই করবে, আমি মনে করি, এখানে তোমাদের 'সম্পদ' হচ্ছে খিলাফত। কিন্তু এরা কেউই খিলাফত পায়নি। "তারপর পূর্ব দিক থেকে কালো পতাকা ধারী আসবে এবং তারা তোমাদেরকে অভূতপূর্বভাবে হত্যা করবে" । মাঝখানে ৮০-৯০ বছর চলে গেছে, পূর্বদিক অর্থাৎ খোরাসান অঞ্চল থেকে কালো পতাকাধারী (তালিবান) বের হয়েছে যারা সৌদি আরবের তথা আল সউদ রাজ পরিবারের তথা মুওয়াহহিদুন মতাদর্শের আরবদের বিরোধিতা করেছে এবং করছে। তারপর আল্লাহ এর রসূল সাঃ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন আমরা যেন, তুষারপাতের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সেখানে যাই কারণ তাদের মধ্যে আছেন মাহদি।

সাওবান বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, "যখন তোমরা দেখবে যে কালো পতাকাগুলো খোরাসানের দিক থেকে এসেছে, তখন তাদের কাছে যাও, কারণ আল্লাহর খলিফা মাহদী তাদের মধ্যে থাকবেন।" (আহমদ এবং বাইহাকী, দালাইল আন-নুবুওয়াতে এটি বর্ণনা করেছেন। মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৪৬১)

বর্তমান সমসাময়িক বিশ্বের প্রখ্যাত আলেম, মুফতি, মুহাদ্দিসগণ (যেমনঃ ইসরার আহমেদ, পাকিস্থান) সবাই একমত যে, বর্তমানে আফগানিস্থানের অঞ্চলকেই নবী সাঃ এর সময় খোরাসান বলা হত। খোরাসান থেকে কালো পতাকাধারী তালিবানরা মূলত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ১৯৯৬ সালে, তাদের নেতা ছিল মোল্লা ওমর। মোল্লা ওমরের পুরা নাম 'মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ' । উনার পিতার নাম মউলভি গোলাম নবী; তার দাদার নাম মউলভি গোলাম রসূল। তিনি পসতুন জাতির খিলজি (Khilji) বা খলজি (Khalji) বা গিলজি (Ghiljī) (খিলজি, খলজি, অথবা গিলজাই নামেও পরিচিত) উপজাতিগোষ্ঠীর হোটাক (Hotak) গোত্রের তমযি (Tomzi) বংশে জন্মগ্রহন করেন। এই বইয়ে পূর্বে আলোচনা করেছিলাম যে, পসতুন জাতি গোড়াপত্তন হয়েছে সাহাবী খালিদ বিন ওয়ালিদের (রাঃ) বংশের এক ছেলের ঘরের মেয়ের সাথে একজন আফগান মুসলিমের বিয়ের মাধ্যমে। তাই, মক্কার কোরাইশ বংশের রক্ত মোল্লা ওমরের শরীরে প্রবাহিত আছে বলে ধরা যেতে পারে। বাংলার শাসক

ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজি এই একই গোত্রের লোক ছিলেন। আমেরিকার আফগানিস্থানে হামলার আগ পর্যন্ত, 'আমীর' হিসেবে মোল্লা ওমর ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ৫ বছর ইসলামি শরিয়া আইন অনুযায়ী আফগানিস্থান শাসন করেন অর্থাৎ আফগানিস্থানে তিনি ও তার দল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন।
যায়েদ বিন আল-আম্মি বলেন: "আমি আবু আস-সিদ্দিক আন-নাজিকে আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন: 'আমরা আমাদের নবীর পরে কিছু ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিলাম, তাই আমরা আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আমার উম্মাতে একজন মাহদী আসবেন যিনি পাঁচ, সাত, নয় বছর শাসন করবেন।" - যায়েদ ছিলেন সন্দেহভাজন, তিনি বললেন: "আমরা বললাম: এটা কী?" তিনি বললেন: "বছর।" তিনি বললেন: "একজন লোক তার কাছে আসবে এবং বলবে: হে মাহদী! 'আমাকে দাও, আমাকে দাও! তাহলে সে তার পোশাকে যা বহন করতে পারবে তা পূর্ণ করবে।" (জামে আত-তিরমিযী ২২৩২)
এই হাদিসে একটি খেয়াল করার মত বিষয় হচ্ছে এই হাদিসে, আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) মাহদির ব্যাপারে নিজের বংশ থেকে আসার কথা বলেন নি।
আলী (রাঃ) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: মাহদী আমাদেরই একজন, আমার পরিবারের একজন। আল্লাহ তাকে এক রাতেই পথ দেখাবেন।" (মুসনাদে আহমাদ, ২/৫৮, হাদিস ৬৪৫; সুনান ইবনে মাজাহ, ২/১৩৬৭)
১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পর মোল্লা ওমর স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরে যান কিন্তু তখন আফগানিস্থান অশান্ত হয়ে উঠে। দেশের সব জায়গায় শয়ে শয়ে সন্ত্রাসী দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। তারা চাঁদাবাজি, দখলবাজি, নারী ধর্ষণ, লুট-পাটে সমাজকে পশুর সমাজের চেয়ে ও নিকৃষ্ট অবস্থায় নিয়ে যায়। মোল্লা ওমরের ভাষায় তাকে সবচেয়ে কষ্ট দিত যখন এই নরপশুরা নারী শিশুদের ধর্ষণ করে হত্যা করে পথের ধারে ফেলে রাখত। কেউই এই সন্ত্রাসীদের বাধা দেবার ছিল না। এমন অবস্থায় একদিন রাতে মোল্লা ওমর স্বপ্নে দেখেন একজন মহিলা তাকে বলছে, " তোমার সহযোগিতা আমাদের দরকার, তোমাকে জেগে উঠতে হবে, তোমাকে এই বিশৃঙ্খলা বন্ধ করতে হবে, আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন" । তারপর মোল্লা ওমর মাত্র ৫০ জন মাদ্রাসা ছাত্র নিয়ে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেন। তিনি নারী ও পুরুষ শিশুদের ধর্ষণ (Bacha bazi) বন্ধ করেন।
উম্মে শারিক (রাঃ) বর্ণনা করেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "মানুষ দাজ্জালের থেকে পালিয়ে পাহাড়ে গিয়ে থাকবে"। (মুসলিম, রিয়াদ আস-সালিহিন ১৮১৩)
তালিবানদের ধ্বংস করতে আমেরিকা, NATO, জাতিসংঘ (UN) আফগানিস্থানে ২০০১ সাল থেকে প্রায় ২০২০ সাল পর্যন্ত ব্যাপক বোমা হামলা, ধ্বংস, হত্যা চালিয়েছিল, তখন সেখানকার মানুষ পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়ে ছিল।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের বলেছেন: 'দাজ্জাল পূর্ব দিকের খোরাসান নামক এক স্থানে আবির্ভূত হবে এবং তার পিছনে এমন কিছু লোক থাকবে যাদের মুখমণ্ডল হাতুড়ি দিয়ে পেটানো ঢালের মতো হবে।'" (সুনান ইবনে মাজাহ ৪০৭২)

দাজ্জাল যখন আফগানিস্থানে (খোরাসানে) আবির্ভূত হয়েছিল তখন তাদের সৈন্যদের মাথা ও মুখ লোহা পেটানো বর্ম (হেলমেট) দিয়ে ঢাকা থাকত যেটা প্রায় সকল দেশের সৈন্যরাই এখন পড়ে। এছাড়া এই সকল সৈন্যদের বেশিরভাগের চেহারা জীমে ব্যয়াম করার কারণে দেখতে হাতুড়ি পেটানো ঢালের মতই লাগে।

খোরাসান থেকে যেই দাজ্জাল আবির্ভূত হয়েছে –এটাই দাজ্জালের চূড়ান্ত পর্যায়। এর অর্থ এটা যে, দাজ্জাল আর কোন নতুন মতাদর্শ নিয়ে পৃথিবীতে আসব না অর্থাৎ এখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দাজ্জাল নিজেকে 'রব' বলেই দাবী করতে থাকবে। কিন্তু দাজ্জাল পৃথিবীতে আছে এবং ইসা আঃ দাজ্জালকে হত্যা করার পূর্ব পর্যন্ত 'দাজ্জাল' পৃথিবীতে থাকবে।

বর্তমানে খোরাসান অঞ্চলে অর্থাৎ আফগান সরকারের সরকার প্রধান হচ্ছেন, হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা। তিনি পসতুন জাতির নুরজাই (Noorzai) উপজাতির লোক যেটি দুররানী তারিন পসতুনদের (Durrani Tareen Pashtuns) 'পানজপাই' (Panjpai) অংশের অন্তর্গত। 'পানজপাই' হচ্ছে 'দুররানি পসতুনদের' একটি উপজাতিগোষ্ঠী বা কতগুলো গোত্রের সমষ্টি । 'আলিজাই' (Alizai), 'ইসহাকজাই' (Ishakzai), 'নুরজাই' (Nurzai) মিলে এই দুররানি পসতুনদের 'পানজপাই' অংশ গঠিত। আপনাদের নিশ্চয়ই উপমহাদেশে দুররানী রাজবংশের শাসনের কথা মনে আছে। হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা হচ্ছেন সেই বংশের লোক। বাংলার মানুষের রক্তেও কররানি, খিলজি, পসতুনদের রক্ত আছে। এরা অস্বাভাবিক রকমের সাহসী হয়। ২০২৪ এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে অস্বাভাবিক সাহসী ছাত্রদের খালি হাতে গুলির সামনে বুক পেতে দাঁড়ানো দেখে আমি আরও নিশ্চিত হই যে, এদের শরীরে বইছে তুর্কি মামলুক যোদ্ধা ও পসতুন যোদ্ধাদের রক্ত। মুসলিম বাঙ্গালীকে এখন কেউ শুধু 'বাঙ্গাল' বলে ভুল করবেন না – এদের শরীরে সাহাবী খালিদ বিন ওয়ালিদের (রাঃ) রক্ত থাকতে পারে, আছে আইন-জালুতের যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী মুসলিম তুর্কি মামলুক যোদ্ধাদের রক্ত।

'হুসেইন বিন আলী আল হাশেমি' ৭ বছর খলিফা ছিলেন যদিও তিনি এই ৭ বছরের বেশিরভাগ সময় নির্বাসনে ছিলেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারেন নি। অন্য দিকে মোল্লা ওমর ৫ বছর ইসলামি শরিয়ার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র পরিচালনা করে গেছেন। কিন্তু 'মোল্লা ওমর' নিজেকে খলিফাতুল মুসলেমিন বলে দাবী করেছেন – এমন কথা কোথাও পাইনি। এই দু'জনের কেউই 'ইমাম মাহদি' হিসেবে কখনো নিজেদেরকে দাবী করেন নি। তারা ইমাম মাহদি হতে পারেন আবার না-ও হতে পারেন; কিন্তু ইমাম মাহদি সম্পর্কে আল্লাহ এর রসূল সাঃ যা কিছু বলেছেন তার সাথে এই দুই জনের অনেক কিছুর মিল পাওয়া যায়।

জামে আত-তিরমিযী ২২৩২ নাম্বার হাদিসে আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন, ইমাম মাহদি ৫ বছর, ৭ বছর, ৯ বছর শাসন করবেন। এখানে ইঙ্গিত আছে যে, ইমাম মাহদি একজন নন কারণ একই ব্যাক্তি খলিফা হিসেবে

একবার ৫ বছর আবার ৭ বছর আবার ৯ বছর শাসন করবেন কিভাবে? এরূপ নজির মুসলিমদের ইতিহাসে নেই। এর অর্থ এটাই যে, ইমাম মাহদি হিসেবে কমপক্ষে তিন ব্যাক্তি আসবেন যাদের একজন ৫ বছর, একজন ৭ বছর, একজন ৯ বছর শাসন করবেন। তাদের নাম ইমাম মাহদি হবে না; 'ইমাম মাহদি' হচ্ছে একটি টাইটেল বা পদবী।

দাজ্জাল কবে খোরাসানে আবির্ভূত হয়েছিল?

প্রথমবার আফগানিস্থানে (খোরাসানে) দাজ্জাল বহু আগেই আবির্ভূত হয়েছিল যেটার সন –তারিখ খুঁজে বের করার গুরুত্ব অনুভব করছি না কারণ দাজ্জাল দ্বিতীয়বার খোরাসানে আবির্ভূত হয়ে গেছে।
আবদুল্লাহ বিন বুসর বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "বড়যুদ্ধ/ভয়াবহ যুদ্ধ এবং শহর (The City) বিজয়ের মধ্যে সময়কাল হবে ছয় বছর, এবং সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।" (মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৪২৬)
২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্থানে হামলা (Operation Storm-333) শুরু করে। তবে মূল যুদ্ধ শুরু হয় রাজধানী কাবুল শহরের কিছু দুরে পাঞ্জশির উপত্যকা দখল করা নিয়ে কারণ এটি যে দলের দখলে থাকবে সেই দল-ই কাবুলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।
১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে পাঞ্জশির উপত্যকায় (Panjshir offensives) যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিউনের (বর্তমানে রাশিয়া) বিরুদ্ধে আফগান মুজাহেদিন, তালিবান, আহমদ শাহ মাসুদের দল যুদ্ধ শুরু করেন। ১৯৮৬ সালে সোভিয়েত ইউনিউনের তৎকালীন সরকার প্রধান মিখাইল সের্গেভিচ গর্বাচেভ (Mikhail Sergeyevich Gorbachev) আফগানিস্থান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন অর্থাৎ বলতে গেলে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে নেন। তাহলে, খোরাসানে বড় যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে আর কাবুল বিজয় হবার ঘোষণা আসে ১৯৮৬ সালে। ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত মাঝে সময় ৬ বছর ধরে নিলাম। ১৯৮৭ সালে সমাজতন্ত্র ও ইসলামের মিশ্রণে আফগানিস্থানের নতুন সংবিধান প্রনয়ন করেন প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহ (President Najibullah) যা তালিবান এবং আফগান মুজাহিদিনরা মানেন নাই। অর্থাৎ ১৯৮৭ সালে অর্থাৎ সপ্তম বছরে আফগান প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহ দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হন। এখানে দাজ্জাল দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হয়েছে কারণ ঐ সংবিধানে মানুষকে আইনদাতা (রব) হিসেবে দাবী করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে দাজ্জাল প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহকে পরাজিত করে মোল্লা ওমর আফগানিস্থানে ইসলামি শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করেন।

হুসেইন বিন আলী আল হাশেমি দাজ্জাল অটোম্যান সম্রাটকে পরাজিত করেছিলেন আরব রিভোল্টে এবং মোল্লা ওমর দাজ্জালকে পরাজিত করেন খোরাসানে (আফগানিস্থানে)। তারপর ২০০১ সালে আমেরিকা

আফগানিস্থানে হামলা করে এবং অনেকটাই দখল করে নেয়। ২০২১ সালের ১৫ ই অগাস্টে তালিবানরা পুনরায় সরকার গঠন করেন। হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা বর্তমানে আফগানিস্তানের সরকার প্রধান এবং আমির।

জাবির বিন সামুরাহ থেকে বর্ণিত, নাফি' বিন 'উতবা বিন আবু ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ বিজয় দান করবেন। তারপর তোমরা রোমানদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ বিজয় দান করবেন। তারপর তোমরা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ বিজয় দান করবেন।" (সুনান ইবনে মাজাহ ৪০৯১)
হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ইসা আঃ আসার পূর্বেই মুসলিমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং বিজয় লাভ করবে। অন্য হাদিসে, নবী (সাঃ) বলেছেন যে, ইসা (আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এখানে ২ টি হাদিসে ব্যবহ্রিত বাক্যের ভাষাগত পার্থক্য বুঝতে হবে। দাজ্জালের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করার অর্থ হচ্ছে দাজ্জাল পরাজিত হবে কিন্তু তার মৃত্যু হবে না অর্থাৎ দাজ্জালের মতাদর্শ পৃথিবীতে থেকে যাবে।
অন্য দিকে ইসা (আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করার অর্থ হচ্ছে ইসা (আঃ) দাজ্জালের মতাদর্শের বিনাশ করবেন ফলে দাজ্জালের মতাদর্শ – শিরক,কুফর মিশ্রিত বিকৃত ইসলাম - পৃথিবীতে আর থাকবে না। দাজ্জালের মৃত্যুর পর মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আনীত শিরক, কুফর মুক্ত প্রকৃত ইসলামই পৃথিবীতে থাকবে।

আমরা কোন জ্ঞান অর্জন করব?

"স্মরণ কর, যখন মূসা তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে পৌঁছা না পর্যন্ত আমি চলতেই থাকবো যদিও বছরের পর বছরও চলতে হয়" । (সূরা কাহফঃ ৬০)
দুই সমুদ্রের মিলনস্থল বলতে আমি কি বুঝি? আমি এই আয়াতের ১ টি আক্ষরিক অর্থ ও ২ টি রূপক অর্থ পেয়েছি। আক্ষরিক অর্থে, আমি মনে করি, দুই সমুদ্রের মিলনস্থল হচ্ছে কৃষ্ণ সাগর (Black Sea) এবং মারমারা সাগরের (Marmara sea) মিলনস্থল বসফরাস প্রণালীর (Bosphorus Strait) কাছাকাছি কোন জায়গা। জায়গাটি কনস্টান্টিনোপল হতে পারে। এটা হচ্ছে আক্ষরিক অর্থ। একটি রূপক অর্থ হচ্ছে, দুই সমুদ্র অর্থ হচ্ছে দুই জাতির মিলনস্থল অর্থাৎ রোমান এবং পারস্য জাতির মিলনস্থল; আমাদের বুঝতে হবে তখনো জুলকারনাইন (কনস্টান্টিন) প্রাচীর নির্মাণ করেননি, তাই এই দুই জাতির মিলনস্থল হচ্ছে বসফরাস প্রণালীর (Bosphorus Strait) কাছাকাছি কোন জায়গা (কনস্টান্টিনোপল?)। যখন এই দুই জাতি মিলে যাবে অর্থাৎ যখন জুলকারনাইনের প্রাচীর (কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর) ভেঙ্গে যাবে তখন সেই জমানায় চলতে হলে আপনার কি ধরণের জ্ঞান প্রয়োজন হবে - সেটা খিজির এবং মুসা আঃ এর এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়ার আছে। এখান থেকে আরেকটি ব্যাপার পরিষ্কার যে, সবকিছু আল্লাহ এর পরিকল্পনা মোতাবেক হচ্ছে কারণ জুলকারনাইনের প্রাচীর তৈরি হবার আগেই আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, জুলকারনাইনের প্রাচীর ভেঙ্গে গেলে তখন

সেই জমানায় আমাদের কি জ্ঞান লাগবে - সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। কি জ্ঞান লাগবে - সেটা খিজির আর মুসার আঃ এর ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি। জাহেরি জ্ঞান বা দুনিয়াবি জ্ঞান লাগবে এবং বাতেনি জ্ঞান বা গায়েবি জ্ঞান লাগবে। জাহেরি জ্ঞান বা দুনিয়াবি জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান, টেকনোলোজি সম্পর্কে আপনাকে খুব ভালোভাবে জানতে হবে অর্থাৎ কোন জিনিস কিভাবে চলে, এর উৎপত্তি কি ভাবে হল? (বিজ্ঞানের জ্ঞানকে আমরা বিশ্বাস করবো না, আমরা শুধু জানব যে, বিজ্ঞানীরা কি বলে; তবে আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে কোনো কিছু জানতেও চাইবো না কারণ এটা যাদুবিদ্যা) সরকার ব্যবস্থার বিভিন্ন মতবাদের মূল বিষয় কি? অর্থনীতি কিভাবে চলছে? রাষ্ট্রনীতি, পৌরনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি। কোথায় কোথায় শিরক, কুফর আছে তা আমাদের বুঝতে হবে, ধরতে হবে। আপনার গায়েবের জ্ঞান-ও লাগবে- এই জ্ঞান আপনি পাবেন কোরআন এবং আল্লাহ এর প্রেরিত রসূল মুহাম্মাদ সাঃ এর বানী (হাদিস) থেকে (*)।

(*) আল্লাহ কোরআন এবং তার প্রেরিত রসূল মুহাম্মাদ সাঃ এর মাধ্যমে আমাদেরকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা আমরা অন্য কোনভাবে জানতে পারতাম না –তাই এই জ্ঞানকে গায়েবি জ্ঞান বলেছি; যেমনঃ জান্নাত, জাহান্নামের বর্ণনা। আল্লাহ এর কিতাব এবং উনার প্রেরিত নবী-রসূলদের বানী ছাড়া অন্য কোন উপায়ে গায়েবি জ্ঞান জানা সম্ভব নয়। সূফীরা বা পীররা যে গায়েবের জ্ঞান পাওয়ার কথা বলেন সেটা মিথ্যা ও ধোঁকাবাজি)

যখন খিজির এমন তিনটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যা আপাত দৃষ্টিতে ভুল বা গুনাহের কাজ মনে হলেও আসলে উনি সঠিক ছিলেন কারণ উনার কাছে দুনিয়াবি জ্ঞান এবং আল্লাহ এর দেয়া গায়েবের জ্ঞান উভয়ই ছিল কিন্তু মুসা আঃ এর কাছে শুধু শরীয়তের জ্ঞান ছিল তাই উনার কাছে এগুলো ভুল কাজ মনে হচ্ছিল। (নিঃসন্দেহে মুসা আঃ আমাদের চেয়ে অনেক জ্ঞানী, আল্লাহ এই ঘটনা আমাদেরকে জানিয়েছেন আমাদেরকে শিক্ষা নেবার জন্য) ।

কনস্টান্টিন ৩২৫ সালে কাউন্সিল অফ নাইসিয়া ডেকেছিলেন; সেখানে তখনকার সময়ের ইসা আঃ এর অনুসারী আলেমরা/ পুরোহিতরা ইসা আঃ আল্লাহ এর পুত্র কি না - এর পক্ষে - বিপক্ষে ভোট দেয় যাতে ইসা আঃ আল্লাহ এর পুত্র এর পক্ষে ভোট পরে ৩১৮ টি আর বিপক্ষে ভোট পরে ৫ টি। আজকে আলেমদের গনতন্ত্র নিয়ে জিজ্ঞেশ করলে 'আলেমরা' বলেন গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কাজ করা যাবে – এই ব্যাপারে ইজমা হয়ে গেছে!

(ইজমা হচ্ছে অধিকাংশ 'আলেমদের' একমত হওয়া, অর্থাৎ 'আলেমদের' ভোটে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কাজ করা যাবে – এই মতটিতে অনেক বেশি ভোট পড়ায় এই মতাদর্শটি গ্রহন করেছেন 'আলেমরা' – ঠিক যেন কনস্টান্টিনের ৩২৫ সালের কাউন্সিল অফ নাইসিয়ার মত যেখানে খ্রিষ্টান আলেমরা ভোট দিয়ে (ইজমা করে) ইসা আঃ আল্লাহ এর পুত্র এই দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।)

শিরক করার পক্ষে আপনাদের ('আলেমদের') ইজমা হয়ে গেছে যে – শিরক করে (অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে) ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 'আলেমদের' কেউ কেউ বলেন যে, "আমাদের আর অন্য কোন উপায়

নেই” । আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ঘুরিয়ে – পেঁচিয়ে বুঝান যে, “ইসলামে গনতন্ত্র আছে”! আপনাদেরকে আল্লাহ কোরআনে উত্তর দিয়ে দিয়েছেন, “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, আর তাতে কোন বক্রতার অবকাশ রাখেননি” (সূরা কাহফঃ১) আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, দাজ্জাল সামনে আসলে আল্লাহ এর রসূল সাঃ আমাদেরকে সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত তিলাওয়াত করতে বলেছেন অর্থাৎ বক্রতার দাওয়াতকে যখন কেউ ইসলাম বলে আমাদের কাছে চালাতে আসবে তখন তাকে বলতে হবে যে, তোমরা ইসলামের কথা বলে যা আমাদের কাছে নিয়ে এসেছ তা তো বক্রতা আর আল্লাহ তো বলেছেন যে, আল্লাহ কোরআনে (ইসলামে) কোন বক্রতা রাখেন নি, তার মানে তোমরা আমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছ তা ইসলাম নয়। গনতন্ত্র বলে, মানুষের ভোটে নিযুক্ত হয়ে মানুষ মানুষের জন্য আইন দিবে –অর্থাৎ গনতন্ত্র বলে মানুষ হচ্ছে আইনদাতা অন্যদিকে ইসলাম বলে আইন দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ, মানুষ শুধু আল্লাহ এর আইন অনুযায়ী সমাজ, রাষ্ট্র, ইত্যাদি সবকিছু চালাবে। ইসলামের মধ্যে তোমরা গনতন্ত্র পেলে কিভাবে?

ইসলাম বলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আইনদাতা মানলে এটা বড় শিরক হয় এবং ঈমান নষ্ট হয়ে মুশরিক হয়ে যায়। আর তোমরা আমাদের বলছ, তোমরা গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে? তোমরা বল যে, ইসলামে ভোট দেয়ার নিয়ম আছে। তাই ইসলামে গনতন্ত্র আছে। তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর দাও, ইসলামে মিথ্যা বলা পাপ আবার হিন্দু ধর্মেও মিথ্যা বলা পাপ; এখন তোমরা কি বলবে যে, ইসলামে হিন্দু ধর্ম আছে? আর হিন্দু ধর্ম অনুসরণ করে আমাদেরকে এখন সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে? নবী (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি দাজ্জালের খবর শুনবে, সে যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। কারণ আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, একজন ব্যক্তি তার কাছে আসবে এবং সে নিজেকে মুমিন মনে করবে এবং তার দ্বারা অদ্ভূত বিভ্রান্তিকর ধারণার কারণে তাকে অনুসরণ করবে।” (সুনানে আবি দাউদ ৪৩১৯) আমরা তোমাদের বলি, তোমরা যা নিয়ে এসেছ তা হচ্ছে ‘অদ্ভূত বিভ্রান্তিকর ধারণা’ – তাই আমরা তোমাদের থেকে দূরে থাকতে চাই। ‘গণতান্ত্রিক ইসলাম’ হচ্ছে দাজ্জালের একটি মতাদর্শ যার ধোঁকায় তোমরা পড়েছ। এই বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

‘আলেমদের’ মধ্যে যারা বলে যে, আমাদের আর অন্য কোন উপায় নেই – তারা কি হাদিস পড়ে না? আল্লাহ বলেছেন, যখন ইয়াজুজ-মাজুজ আসবে তখন ইসা আঃ যেন সঙ্গী- সাথীদের নিয়ে পাহাড়ে চলে যান। তাহলে, তোমরা তো পাহাড়ে চলে যেতে পারো –পাহাড়ে দাজ্জাল বা ইয়াজুজ-মাজুজ যাবে না বা গেলেও তারা সেখান থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। এর প্রমাণ বর্তমান বিশ্বের আফগানিস্থান। এখনকার সময়ে ফিতনা থেকে বাচার একটি উপায় হচ্ছে, সমাজ ছেড়ে পাহাড়ে চলে যাওয়া অথবা জঙ্গলে চলে যাওয়া এবং সেখানেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়া।

সমাজে থাকতে হলে দাজ্জালের পরিচয় মানুষের কাছে প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে ফলে দাজ্জাল গ্রেফতার করবে, জেল দিবে, নির্যাতন করবে, এমন কি হত্যাও করতে পারে –এটাই হচ্ছে দাজ্জালের নিয়ে আসা আগুনে পড়া– যারা সমাজে থেকে এই ধরণের কাজ করবে তারা দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাচতে পারবে এবং এই লোকদের-ই জান্নাতে যাবার সম্ভাবনা আছে। একজন বিশ্বাসী এই সমাজে এমন সিদ্ধান্ত নিবে যেটা দেখে সাধারণ মুসলিমরা তাকে ভুল মনে করবে অথচ সেই সঠিক কিন্তু সমাজের লোকেদের জ্ঞান নেই দেখে তারা বুঝতে পারবে না।

যখন পৃথিবীতে এই অবস্থা চলতে থাকবে তখন ইসা আঃ আসবেন।

যখন ইসা আঃ তার মাথা নিচু করবেন, তখন তা (মাথা) থেকে ঘামের মালা ঝরবে (সুনান ইবনে মাজাহঃ হাদিস নং: ৪০৭৫) । আমি মনে করি, এর ব্যাখ্যা হচ্ছে ইসা আঃ মানুষকে আল্লাহ এর বানী/ ওহী সম্পর্কে বলবেন (একটি হাদিসে উল্লেখ আছে, যখন মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কাছে ওহী আসত তখন তিনি ঘামতেন) । ইসা আঃ এর কাছে নতুন কোন ওহী আসবে না- কিন্তু এখানে মাথা নিচু করা এবং ঘামা বলতে, মনে হচ্ছে, তিনি মানুষের দিকে বক্তব্য দিচ্ছেন এবং ওহীর (কোরআনের আয়াত) কথা প্রচার করছেন।

"যে কাফের তার নিঃশ্বাসের সুগন্ধ পাবে সে মারা যাবে, এবং তার নিঃশ্বাস তার চোখ যতদূর দেখতে পাবে ততদূর পৌঁছাবে। তারপর তিনি বেরিয়ে পড়বেন এবং লুদের দরজায় তাকে (দাজ্জালকে) ধরবেন এবং তাকে হত্যা করবেন"। (সুনান ইবনে মাজাহঃ হাদিস নং: ৪০৭৫)- আমার মতে এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, যে কাফিরের কাছে তার কথা পৌঁছুবে সে ইসলাম গ্রহন করবে অথবা পরাজিত হবে (আমার মতে,কাফিরের দৈহিক মৃত্যু হবে না, তার ভিতরে যে অবিশ্বাস ছিল তার মৃত্যু হবে)। কারণ আমরা যখন কথা বলি তখন আমরা নিঃশ্বাসের মাধ্যমেই কথা বলি (ফুসফুস থেকে বাতাস গলা দিয়ে বের হবার সময় মুখের না না জায়গায় বাধা পেয়ে শব্দ উৎপন্ন হয় – এভাবেই আমরা কথা বলি। নিঃশ্বাস বলতে এখানে কথা বুঝানো হচ্ছে বলে আমি মনে করি)। ইসা আঃ এর কথা যখন কোন কাফির শুনবে তখন সে ইসলাম গ্রহন করবে অর্থাৎ কাফিরের যে আদর্শ/ বিশ্বাস ছিল তা ইসা আঃ এর প্রচার করা ওহীর জ্ঞানের কাছে পরাজিত হবে; তার নিঃশ্বাস তার দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত যাবে অর্থাৎ মানুষের মাধ্যমে ইসা আঃ এর কথা/বানী অতদুর পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে। এরপর ইসা আঃ বেরিয়ে পড়বেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। হাদিস পড়ে এটাও মনে হচ্ছে যে, ইসা আঃ আসার আগে ও পড়ে মুসলিমরা যুদ্ধ করবে।

"……যখন তারা এই অবস্থায় থাকবে, তখন আল্লাহ তাকে ওহী দেবেন: "হে ঈসা, আমি আমার কিছু বান্দাকে বের করে এনেছি যাদের কেউ হত্যা করতে পারবে না, তাই আমার বান্দাদের নিরাপদে তুরে নিয়ে যাও।" তারপর ইয়াজুজ ও মাজুজ বেরিয়ে আসবে এবং তারা, যেমন আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, "প্রত্যেক টিলা থেকে নেমে আসবে।" [21:96] তাদের প্রথমজন তিবেরিয়াস হ্রদের পাশ দিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে পান করবে, তারপর তাদের শেষজন সেখান দিয়ে যাবে এবং বলবে: "এখানে একসময় পানি ছিল" ………… । (সুনান ইবনে মাজাহঃ হাদিস নং: ৪০৭৫)

ইসা আঃ দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং তার বাহিনীকে পরাজিত করবেন আর এটা হবে যুদ্ধের মাধ্যমে। যুদ্ধের সময় পৈত্তলিকতায় ও যাদুতে (বিজ্ঞানে) বিশ্বাসীরা অর্থাৎ ইয়াজুজ-মাজুজ সুরক্ষিত বিল্ডিং-এ, টিলায় বা উঁচু ভুমিতে লুকিয়ে থাকবে বলে মনে হচ্ছে। যখন দাজ্জালের বাহিনী পরাজিত হবার মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হবে তখন পৈত্তলিকতায় ও যাদুতে (বিজ্ঞানে) বিশ্বাসীরা অর্থাৎ ইয়াজুজ-মাজুজ সুরক্ষিত বিল্ডিং, টিলা বা উঁচু ভূমি থেকে বের হয়ে আসবে। ইবনে মাজাহের ৪০৭৫ নাম্বার হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ইসা (আঃ) একটি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করবেন যেখানে মুসলিমরা একজন নেতার অধীনে আগে থেকেই যুদ্ধ করতে থাকবে। অনেক আলেম মুসলিমদের এই নেতাকে ইমাম মাহদি বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেহেতু ইসা আঃ অবতরণ করার পূর্বেই যুদ্ধ শুরু হবে তাই ইয়াজুজ মাজুজ যুদ্ধ থেকে বাচার জন্য লোকালয় ছেড়ে টিলা বা উচ্চ ভুমিতে পালিয়ে যাবে। যুদ্ধ শেষ হলে তারা আবার লোকালয়ে ফিরে আসবে। অথবা ব্যাপারটা এমন হতে পারে যে, ইসা আঃ দাজ্জালকে হত্যা করার পর অমুসলিম বাহিনী (ইয়াজুজ-মাজুজের দল) ইউরোপ বা অন্যান্য অঞ্চল থেকে আরব ভূখণ্ডে আসবে।

আল্লাহ বলবেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজকে কেউ হত্যা করতে পারবে না অর্থাৎ পরাজিত করে নিঃবংশ করতে পারবে না। ইসা আঃ যেন সঙ্গী সাথী নিয়ে তূর পাহাড়ে চলে যান। তিবেরিয়াস হ্রদের পানির ব্যাপারটি দিয়ে বুঝা যাচ্ছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজের দল সংখ্যায় অনেক বড় হবে এবং তাদের সময়কাল ও অনেক দীর্ঘ হবে। তাদের প্রথম যে দল আসবে সেই দলের বিশ্বাসে - বিশ্বাসী লোকেরা ও তাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে যাবে - অনেক দিন ধরে তারা দুনিয়াতে থাকবে।

অনেকে বলেন ইসা আঃ জিজিয়া বন্ধ করে দিবেন কারণ তখন কোন কাফির-ই জীবিত থাকবে না কারণ ইসা আঃ সকল কাফিরকে তার নিঃশ্বাসের মাধ্যমে হত্যা করবেন – আমার মতে এটা ভুল ব্যাখ্যা। আমি মনে করি, ইসা আঃ জিযিয়া কারো কাছ থেকে নিবেন না কারণ তখন আল্লাহ এত বেশি ফসল/খাদ্য দিবেন (তথ্য সূত্রঃ সুনান ইবনে মাজাহঃ ৪০৭৫) যে জিযিয়া নেয়ার কোন প্রয়োজন হবে না।

আমরা এখন হাদিসে বর্ণিত ইতিহাসের কোন পর্যায়ে আছি

আল-বুখারী আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, দাজ্জাল যাকে হত্যা করবে, সে হবে সর্বোত্তম লোকদের একজন, যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর শহর থেকে দাজ্জালের কাছে যাবে এবং দাজ্জালকে বলবে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই সেই দাজ্জাল যার সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদের জানিয়েছেন।" দাজ্জাল (লোকদের) বলবে: "তোমরা কি মনে করো - যদি আমি এই ব্যক্তিকে হত্যা করে তাকে জীবিত করি, তাহলে কি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকবে?" তারা বলবে, "না।" তাই সে তাকে হত্যা করবে, তারপর তাকে জীবিত করবে। তারপর সে (মুমিন ব্যক্তি) বলবে, "আল্লাহর কসম, আমি আজ যতটা নিশ্চিত, তোমার সম্পর্কে

এততটা নিশ্চিত (আগে) ছিলাম না।" দাজ্জাল তাকে হত্যা করতে চাইবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। (আল-বুখারী, নং ৬৫৯৯)

আমার মতে, এখন আমরা যেই দাজ্জালের সময় আছি তার সময়ের জন্য এই ঘটনার ব্যাখ্যা হচ্ছেঃ দাজ্জাল বা দাজ্জালের একচোখা নীতিতে বিশ্বাসী লোকেরা, আল্লাহ একমাত্র আইনদাতা বলে বিশ্বাসী একজন যুবককে ধরবে তারপর তাকে গুম করে ফেলবে – বহু বছর ধরে তার কোন খোঁজ পাওয়া যাবে না। সবাই ধরে নিবে যেঃ সে মারা গেছে, দাজ্জাল তাকে মেরে ফেলেছে। তার বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তান তার মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ এর কাছে দুয়া শুরু করবে। এমন সময় দাজ্জাল লোকদেরকে নিজের উপর আরও বিশ্বাসী করার জন্য এই যুবককে দিয়ে বলাতে চাইবে যে, দাজ্জালের একচোখা নীতিতে (গনতন্ত্র/ সমাজতন্ত্র/ রাজতন্ত্র/ একনায়কতন্ত্রে / সুফিজম/ পীরতন্ত্রে) কোন শিরক নেই – এই নীতিই সঠিক নীতি। তখন দাজ্জাল তাকে বের করে নিয়ে আসবে। তাকে দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করাবে তখন সে দুনিয়ার সামনে বলে দিবে যে, এই একচোখা নীতিই হচ্ছে দাজ্জালের ফিতনা- মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শিরক অথবা দাজ্জালের জেল থেকে বের হবার পর, সে দাজ্জালকে অস্বীকার করতেই থাকবে এবং মানুষের কাছে প্রচার করতেই থাকবে যে, এই একচোখা নীতিই (গণতান্ত্রিক ইসলাম, রাজতান্ত্রিক ইসলাম, সুফিজম বা পীরতন্ত্রের ইসলাম) হচ্ছে দাজ্জালের ফিতনা আর এটা হচ্ছে মানবজাতির ইতিহাসে অন্যতম বড় শিরক। কিন্তু দাজ্জাল এরপর এই যুবককে আর গুম করতে পারবে না বা হত্যা করতে পারবে না। এই রকম বহু যুবকের সাথে এমন ঘটনা ঘটার পর দাজ্জালের শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। সে আর কাউকে গুম করতে বা হত্যা করতে পারবে না। - রূপক অর্থে মিলে যাচ্ছে। এখানে একটি বুঝার বিষয় আছে, দাজ্জালের বিরুদ্ধে যে যুবকের কথা হাদিসে বলা হয়েছে তাতে শুধু একজন যুবকের বা ব্যাক্তির ঘটনাই বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু এটা একটা ইঙ্গিত যে, এ রকম হাজারো যুবক দাজ্জালের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং তাদের সাথেও হাদিসে উল্লেখিত ঘটনার মতই ঘটনা ঘটবে।

চিন্তা করে দেখুন, মানব ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তশালী ফিতনার শক্তি ধ্বংস হবে মুহাম্মাদ সাঃ এর খুবই সাধারণ কিছু অনুসারীদের মাধ্যমে যারা সমাজে হয়তো ‘আলেম’ হিসেবে পরিচিতও নয়। ইসা আঃ দাজ্জালকে হত্যা করবেন কিন্তু দাজ্জালের ক্ষমতা তার আগেই নষ্ট হবে মুহাম্মাদ সাঃ এর খুবই সাধারণ কিছু অনুসারী যুবকের বিশ্বাসের মাধ্যমে। আপনি যদি এই যুবকদের মধ্যে কেউ হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জন্য সুসংবাদ – আল্লাহ এর রসূল সাঃ আপনার কথাই বলে গেছেন উনার পবিত্র ও সম্মানিত বানীতে।

এখান থেকে আরেকটি তথ্য আমরা পাই সেটা হচ্ছে, দাজ্জাল এবং তার একচোখা নীতির (যেমনঃ পীরতন্ত্র, গনতন্ত্রের) পতন হবে জ্ঞানের মাধ্যমে। জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞানের প্রচারের মাধ্যমে দাজ্জালকে চিনতে পারলে এবং মানুষকে চিনাতে পারলেই দাজ্জাল এবং তার একচোখা নীতির পতন হবে। খেয়াল করে দেখুন, যুবক কিন্তু দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করেনি বরং যুবক দাজ্জালের আসল পরিচয় অর্থাৎ সে যে দাজ্জাল সেটা মানুষের সামনে

তুলে ধরেছে আর এতেই দাজ্জালের শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। এটাও সত্যি যে, দাজ্জালের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ হয়েছে এবং হবে।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন:

আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, দাজ্জাল বের হবে এবং মুমিনদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তার দিকে এগিয়ে যাবে এবং দাজ্জালের সশস্ত্র প্রহরীরা/বাহিনী তার সাথে দেখা করবে এবং তারা তাকে বলবে: 'তুমি কোথায় যেতে চাও?' তিনি বলবেন: 'যে (দাজ্জাল) আবির্ভূত হয়েছে তার কাছে আমি যেতে চাই।' তারা তাকে বলবে: 'তুমি কি আমাদের রবকে (অর্থাৎ দাজ্জাল) বিশ্বাস কর না?' তিনি বলবেন: আমাদের রব সম্পর্কে কোন কিছু গোপন নেই।' তাদের (দাজ্জালের বাহিনীর) কেউ কেউ বলবে: 'তাকে হত্যা করা যাক', কিন্তু তাদের কেউ কেউ বলবে: 'তোমার রব (দাজ্জাল) কি তোমাদেরকে তার অনুমতি ছাড়া কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করেননি?' তাই তারা তাকে দাজ্জালের কাছে নিয়ে যাবে, যখন মুমিন তাকে দেখবে, তখন সে বলবে: "হে লোকসকল! এই সেই দাজ্জাল যার সম্পর্কে মুহাম্মাদ সাঃ আমাদেরকে বলে গেছেন" । তারপর দাজ্জাল তার লোকদেরকে সেই লোকের মাথা ছিন-ভিন্ন করার নির্দেশ দিয়ে বলবে, "তাকে ধরো এবং তার মাথা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দাও" । তারপর তার পেটে ও পিঠে আঘাত করা হবে। (তারপর) দাজ্জাল তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কি (এখন) আমাকে বিশ্বাস করো না? তিনি (সেই ব্যাক্তি) বলবেন: 'তুমিই মিথ্যা মসীহ (দাজ্জাল)।' তারপর দাজ্জাল তার ব্যাপারে নির্দেশ দিবে। দাজ্জালের নির্দেশ মত (সেই ব্যক্তির) মাথা হতে পা পর্যন্ত তাকে করাত দ্বারা চিড়ে দু টুকরো করে দেয়া হবে। তারপর দাজ্জাল উভয় টুকরার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হয়ে তাকে সম্বোধন করে বলবে, 'উঠো'। সে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর আবারো তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি আমাকে (দাজ্জালকে) বিশ্বাস করবে না? লোকটি বলবেন: 'এটা আমার অন্তর্দৃষ্টি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে যে, তুমি দাজ্জাল'; তিনি আরও বলবেন: 'হে লোকসকল! আমার পরে সে (দাজ্জাল) অন্য কোন মানুষের সাথে এমন আচরণ করতে পারবে না।'

(তখন) দাজ্জাল তাকে হত্যার চেষ্টা করবে। তার ঘাড় এবং কণ্ঠহারের (কলারবোনের) মধ্যবর্তী স্থানটি তামায় পরিণত হবে এবং সে (দাজ্জাল) তাকে হত্যা করার কোন উপায় পাবে না। তাই সে (দাজ্জাল) তার হাত-পা ধরে ধরে নিক্ষেপ করবে (এমন কিছুতে যাকে আগুন বলে মনে হয়)। লোকেরা মনে করবে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে অথচ তাকে জান্নাতে নিক্ষেপ করা হয়েছে।রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন, "সেই ব্যক্তি হবেন বিশ্বজগতের রবের (আল্লাহ এর) নিকট শাহাদাতের দিক থেকে মানুষের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট। (রিয়াদ আস-সালিহীন ১৮১৫ / সহীহ মুসলিম ২৯৩৮সি)

বর্তমানে আমরা হাদিসে বর্ণিত সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, হাদিসটিতে বর্তমান বিশ্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

মুসলিমদের মধ্য থেকে দাজ্জাল আবির্ভূত হয়েছে যে ইসলামের সাথে গনতন্ত্র মিশিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে বা এই দাজ্জাল গণতন্ত্র এবং সুফিজম (পীরতন্ত্র) উভয়টিকেই ইসলামের অংশ বলে স্বীকৃতি দেয়। একজন মুমিন ব্যক্তি দাজ্জালের কাছে যেতে চাওয়ার অর্থ হচ্ছে, সে দাজ্জালকে সরিয়ে দাজ্জালের জায়গা নিতে চায় অর্থাৎ সরকার প্রধান হয়ে রাষ্ট্রে দাজ্জালের মতাদর্শ বাদ দিয়ে মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তখন তাকে দাজ্জালের বাহিনী (পুলিশ, র‍্যাব, ডিবি, ডিজিএফআই, ইত্যাদি সরকারি বাহিনী) গ্রেফতার করে। "তারা তাকে বলবে: 'তুমি কি আমাদের রবকে (অর্থাৎ দাজ্জালকে) বিশ্বাস কর না?" হাদিসে এই কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে, এরা (পুলিশ, ডিবি, র‍্যাব, ইত্যাদি) তাকে জিজ্ঞেস করে – তুমি কি গনতন্ত্রে বিশ্বাস করো না? তুমি কি জনগণের ভোটে নির্বাচিত আইনদাতাদের মানো না - যারা সংসদে বসে আমাদের জন্য আইন দেয়?

'তিনি (সেই ব্যক্তি) বলবেন: আমাদের রব সম্পর্কে কোন কিছু গোপন নেই।' হাদিসে এই কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে, তোমাদের রব নিজেদেরকে সরাসরি 'রব' বলে দাবী করে না – তারা শুধু রবের আইন দেয়ার গুণটি/ অধিকারটি তাদের আছে বলে দাবী করে এবং আল্লাহ এর আইনের বিরুদ্ধে আইন দেয়। কিন্তু আমাদের রব আল্লাহ কোন কিছু গোপন করেন নি। তিনি সরাসরি বলেছেন যে, তিনি-ই একমাত্র 'রব'; আইন দেয়ার গুণ ও অধিকার একমাত্র তার-ই।

আমাদের রব আল্লাহ কোরআনে পরিষ্কারভাবে বলেছেন, "……………আল্লাহ যা (আইন কোরআনে) নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির" । (কোরআনঃ সূরা মায়েদাঃ ৪৪) তাহলে, যারা আল্লাহকে একমাত্র আইনদাতা না মেনে নিজেরাই নিজেদের আইনদাতা দাবী করে এবং আইন দেয় তারা কি কাফির হবে না? যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আইনদাতা বলে মানবে বা ভোট দিয়ে আইনদাতা হিসেবে নিযুক্ত করবে তারা কি কাফির হবে না?" এভাবে সেই ব্যাক্তি বলবেন যে, আমাদের রবের কোন কিছু গোপন নেই।

তাদের (দাজ্জালের বাহিনীর) কেউ কেউ বলবে: 'তাকে হত্যা করা যাক', কিন্তু তাদেরই কেউ কেউ বলবে: 'তোমার রব (দাজ্জাল) কি তোমাদেরকে তার অনুমতি ছাড়া কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করেননি?' হাদিসের এই কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে, দাজ্জালের বাহিনী অর্থাৎ পুলিশ, র‍্যাব, ডিবি ইত্যাদি যখন সেই ব্যক্তি বা যুবককে ধরবে তখন তারা তাকে হত্যা (ক্রস ফায়ার) করতে চাইবে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলবে যে, আমাদের রব (গণতান্ত্রিক সরকার এবং আদালতের বিচারক) তো বলেছেন যে, সরকারের আদালতের অনুমতি/ আদেশ ছাড়া কাউকে হত্যা করা যাবে না।

"তাই তারা তাকে দাজ্জালের কাছে নিয়ে যাবে, যখন মুমিন তাকে দেখবে, তখন সে বলবে: "হে লোকসকল! এই সেই দাজ্জাল যার সম্পর্কে মুহাম্মাদ সাঃ আমাদেরকে বলে গেছেন"" । হাদিসের এই কথার অর্থ হচ্ছে, দাজ্জালের বাহিনী (পুলিশ) তাকে, আল্লাহ এর আইনকে অস্বীকার করা, মানুষের দেয়া আইন দ্বারা পরিচালিত আদালতে (দাজ্জালের কাছে) নিয়ে যাবে। আদালতে উপস্থিত লোকদের সামনে মামলার কাজ চলবে, তখন

সবাই জানবে কেন – এই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। লোকেদের কাছে এই ব্যক্তির কথা ছড়িয়ে যাবে যে, সে বলছে, আমাদের সরকার এবং সরকার প্রধান-ই হচ্ছে দাজ্জাল যারা আল্লাহ এর দেয়া আইন বাদ দিয়ে নিজেরাই আইন দেয় এবং নিজেদের আইন দিয়ে রাষ্ট্র ও বিচার কাজ চালায়।

"তারপর দাজ্জাল তার লোকদেরকে সেই লোকের মাথা ছিন্ন-ভিন্ন করার নির্দেশ দিয়ে বলবে, "তাকে ধরো এবং তার মাথা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দাও" । তারপর তার পেটে ও পিঠে আঘাত করা হবে" । হাদিসের এই কথার অর্থ হচ্ছে, আদালতের বিচারক (দাজ্জাল) সেই ব্যাক্তি বা যুবককে রিমান্ডে পাঠাবে অর্থাৎ তাকে নির্যাতন করার নির্দেশ দিবে; মাথা ছিন্ন-ভিন্ন করার ব্যাখ্যা হচ্ছে তার মাথা থেকে সকল তথ্য, কথা বের করো। 'তাকে ধরো' কথার অর্থ হচ্ছে আদালতের বিচারক (দাজ্জাল) সেই ব্যাক্তির বা যুবকের জামিন দিবে না। বরং তাকে রিমান্ডের নির্দেশ দিবে। তারপর পুলিশ বা ডিবি বা অন্য সরকারি বাহিনী সেই ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে গিয়ে পিটাবে; কোথায় পিটাবে সেটাও বলা আছে – 'পেটে এবং পিঠে' অর্থাৎ এমন জায়গায় এবং এমন ভাবে মারা হবে যাতে সেই ব্যাক্তি বা যুবক মারা না যায়। যারা রিমান্ড সম্পর্কে জানেন, তারা জানেন যে, রিমান্ডে মাথায় মারা হয় না এবং মারার সময় খেয়াল রাখা হয় যেন, আসামি মারা না যায় – এই বিষয়টার দিকে ইঙ্গিত দিতেই হাদিসে পেটে এবং পিঠে মারার কথা বলা হয়েছে বলে আমি মনে করি।

"(তারপর) দাজ্জাল তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কি (এখন) আমাকে বিশ্বাস করো না? তিনি (সেই ব্যাক্তি) বলবেন: 'তুমিই মিথ্যা মসীহ (দাজ্জাল)।' তারপর দাজ্জাল তার ব্যাপারে নির্দেশ দিবে। "হাদিসের এই কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে, রিমান্ডে এবং আদালতে দাজ্জাল (পুলিশ ও বিচারক) তাকে বুঝাবে যে, গনতন্ত্র মেনে নাও, মৌলবাদ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসো, ইত্যাদি। জবাবে সেই ব্যক্তি/যুবক বলবে, তুমিই দাজ্জাল।

"তারপর দাজ্জাল তার ব্যাপারে নির্দেশ দিবে। দাজ্জালের নির্দেশ মত (সেই ব্যক্তির) মাথা হতে পা পর্যন্ত তাকে করাত দ্বারা চিড়ে দু টুকরো করে দেয়া হবে। তারপর দাজ্জাল উভয় টুকরার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হয়ে তাকে সম্বোধন করে বলবে, 'উঠো'। সে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে" । হাদিসের এই কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে, আদালত তদন্ত করতে নির্দেশ দিলে পুলিশ তদন্ত করে সেই ব্যক্তির স্ত্রীকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে। তারপর নারীদের জেলে স্ত্রীকে রাখবে আর পুরুষদের জেলে ঐ ব্যক্তিকে রাখবে। আপনারা জানেন, ইসলামে বলা আছে যে, পুরুষদের বুকের পাজরের হাড় থেকে তার স্ত্রীকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। স্বামী-স্ত্রী আলাদা শরীর হলেও তারা আসলে একই শরীরের দুইটি অংশ। তাই, করাত দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে চিড়ে ফেলার অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তির থেকে তার স্ত্রীকে আলাদা করে ফেলা। তখন দাজ্জাল (পুলিশ), স্বামী এবং স্ত্রীকে আদালতে বিপরীতমুখী ২ টি কুঠুরির মধ্যে রেখে স্বামীকে বলবে, বিচারক (দাজ্জাল) আসছেন – উঠে দাড়াও এবং এই অবস্থায় বিচারকের (দাজ্জালের) সামনে সেই ব্যক্তিকে দাড়িয়েই থাকতে হবে যতক্ষণ আদালতের শুনানি চলে।

"এরপর আবারো তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি আমাকে অর্থাৎ বিচারককে/সরকারকে (দাজ্জালকে) বিশ্বাস করবে না? লোকটি বলবেন: 'এটা আমার অন্তর্দৃষ্টি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে যে, তুমি দাজ্জাল'; তিনি

আরও বলবেন: 'হে লোকসকল! আমার পরে সে (দাজ্জাল) অন্য কোন মানুষের সাথে এমন আচরণ করতে পারবে না।'" হাদিসের এই অংশের ব্যাখ্যা হচ্ছে, দাজ্জাল তখন আদালতে তাকে তার ভুল স্বীকার করে গনতন্ত্রকে এবং গণতান্ত্রিক সরকারকে মেনে নেয়ার আহবান জানাবে। কিন্তু সে এতদিন ভয়াবহ নির্যাতন শিকারের পর আরও নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারবে যে, এরাই হচ্ছে দাজ্জাল। যখন এই রকম হাজারো ব্যক্তিকে দাজ্জাল (সরকার) গুম করার ৬ মাস -১ বছর – ২ বছর পর আদালতে (দাজ্জাল) হাজির করবে, সমাজে হাজির করবে, তখন মানুষ জেনে যাবে যে, এই সরকার – ই হচ্ছে দাজ্জাল (মিথ্যাবাদী/প্রতারক) ফলে দাজ্জাল (সরকার) আর কোন ব্যক্তিকে গুম করতে পারবে না কারণ এতে সরকারের সুনাম নষ্ট হবে - এই ভয়ে। তাই, এই ব্যক্তিই প্রমাণ করবে বা বলবে যে, দাজ্জালই (সরকারই) মানুষকে গুম করছে ফলে সরকার (দাজ্জাল) আর মানুষকে গুম করতে পারবে না কারণ এতে সরকারের (দাজ্জালের) গ্রহণযোগ্যতা এবং সুনাম নষ্ট হয়।

"(তখন) দাজ্জাল তাকে হত্যার চেষ্টা করবে। তার ঘাড় এবং কণ্ঠহারের (কলারবোনের) মধ্যবর্তী স্থানটি তামায় পরিণত হবে এবং সে (দাজ্জাল) তাকে হত্যা করার কোন উপায় পাবে না। তাই সে (দাজ্জাল) তার হাত-পা ধরে ধরে নিক্ষেপ করবে (এমন কিছুতে যাকে আগুন বলে মনে হয়) । লোকেরা মনে করবে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে অথচ তাকে জান্নাতে নিক্ষেপ করা হয়েছে।রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন, "সেই ব্যক্তি হবেন বিশ্বজগতের রবের (আল্লাহ এর) নিকট শাহাদাতের দিক থেকে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট" ।

"হাদিসের এই কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে, তখন দাজ্জাল সেই ব্যক্তির কথাগুলো যেন ছড়িয়ে না পরে এবং মানুষ যেন সেই ব্যক্তির কথা ও ইসলামের দাওয়াত না পায় সে জন্য চেষ্টা করবে এবং সেই ব্যক্তিকে ফাঁসি দিতে চাইবে কিন্তু আদালত (দাজ্জাল) সেই রকম রায় দিতে পারবে না কারণ ফাঁশির রায় দেয়ার মত কোন অপরাধ সেই ব্যক্তি করেই নি। তাই, দাজ্জাল তাকে আদালতের রায়ের মাধ্যমে ফাঁসি দিতে পারবে না। তখন দাজ্জাল (অর্থাৎ দাজ্জালের বাহিনী, যেমনঃ পুলিশ, র‍্যাব, ডিবি, ডিজিএফআই ইত্যাদি) সেই ব্যক্তিকে উঁচু কোন জায়গা (যেমন বিল্ডিং) থেকে ফেলে হত্যা করবে বা হত্যার পর তার লাশ নদীর পানিতে বা জঙ্গলে বা সাগরের পানিতে ফেলে দিবে। যেহেতু সমাজের মানুষ ইসলাম সম্পর্কে জানে না এবং গনতন্ত্র যে শিরক – এটা জানে না, তাই তারা মনে করবে যে, সেই ব্যক্তি একজন চরমপন্থী মৌলবাদী ছিল ফলে সেই ব্যক্তিটি মৃত্যুর পর জাহান্নামের আগুনে যাবে কিন্তু আসলে সে শহীদ হয়েছে এবং সে জান্নাতে গেছে। আল্লাহ এর কাছে এই ব্যক্তি একজন বিশিষ্ট শহীদ হিসেবে মর্যাদা পাবে।

আপনি যদি এই যুবক -যুবতীদের মধ্যে কেউ হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জন্য সুসংবাদ – আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) আপনার কথাই বলে গেছেন তার পবিত্র ও সম্মানিত বানীতে।

ইয়াজুজ-মাজুজ হচ্ছে পৈত্তলিক ও যাদুতে বিশ্বাসী (বিজ্ঞানে বিশ্বাসী) সম্প্রদায়। বর্তমানে মানুষের ভিতরে প্রায় সবাই পৈত্তলিক বা মুশরিক; খ্রিষ্টানরা ট্রিনিটি (trinity) তে বিশ্বাস করে পৈত্তলিক হয়ে গেছে। ইহুদীরা ও অন্য

যারা (মুসলিম সহ) আছে তারা সবাই যাদুতে অর্থাৎ বিজ্ঞানে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানে বিশ্বাসী নয় এমন লোক এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন। এরাই হচ্ছে যাদুকর ও যাদুতে (বিজ্ঞানে) বিশ্বাসী। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব জায়গায় যাদু (বিজ্ঞান) শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। দাজ্জালের মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে পুরো সমাজ, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে। সুফিজম বা পীরতন্ত্র বা গনতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক ইসলামের উপর এমনভাবে মানুষ ঈমান এনেছে যে, এগুলোই যেন ইসলামের সঠিক পথ। দাজ্জাল ১৪৫৩ সালের কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সাত মাসের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিল, তারপর দাজ্জাল বহু বার বহু জায়গায় আবির্ভূত হয়েছে, খোরাসানেও (আফগানিস্থানে) দাজ্জাল আবির্ভূত হয়েছে। ইমাম মাহদি (হুসেইন ইবনে আলী আল হাসমি) ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত খলিফার দায়িত্ব পালন করেছেন; খোরাসানের কালো পতাকাধারীরাও চলে এসেছেন। আমার মতে, বর্তমান সময়ে দাজ্জাল তার সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আমার মতে, যুগের হিসাবে, আমরা এখন উপরের হাদিসে (রিয়াদ আস-সালিহীন ১৮১৫) বর্ণিত ব্যক্তির যুগে বসবাস করছি। আল্লাহ চাইলে, এরপরেই ইসা আঃ আসবেন অর্থাৎ আমাদের সময় হচ্ছে ইসা আঃ আসার আগের সময়। ইতিপূর্বে, 'প্রথমবার দাজ্জালের আবির্ভাব' নামের অধ্যায়টিতে আমরা সাহিহ মুসলিমের ২৮৯৭ নাম্বার হাদিসটি ইতিহাস অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখেছিলাম যে, আমরা ইসা আঃ আসার পূর্বের সময়ে বসবাস করছি। এখন রিয়াদ আস-সালেহিন ১৮১৫ নাম্বার হাদিসের ব্যাখ্যাও আমরা একই তথ্য পেলাম যে, আমরা ইসা আঃ এর আগমনের পূর্ব সময়ে বসবাস করছি।

যারা এখনো বুঝে হোক বা না বুঝে হোক দাজ্জালের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের প্রতি অনুরোধ হচ্ছে, "আপনি নিজে জ্ঞান অর্জন করুন, কোন আলেম বা এই বইয়ের ব্যাখ্যাকে আপনার বিশ্বাস করতে হবে না। আপনি জ্ঞান অর্জন করলে আল্লাহ আপনাকে এই জমানার পরীক্ষায় পাস করিয়ে দিবেন। মনে রাখবেন, আপনাকে শুধু জ্ঞান অর্জন করে দাজ্জালকে চিনতে বলা হচ্ছে এবং তার ভুল বিশ্বাস থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে বলা হচ্ছে। জ্ঞান অর্জন বলতে কোরআন বুঝে বুঝে পড়াকে বুঝাচ্ছি।

ইসা আঃ আসলে আমরা কি উনাকে চিনতে পারব?

আমাদের চিন্তার কত আগেই দাজ্জাল আবির্ভূত হয়েছে এবং প্রায় সকল দাজ্জাল-ই আবির্ভূত হয়ে গেছে কিন্তু আমরা এখনো ভেবে বসে আছি যে, দাজ্জাল এখনো আবির্ভূত-ই হয়নি। আমরা আরও ভেবে বসে আছি যে, ইমাম মাহদি এখনো আসেনি; ইয়াজুজ-মাজুজ মুক্তি পায়নি। অথচ অনেক বছর আগেই এই ঘটনাগুলো ঘটে গেছে। তাহলে ইসা আঃ যখন আসবেন এবং এসে দাজ্জালকে হত্যার পর সঙ্গী- সাথী নিয়ে পাহাড়ে চলে যাবেন তখন আমরা কি বুঝতে পারব যে, ইসা আঃ এসেছেন? ইসা আঃ যে এসেছেন এটা খুব কম মানুষ-ই জানতে পারবে বলে আমার মনে হয়। কারণ দাজ্জাল হচ্ছে একজন বিভ্রান্তকারি যালিম শাসক। তাকেই ইসা আঃ হত্যা

করবেন এবং এটা হবে আরব অঞ্চলে (বর্তমান প্যালেস্টাইন বা সিরিয়াতে); তখন মিডিয়ার রিপোর্টে (পত্রিকার রিপোর্ট) কি এই খবর আসবে? আমার মনে হচ্ছে, ইসা আঃ আসার খবর কোন মিডিয়াতে বা পত্রিকাতে আসবে না কারণ মিডিয়া, পত্রিকা নিয়ন্ত্রণ করে দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ-মাজুজ। দাজ্জালের নাম কখনোই দাজ্জাল হবে না। দাজ্জাল হচ্ছে একটি টাইটেল বা পদবী। তাহলে, কোনো বিভ্রান্তিকারি যালিম মুসলিম বা অমুসলিম শাসক মারা গেলে সেই শাসক- ই যে দাজ্জাল ছিল, সেটা বুঝা যাবে কিভাবে?

(*) এখানে আমি বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী হাদিসের ব্যাখ্যা করছি; আমার ব্যাখ্যা ভুল হতে পারে আবার কিছুটা সঠিকও হতে পারে। কেউ এগুলিকে ভবিষ্যৎবানী হিসেবে নিবেন না।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত আসবে না যতক্ষণ না মুসলিমরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং মুসলমানরা তাদের হত্যা করবে যতক্ষণ না ইহুদিরা পাথর বা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে এবং একটি পাথর বা গাছ বলবে: মুসলিম, অথবা আল্লাহর বান্দা, আমার পিছনে একজন ইহুদি আছে; আসো এবং তাকে হত্যা করো; কিন্তু ঘরকদ গাছ বলবে না, কারণ এটি ইহুদিদের গাছ"। (সহীহ মুসলিম ২৯২২)
আমরা এই বইয়ে ৩ বার তিনটি পৃথক হাদিস থেকে প্রমাণ পেয়েছি যে, ইসরায়েল একটি দাজ্জাল ইহুদী রাষ্ট্র। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর পদটি হচ্ছে দাজ্জালের পদ। যে এই পদে বসেছে এবং বসবে সেই দাজ্জাল হবে। উক্ত হাদিসে ইসরায়েলের ইহুদীদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধ হবার কথাই বলা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এই যুদ্ধ শুরুর কিছু পূর্বে বা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইসা আঃ আসবেন বলে মনে হচ্ছে। ইসা আঃ ইসরায়েল রাষ্ট্রটির এবং এর ইহুদীদের কোন অস্তিত্ব রাখবেন না বলেই মনে হচ্ছে। ইসরায়েল রাষ্ট্র না থাকলে তার প্রধানমন্ত্রীর পদ-ও থাকবে না। যুদ্ধে ইসা আঃ দাজ্জালকে হত্যা করার কথা যে হাদিসে এসেছে তা খুব সম্ভবত ইসরায়েলের সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হতে পারে বা ইহুদীদের প্রধান নেতা হবে- এমন সম্ভাবনাই বেশি। বর্তমান জমানার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর দাজ্জাল হচ্ছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর পদটি। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নিহত হলে এবং ইসরায়েলের ইহুদীরা অস্তিত্বহীন হলে ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে ইয়াজুজ-মাজুজ সিরিয়া অঞ্চলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে এটাই স্বাভাবিক। তখন, আল্লাহ ইসাকে (আঃ) সঙ্গী- সাথীদেরকে নিয়ে তূর পাহাড়ে চলে যেতে বলবেন – হাদিসের এমন ব্যাখ্যাই আমার কাছে সঠিক বলে মনে হচ্ছে।

আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন" ………………….।তাই তারা (ইয়াজুজ-মাজুজ) মাটি খুঁড়ে মানুষের কাছে বেরিয়ে আসবে এবং তারা সমস্ত পানি পান করবে। লোকেরা তাদের দুর্গে তাদের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে সুরক্ষিত

করবে। তারা আকাশের দিকে তীর ছুঁড়বে এবং সেগুলো তাদের উপর রক্ত লাগিয়ে ফিরে আসবে এবং তারা বলবে: "আমরা পৃথিবীবাসীদের পরাজিত করেছি এবং আসমানবাসীদের উপর কর্তৃত্ব করেছি।" "অতঃপর আল্লাহ তাদের ঘাড়ের নীচে একটি কীট প্রেরণ করবেন এবং এর মাধ্যমে তাদের হত্যা করবেন।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ, পৃথিবীর পশুরা তাদের মাংস খেয়ে মোটা হয়ে যাবে।" (সুনান ইবনে মাজাহ: ৪০৮০)

ইয়াজুজ – মাজুজ আকাশের দিকে তীর ছুড়বে বলতে আমি বুঝেছি ইয়াজুজ-মাজুজ যে আকাশের/ মহাকাশের দিকে রকেট ছুড়ছে – সেটাই হচ্ছে আকাশের দিকে তীর ছুড়ে মারা। সুনানে ইবনে মাজাহের ৪০৮০ নাম্বার হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী কোন পর্যায়ে বর্তমানে ইয়াজুজ-মাজুজ আছে? ইয়াজুজ-মাজুজ কি বলছে যে, "আমরা পৃথিবীবাসীদের পরাজিত করেছি এবং আসমানবাসীদের উপর কর্তৃত্ব করেছি।" --- এই রকম লেখা তো প্রায়ই পত্রিকায় এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান ও মহাকাশ বিষয়ক অনুষ্ঠানে বলা হয় যে, “মানুষ পৃথিবীকেও বিজয় করেছে আবার মহাকাশও জয় করেছে” । ১৯৬৯ সালে ইয়াজুজ –মাজুজ মহাকাশে রকেটে মানুষ পাঠিয়ে তা আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে যা ‘Apollo-11’ মিশন নামে পরিচিত। ১৯৬৯ সালে চাঁদ থেকে ২১.৫ কেজি চাঁদের উপাদান (চাঁদের মাটি, বালি, পাথর ইত্যাদি) ইয়াজুজ-মাজুজ নিয়ে এসেছে। এরপর মহাকাশে অনেক রকেট (তীর) পাঠানো হয়েছে যা আবার পৃথিবীতে ফেরত এসেছে। “সেগুলো তাদের উপর রক্ত লাগিয়ে ফিরে আসবে” হাদিসে এই রক্তের অর্থ কি? এটা বুঝতে আমরা দেখব, কোরআনে ‘রক্ত’ শব্দটি কি হিসাবে বেবহ্রিত হয়েছে।

“অতঃপর আমি তাদের উপর প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্তের বিপদ পাঠিয়েছিলাম সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে, কিন্তু তারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল। তারা ছিল এক অপরাধী জাতি। ”(কোরআনঃ সূরা আরাফঃ ১৩৩)
অর্থাৎ রক্ত হচ্ছে আল্লাহ এর পক্ষ হতে একটি শাস্তির প্রতীক।

“স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, ‘আমি যমীনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি’; তারা বলল, ‘আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসামূলক তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা ঘোষণা করি’। তিনি বললেন, ‘আমি যা জানি, তোমরা তা জান না’” । (কোরআনঃ সূরা বাকারাঃ ৩০)
সূরা বাকারার ৩০ নাম্বার আয়াতে রক্তপাত বলতে হত্যা/ নিহত হওয়াকে বুঝানো হচ্ছে।
পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (১) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে। (২) (সূরা আলাকঃ১-২)
সূরা আলাকের ১ ও ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে সৃষ্টি করার কথা বলছেন। তাহলে, রক্তপিণ্ডটিতে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান আল্লাহ রেখেছেন যেখান থেকে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

উপরে বর্ণিত কোরআনের আয়াতে 'রক্ত' সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সেই আলোকে যদি সুনান ইবনে মাজাহের ৪০৮০ নাম্বার হাদিসে বর্ণিত রক্তকে ব্যাখ্যা করি তাহলে আমার মতে ব্যাখ্যা হয় যে, তীরের গায়ে যে রক্ত লেগে পৃথিবীতে ফিরে আসবে তাতে জীবিত কিছু থাকবে কিন্তু তাকে পরিপূর্ণ জীব বলা যাবে না, তবে প্রাণের অস্তিত্ব সেই রক্তে আছে যেমন মানুষ মায়ের পেটে প্রথম অবস্থায় রক্তপিণ্ড আকারে থাকে। এই রক্তটি পৃথিবীর বাহির থেকে আসবে তাই এটিতে বিপদ রয়েছে। আল্লাহ রক্তের বিপদের কথা বলেছেন যা দিয়ে আল্লাহ শাস্তি দেন। এই রক্ত মৃত্যুর দিকেও ইঙ্গিত করে যা সূরা বাকারার ৩০ নাম্বার আয়াতে বলা আছে। আমার মনে হচ্ছে, এই রক্তে থাকবে সেই কীট যেটি আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজের ঘাড়ে পাঠাবেন। হাদিসে আল্লাহ এর রসূল সাঃ যাকে কীট বলেছেন, আমার মনে হয় তাকেই বিজ্ঞানীরা বলে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া বা এক কোষী জীব। রক্তের মধ্যে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া অনেক দিন বাচতে পারে এবং রক্ত ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার বা এক কোষী জীবের খুব ভালো পরিবাহী।

যারা বইটি এই পর্যন্ত পড়েছেন, তারা জানেন যে, পৈত্তলিক ও যাদুতে (বিজ্ঞানে) বিশ্বাসী মানুষরাই হচ্ছে ইয়াজুজ-মাজুজ । বিজ্ঞানের বিশ্বাসী যে সকল মুসলিম আছে তারাও মাজুজের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন, "……………………। তারপর আল্লাহর নবী ঈসা এমন কিছু লোকের কাছে আসবেন যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন, এবং তিনি তাদের মুখ মুছে দেবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বলবেন। যখন তারা এই অবস্থায় থাকবে, তখন আল্লাহ তাকে ওহী দেবেন: "হে ঈসা, আমি আমার কিছু বান্দাকে বের করে এনেছি যাদের কেউ হত্যা করতে পারবে না, তাই আমার বান্দাদের নিরাপদে তুরে নিয়ে যাও।" তারপর ইয়াজুজ ও মাজুজ (সেখানে) বেরিয়ে আসবে এবং তারা, যেমন আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, "প্রত্যেক টিলা থেকে নেমে আসবে।" [21:96] তাদের প্রথমজন তিবেরিয়াস হ্রদের পাশ দিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে পান করবে, তারপর তাদের শেষজন সেখান দিয়ে যাবে এবং বলবে: "এখানে একসময় পানি ছিল।" আল্লাহর নবী ঈসা এবং তার সঙ্গীদের সেখানে অবরুদ্ধ করা হবে যতক্ষণ না তাদের কারো কাছে ষাঁড়ের মাথা তোমাদের কারো কাছে আজ একশ দিনারের চেয়েও প্রিয় হয়ে উঠবে। তারপর, আল্লাহর নবী ঈসা এবং তার সঙ্গীরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন। তারপর আল্লাহ তাদের ঘাড়ে একটি কীট পাঠাবেন এবং পরের দিন সকালে তারা সবাই এক হয়ে (একসাথে) মারা যাবে। আল্লাহর নবী ঈসা এবং তার সঙ্গীরা নেমে আসবেন এবং তারা তাদের (ইয়াজুজ-মাজুজের মৃত দেহের) দুর্গন্ধ, দুর্গন্ধ এবং রক্ত থেকে এক বিঘত জায়গাও পাবে না। তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, আর তিনি বাক্ট্রিয়ান উটের গলার মতো ঘাড়ওয়ালা পাখি পাঠাবেন, যারা সেগুলো তুলে নিয়ে যাবে এবং আল্লাহ এর যেখানে ইচ্ছা সেখানে ছুঁড়ে ফেলবে।………………………………।" (হাদিস নং: ৪০৭৫; সুনান ইবনে মাজাহ। রিয়াদ আস সালেহিন ১৮০৮, অনুরূপ হাদিসঃ সাহিহ মুসলিমঃ ৭১০৬;)

উল্লেখিত তিনটি হাদিসে শেষ জমানা অর্থাৎ আমাদের জমানা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। ইয়াজুজ-মাজুজের থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হলে কি করতে হবে সেই সম্পর্কে আল্লাহ এর রসূল সাঃ আমাদেরকে

এই হাদিসে ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রথম কথা হচ্ছে, ইয়াজুজ-মাজুজকে আমরা পরাজিত করতে পারব না কারণ ইসা আঃ কে আল্লাহ বলে দিবেন যে, এদেরকে (ইয়াজুজ-মাজুজকে) কেউ পরাজিত করতে পারবে না। আল্লাহ ইসা আঃ কে সঙ্গী- সাথী নিয়ে তূর পাহাড়ে যেতে বলবেন। সেখানে (তূর পাহাড়ে) ইসা আঃ ও তার সঙ্গী –সাথীরা ইয়াজুজ-মাজুজের সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকবেন এবং আলাদা একটি সমাজ গড়ে তুলবেন; অবস্থা এমন হবে যে, সেই সমাজে একটি ষাঁড়ের মাথার দামও অনেক অনেক বেশি হবে। আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজের ঘাড়ে একটি কীট পাঠাবেন ফলে তারা অতি দ্রুত একসাথে সবাই মারা পড়বে। যেই কীটটির কথা এখানে বলা হচ্ছে সেই ধরণের রোগকে বর্তমান বিজ্ঞানীরা ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংগঠিত মহামারী বলে সম্বোধন করেন বলে মনে হচ্ছে। এই ধরণের ভাইরাস আল্লাহ পাঠাবেন ইয়াজুজ-মাজুজের ঘাড়ে।
হাদিসে উল্লেখিত 'তারপর আল্লাহ তাদের ঘাড়ে একটি কীট পাঠাবেন………' । মনে হচ্ছে, এই কীট পৃথিবীতে ছিল না - আল্লাহ এটাকে ইয়াজুজ-মাজুজের ঘাড়ে পৃথিবীর বাহির থেকে পাঠাবেন অর্থাৎ আল্লাহ এই কীট পৃথিবীর বাহির থেকে পাঠাবেন বলে মনে হচ্ছে।

আল্লাহ কিভাবে এই কীট ইয়াজুজ-মাজুজের ঘাড়ে পাঠাবেন সেটা সম্ভবত সুনান ইবনে মাজাহ: ৪০৮০ নাম্বার হাদিসে বলা আছে। "……তারা (ইয়াজুজ-মাজুজ) আকাশের দিকে তীর ছুঁড়বে এবং সেগুলো তাদের উপর রক্ত লাগিয়ে ফিরে আসবে এবং তারা বলবে: "আমরা পৃথিবীবাসীদের পরাজিত করেছি এবং আসমানবাসীদের উপর কর্তৃত্ব করেছি।……।"

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বলছে যে, মহাকাশে প্রচুর ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া রয়েছে যার কারণে মহাকাশ থেকে কোন স্পেসশিপ বা রকেট ফেরত আসলে সেগুলোকে এবং মহাকাশ থেকে ফেরত আসা মানুষদেরকে (নভোচারীদের) খুব ভালোভাবে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করার জন্য স্প্রে করা হয়। কিন্তু মহাকাশে থাকা ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কি দুনিয়ার ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া মত-ই হবে যে দুনিয়ার ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংসকারি স্প্রে সেই সব ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার উপর কাজ করবে? মহাকাশে এমন অনেক ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে যেগুলোকে বিজ্ঞানীরা হয়তো শনাক্ত করতেও পারছেন না। পৃথিবীতেই কোটি কোটি প্রজাতির ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া আছে যে গুলোকে মানুষ ধ্বংস করতে পারে না আর মহাকাশে যে কত জটিল প্রজাতির ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, এক কোষী জীব আছে –সেটা আল্লাহ-ই জানেন। এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করে, আমি মনে করি যে, ইয়াজুজ- মাজুজের সকলের এক সাথে মৃত্যুর বিষয়ে হাদিসে যা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ মানুষের (ইয়াজুজ-মাজুজের) আকাশে/ মহাকাশে পাঠানো তীরে (রকেটে) রক্ত (ভাইরাস/ ব্যাকটেরিয়া) লাগিয়ে পৃথিবীতে ফেরত পাঠাবেন। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজ এটা বুঝতে পারবে না। তারা অহংকার ও দাম্ভিকতায় খুশি হয়ে বলতে থাকবে যে, তারা জমিনের সবাইকে পরাজিত করেছে এবং আসমানবাসীদের উপরও কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে যেমনটি এখন মানুষ বলছে। তখন আল্লাহ সেই কীট (ভাইরাস/ ব্যাকটেরিয়া/ এক কোষী জীব) ইয়াজুজ-মাজুজের (পৌত্তলিক ও যাদুতে/বিজ্ঞানে বিশ্বাসী

মানুষদের) ঘাড়ে পাঠাবেন ফলে তারা অতি দ্রুত এক সাথে সবাই মারা যাবে। হাদিসের বর্ণনায় দেখা যায় যে, পৃথিবীতে এক বিঘত জায়গা থাকবে না যেখানে ইয়াজুজ-মাজুজের রক্ত, দুর্গন্ধ নেই। এটা স্বাভাবিক; সারা দুনিয়ার সকল পৈত্তলিক ও যাদুতে (বিজ্ঞানে) বিশ্বাসী সকল মানুষ যদি একদিনে এক সাথে মারা যায় তাহলে তাদের দেহ পঁচে কি পরিমাণ দুর্গন্ধ হবে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। বর্তমানে যে পরিমাণ ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীতে আছে সেই হিসাবে তাদের সংখ্যা কমপক্ষে ৫০০ কোটি হবে বলে আমার মনে হয়। এখন প্রশ্ন আসে – আল্লাহ কি সেই কীটটি পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন? আল্লাহ কি ইয়াজুজ-মাজুজের তীরে (রকেটে) রক্ত লাগিয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন? এমন হতে পারে যে, ইতিমধ্যেই সেই কীটটি রকেটের গায়ে রক্তর মত লেগে পৃথিবীতে চলে এসেছে কিন্তু এখনো মানুষের (ইয়াজুজ-মাজুজের) মধ্যে সংক্রমিত হয়নি; আবার এমন হতে পারে যে, এখনো সেই কীটটিকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়নি, ভবিষ্যতে কোন রকেটের গায়ে রক্ত লাগিয়ে পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হবে যাতে সেই কীটটি (ভাইরাস/ ব্যাকটেরিয়া / এক কোষী জীব) থাকবে। আমরা জানি, গ্রীকরা Apollo নামে একজন God আছে বলে বিশ্বাস করত এবং তারা তার পুজা করত। পৈত্তলিকতার শিরক ইয়াজুজ-মাজুজ আসমান পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছে তাদের মহাকাশযানের নাম Apollo রেখে। তারা কি আসমানে শিরক প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।

* এখানে আমি আমার সীমিত জ্ঞান দ্বারা হাদিসের ব্যাখ্যা করেছি। কেউ এগুলিকে ভবিষ্যৎ বানী হিসেবে নিবেন না। ভবিষ্যতে কি হবে জানেন একমাত্র আল্লাহ। আমার হাদিসের ব্যাখ্যা ভুল হতে পারে আবার ঠিকও হতে পারে। আমার এই বইটি লিখার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সচেতন করা – তারা যেন কোরআন, হাদিস বুঝে বুঝে পড়ে এবং চিন্তা –ভাবনা করে; মানুষ যেন কোন 'আলেমকে' অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে।

এরূপ আশা করা যায় যে, যারা প্রকৃত মুসলিম অর্থাৎ যারা একমাত্র আল্লাহকে আইনদাতা বলে মানেন এবং ইসলামের মাঝে অন্য কিছুর মিশ্রণকে অস্বীকার করেন, তারা ইসা আঃ কে চিনতে পারবেন।

ইসা আঃ এর আগমন সম্পর্কে পূর্বে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। ইসা আঃ কখন আসবেন? তিনি কি কি কাজ করবেন? এই সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে।

"আবদুল্লাহ বিন আমর বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেছেন, "মরিয়মের পুত্র ঈসা পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, বিবাহ করবেন, সন্তান জন্ম দেবেন এবং পঁয়তাল্লিশ বছর অবস্থান করবেন, এরপর তিনি মারা যাবেন এবং আমার সাথে আমার কবরে সমাহিত হবেন। তারপর আমি এবং মরিয়মের পুত্র ঈসা, আবু বকর এবং উমরের মধ্যবর্তী এক কবর থেকে উঠবো।" ইবনে আল-জাওযী কিতাবুল-ওয়াফা' মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৫০৮-এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে মরিয়মের পুত্র (অর্থাৎ ঈসা) ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে অবতীর্ণ হন। তিনি ক্রুশ ভেঙে

ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিজিয়া কর বাতিল করবেন। অর্থের প্রাচুর্য এত বেশি হবে যে কেউ তা (দান হিসেবে) গ্রহণ করবে না।” (সহীহ আল-বুখারী ২৪৭৬)

আমার মতে, ইসা আঃ জিজিয়া বাতিল করবেন কারণ তখন জিজিয়া নেবার কোন প্রয়োজন হবে না কারণ সম্পদের প্রাচুর্য তখন অনেক বেশি হবে।

বুখারী ও মুসলিমের একটি বর্ণনায় তিনি (মুহাম্মাদ সাঃ) বলেন, "যখন মরিয়মের পুত্র অবতরণ করবেন এবং তোমাদের ইমাম তোমাদেরই একজন হবেন, তখন তোমাদের কী হবে?" জাবির বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহর রাসূল বলেছেন, "আমার উম্মতের একটি অংশ সত্যের জন্য লড়াই করা এবং কিয়ামত পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করা বন্ধ করবে না।" তিনি বলেন যে, মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) তখন অবতরণ করবেন এবং তাদের সেনাপতি তাকে তাদের নামাজে ইমামতি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন, কিন্তু তিনি বলবেন, "না, তোমাদের এই জাতির জন্য আল্লাহ একদলকে অন্যদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন।" (মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৫০৭)

উপমহাদেশে বসবাসকারীরা কাদের বংশধর

আমি যেহেতু উপমহাদেশের বাসিন্দা তাই এই অঞ্চলের বংশধারা (Blood line) নিয়ে আলোচনা করা সহজ। কিন্তু এটি সারা পৃথিবীর জন্যই প্রযোজ্য হবে। ইতিহাসবিদ ফেরেস্তার মতে মুসা আঃ এর সময় ফেরাউনের পতনের পর তার কিছু অনুসারী ভারতে চলে আসে। আমরা জানি, কাদেসিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর জরাথুস্ট্রবাদে (Zoroastrianism) বিশ্বাসী পারস্যের অনেক লোক ভারতে চলে আসে। এদের মধ্যে বিয়ে হতে থাকে এবং রক্তের বা বংশধারার সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে। জুলকারনাইনের দেয়াল ভেঙ্গে যাবার পর ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্যেও বংশধারার সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে।

ইয়াজুজ-মাজুজ প্রজন্মের হিসাব করার জন্য জন্মসাল ভাগ করে নিয়েছে। যাদের জন্ম সাল ১৯০১-১৯২৭ সালের মধ্যে তাদের প্রজন্মের নামঃ The Greatest Generation কারণ তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ করেছে। ১৯২৮ – ১৯৪৫ সালের মধ্যে যাদের জন্ম তাদের প্রজন্মের নামঃ The Silent Generation; ১৯৪৬-১৯৬৪ সালের মধ্যে যাদের জন্ম তাদের প্রজন্মের নামঃ Baby Boom Generation; ১৯৬৫-১৯৮০ সালের মধ্যে যাদের জন্ম তাদের প্রজন্মের নামঃ Generation X; ১৯৮১-১৯৯৬ সালের মধ্যে যাদের জন্ম তাদের প্রজন্মের নামঃ Generation Y; ১৯৯৭-২০১০ সালের মধ্যে যাদের জন্ম তাদের প্রজন্মের নামঃ Generation Z; ২০১০-২০২৪ সালের মধ্যে যাদের জন্ম তাদের প্রজন্মের নামঃ Generation Alpha (α); ২০২৫-২০৩৯ সালের মধ্যে যাদের জন্ম তাদের প্রজন্মের নামঃ Generation Beta (β). এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, ১৯৬৫ সালের পর থেকে যাদের জন্ম হয়েছে তাদের থেকে প্রজন্ম চিহ্নিত করার জন্য সাংকেতিক নাম ব্যাবহার করা হচ্ছে। 'The Greatest Generation', The Silent Generation, Baby Boom Generation, Generation X, generation গুলোর লোকেরা বিজ্ঞান ও টেকনোলজিতে কিছুটা পটু হলেও তারা সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান ও টেকনোলজিতে নির্ভর করেনি এবং অভ্যস্ত হয়নি। জেনারেশন

আলফা থেকে যে জেনারেশন আসছে তারা প্রচুর পরিমাণে বিজ্ঞান ও টেকনোলোজি নির্ভর হচ্ছে এবং হবে। তারা বিজ্ঞান ও টেকনোলজিতে আগের জেনারেশনগুলোর চেয়ে অনেক বেশি পটু ও বিশ্বাসী হচ্ছে ।

উপমহাদেশে এমন মানুষের আবির্ভাব হয়েছে যাদের শরীরে ফেরায়ুনদের অনুসারী এবং জরাথুস্ট্রবাদে (Zoroastrianism) বিশ্বাসী লোকদের মধ্যে বিয়ে হতে হতে এখন এই generation এর লোকেদের শরীরে উভয় বংশের রক্তই বিদ্যমান এর সাথে রোমান পৈত্তলিক রক্তও মিশে গেছে। সারা পৃথিবীতেই এমনটি ঘটেছে।

বিষয়টা বোঝার জন্য ভারতীয় উপমহাদেশকে বিবেচনা করি, আমাদের মুসলিমদের জন্য আল্লাহ বিয়ের ব্যাপারে নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, মুসলিম পুরুষরা মুসলিম, ইহুদী, খ্রিষ্টান নারীদের বিয়ে করতে পারবে কিন্তু পৈত্তলিক (অগ্নি বা মূর্তিপুজক) কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না – এতে মুসলিমদের মধ্যে পৈত্তলিক সংস্কৃতি যাতে না ঢুকে সেটা নিশ্চিত হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশ সহ বিশ্বের অনেক জায়গায়- ই মদিনা থেকে বের হওয়া মুসলিম ও তুর্কি মামলুক যোদ্ধাদের রক্তের যে সংমিশ্রণ বিয়ের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল তা পরিপূর্ণভাবে ঘটে গেছে। অর্থাৎ রক্তধারার ক্রস কমপ্লিট হয়েছে। এখন বাংলাদেশে এমন মুসলিম খুঁজে পাওয়া কঠিন যার শরীরে মুসলিম মামলুক যোদ্ধা বা মদিনা থেকে বের হওয়া দলের রক্ত নেই। বাংলাদেশে ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থান একটি প্রমাণ যে, বংশের ক্রস বা Blood Line এর ক্রস সম্পন্ন হয়েছে। খালি হাতে গুলির সামনে বুক পেতে দেয়া বাঙ্গালী মুসলিম যুবকদের রক্তে রয়েছে খালিদ বিন ওয়ালিদের বংশধরদের রক্ত (আফগানি/ পসতুন রক্ত) আর মুসলিম মামলুক তুর্কিদের বংশধরদের রক্ত যাদের পূর্ব পুরুষ আইন- জালুতের যুদ্ধে রোমান-মঙ্গোল যৌথবাহিনীকে পরাজিত করেছিল এবং রোমানদেরকে আরব মূল ভূখণ্ড অর্থাৎ লেভানট অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেছিল।

ইতিহাসবিদ ‘ফেরেস্তার’ মতে মুসা আঃ এর সময় ফেরাউনদের কিছু অনুসারী এবং বংশধর ভারতে এসে বসবাস শুরু করে। কাদেসিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর জরাথুস্ট্রবাদে (Zoroastrianism) বিশ্বাসী পারস্যের অনেক লোক ভারতে চলে আসে। এই উভয় বংশের (blood line) মধ্যে বিয়ে হতে থাকে; সেই সাথে সাথে এদের সাথে স্থানীয় হিন্দুদের (পৈত্তলিকদের) বিয়ে হতে থাকে এবং রক্তের বা বংশধারার সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে। এভাবে বর্তমান ভারতের সনাতন ধর্মালম্বীদের রক্তে ফেরায়ুন ও জরাথুস্ট্রবাদে বিশ্বাসী লোকদের রক্ত বা বংশধারা ঢুকে গেছে । এটি দিল্লি সালতানাতের মামলুক রাজবংশ, লোদি রাজবংশ ও সায়্যিদ রাজবংশের শাসিত অঞ্চলগুলোতে কম হয়েছে বলে মনে করি এবং বাংলা সালতানাতের অঞ্চলগুলোতে কম হয়েছে বলে মনে করি কারণ এই অঞ্চলগুলো মুসলিমদের দ্বারা দীর্ঘদিন শাসিত হয়েছে, কিন্তু অন্য অঞ্চলগুলোতে বেশি হয়েছে। এজন্য আপনি বর্তমানে দিল্লি, জনপুর (বিহার), বানারস, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে চরমপন্থি হিন্দু কম পাবেন। বর্তমান ভারতের অন্য অঞ্চলগুলোতে (গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, হরিয়ানা, ইত্যাদি) হিন্দু চরমপন্থির সংখ্যা বেশি। এরাই এখন অখণ্ড ভারতের দাবী তুলছে এবং বাংলাদেশসহ পাকিস্থান, নেপাল দখল করে নেয়ার স্বপ্ন বুনছে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যখন মামলুক যোদ্ধারা এবং মদিনা থেকে বের হওয়া দলের বংশধররা উপমহাদেশে এসেছে তারা তাদের বিশ্বাস, মতাদর্শ, চিন্তা –ভাবনা নিয়েই এসেছে এবং তা তাদের বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। এভাবে বংশানুক্রমে সেই বিশ্বাস, মতাদর্শ, চিন্তাভাবনা উপমহাদেশে বসবাসকারী মুসলিমদের মধ্যেও আছে। একই ঘটনা ফেরায়ুনদের ও জরাথুস্ট্রবাদে বিশ্বাসীদের বংশধরদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। উপমহাদেশে মামলুক যোদ্ধা ও মদিনা থেকে বের হওয়া দলের বংশধররা যেমন আছে তেমনি ফেরায়ুনদের ও জরাথুস্ট্রবাদে বিশ্বাসীদের বংশধররাও আছে।

*** এই বিষয়ে পরিপূর্ণ আলোচনা "বঙ্গ অর্থাৎ বাংলা অঞ্চলে দাজ্জালের শাসনের শুরু" অধ্যায়টিতে পেয়েছেন বলে আশা করি।

আমাদের করনীয়ঃ

আবু দারদা’ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “যদি কেউ সূরা আল-কাহফের শুরুর দশটি আয়াত অন্তর দিয়ে শিখে (learns by heart), তাহলে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সুরক্ষিত থাকবে।” (সাহিহ মুসলিম ৮০৯এ; মিশকাত আল-মাসাবিহ ২১২৬)

উপরে বর্ণিত হাদিসগুলো আমাদের দেশের লোকেরা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে। আমরা মনে করি যে, সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করলে বা পড়লেই বুঝি দাজ্জালের ফিতনা থেকে আমি বেচে যাবো; দাজ্জালের পরীক্ষা আমার কাছে আসবে না। কিন্তু অন্তর দিয়ে শিখার অর্থ তো তোঁতা পাখির মত না বুঝে মুখস্ত করা নয়। আমার অন্তরে তখন-ই কোন কিছু প্রবেশ করবে যখন আমি তা বুঝে পড়ব, তারপর মুখস্ত করবো যাতে আমি আয়াতগুলো ভুলে না যাই - কারণ এই আয়াতগুলোতে যা কিছু আল্লাহ আমাকে করতে বলেছেন তা আমি করবো কিভাবে - যদি আমি আয়াতগুলোই ভুলে যাই? সুতরাং সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত অন্তর দিয়ে বুঝে, মুখস্ত করে, সেভাবে কাজ করাই হচ্ছে মূল বিষয়।

যারা আরবী ভাষা বুঝেন না –তারা কি করবেন? তারা বাংলা অনুবাদ পড়বেন এবং যদি ইংলিশে ভালো হন তাহলে ইংলিশ অনুবাদও পড়বেন।

মিশকাত আল-মাসাবিহ ২১২৬ নাম্বার হাদিসে সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত অন্তর দিয়ে শিখার কথা বলা হয়েছে।

“যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর বান্দার (মুহাম্মাদ সাঃ) উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে তিনি বক্রতা রাখেননি (১)” (সূরা আল কাহফঃ১)

এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, তিনি তার বান্দার উপর কোরআন নাযিল করেছেন। এখানে একটি কথা পরিষ্কার করে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন যে, মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহ এর বান্দা। মুহাম্মাদ সাঃ এর উপর কোরআন নাযিল

করার কারণে তিনি আল্লাহ এর রসূল হয়েছেন। এখানে পরোক্ষভাবে আল্লাহ আমাদের সাবধান করছেন যে, মুহাম্মাদ সাঃ এর যেন এত প্রশংসা না করা হয় যে সেটা শিরক হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস আছে, উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি নবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, "আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করো না, যেমন খ্রিস্টানরা মরিয়মের পুত্রের প্রশংসা করেছিল, কারণ আমি কেবল একজন বান্দা। অতএব, আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল বলো।" (সাহিহ বুখারী ৩৪৪৫)

এই দিক দিয়ে দাজ্জাল আমাদের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করবে। খেয়াল করলে দেখবেন, সুফিজমে বিশ্বাসীরা আল্লাহ এর রসূল সাঃ কে নিয়ে এমন সব কথা বলে যা শিরকের পর্যায়ে পড়ে। নবী সাঃ নূরের তৈরি না মাটির তৈরি - এই ধরণের বিষয় নিয়ে তারা বিশাল বিতর্ক জুড়ে দেয়, তাদের মিলাদে নবী সাঃ হাজির হন, নবী সাঃ মারা যাননি, নবী সাঃ গায়েব জানেন – এমন সব দাবী তারা করে যা পরিষ্কার শিরক। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, অন্য সকলের মতই মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহ এর একজন বান্দা - যার উপরে কোরআন নাযিল হওয়ার কারণে তিনি আল্লাহ এর রসূল (দূত) হয়েছেন, তাহলে আশা করা যায় সে এই সব শিরক থেকে বাচতে পারবে। তবে এই জন্য তাকে পুরা কোরআন বুঝে বুঝে পড়তে হবে। পুরা কোরআন বুঝে বুঝে পড়ার কথা এই আয়াতে বলা আছে।

আল্লাহ এই আয়াতে বলছেন যে, তিনি এমন একটি কিতাব নাযিল করেছেন যাতে তিনি কোন ধরণের বক্রতা রাখেন নি। এখন পুরা কোরআন বুঝে বুঝে না পড়লে, দাজ্জাল যখন বক্রতা নিয়ে আপনার কাছে আসবে তখন আপনি কিভাবে বুঝবেন যে, কোনটা বক্রতা আর কোনটা সরল পথ (ইসলাম)? কোরআনের জ্ঞানের নিরিখে তুলনা করলে আপনি দাজ্জালের বক্রতা ধরতে পারবেন। দাজ্জাল ইসলামের ভিতরে, কোরআনের ব্যাখ্যায় বক্রতা ঢুকিয়ে দিবে, পুরো কোরআন বুঝে বুঝে পড়লে আপনি দাজ্জালের সেই বক্র ব্যাখ্যা ধরতে পারবেন। সেই সাথে সাথে আল্লাহ বলছেন যে, তিনি তার একজন বান্দার (মুহাম্মাদ সাঃ) উপর কোরআন নাযিল করেছেন- তাহলে সেই বান্দার কথাও তো আপনাকে জানতে হবে এবং উনার দিক –নির্দেশনা জানতে হবে। এজন্য আপনাকে হাদিসের বই ও পড়তে হবে। মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বাণী সম্পর্কে জানতে হবে কারণ উনি উনার বানীতে কোরআনের আয়াত ব্যাখ্যা করে বলেছেন।

এরপর আসবে আলেমদের ব্যাখ্যা। আপনি কি কোরআনের ব্যাখ্যা ও হাদিসের ব্যাখ্যা আলেমদের থেকে নিবেন? এখন প্রশ্ন আসবে আলেম কে? ১৪৫৩ সালে দাজ্জাল আবির্ভূত হবার পর থেকে বর্তমান পৃথিবী পর্যন্ত কেউই নিজেকে আলেম বলে দাবী করার যোগ্যতা রাখেন না এবং কাউকে আলেম বলে স্বীকৃতি দেবার মত অবস্থাও পৃথিবীতে নেই। আমাদের দেশে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, মাদ্রাসা থেকে যে পাস করবে সেই আলেম। এ রকম কথা কোরআনে আল্লাহ বলেন নাই এবং তার রসূল মুহাম্মাদ সাঃ বলেন নাই যে, মাদ্রাসা থেকে পাস করলেই একজন ব্যাক্তি আলেম হবে। কোরআন সহিহ, শুদ্ধভাবে তিলায়াত করতে পারলে বা আরবীতে কথা

বলতে পারলে একজন ব্যক্তি আলেম হবে এমন কথা কোনখানে বলা নাই - বরং দাজ্জাল আবির্ভূত হবার পর ঈমান থাকার উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: ………………….।দাজ্জালের একটি চোখ অন্ধ, যার উপর ঘন চামড়ার স্তর রয়েছে এবং তার চোখের মাঝখানে "কাফের" লেখা আছে, যা প্রত্যেক মুমিন পড়তে পারবে, সে শিক্ষিত (আলেম) হোক বা নিরক্ষর।' (সহিহ মুসলিম ২৯৩৪ বি)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কোন নবীই প্রেরিত হননি যিনি তাঁর সম্প্রদায়কে একচোখা মিথ্যাবাদী সম্পর্কে সতর্ক করেন নি। সে একচোখা, কিন্তু তোমাদের রব একচোখা নন, এবং তার দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে 'কাফের'। (আল-বুখারী, নং 6598)। অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে: "তার চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে 'কাফ' 'ফা' 'রা'।" (মুসলিম, নং 5219) হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনা অনুসারে, "এটি প্রত্যেক মুমিন, শিক্ষিত (আলেম) বা নিরক্ষর পড়তে পারবে।" (সাহিহ মুসলিম, নং ৫২২৩)

বুঝা যাচ্ছে, ঈমান থাকাটাই বর্তমান সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দাজ্জালকে চিনার জন্য আপনার আলেমের কাছে যাবার দরকার নাই। আপনার যদি ঈমান থাকে তাহলেই আপনি দাজ্জালকে চিনতে পারবেন। একজন লোক সমাজে আলেম হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া সত্ত্বেও তার যদি ঈমান না থাকে তাহলে সে দাজ্জালকে চিনতে পারবে না। অন্যদিকে একজন লোক যে আলেম নয় কিন্তু তার ঈমান আছে, তাহলে সে দাজ্জালকে চিনতে পারবে। সুতরাং বুঝা গেলো, এখন সমাজে আলেম হিসেবে স্বীকৃতি পাবার চেয়ে ঈমানদার হওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে কে আলেম আর কে আলেম নয় - এই স্বীকৃতি কে দিবে? মাদ্রাসা থেকে পাস করা কোন 'আলেমের' সাথে মত পার্থক্য হলেই তারা বলে," আপনি কি আলেম? আপনি কি মাদ্রাসায় পড়েছেন? আপনি কি আরবী জানেন? আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন, "আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ"। তারপর মাদ্রাসা থেকে পাস করা এই নামধারী আলেমরা ইসলাম সম্পর্কে সকল মতামত দেবার অধিকারী বলে নিজেদের দাবী করে। তারা অন্য সাধারণ মুসলিমদের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ দাবী করে। অথচ তারা যে 'আলেম' এই স্বীকৃতি তাদেরকে কি আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) দিয়েছেন? দেন নি।

যারা সুফিজমে বা পীরতন্ত্রে বিশ্বাসী তাদের মধ্যে লাখ লাখ 'আলেম' আছে (যেমনঃ দেওবন্দি কওমি মাদ্রাসার আলেম, সুন্নি তরিকার আলেম)। যারা গনতন্ত্রে বিশ্বাসী তাদের মধ্যে লাখ লাখ 'আলেম' আছে (যেমনঃ আলিয়া মাদ্রাসার আলেম)। এই দুই দল বাদ দিলে বাংলাদেশে নিজেকে আলেম বলে দাবী করে এমন লোক খুঁজে পাওয়াই মুশকিল হবে। যারা নিজেদের আলেম বলে দাবী করছে – দেখা যাচ্ছে তারা প্রকাশ্যে শিরকে লিপ্ত অথচ তারা নিজেদের আলেম বলে দাবী করে। বর্তমানে আলেম হবে সেই ব্যাক্তি - যে নিজেকে আলেম বলে দাবী করবে না কিন্তু কোন বিষয় তার কাছে উত্থাপিত হলে সে কোরআনের আয়াত ও হাদিসের ভিত্তিতে সমাধান দিতে

পারবে। সে অবশ্যই কোরআনের আয়াত বলবে এবং হাদিস বলবে –তারপর কোরআনের আয়াত এবং হাদিসের ব্যাখ্যা করবে।

ইসলামের কোন নিয়ম –কানুন যদি কোন 'আলেম' কোরআনের আয়াত না বলে বা হাদিস বর্ণনা না করে শুধু নিয়ম-কানুন বলে, তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

'শায়খ' বা 'শাইখ' শব্দটি ১৪৫৩ সালে সর্ব প্রথম সুফিজমে বিশ্বাসীরা তাদের 'আলেমদের' সম্মান প্রদর্শন করতে ব্যবহার শুরু করে যা এখন সবাই ব্যবহার করছে।

বর্তমানে একজন ব্যাক্তিকে নিজে কোরআন বুঝে বুঝে পড়তে হবে। আরবি ভাষা না বুঝলে বাংলায় তিন- চার জন অনুবাদকের কোরআনের বাংলা অনুবাদের ব্যাখ্যা পড়তে হবে। এতে সে অনেকটুকুই কোরআন বুঝতে পারবে। কোরআন আরবিতেই আল্লাহ নাযিল করেছেন বাংলা বা অন্য ভাষায় কোরআনের অনুবাদ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু একদম না বুঝে পড়ার চেয়ে বাংলা অনুবাদের ব্যাখ্যা পড়ে যতটুকু বুঝতে পারা যাবে – তাতেই অনেক লাভ হবে। কিছু বাংলা অনুবাদের ব্যাখ্যাকারকদের নাম আমি এখানে লিখে দিচ্ছিঃ

১) তাইসিরুল কোরআন।

২) শেখ মুজিবর রাহমান

৩) ড. আবু বকর মুহাম্মাদ জাকারিয়া

৪) আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স; ইত্যাদি।

এই ৪ টি কোরআনের অনুবাদের ব্যাখ্যা পড়লে একজন মুসলিম কোরআনের অনেক কিছুই বুঝতে পারবেন। যারা ইংলিশ ভালো পারেন; তারা বাংলার পাশপাশি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে গিয়ে ইংলিশে কোরআনের অর্থে ব্যাখ্যা পড়তে পারেন। কোরআন বুঝে বুঝে পড়ার জন্য https://quran.com/ একটি ভালো ওয়েবসাইট।

ইংলিশে কোরআনের অর্থের ব্যাখ্যা যারা করেছেন তাদের মধ্যে বিখ্যাত কিছু লেখকদের নামঃ

1) Dr. Mustafa Khattab (The Clear Quran)

2) Saheeh International

3) Abdullah Yusuf Ali

4) MAS Abdel Haleem

বাংলা এবং ইংলিশে ৮ জনের কোরআনের অর্থের ব্যাখ্যা পড়ার পর একজন মুসলিম কোরআনের অনেক কিছু বুঝতে পারবে যা বর্তমানের অনেক 'আলেমও' বুঝে না। তারপর, আপনি হাদিস পড়া শুরু করবেন। রিয়াদুস সালেহিন, সাহিহ বুখারি, সাহিহ মুসলিম অবশ্যই পড়বেন। এত টুকু পড়ার পর আপনি বিভিন্ন 'আলেমদের' বক্তব্য, মতামত শুনলে নিজেই বুঝতে পারবেন যে, সেই 'আলেম' সত্য বলছে না ভুল বলছে কারণ আল্লাহ চাইলে, তখন আপনি অনেকটুকু জ্ঞান অর্জন করেছেন। আল্লাহ চাইলে, যদি নিয়মিত পড়েন – এই সবগুলো বই পড়ে শেষ করতে আপনার ৮-১০ মাস সময় লাগতে পারে। যতদিন-ই লাগুক পড়া চালিয়ে যাবেন এবং বার

বার পড়বেন। কোরআন বুঝে বুঝে পড়া জীবনে কখনোই বাদ দিবেন না। মৃত্যু পর্যন্ত কোরআন বুঝে বুঝে পড়া চালিয়ে যেতে হবে, বার বার পড়তে হবে।

কোরআন, হাদিস নিজে না জেনে, কোন 'আলেমের' কথা অনুসরণ করলে আপনার দাজ্জালের ধোঁকায় পড়ার সম্ভাবনা খুব খুব বেশি। ১৪৫৩ সালে যেই দাজ্জাল বেরিয়েছিল সে ইসলামের মধ্যে সুফিজমকে বা পিরতন্ত্রকে এবং তাকলিদকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। 'মুয়াহহিদুন' বা সালাফি বা আহলে হাদিস নামে যেই দল বেরিয়েছিল তারা সুফিজমকে বাদ দিলেও খেলাফতকে বাদ দিয়ে মুসলিম শাসকের (সৌদি রাজপরিবারের) গোলামি করা শুরু করেছিল যা এখনো বলবত আছে। তারপর এসেছে একদল মুসলিম যারা গণতান্ত্রিক ইসলাম নামে আরেক বিকৃত ইসলাম নিয়ে এসেছে। এদের সকলের লাখ লাখ 'আলেম' আছে যারা আপনাকে কোরআন ও হাদিসের (বিকৃত) ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবে যে, তারাই সঠিক। আপনি যদি নিজে কোরআন, হাদিস নিয়ে লেখাপড়া না করেন তাহলে এই জমানায় মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

কিয়ামতের দিন আপনি কিন্তু আল্লাহ এর কাছে এই কথা বলতে পারবেন না যে, আপনি সমাজের আলেমদের অনুসরণ করেছিলেন, কারণ এরা যে আলেম – এই সার্টিফিকেট তো আল্লাহ তাদেরকে দেয় নি। কিয়ামতের দিন একজন আলেমকে জাহান্নামে দেয়া হবে কারণ সে এই কারণে জ্ঞান অর্জন করেছিল যাতে লোকেরা তাকে আলেম বলে (সহীহ মুসলিম ১৯০৫ক) । আর আমাদের সমাজের মাদ্রাসা থেকে পাস করা কাউকে 'আলেম' হিসাবে স্বীকৃতি না দিলে তারা আপনার ভয়াবহ অবস্থা করে ছাড়বে। বাংলাদেশে অধিকাংশ 'আলেম' ওয়াজ করে প্রচুর টাকা নেয় – যেটা প্রমাণ করে যে, তারা সঠিক পথে নেই। আল্লাহ মুহাম্মাদ সাঃ কে ইসলাম প্রচার করে তার বিনিময়ে টাকা নিতে বা টাকা চাইতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এখন 'আলেমরা' বলেন যে, আমরা তো ওয়াজের বিনিময়ে টাকা চাই না কিন্তু এলাকার লোকজন খুশি হয়ে উপহার (হাদিয়া) দেয়। কিন্তু টাকা না দিলে এই 'আলেমরা' ওয়াজ করতেও যায় না; তারা আগে থেকেই কত টাকা হাদিয়া দেয়া হবে তা চুক্তি করে নেয়। এটা হচ্ছে তাদের বক্রতার একটি উদাহরণ; যেই বক্রতার কথা এই আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। কোরআনে আল্লাহ কোন বক্রতা রাখেন নি। ইসলাম হচ্ছে সরল পথ। যারাই একে আকা –বাঁকা, বক্র পথ বানাতে চাইবে তারাই দাজ্জাল বা দাজ্জালের অনুসারী।

দাজ্জাল মানুষকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বুঝাবে যে, ইসলামে সুফিজম/ পীরতন্ত্র আছে; সে আরও বুঝাবে যে, ইসলামে গণতন্ত্র আছে। এই সব- ই হচ্ছে বক্রতা। আপনি যদি তাদের কথা শুনতে যান তাহলে আপনার মনে হতে পারে যে, তাদের কথা ঠিক-ই আছে কারণ তারা আপনাকে কোরআন থেকে, হাদিস থেকে, সাহাবীদের আমল থেকে ঘুরিয়ে, পেঁচিয়ে, বক্র ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেবে যে, তারা সঠিক। এই অবস্থার কথাই আল্লাহ এর রসূল সাঃ আমাদেরকে বলে গেছেন।

নবী (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দাজ্জালের খবর শুনবে, সে যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। কারণ আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, একজন ব্যক্তি তার কাছে আসবে এবং সে নিজেকে মুমিন মনে করবে এবং তার (দাজ্জাল) দ্বারা অদ্‌ভূত বিভ্রান্তিকর ধারণার কারণে তাকে অনুসরণ করবে।" (সুনানে আবু দাউদ ৪৩১৯; সহীহ)
তাহলে, আমাদের এখন এই আয়াত মোতাবেক করনীয় হচ্ছে, ১) নিজে কোরআন, হাদিস নিয়ে লেখাপড়া করা। ২) সুফিজম বা পীরতন্ত্রে বা গণতান্ত্রিক ইসলামে বিশ্বাসী বা ইসলামি গণতান্ত্রিক দলের অনুসারীদের থেকে জ্ঞান অর্জন বন্ধ করা, তাদের বই, লিফলেট, ওয়েবসাইট সম্পূর্ণ বর্জন করা। ৩) যে সব দল গণতন্ত্র মানে বা গণতান্ত্রিক নির্বাচন করে তাদেরকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা। তাদের থেকে যত দূরে থাকতে পারবেন তত- ই ভালো। এই পদক্ষেপগুলো আপনাকে দাজ্জালের অনুসারী হওয়া থেকে অনেকটুকু দূরে রাখবে। ৪) সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ এর জন্য; মানুষের বা বিজ্ঞানের প্রশংসা করবেন না। জমিতে উন্নতমানের বীজ, সাঁর, কীটনাশক দিয়েছি তাই, ফলন ভালো হয়েছে – এই ধরণের বিশ্বাস যেন মনে না ঢুকে, কথায় প্রকাশ না পায়। ৫) মুহাম্মাদ সাঃ এর আনীত ইসলাম প্রচার করা; দাজ্জালের পরিচয় মানুষের কাছে প্রকাশ করা, প্রচার করা এবং এর ফলে দাজ্জালের জেল, জুলুম, অত্যাচার আসলে তা সহ্য করা। ৬) দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাচার আরেকটি উপায় হচ্ছে সমাজ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া। যেমনঃ বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ের উপত্যকায় বা নিভৃত কোন স্থানে এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই জীবন কাটিয়ে দেয়া।বিজ্ঞানকে কোরআনের যাচাই করার মাপকাঠি বানাবেন না। বিজ্ঞানের কথা সত্য ধরে নিয়ে তার উপর ভিত্তি করে কোরআনের উপর ঈমান না এনে – কোন ধরণের শর্ত ছাড়াই কোরআনকে বিশ্বাস করুন। কোরআনের ভিত্তিতে বিজ্ঞানকে যাচাই করুন। বর্তমানে যে বিজ্ঞান আমরা স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ব বিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি, বিজ্ঞানের যে সকল মতাদর্শ বা আবিষ্কার - যা কিছু পেপারে বা মিডিয়ায় আসছে তার অনেক কিছুতেই আল্লাহকে অস্বীকার করা হচ্ছে।
আপনি বিজ্ঞান বই থেকে শিখলেন যে, কিভাবে একটি গাড়ি বা সাইকেল তৈরি করতে হয় – এতে শিরক নেই কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, মৌসুমি বায়ুর কারণে বাংলাদেশে বর্ষাকালে বেশি বৃষ্টিপাত হয় – এতে শিরক আছে। এখন বিজ্ঞানের কোন কোন বিষয়গুলোতে কুফর ও শিরক আছে এবং কোন বিষয়গুলো বা মতবাদগুলোতে শিরক/ কুফর নেই - তা খুঁজে বের করা কঠিন। বিজ্ঞানের ভিতরে শিরক ও কুফরের মিশ্রণ আছে। তাই, বিজ্ঞান চর্চা করতে গেলে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। শিরক ও কুফর সংশ্লিষ্ট বিষয় বা মতবাদগুলো বাদ দিতে হবে। এই কাজটি খুবই কঠিন হবে। এজন্য যারা এটা করতে পারবেন না –তাদের জন্য বিজ্ঞান না পড়াই শ্রেয়।
"(কোরআনকে) করেছি সম্পূর্ণরূপে সরল (সোজা), যাতে তার (আল্লাহ এর) পক্ষ থেকে চরম শাস্তির ব্যাপারে হুঁশিয়ার করা হয়েছে; বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দেয়ার জন্য – যারা ভালো কাজ করে – যাতে তারা উত্তম পুরষ্কার পায়। (২) তাতে তারা চিরকাল থাকবে" । (৩) (সূরা কাহফঃ২-৩)

আল্লাহ কোরআনকে সরল করেছেন সুতরাং যারা বলে যে, কোরআন পড়ে বুঝবেন না –তাদের কথা মিথ্যা। কোরআনে বক্রতা ও জটিলতা নেই; কোরআন হচ্ছে সরল সুতরাং কোরআন বুঝে বুঝে পড়ুন। আল্লাহ চাইলে, কোরআন বুঝে বুঝে পড়লেই আপনি বুঝতে পারবেন।

কোরআনকে আল্লাহ সরল করেছেন যাতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি – আল্লাহ এর চরম শাস্তির হুশিয়ারি এবং বিশ্বাসীদের জন্য সুসংবাদ – যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য। বিশ্বাসী হয়ে ভালো কাজ করলেই পাওয়া যাবে উত্তম পুরষ্কার। এখন বিশ্বাসী কারা? যারা কোরআনের সরল কথাগুলোকে বিশ্বাস করে। এখন কোরআনের সরল কথা জানতে হলে কোরআন অবশ্যই বুঝে বুঝে পড়তে হবে।

আল্লাহ কোরআনকে সরল করেছেন। আমাদেরকেও সরল হতে হবে। কোরআনের মধ্যে কোন ধরণের বক্রতা বা বক্র পথ অনুসন্ধান করা যাবে না, বক্র পথে চলা যাবে না। যেমনঃ এখন যৌবন কাল এখন গুনাহ করে নেই, জীবন উপভোগ করে নেই; ঘুষ খেয়ে নেই, অপরাধ - অন্যায় করে নেই; পরে (বৃদ্ধ হলে) তওবা করে, হাজ্জ করে পাক্কা ইমানদার মুমিন হয়ে যাবো। তওবা করলে আল্লাহ তো মাপ করেই দিবেন –তাহলে এখন গুনাহ করলে অসুবিধা কি? এই সকল চিন্তা –ভাবনা হচ্ছে বক্র চিন্তা – বক্র পথ অনুসন্ধান করা। এই ধরণের চিন্তা থেকেই একজন মানুষের মধ্যে দ্বিমুখীতা আসে, যেই রূপ দ্বিমুখীতা ইবনে সাইদের ভিতরে ছিল কারণ সে আল্লাহ এর সাথে চালাকি করতে চাচ্ছে, আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছে যে, আল্লাহ যে তওবার সুযোগ দিয়েছেন সেটার সুযোগ নিয়ে সে এখন গুনাহ করতে চায় এবং পরে তওবা করে ভালো হতে চায়। কিন্তু আল্লাহকে কেউই ধোঁকা দিতে পারবে না। তাই, কোরআনের মধ্যে বক্র পথ অনুসন্ধান না করে, জান্নাতে যাওয়ার বক্র পথ অনুসন্ধান না করে কোরআনের সরল পথে চলতে হবে।

আল্লাহ যে উত্তম পুরস্কারের কথা বলছেন তাতে বিশ্বাসী সৎ কর্মশীলরা চিরদিন থাকবে।

"আর তাদেরকে সতর্ক করার জন্য যারা বলে, 'আল্লাহ পুত্র গ্রহণ করেছেন।' (৪) এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই, আর তাদের পিতৃ-পুরুষদেরও ছিল না। কত বড় সাংঘাতিক দাবী তাদের মুখ থেকে বের হয়! তারা মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলে না। (৫) তাহলে, [হে মুহাম্মাদ], যদি তারা এই বাণীতে বিশ্বাস না করে, তাহলে তুমি তাদের জন্য শোক এবং দুঃখ করতে করতে হয়তো নিজেই মৃত্যু বরণ করবে। (৬)" (সূরা কাহফঃ৬)

আমাদেরকে দেখতে হবে কারা এই কথা বলে যে, আল্লাহ পুত্র গ্রহন করেছেন? খ্রিষ্টানরা বলে। তবে তারা শুধু এতটুকুই বলে না, তারা বলে ট্রিনিটির কথা অর্থাৎ 'একের মধ্যে তিন' এর কথা। খ্রিষ্টানরা বলে যে, রব যাকে ইংলিশে God বলে তারা ডাকে, সেই রব একজনই। কিন্তু God (আল্লাহ), Jesus (ইসা আঃ), Holy Spirit (জিব্রাইল আঃ) তিনজন মিলে একজন রব বা God। অর্থাৎ তাদের মত হচ্ছে এই তিনজন আলাদা হলেও তারা নিজেদের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে একজন হয়েছে। কথাগুলো কি পরিচিত মনে হচ্ছে? জি হ্যাঁ; সুফিজমে এটাকেই বলে 'ফানা' হয়ে যাওয়া। একটু খেয়াল করে দেখুন। সূরা কাহফের ৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ ট্রিনিটির কথা বলেন নি।

আল্লাহ বলেছেন, সেই সব লোকের কথা যারা বলে আল্লাহ পুত্র গ্রহন করেছেন। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ইসা আঃ ছাড়াও আরও অনেকের ব্যাপারে এমন দাবী করা হবে যে তারা আল্লাহ এর সাথে এক হয়ে গেছে, ফানা হয়ে গেছে। এই আয়াতে আল্লাহ এই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। সুফিজমে বা পিরতন্ত্রে বিশ্বাসীরা এবং তাদের সূফীরা বা পীররা দাবী করে যে, সুফি বা পীরের সাথে আল্লাহ এর কোন পার্থক্য নেই; তারা আল্লাহ এর সাথে মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে।

ফানার একটি ব্যাখ্যা হলো একত্ব বা সত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐক্য (ইত্তিহাদ) প্রতিষ্ঠা।-এই ধারণার দুই বিখ্যাত প্রচারক হলেন বায়েজিদ বোস্তামি এবং মানসুর আল–হাল্লাজ, যারা ফানাকে সম্পূর্ণ ঐক্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ফানার বিষয়ে জালালুদ্দিন রুমি-র ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

"যখন শেখ (হাল্লাজ) বললেন, 'আমি আল্লাহ' এবং তা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করলেন, তিনি সকল অন্ধ (সন্দেহবাদী) ব্যক্তিকে পরাজিত করলেন। যখন একজন মানুষের 'আমি' অস্তিত্ব থেকে বিলীন হয়ে যায়, তখন কী থাকে? চিন্তা করো, হে অবিশ্বাসী” ।

সুলতান বাহু তাঁর "আইন-উল-ফকর" গ্রন্থে ফানাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

"শুরুতে আমি ছিলাম চার, পরে তিন হলাম, তারপর দুই। এবং যখন আমি 'দুই' থেকে মুক্তি পেলাম, তখন আমি আল্লাহর সঙ্গে এক হয়ে গেলাম।"

সুফিবাদ বা পীরতন্ত্রে বিশ্বাসী সৈয়দ হোসেইন নাসর এই ব্যাখ্যাকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক সত্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া সূফীরা বা পীররা এবং তাদের অনুসারীরা বিশ্বাস করে যে, কিয়ামতের দিন পীর সাহেব তার মুরিদের জন্য আল্লাহ এর কাছে সুপারিশ করে তাদেরকে শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দিবেন এবং জান্নাত পাইয়ে দিবেন। এই বিশ্বাস কি আর কারো আছে?

খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ মানুষের অপরাধের জন্য মানুষকে শাস্তি দিতে চাইলে ইসা আঃ ক্রসে নিজের জীবন (রক্ত) দিয়ে মানুষের প্রতি আল্লাহ এর শাস্তি ফিরিয়ে দেন; ইসা আঃ এর কারণে মানুষ আল্লাহ এর শাস্তি থেকে বেচে গেলো ---- এই হচ্ছে খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস।

তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, সূরা কাহফের ৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ শুধু খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্য করে এই কথা বলেননি যে, “আর তাদেরকে সতর্ক করার জন্য যারা বলে, ‘আল্লাহ পুত্র গ্রহণ করেছেন।’ বরং আল্লাহ তাদের সকলকে উদ্দেশ্য করেও এই কথা বলেছেন যারা খ্রিষ্টানদের মত দাবী করে যে, তাদের নেতা (ইসা আঃ বা সুফি বা পীর) আল্লাহ এর সাথে মিলে এক (ফানা) হয়ে গেছে।

সূফীরা/ পীররা দাবী করে যে, ফানা হয়ে যাবার পর তারা আল্লাহ এর ওলী হয়ে যায়। ‘ওলী’ শব্দের অর্থ বন্ধু। আল্লাহ এর ওলী বলতে বুঝায় “যার সাথে আল্লাহ এর গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, আল্লাহ এর বন্ধু” । সুফিবাদে ওলীরা/পীররা অলৌকিক কাজ করতে পারার দাবী করে।

খ্রিষ্টানরা দাবী করে যে, ইসা আঃ নিজেই অলৌকিক কাজ করতে পারতেন।

এছাড়া, সুফি/ পীরদের অলৌকিক কাজের প্রচুর কাহিনী শোনা যায় যাতে শিরক, কুফর মিশ্রিত থাকে। ইসা আঃ সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের যেরূপ বিশ্বাস ও মতাদর্শ - সুফি বা পীরদের সম্পর্কে তাদের অনুসারীদের বিশ্বাস ও মতাদর্শ প্রায় একই। পার্থক্য এতটুকুই যে, খ্রিষ্টানরা ইসা আঃ কে 'আল্লাহ এর পুত্র' বলে ডাকে আর সুফির অনুসারী বা পীরের মুরিদরা - সুফি বা পীরকে 'আল্লাহ এর ওলী' বলে ডাকে।

"মধ্যপন্থী ইসলামী সুফিবাদে" যারা বিশ্বাস করে তাদের একজন আল-সাররাজ অবতারবাদ এবং সংমিশ্রণের ধারণাকে (নিচে উল্লেখিত ঐক্যবাদী ব্যাখ্যা) কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন:

"কিছু বাগদাদি সুফি এই ভুল ধারণা পোষণ করেছেন যে, যখন তারা তাদের নিজস্ব গুণাবলী থেকে মুক্ত হন, তখন তারা আল্লাহর গুণাবলীতে প্রবেশ করেন। এটি অবতারবাদের ধারণা সৃষ্টি করে অথবা খ্রিস্টধর্মের যিশু সম্পর্কিত বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়। এই মতবাদ কিছু প্রাচীন সুফিদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হলো—যখন একজন ব্যক্তি নিজের গুণাবলী থেকে বেরিয়ে আসে এবং আল্লাহর গুণাবলীতে প্রবেশ করে, তখন সে নিজের ইচ্ছা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় প্রবেশ করে। সে বুঝতে পারে যে তার ইচ্ছা আল্লাহর দান এবং এই দানের ফলে সে নিজেকে ভুলে যায় এবং সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর প্রতি নিবেদিত হয়। এটি ঐক্যবাদীদের (তাওহিদবাদীদের) একটি ধাপ। যারা এই মতবাদে ভুল করেছেন, তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে আল্লাহর গুণাবলী আল্লাহ নিজে নন। গুণাবলীর সঙ্গে আল্লাহকে অভিন্ন করা অবিশ্বাসের (কুফর) শামিল, কারণ আল্লাহ আত্মায় অবতীর্ণ হন না। বরং আত্মায় যা প্রবেশ করে, তা হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর ঐক্যের প্রতি বিশ্বাস (তাওহিদ) এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা।"(—আল-সাররাজ, কিতাব আল-লুমা ফি আল-তাসাউউফ)

বুঝা গেলো, সুফিরাই প্রথম এই ধারণা নিয়ে আসছে যে, আল্লাহ এর গুণাবলী মানুষের মধ্যে আসতে পারে বা মানুষ আল্লাহ এর গুণাবলীতে প্রবেশ করতে পারে। এখান থেকেই ইসলামিক গনতন্ত্রকে জায়েজ করার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ একজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে, আইন দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ; আইন দেয়ার গুণ ও অধিকার একমাত্র আল্লাহ এর-ই আছে। কিন্তু সূফীরা / পীররা বিশ্বাস করে যে, মানুষ/সুফিরা আল্লাহ এর গুণে প্রবেশ করতে পারে অর্থাৎ চাইলে তারা আইন –ও দিতে পারবে যেহেতু তারা বিশ্বাস করে যে, তারা আল্লাহ এর গুণে প্রবেশ করেছে। (নাউজুবিল্লাহ)
উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, সুফিজমে বা পীরতন্ত্রে প্রচুর শিরক ও কুফর আছে। এখন বুঝা যাচ্ছে, কেন দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাচতে হলে সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত বুঝে বুঝে পড়তে হবে।

যারা পিরতন্ত্র বা সুফিবাদে বিশ্বাসী বা গনতন্ত্রে বিশ্বাসী বা ইসলামি গণতান্ত্রিক দল করে, নির্বাচন করে আইনদাতা হতে চায় এবং তাদের যারা অনুসারী – এরা সবাই দাজ্জালের অনুসারী। খ্রিষ্টানদের মত এরাও সবাই মুশরিক কারণ এরা বড় শিরক করছে ।

“পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে ওর (পৃথিবীর) শোভা-সৌন্দর্য করেছি যাতে আমি মানুষকে পরীক্ষা করতে পারি যে, ‘আমালের ক্ষেত্রে কারা উত্তম। (৭) আমি অবশ্যই তার উপর যা আছে তা বৃক্ষলতাহীন শুকনো ধূলা মাটিতে পরিণত করব। (৮)” (সূরা কাহফঃ ৭-৮)

আমাদেরকে বুঝতে হবে এই পৃথিবীর সকল আনন্দ উপকরণ, খাদ্য, আরাম –আয়েশ, সৌন্দর্য ইত্যাদিকে আল্লাহ দিয়েছেন আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য – এগুলোকে ভোগ করার জন্য নয়। এই সকল কিছু হচ্ছে পরীক্ষার উপকরন মাত্র। নারীর জন্য পুরুষ, পুরুষের জন্য নারী হচ্ছে পরীক্ষা। সকল কিছুই পরীক্ষা। তাহলে এগুলো অর্জনের জন্য সময় শ্রম ব্যয় করা, এগুলো জমা করা বা এগুলো না পেলে কষ্ট পাওয়া সবই ভুল। দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদেরকে এই সব আরাম- আয়েশ, ভোগ- বিলাস ইত্যাদি সকল কিছু ত্যাগ করতে হবে। পৃথিবীর উপরে যা কিছু আছে তাকে আল্লাহ বৃক্ষলতাহীন করে দিবেন অর্থাৎ এই সকল উপকরণ কোন কিছুই থাকবে না, এই সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী। তাই, আমাদেরকে দুনিয়ার অর্জনকে বাদ দিয়ে আখিরাতের জীবনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। আপনি যখন দাজ্জালের পরিচয় মানুষকে বলে দিবেন তখন দাজ্জাল আপনার চাকরি কেড়ে নিতে পারে, জেল দিতে পারে, মামলা দিতে পারে – আপনি দুনিয়ার সকল কিছুই হারাতে পারেন, এখন আপনার এই আয়াতগুলোতে যদি বিশ্বাস থাকে যে, এই পৃথিবীর সকল উপকরণ হচ্ছে শুধুমাত্র পরীক্ষা তাহলে আপনি আল্লাহকে খুশি করার জন্য এই সকল কিছু পরিত্যাগ করতে পারবেন।

হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: 'আমি জানি দাজ্জালের সাথে কী থাকবে। তার কাছে দুটি প্রবাহমান নদী থাকবে, একটি দেখতে স্বচ্ছ পানির মতো মনে হবে এবং আরেকটি দেখতে জ্বলন্ত আগুনের মতো। যদি কেউ তা দেখে, তাহলে সে যেন সেই নদীর কাছে যায় যাকে সে আগুন বলে মনে করে এবং চোখ বন্ধ করে, তারপর মাথা নিচু করে তা থেকে পান করে, কারণ এটি ঠান্ডা পানি। দাজ্জালের একটি চোখ অন্ধ, যার উপর ঘন চামড়ার স্তর রয়েছে এবং তার দুই চোখের মাঝখানে "কাফের" লেখা আছে, যা প্রত্যেক মুমিন পড়তে পারবে, সে শিক্ষিত (আলেম) হোক বা নিরক্ষর।' (সহিহ মুসলিম ২৯৩৪ খ.)

বর্তমানকালে দাজ্জাল আমাদের কাছে তার ২ টি নদী নিয়ে হাজির হয়েছে। একটি নদী দেখতে স্বচ্ছ পানির মত। এটি হচ্ছে সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করে গাড়ি, বাড়ি এবং যাবতীয় আরাম –আয়েশের উপকরণের ব্যবস্থা করা; নাইট ক্লাব, মদ, জুয়া, পর্ণগ্রাফি, নাচ, গান, মডেলিং, সিনেমাতে নারীদের দেহ প্রদর্শনী, অবাধ যৌনাচার, ধূমপান ও নেশা, বিনোদনের কেন্দ্র – যেমনঃ সমুদ্র সৈকতে, প্রমোদ তরীতে - মদ, জুয়া, নগ্ন নারীর প্রলোভন, ইত্যাদি। বাহির থেকে দেখলে এই সকল কিছুকে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয় কিন্তু এই সকল বিষয়ের সাথে থাকে হতাশা, না পাওয়ার বেদনা, গ্লানি, অসুস্থতা। এই আনন্দ উপকরণগুলো আপনাকে এমন কিছুর স্বপ্ন দেখায় যা কোনদিন-ই পাবার নয়।

দাজ্জালের সাথে আছে আরেকটি নদী যা দেখতে আগুনের মত মনে হয়। এটি হচ্ছে সুদের কাজে না গিয়ে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে ছোট চাকরি বা ব্যবসা বা কাজ করা, মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে জেলে যাওয়া, গুম হওয়া, পুলিশের দ্বারা নির্যাতিত হওয়া, সমাজের মানুষের কাছে অপমানিত হওয়া, দারিদ্রতায় জীবন যাপন করা, পরিবার ও আত্মীয়স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়া, অর্থের অভাবে বিয়ে করতে না পারা বা স্ত্রী চলে যাওয়া, ইত্যাদি। যদিও বাহির থেকে এই জীবনকে কষ্টের মনে হয় কিন্তু এই জীবনেই আসলে শান্তি আছে। এ জীবনে না পাওয়ার বেদনা নেই, মানসিক অশান্তি নেই, নারী ঘটিত বিরহ নেই, সুদের টাকা পরিশোধের টেনশন নেই; মদ, নেশা বা নারী দেহ পাবার আকাঙ্খা নেই, নির্লোভ জীবন – শান্তির জীবন।

"আমিতো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন। (৮৭) তুমি দুনিয়ার দ্রব্য সামগ্রীর প্রতি চোখ তুলে তাকিও না যা আমি তাদের বিভিন্ন লোকেদের দিয়েছি। তাদের জন্য তুমি দুঃখ করো না, আর মু'মিনদের জন্য তোমার ডানা (হাত) মেলে দাও। "(কোরআনঃ সূরা আল হিজরঃ ৮৭-৮৮)

দাজ্জাল যে আগুনের নদী আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে তা থেকে চোখ বন্ধ করে, মাথা নিচু করে, পান করতে হবে কেন? যারা দাজ্জালকে মেনে নিবে,তাকে অনুসরণ করবে তারা প্রচুর সম্পদের মালিক হবে, তারা আরাম-আয়েশের জীবন যাপন করবে; উঁচু অট্টালিকার মালিক হবে, তাদের গাড়ি থাকবে, নারী থাকবে, সমাজে সম্মান থাকবে; তাদের যদি সম্পদ বেশি না-ও থাকে তবু তারা টিভিতে, মোবাইলে নাচ, গান, খেলাধুলা, নগ্ন নারী উপভোগ করবে। একজন মুসলিম যদি এই সকল জিনিসের দিকে নজর দেয় তাহলে এ সকল জিনিসের প্রতি তার আকর্ষণ জন্মাবে অপরদিকে আগুনের নদীতে থাকবে মামলা, জেল, নির্যাতন, দারিদ্রতা, সমাজে অসম্মানিত হওয়া ও নিহত হওয়ার সম্ভাবনা। যে এই আগুনের নদী থেকে পান করতে চাইবে তাকে আপাতদৃষ্টিতে কঠিন কষ্টের জীবনকে গ্রহন করতে হবে আর এজন্য সে দুনিয়াবী আরাম-আয়েশ নিয়ে মোটেই চিন্তা করবে না, এই সকল জিনিসের দিকে ভ্রুক্ষেপ ও করবে না। সে যদি দুনিয়াদার দাজ্জালের অনুসারী লোকদের আরাম -আয়েশ, সম্পদের দিকে দৃষ্টি দেয় তাহলে তার অন্তরে এই সকল কিছু পাবার মোহ ও আকর্ষণ জন্মাবে, তখন সে ইসলামের দোহাই দিয়ে, কোরআনকে বিক্রি করে দিবে, কোরআনের আয়াতকে বিক্রি করে দিয়ে সে আরামের জীবন -যাপন করবে; যেমনঃ বাংলাদেশের কওমী, আলিয়া, আহলে হাদিসপন্থী আলেমগণ। এরা ৯০ মিনিট ওয়াজ মাহফিল করে ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ পর্যন্ত টাকা নেয় – এরা তো টাকার গোলামি করছে - এরা কিভাবে ইসলাম সম্পর্কে সত্য কথা বলবে? এরা কিভাবে সঠিক পথ পাবে? এরা হচ্ছে সত্য গোপনকারী তথাকথিত আলেম। এরা হচ্ছে পীরতান্ত্রিক ইসলামের অনুসারী, গণতান্ত্রিক ইসলামের অনুসারী, রাজতান্ত্রিক ইসলামের অনুসারী - এরাই তো দাজ্জালের খাঁটি অনুসারী। এদের নেতাদের গাড়ি আছে, ফ্লাট আছে, আরাম -আয়েশ আছে। এরা ওজুর নিয়ম শিখায়, নামাযের নিয়ম শিখায়, কিভাবে রিজিক বাড়বে তার দুয়া শিখায় আর হিজাব না করার কারণে নারীদের অসম্মান করে কথা বলে। কিন্তু মানুষকে আইনদাতা মানলে, মানুষকে ভোটে দিয়ে আইনদাতা হিসাবে নিযুক্ত করলে বড় শিরক করা হবে -ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে - এই কথা

তারা কখনো প্রচার করে না। কারণ এই কথা প্রচার করলে, আরাম-আয়েশ থাকবে না, গাড়ি, ফ্লাট থাকবে না; বৌ নিয়ে রিসোর্টে মজা করা যাবে না। আপনি যদি মনে করেন, কোনো দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না থাকার পর-ও মুসলিমরা আরাম-আয়েশে থাকতে পারে তাহলে মুহাম্মাদ সাঃ এর এবং সাহাবীদের মক্কার জীবন খেয়াল করুন। মক্কায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল না - তখন মুহাম্মাদ সাঃ এবং সাহাবীরা কি আরাম -আয়েশে ছিলেন? ছিলেন না, উনারা নির্যাতন, দারিদ্রতা, কষ্টের মধ্যে ছিলেন কারণ উনারা শিরক্‌মুক্ত, কুফর মুক্ত, কোন রকম মিশ্রণমুক্ত ইসলাম প্রচার করতেন। বর্তমান সমাজে আপনি শিরকমুক্ত,কুফরমুক্ত ইসলাম প্রচার করলে আপনার অবস্থা নবী সাঃ এবং উনার সাহাবীদের মক্কার জীবনের মতই হবে। এখন আপনি যদি কওমী, আলিয়া, আহলে হাদিসের তথাকথিত আলেমদের মত আরামে থাকতে চান তাহলে - এই জমানায় আপনি তাদের মত-ই দাজ্জালের অনুসারী কখন হয়ে যাবেন – সেটা আপনি বুঝতেও পারবেন না। তাই, তাদের দিকে, তাদের সম্পদের দিকে, তাদের সুনামের দিকে চোখ তুলেও তাকাবেন না।

একবার যদি আপনি আগুনের পানি পান করতে পারেন বা এই পথে চলা শুরু করেন তাহলে দেখবেন যে, এটাই আসলে ঠাণ্ডা পানি – এটাই আসলে শান্তির জীবন যে জীবনে মৃত্যুর ভয় নেই।

সূরা কাহফের ৯ ও ১০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রকীমের* অধিবাসীরা ছিল আমার নিদর্শনগুলোর মধ্যে বিস্ময়কর? (৯) যুবকরা যখন গুহায় আশ্রয় নিল তখন তারা বলেছিলঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি নিজ হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন।" (১০) (সূরা কাহফ ৯-১০)

*ড. মুস্তাফা খাত্তাবের, দি ক্লিয়ার কোরআন, (Dr. Mustafa Khattab, The Clear Quran) দেয়া তথ্য মতে, আর-রাকিম হল সেই ফলক যা গুহার প্রবেশপথে স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে গুহার অধিবাসীদের নাম এবং কাহিনী লেখা ছিল। এটি ২৫০ সালের দিকে, রোমান সম্রাট ডেসিয়াসের রাজত্বকালে, গ্রীক পৌত্তলিক রাজা ডেসিয়াস এবং তার বাহিনী এবং পৈত্তলিকদের হাতে নির্যাতন থেকে বাঁচতে ইফিসাস শহরের বাইরে একটি গুহার ভেতরে লুকিয়ে থাকা ইসা আঃ এর অনুসারী (খ্রিস্টান) যুবকদের একটি ছোট দলের কাহিনী। (Great Prosecution of Christians (৩০৩-৩১১ সাল) এর বিষয়ে এই বইয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। জুলকারনাইন (সম্রাট কনস্টানটাইন) ৩১৩ সালে প্রকাশ্যে ইসা আঃ এর অনুসারী হবার ঘোষণা দেন এবং ইসা আঃ এর অনুসারীদের (খ্রিষ্টানদের) উপর গ্রীক/ রোমান পৈত্তলিকদের নির্যাতন বন্ধ করেন।)

বর্তমান সমাজে আপনি যখন মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলামের কথা বলবেন, দাজ্জালের পরিচয় মানুষের সামনে তুলে ধরবেন তখন দাজ্জাল, দাজ্জালের বাহিনী, দাজ্জালের সহযোগী এবং দাজ্জালের অনুসারী "মুসলিমরা" আপনার ক্ষতি করতে চাইবে, নির্যাতন করবে – আপনাকে তাদের মত দাজ্জালের অনুসারী বানাতে চাইবে। তারা চাইবে আপনি যেন সুফিবাদ বা পীরতন্ত্রকে কিছুটা হলেও মেনে নেন যে রূপ দেওবন্দি আলেমরা (কওমি

মাদ্রাসার আলেমরা) মেনে নিয়েছে। তারা চাইবে আপনি যেন গণতান্ত্রিক ইসলামকে মেনে নেন। তখন আপনি কি এই সকল নির্যাতন, দারিদ্রতা, বিপদ, মামলা, গুম, জেল, ইত্যাদি মেনে নিয়ে সমাজে টিকতে পারবেন? আপনি কি ইসলামের মধ্যে এত ধরণের মিশ্রণের মাঝে মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম অনুসরণ করতে পারবেন? সব সময় আপনার কাছে দাজ্জালের সুফিবাদ বা পিরতন্ত্র , গণতান্ত্রিক ইসলামের দাওয়াত আসতে থাকবে, ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদকে মেনে নেয়ার দাবী আসবে – তখন আপনি কি নিজেকে শিরক, কুফরে নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাচাতে পারবেন? এই রকম পরিস্থিতিতে, আপনি কি করবেন - সেই পরামর্শ যদি চান তাহলে সেই পরামর্শ আল্লাহ আপনাকে দিয়ে দিয়েছেন। ইসা আঃ এর অনুসারীদের উপর যখন ভয়াবহ নির্যাতন করেছিল গ্রীক পৈত্তলিক রাজারা; তখন কিছু যুবক নিজেদের ঈমান ও দীনকে নিয়ে পাহাড়ের গুহায় চলে গিয়েছিল লোকালয় ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে – আমাদেরকেও আল্লাহ এই পদক্ষেপ নিতে বলছেন যদি আমরা এই সমাজে ঈমান নিয়ে, দীন নিয়ে টিকতে না পারি।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন একজন মুসলিমের সর্বোত্তম সম্পদ হবে ভেড়া, যা সে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বৃষ্টিপাতের স্থানে (উপত্যকায়) নিয়ে যাবে যাতে সে তার দীনকে ফিতনা থেকে রক্ষা করতে পারে। (সহীহ আল-বুখারী ১৯)

আমাদের জমানাই হচ্ছে সেই জমানা যার কথা আল্লাহ এর রসূল সাঃ উপরে বর্ণিত হাদিসে বলেছেন। আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শুরু থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জাল থেকে মুক্ত থাকবে" । অন্য বর্ণনায়, নবী (সাঃ) বলেছেন, "সূরা কাহাফের শেষ দশটি আয়াত থেকে।" (সহীহ মুসলিম ৮০৯)

সূরা কাহফের শেষ দশ আয়াত পড়ে যা বুঝলামঃ

"আমার স্মরণ থেকে যাদের চক্ষু ছিল আবরণে ঢাকা আর তারা শুনতেও সক্ষম ছিল না।" (সূরা কাহফঃ১০১)

আয়াতে "غِطَاءٍ" (ghitaa / ঘিতা) শব্দটির অর্থ ২ টি পাওয়া যায়। একটি অর্থ হচ্ছে 'অন্ধ' (Blinded) অপর অর্থ হচ্ছে 'ঢেকে থাকা' (Covered).

"যাদের চক্ষু ছিল অন্ধ, আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যারা শুনতেও ছিল অপারগ।" (সূরা কাহফঃ১০১)

"আমি বহু সংখ্যক জ্বীন আর মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে দেখে না, তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে শোনে না, তারা জন্তু-জানোয়ারের মত, বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট, তারা একেবারে উদাসীন।" (সূরা আল- আ'রাফঃ১৭৯)

হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: 'আমি জানি দাজ্জালের সাথে কী থাকবে। তার কাছে দুটি প্রবাহমান নদী থাকবে, একটি দেখতে স্বচ্ছ পানির মতো মনে হবে এবং আরেকটি দেখতে জ্বলন্ত আগুনের মতো। যদি কেউ তা দেখে, তাহলে সে যেন সেই নদীর কাছে যায় যাকে সে আগুন বলে মনে করে এবং চোখ বন্ধ করে, তারপর মাথা নিচু করে তা থেকে পান করে, কারণ এটি ঠান্ডা পানি। দাজ্জালের একটি চোখ অন্ধ, যার উপর ঘন চামড়ার স্তর রয়েছে এবং তার দুই চোখের মাঝখানে "কাফের" লেখা আছে, যা প্রত্যেক মুমিন পড়তে পারবে, সে শিক্ষিত (আলেম) হোক বা নিরক্ষর।' (সহিহ মুসলিম ২৯৩৪ খ.)

হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: 'দাজ্জাল তার বাম চোখে অন্ধ এবং তার প্রচুর চুল রয়েছে। তার সাথে জান্নাত এবং জাহান্নাম থাকবে, কিন্তু তার জাহান্নাম হচ্ছে আসলে জান্নাত এবং তার জান্নাত হচ্ছে আসলে জাহান্নাম।" (সুনান ইবনে মাজাহ ৪০৭১)

উপরে বর্ণিত কোরআনের আয়াত এবং হাদিস বুঝে বুঝে পড়লে এবং চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন যে, দাজ্জালের চোখ অন্ধ হবার বিষয়টি হচ্ছে তার এক চোখে সে আল্লাহ এর নিদর্শন দেখতে পায় না বা তার এক চোখ ঢেকে দেয়া আছে অর্থাৎ সে ইসলামের অর্ধেক বুঝে এবং মানে কিন্তু বাকি অর্ধেক সে বুঝে না এবং মানে না। সে একদিকে আল্লাহ এর ইবাদত করে অপরদিকে সে শিরক ও করে এবং শিরক মিশ্রিত ইসলামকেই সে মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম মনে করে – এজন্যই দাজ্জালের এক চোখ অন্ধ। সুফিজম বা পিরতন্ত্রের সাথে কথাগুলো একদম মিলে যাচ্ছে, তেমনিভাবে গণতান্ত্রিক ইসলামের সাথেও কথাগুলো মিলে যাচ্ছে। রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র মিশ্রিত ইসলাম হচ্ছে এমন ইসলাম যা দাজ্জাল বিশ্বাস করে এবং প্রচার করে।

সূরা কাহফের ১০১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলছেন সেই সব কাফিরদের কথা যাদের ২ টি চোখ-ই আল্লাহ এর স্মরণ হতে আবরণে ঢাকা ছিল অর্থাৎ অন্ধ ছিল এই অর্থে যে তাদের চোখ থাকতেও তারা আল্লাহ এর নিদর্শনাবলী দেখতে পায় না ফলে তারা আল্লাহ এর প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহকে স্মরণ করে না। আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, দাজ্জালের এক চোখ অন্ধ অর্থাৎ সে এক চোখে আল্লাহ এর নিদর্শনাবলী দেখতে পায় অর্থাৎ সে আল্লাহ এর প্রতি অর্ধেক ঈমান আনে, আল্লাহকে অর্ধেক স্মরণ করে কিন্তু দাজ্জাল অপর চোখে দেখতে পায় না অর্থাৎ দাজ্জাল আল্লাহ এর নিদর্শনাবলী অর্ধেক দেখতে পায় না এবং আল্লাহ এর যতটুকু স্মরণ করা উচিত তার অর্ধেক সে স্মরণ করে না। যারা পীরতন্ত্র, সুফিজম, গণতান্ত্রিক ইসলাম বা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ইত্যাদি মানেন তারা নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, দুয়া করেন কিন্তু আইনদাতা হিসেবে আল্লাহকে মানেন না, নিজের পীরের মধ্যে আল্লাহ এর গুণাবলী আছে বলে মনে করেন, মনে করেন যে, পীর বা সুফি আল্লাহ এর সাথে এক হয়ে গেছে – এই সব –ই শিরক। কিন্তু তারা এটা বুঝে না – তারা এগুলোকেই ইসলাম মনে করে পালন করে। দাজ্জাল হচ্ছে সমাজে মুসলিম এবং সে ইসলামের অনেক নিয়ম মানে কিন্তু সে শিরককেও ইসলামের অংশ মনে করে পালন করে – এটা হচ্ছে আমার মতে, দাজ্জালের এক চোখ অন্ধ হবার ব্যাখ্যা।

তাদেরকে যদি আপনি বুঝাতে চান; কোরআনের কথা , নবীর (সাঃ) কথা বলতে চান – তারা আপনার কথা শুনবেই না। তারা নিজেরাও কোরআন, হাদিস বুঝে বুঝে পড়বে না – তারা তাদের 'আলেমদের' অন্ধ অনুসরণ করবে। তারপরও আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত মানুষকে দিয়ে যেতে হবে।

"যারা কুফুরী নীতি গ্রহণ করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাহদেরকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করবে? আমি কাফিরদের বিনোদনের জন্য জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি।" (সূরা কাহফঃ ১০২)

বর্তমানে মুসলিমরা আল্লাহ এর পরিবর্তে আল্লাহ এর বান্দা মানুষকে 'রব' (আইনদাতা) হিসেবে গ্রহন করেছে। মানুষ তার মতই, আল্লাহ এর বান্দা, অন্য মানুষকে আল্লাহ এর সমকক্ষ হিসাবে বিশ্বাস করছে। এদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছেন।

"বলুন, 'আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব নিজেদের কাজের (ফলাফল পাবার) ক্ষেত্রে কারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? (১০৩) তারা হল সে সব লোক দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে আর তারা নিজেরা মনে করছে যে, তারা সঠিক কাজই করছে। (১০৪) তারা হল সে সব লোক যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতকে(বাণীকে) ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হবার ব্যাপারটিকে অস্বীকার করে। যার ফলে তাদের যাবতীয় কাজ নিস্ফল হয়ে গেছে। কিয়ামাতের দিন আমি তাদের (কাজের) জন্য কোন ওজন কায়িম করব না" । (১০৫) (সূরা কাহফঃ১০৩-১০৫)

যারা শিরক বা কুফর মিশ্রিত বিকৃত ইসলাম অনুসরণ করছে তারা এই দলের অন্তর্ভুক্ত। তারা নামায পড়ে, রোজা রাখে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে চেষ্টা – সাধনা করে, অনেক ত্যাগ (কোরবানি) করে, অনেক কষ্ট করে কিন্তু তাদের চেষ্টার ফলাফল ব্যর্থ হয়ে গেছে। তারা কাজের ফলাফল পাবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ। চিন্তা করে দেখুন, সুফিরা বা পীরের অনুসারীরা কত সালাত পড়ে, অনেকে তাহাজ্জুতের সালাত ও পড়ে; গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কত মানুষ কত চেষ্টা, কষ্ট করছে কিন্তু তাদের কাজের ফলাফল হিসেবে তারা কিছুই পাবে না – কাজের ফল লাভের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ আর কেউ কি আছে? পীরদের বা সুফিদের মুরিদরা বা অনুসারীরা বিশ্বাস করে যে, কিয়ামতের দিন তাদের পীর তাদের পক্ষে সুপারিশ করে তাদেরকে জান্নাত পাইয়ে দিবে – এভাবে তারা আল্লাহ এর সাথে কিয়ামতের দিন হিসাব দেবার জন্য দেখা হবার বিষয়টিকে অস্বীকার করে। কিয়ামতের দিন, আল্লাহ তাদের কাজের মধ্যে কোন ওজন দিবেন না। তাদের কাজ থাকবে অনেক কিন্তু সেই কাজ হবে ওজন শূন্য।

"এটাই তাদের প্রতিফল-জাহান্নাম, কারণ তারা কুফুরী করেছে আর আমার আয়াত (বাণী) ও রসূলদেরকে হাসি-তামাশার বিষয় বানিয়েছে। "(১০৬) (সূরা কাহফঃ ১০৬)

আল্লাহ এর প্রেরিত রসূলদের নিয়ে মিথ্যা কথা বলার কারণে এবং রসূলদের কথাকে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়ার কারণে এবং কুফরি করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিফল হিসেবে জাহান্নাম দিবেন। "যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে ফিরদাউসের বাগান। (১০৭) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে তারা স্থানান্তরিত হতে চাইবে না (১০৮)" (সূরা কাহফঃ১০৭-১০৮)

জান্নাত এতই আনন্দপূর্ণ যে সেখান থেকে কেউ অন্য কোথাও যেতে চাইবে না। উপরে বর্ণিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ মুমিনদের যে পুরস্কার দিবেন তার বর্ণনা করেছেন।

"বলুন (মুহাম্মাদ), 'সমুদ্রগুলো যদি আমার প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য কালি হয়ে যায়, তবু আমার প্রতিপালকের কথা লেখা শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে, আমি যদি এর সাথে আরো অনুরূপ পরিমাণ সমুদ্র নিয়ে আসি তবুও" । (সূরা কাহফঃ১০৯)

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ এর জন্য। তিনি মহান, অনাদি, অনন্ত। আমি আল্লাহ এর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলাম।

"বলুন (মুহাম্মাদ), 'আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার নিকট ওয়াহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবল এক ইলাহ। কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ কাজ করে আর তার প্রতিপালকের আনুগত্যে (ইবাদাতে) কাউকে শরীক না করে" । (সূরা কাহফঃ১১০) এই আয়াতে আল্লাহ পরিষ্কার করে দিয়েছেন কে নবী আর কে সাধারণ মানুষ। মুহাম্মাদ সাঃ কে আল্লাহ বলতে বলেছেন যে, তিনি আমাদের মতই মানুষ, উনার সাথে আমাদের পার্থক্য হচ্ছে উনার কাছে ওহী আসে কিন্তু আমাদের কাছে ওহী আসে না। কিন্তু সুফি সাধক পীররা যারা নিজেদেরকে আল্লাহ এর ওলী বলে দাবী করে - তারা দাবী করে যে, তাদের কাছে আল্লাহ এর পক্ষ থেকে এক ধরণের অনুভূতি বা প্রেরণা বা তথ্য (ইলহামঃ Divine Inspiration) আসে। এভাবে তারা পরোক্ষভাবে নিজেদেরকে নবী বলেই দাবী করছে। যদিও সূফীরা বা পীররা দাবী করে যে, তাদের কাছে ওহী আসে না, ওহী এবং ইলহামের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু এই দুই বিষয়ের মুলে গেলে আমরা বুঝতে পারি যে, এই দুইটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ওহী হচ্ছে তথ্য বা জ্ঞান যা আল্লাহ এর পক্ষ থেকে নবীদের কাছে আসত। সুফি বা পীরদের দাবী করা 'ইলহাম' ও এক ধরণের তথ্য বা জ্ঞান - যা তাদের দাবী মতে আল্লাহ এর পক্ষ থেকে তাদের কাছে আসে। তাহলে, ওহী ও 'ইলহামের' মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? এভাবে সূফীরা/ পীররা মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। কষ্টের কথা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রায় সকল 'আলেমরা' সুফিবাদকে স্বীকৃতি দেয়। তারা ভালো, খাঁটি সুফি (পীর) ও ভণ্ড সুফি (পীরের) মধ্যে খাঁটি পীরকে বেছে নিতে বলে কিন্তু খাঁটি পীর বা সুফি বলে কিছু নেই। সকল পীর বা সুফি-ই হচ্ছে শিরক ও কুফর মিশ্রিত বিকৃত ইসলামের অনুসারী।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাঃ এর মাধ্যমে ওহীর মূল বিষয়টিও বলে দিয়েছেন আর তা হচ্ছে আমাদের ইলাহ কেবল একজনই। সুতরাং পীরদের/ সুফিদের/ গনতন্ত্র/ সমাজতন্ত্রপন্থীদের সকল অদ্ভুত বিভ্রান্তিকর ধারণাকে অস্বীকার করতে হবে এবং আল্লাহ এর সাথে কাউকেই শরীক করা যাবে না।

একটি ভুল বিশ্বাসের উদাহরণ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তিনটি নিদর্শন প্রকাশ পায়, তখন ঈমান এনে কোন আত্মার কোন লাভ হবে না, যদি না সে ইতিমধ্যেই ঈমান এনে থাকে অথবা ঈমানের মাধ্যমে নেকী অর্জন না করে থাকে: (নিদর্শন তিনটি হচ্ছে) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, মিথ্যা মসীহ (দাজ্জাল) এবং পৃথিবী থেকে পশুর উদয় (beast from the earth) ।" (সহীহ মুসলিম ১৫৮) (দাজ্জালকে কেন মিথ্যা মাসিহ বলা হয় তার ব্যাখ্যা এই বইয়ের সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াতের ব্যাখ্যায় দেয়া হয়েছে)

হাদিসে উল্লেখিত তিনটি নিদর্শনের মধ্যে ২ টি নিদর্শন প্রকাশিত হয়ে গেছে – এটা আমি নিশ্চিত। একটি হচ্ছে দাজ্জালের আবির্ভাব, অন্যটি হচ্ছে পৃথিবী থেকে পশুর উদয় (beast from the earth).

আমরা বর্তমান প্রেক্ষাপটে যদি শুধু বাংলাদেশের কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখতে পাই, কোটি কোটি মুসলিমরা দাজ্জালের ধোঁকায় পরে ঈমান হারা হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যেই কত ভ্রান্ত আকিদাহ আছে তা বলা মুশকিল কারণ ১৪৫৩ সালে দাজ্জাল (সুফিজম) আবির্ভূত হয়ে ইসলামের ভিতরে অনেক ভ্রান্ত আকিদাহের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে যা আমাদের সমাজের 'আলেমরা' গ্রহন করেছে এবং আমাদের মাঝে প্রচার করছে। তার একটি উদাহরন এখানে দেইঃ

বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিমের একটি বিশ্বাস হচ্ছে, "মানুষের আত্মার কোন দিন শেষ হবে না। মানুষের মৃত্যুর পর একদিন কিয়ামত হবে তারপর সবাই হয় জান্নাতে বা জাহান্নামে যাবে – সেখানে তারা চিরদিন থাকবে – সেখানে মৃত্যু হবে না, মানুষের সেই জীবন কখনো শেষ হবে না" । এই কথাগুলোর মধ্যে একটি শিরক আছে। একমাত্র আল্লাহ এর শুরু বা শেষ নেই। এখন কেউ যদি দাবী করে যে, মানুষের শেষ নেই তাহলে সে তো দাবী করছে যে আল্লাহ এর গুণ মানুষের মধ্যে আছে! নাউ-জুবিল্লাহ। একমাত্র আল্লাহ এর কোন শেষ নেই, তিনি ছাড়া আর সকল প্রাণীর এবং সকল কিছুর শেষ আছে। এক সময় আমরা কেউ ছিলাম না, কোন ফেরেস্তা ছিল না, নবী- রসূল ছিল না, জান্নাত-জাহান্নাম ছিল না, আল্লাহ ছাড়া কিছু ছিল না। আল্লাহ সবাইকে এবং সকল কিছুকে সৃষ্টি করেছেন। এমন এক সময় আসবে যখন আমরা কেউ থাকব না, কোন ফেরেশতা থাকবে না, জান্নাত –জাহান্নাম থাকবে না, আমাদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। আল্লাহ ছাড়া আর সকল কিছুর শেষ আছে। এটা হচ্ছে সঠিক বিশ্বাস। এই কথা ঠিক যে, জান্নাত বা জাহান্নামে মানুষের মৃত্যু হবে না কিন্তু তার মানে এই না

যে, জান্নাত-জাহান্নাম শেষ হবে না বা মানুষের শেষ হবে না। আল্লাহ বলেছেন, মানুষ জান্নাতে বা জাহান্নামে চিরদিন থাকবে কিন্তু এই 'চিরদিন' বলতে আল্লাহ কি বুঝাচ্ছেন –তার ব্যাখ্যা আল্লাহ কোরআনেই দিয়ে দিয়েছেন। একদিন মানুষ ও জান্নাত- জাহান্নাম সহ সকল কিছু অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে; শুধু আল্লাহ থাকবেন – তার কোন শেষ নেই।

এই সম্পর্কে কোরআনে আয়াত আছেঃ "যারা হতভাগা হবে তারা জাহান্নামে যাবে, সেখানে তাদের জন্য আছে হা-হুতাশ আর আর্ত চীৎকার। (১০৬) সেখানে তারা স্থায়ী হবে চিরকালের জন্য, যে পর্যন্ত আকাশসমূহ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছে করেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই করতে সক্ষম যা তিনি করতে চান। (১০৭) আর যারা সৌভাগ্যবান হবে, তারা জান্নাতে স্থায়ী হবে যে পর্যন্ত আকাশসমূহ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্য রকম ইচ্ছে করেন। এ হল এক অব্যাহত পুরস্কার। (১০৮)" (সূরা হুদঃ ১০৬-১০৮)

সূরা হুদের ১০৮ নাম্বার আয়াতের শেষ অংশের অর্থ একেকজন আলেম, একেকভাবে করেছেন, কেউ বলেছেন এর অর্থ, "অব্যাহত পুরস্কার"; কেউ বলেছেন, 'অন্তহীন পুরষ্কার'; কেউ অনুবাদ করেছেন, 'নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার' । শেষ অংশের এই অনুবাদ যাই করা হোক না কেন, আল্লাহ তো এই "অব্যাহত পুরস্কার / 'অন্তহীন পুরষ্কার' / 'নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার' কি তা – আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, "অব্যাহত পুরস্কার /, 'অন্তহীন পুরষ্কার' / 'নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার' হচ্ছে যে পর্যন্ত আসমান জমিন থাকবে ততদিন তারা জান্নাতে থাকবে। ১০৭ নাম্বার আয়াতে জাহান্নামীদের শাস্তির বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন যে, 'সেখানে তারা স্থায়ী হবে চিরকালের জন্য, যে পর্যন্ত আকাশসমূহ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে' তারপরও শর্ত আছে যে, আল্লাহ যদি চান তাহলে অন্য কিছুও করতে পারেন অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে, এই সময় বাড়াতে পারেন বা কমাতে পারেন বা অন্য কিছুও করতে পারেন – এটা আল্লাহ এর ইচ্ছা। সাধারণভাবে আমরা ধরে নিতে পারি যে, জান্নাতে ও জাহান্নামে যারা যাবে, তারা যতদিন আসমান-জমিন থাকবে ততদিন জান্নাতে এবং জাহান্নামে থাকবে – এটাই হচ্ছে 'চিরদিনের' ব্যাখ্যা। আসমান- জমিন যেদিন আল্লাহ রাখবেন না - সেদিন জান্নাত- জাহান্নামেও কেউ আর থাকবে না। 'যে পর্যন্ত আসমান- জমিন থাকবে' – এই কথা বলার মাধ্যমে, বিশেষ করে 'যে পর্যন্ত' শব্দটি ব্যাবহার করে আল্লাহ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ একদিন আসমান জমিনকে রাখবেন না, অস্তিত্বহীন করে দিবেন।

এর প্রমাণ আমরা কোরআনের এই আয়াতেও পাইঃ "আল্লাহর ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বলে ডেকো না, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তার চেহারা ছাড়া অন্য সকল কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বিধান তাঁরই, আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে" । (কোরআনঃ সূরা আল –কাসাসঃ ৮৮)

'একমাত্র তোমার রবের মুখমন্ডলই অবিনশ্বর - যিনি মহিমাময়, মহানুভব'। (সূরা আর রাহমানঃ ২৭) সুতরাং বুঝা গেলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছুই নশ্বর। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছুর শেষ আছে। অন্য

কোন কিছুর বা মানুষের বা জান্নাতের বা জাহান্নামের বা নবী রসূলদের বা ফেরেশতাদের বা মানুষের আত্মার শেষ নেই – এই কথা বলা বা বিশ্বাস করা হচ্ছে শিরক।

কোরআনের আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছুই এক সময় অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। আসমান, জমিন, জান্নাত, জাহান্নাম, নবী রসূল, ফেরেশতা, মানুষ ইত্যাদি সকল কিছুর এক সময় কোন অস্তিত্ব ছিল না; এই সবকিছুই এক সময় আবার অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। সুফিজমে বা পীরতন্ত্রে বিশ্বাসীরা - "মানুষের আত্মার কোন শেষ নেই, তারা জান্নাতে বা জাহান্নামে চিরদিন থাকবে যার কোন শেষ হবে না" – এই ধরণের কথাগুলো ইসলামে ঢুকিয়ে, ইসলামকে বিকৃত করেছে এবং মুসলিমদের ঈমান নষ্ট করছে।

আমি এখানে সমাজে প্রচলিত একটি শিরক সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। এই রকম কত শিরকি, কুফরি বিশ্বাস যে, আমাদের সমাজে, এমন কি ৫ ওয়াক্ত নামায পড়া মুসলিমদের মধ্যে আছে – আল্লাহ-ই ভালো জানেন। কোটি কোটি মুসলিমতো আছে যারা ইসলাম নিয়ে সম্পূর্ণ বেখবর; তারা সালাত-ই (নামায) পড়ে না – এরা মূলত দুনিয়াদার। এরা দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতকে বিক্রি করে দিয়েছে। আল্লাহ আমাদের শিরক্‌মুক্ত রাখুক এবং হিদায়াত করুক।

এখন দেখুন, এই সমাজে থেকে শিরক্‌মুক্ত, কুফর মুক্ত মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম খুঁজে পাওয়া কত কঠিন। দাজ্জাল ২ বার আবির্ভূত হয়ে গেছে। এমন কি দাজ্জাল এখন তার সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী সময় পার করছে বলে মনে হচ্ছে। এরপর –ই আসবেন ইসা ইবনে মরিয়ম আঃ। আমরা জমানার এই সময়েই অবস্থান করছি। ইসা ইবনে মরিয়ম আঃ আসার আর কত সময় বাকি? এটা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন।

দাজ্জাল আবির্ভূত হবার কিছু চিহ্ন

যাদের মতে দাজ্জাল এখনো আবির্ভূত হয়নি তাদের জন্যঃ

ধরুন, আগামীকাল দাজ্জাল সমাজে চলে আসল এবং সে সবাইকে দেখাল যে, সে প্লেন ছাড়াই আকাশে উড়তে পারে এবং সাবমেরিন ছাড়াই সমুদ্রের নিচে থেকে ঘুরে আসতে পারে, এমন কি রকেট ছাড়াই মহাকাশ থেকেও ঘুরে আসতে পারে – মানুষ কি অবাক হবে? মানুষ কি এই সব কারণে তাকে God বলে মানবে? একজন ইহুদী বা খ্রিষ্টান ও তাকে এই সব কারণে God বলে মানবে না কারণ মানুষ দাজ্জালকে বলবে যে, "আমরাও আকাশে উড়তে পারি প্লেন দিয়ে, মহাকাশে যেতে পারি রকেটের মাধ্যমে, সমুদ্রের নিচে যেতে পারি সাবমেরিনের মাধ্যমে – এটা আর এমন কি কঠিন কাজ; তুমি হয়তো এমন কোন যাদু বা টেকনোলজি ব্যাবহার করছ যা আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু এই সব ব্যাপার আমাদের কাছে অবাক করার মত কিছু নয় – এই কারণে আমরা তোমাকে God বলে মানার মত কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না" এবং তাকে কেউ God বলে মানবেও না। তাহলে, দাজ্জাল

কিভাবে নিজেকে God বা রব বলে নিজেকে মানুষের কাছে দাবী করবে এই জমানায়? এখন যদি দাজ্জাল আগামীকাল এসে সমাজের মানুষকে বলে, "আমি উন্নত মানের সার ও কীটনাশক দিবো ফলে তোমাদের শস্যের উৎপাদন ৫ গুণ বেড়ে যাবে, তোমাদের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছিয়ে দিবো, পারমাণবিক প্রযুক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বিদ্যুৎ বিল ৭০% কমিয়ে দিবো ফলে সবকিছুর দাম ৭০% কমে যাবে, প্রতি মাসে খেলার টুর্নামেন্ট থাকবে, সিনেমা, আনন্দ ফুর্তির সব উপকরণ সুলভ করে দিবো – তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার আইন মানবে, আইনদাতা হিসেবে আল্লাহকে নয়, আমাকে মানবে"।

মানুষ বলবে, "আমরা তো এখন ভোট দিয়ে আমাদের মতন মানুষকেই আইনদাতা হিসেবে নির্বাচিত করি যারা সংসদে বসে আমাদের জন্য আইন দেয় আর আমরা তাদের আইন মানি – আমরা আল্লাহকে আইনদাতা বলে মানি না, কোরআনে আল্লাহ এর দেয়া আইন বহু আগেই বাতিল করে মানুষের দেয়া আইন মানছি, এখন তুমি যে সব ওয়াদা করছ আর উৎপাদনের যে প্রযুক্তি তোমার কাছে আছে তাতে আমরা এখন থেকে তোমাকেই আইনদাতা বলে মানব এবং তোমার আইন /হুকুম-ই এখন থেকে মানব"। দাজ্জাল আমার আপনার বুঝার বহু আগেই আবির্ভূত হয়েছে। আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, দাজ্জাল মেঘ যেভাবে বাতাসের উপর ভর করে চলে সেভাবে চলবে, মাটিকে বলবে ফসল দিতে, মাটি তাকে ফসল দিবে। এই কথাগুলোর ব্যাখ্যা হচ্ছে, আমরা যদি কোনভাবেই দাজ্জালের আবির্ভাবের বিষয়টা বুঝতে না পারি তাহলে অন্তত এই সব চিহ্ন যখন দেখা যাবে যে, মানুষ আকাশে মেঘের মত বাতাসে ভর দিয়ে চলছে, মাটি তার সম্পদ (খনিজ তেল, ধাতু, খনিজ আকরিক, গ্যাস ইত্যাদি) বের করে দিচ্ছে, মানুষ বিশ্বাস করছে যে, সার কীটনাশক প্রয়োগের ফলে মাটি থেকে ফসল বের হচ্ছে তখন বুঝতে হবে যে, দাজ্জাল আবির্ভূত হয়ে গেছে।

এভাবে আমাদের বুঝার বহু আগেই দাজ্জাল সমাজে, পৃথিবীতে নিজেকে রব (God) বলে দাবী করেছে এবং তার আদর্শ/ বিশ্বাস বেশিরভাগ মানুষ মেনেও নিয়েছে। দাজ্জাল এই সমাজের মানুষকে দিয়ে এমন শিরক করিয়ে নিচ্ছে যা মুসলিমদের ইতিহাসে আগে কখনো হয়নি – আগে কখনো মানুষ অন্য একজন মানুষকে আইনদাতা বলে নিযুক্ত করেনি যা ১৪৫৩ সালের পর থেকে এই পৃথিবীতে ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে যার নাম গণতন্ত্র। আমরা জানি, দাজ্জালের পরীক্ষায় অনেক মুসলিম ঈমান হারা হয়ে মুশরিক হয়ে যাবে – এখন দেখুন কত মুসলিম "ইসলামিক গনতন্ত্র" নামে একটি ভুল মতবাদ নিয়ে আসছে যাতে আছে শিরকের মিশ্রণ। ইসলামিক গনতন্ত্র নামে যা আমাদের কাছে এসেছে তা আসলে দাজ্জালের মতাদর্শ বা তার বিভ্রান্তিকর ধারণা।

গণতন্ত্র জাতিকে দুই ভাগে ভাগ করে ফলে জাতি কখনোই ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। সরকারি দল চিন্তা করে ৪-৫ বছর পড়ে যখন নির্বাচন হবে তখন বিরোধীদল যেন কোনভাবেই জিততে না পারে – এই চিন্তা করে বিরোধীদলের উপর দমন-পীড়ন চালায়। জনগনের টাকা ইচ্ছামত চুরি করে কারণ তারা ভাবে যে ৫ বছর পর আর যদি সরকারে আসতে না পারি – তাহলে এই সুযোগ তোঁ আর পাবো না। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র,

একনায়কতন্ত্র, সাম্যবাদ, কমিনিজম হচ্ছে দাজ্জালের বিশ্বাস যার দাওয়াত সে পৃথিবীর সকল মানুষকে দিচ্ছে পত্রিকা, ডিশ টিভি, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে। প্রতিটি শহরে, নগরে যেখানে ইন্টারনেট বা টিভি গেছে সেখানেই দাজ্জালের বিশ্বাসের দাওয়াত পৌঁছে গেছে। দাজ্জাল যে বলেছে, আমি প্রতিটি শহরে যাবো – এর অর্থ দাজ্জালের প্রতিনিধি প্রতিটি শহরে যাবে বা থাকবে – আপনার শহরেও আছে কমিশনার বা চেয়ারম্যান যারা দাজ্জালের আইন –কানুন বিধি-বিধান কার্যকর করে এবং খেয়াল রাখে যে, দাজ্জালের বিরুদ্ধে কেউ যেন কিছু না বলে।

ইসলামে প্রধান ও মূল একটি বিশ্বাস হচ্ছে, আইন দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ, আনুগত্য পাবার মালিক একমাত্র আল্লাহ। গণতন্ত্রের কথা হচ্ছে আইন দেয়ার মালিক জনগনের ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা। আপনি যাকে আইনদাতা বলে মানেন, আপনি তাকেই নিজের রব (God) বলে গ্রহন করেছেন – এটাই ইসলামের নিয়ম। চিন্তা করে দেখুন, প্রথমবার ১৪৫৩ সালের পর এবং দ্বিতীয়বার ১৯১৯ সালের পর দাজ্জাল আবির্ভূত হয়ে সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজে কতটা প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে !

বহু সংখ্যক মুসলিম আলেমরা ইসলামে গণতন্ত্র আছে – এই মর্মে ফতোয়া দিয়ে গণতন্ত্র মিশ্রিত ইসলামকে মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম বলে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছে। যখন মুসলিম শাসক বা সরকার প্রধান এই গণতন্ত্র দিয়ে মুসলিমদের শাসন করতে শুরু করেছে তখন-ই সেই শাসক বা সরকার প্রধান দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

গনতন্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে বা গণতন্ত্রকে মেনে নিয়ে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রে অনেক মুসলিমদের দল আবির্ভূত হয়েছে। যেমনঃ মুসলিম ব্রাদারহুড (মিশর), জামাতে ইসলামি (পাকিস্থান ও বাংলাদেশ), চরমোনাই পীর (ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলন) , খেলাফত মজলিশ ইত্যাদি। এরা নিজেদের ইসলামি দল বলে দাবী করলেও আসলে এরা দাজ্জাল। কিন্তু দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হতে হলে এদেরকে রাষ্ট্রের শাসনভার হাতে পেতে হবে - যা তারা এখনো পায়নি। কিন্তু বহু মুসলিমের ঈমান তারা নষ্ট করে দিয়েছে। এই সব দলে যোগ দিয়ে মুসলিমরা ইসলামের কাজ করছে বলে মনে করছে, ইসলামের জন্য নিজেদের জীবন ও সম্পদ কোরবানি করছে বলে মনে করছে কিন্তু তারা আসলে গণতান্ত্রিক ইসলামের জন্য কাজ করছে ফলে তারা দাজ্জালের ধোঁকায় পড়ে গেছে। আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন, দাজ্জালের ফিতনা হচ্ছে মানবজাতির সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা/ ফিতনা। এই কথাটা আমাদের চিন্তা করে দেখা উচিত।

যারা বুঝতে পারছেন না তাদের জন্যঃ পাকিস্থান বা তুরস্ক বা বাংলাদেশ কেন দাজ্জালের শাসন শুরু হয়েছিল? গনতন্ত্র হচ্ছে একটি শিরক। আল্লাহ বলেছেন, আইন দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ; গনতন্ত্র বলে আইন দেয়ার মালিক মানুষের ভোটে নির্বাচিত মানুষ (সংসদ সদস্যরা) । তেমনিভাবে একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদিও দাজ্জালের শাসন – যদি সেটা মুসলিম দেশে বা ভূখণ্ডে হয়। যদি অমুসলিমদের দেশে বা সমাজে বা

রাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গনতন্ত্র, ইত্যাদি থাকে তাহলে সেটি দাজ্জালের শাসন বলে অভিহিত হবে না – কারণ ১৪৫৩ সালে জুলকারনাইনের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবার পর থেকে অমুসলিমরা সাধারণভাবে ইয়াজুজ-মাজুজ বলে অভিহিত হচ্ছে। তাই, বাংলাদেশ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্থানের দাজ্জালের শাসনের অধীনেই ছিল। এখন প্রশ্ন আসবে, ১৪৫৩ সাল থেকে মোট কত জন দাজ্জাল আবির্ভূত হয়েছে? অটোম্যানদের মধ্যে, তুরস্কের সরকার প্রধানদের মধ্যে, ইবনে সউদের রাজবংশের মধ্যে, পাকিস্থানের সরকার প্রধানদের মধ্যে এবং বাংলাদেশের সরকার প্রধানদের সবাই দাজ্জাল কিন্তু দাজ্জাল হিসেবে কে কে আবির্ভূত হয়েছে আর কে কে হয়নি সেটা সঠিকভাবে খুঁজে বের করা অনেক কঠিন ব্যাপার। কারণ দাজ্জাল হওয়া আর দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হওয়া ভিন্ন ব্যাপার। যেমনঃ ইবনে সাইদ দাজ্জাল ছিল কিন্তু সে দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়নি। আশা করি, আমরা এখন কোন জমানায় আছি – সেটা নিয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা পাঠকের হয়েছে।

আমরা ফিতনার জমানার কোন পর্যায়ে আছি এবং করনীয় কি?

ফিতনা সম্পর্কিত কিছু হাদিস এখানে আলোচনা করা হল। ফিতনা সম্পর্কিত হাদিসগুলো বুঝতে হলে আমাদেরকে প্রথমে এই সম্পর্কিত কিছু বিষয় বুঝতে হবে।

ফিতনা শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে পরীক্ষা। মুসলিমদের নিজেদের মধ্যে লড়াই বা যুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধ ফিতনার অন্তর্ভুক্ত কারণ সেই সময়ে কে সঠিক আর কে ভুল বুঝে উঠা কঠিন। আপনি সেই সময়ে থাকলে কোন পক্ষ নিবেন যখন মুসলিমদের দুইটি দল পরস্পর একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছে? সুতরাং এটা একটা কঠিন পরীক্ষা। তাই, মুসলিমরা যদি নিজেদের মধ্যে লড়াই করে তাহলে সেটা ফিতনার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ধরা হয়েছে।

সুনান আবু দাউদের ৪২৫২ নাম্বার হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, যখন মুহাম্মাদ সাঃ এর অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে তরবারি ব্যাবহার শুরু করলে তা কিয়ামতের আগ পর্যন্ত আর থামানো হবে না। আর এই গৃহযুদ্ধ বা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে ফিতনা। ৬৫৬ সালে মুসলিমরা ওসমান (রাঃ) নিহত হবার মধ্যে দিয়ে প্রথম গৃহযুদ্ধে বা ফিতনায় পতিত হয়। ৬৫৬ সালেই আয়েশা (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) এর মধ্যে যুদ্ধ হয় যা উটের যুদ্ধ (জঙ্গে জামাল) নামে পরিচিত। তাহলে, বুঝা যাচ্ছে, আমাদের সময়ের বহু আগেই ফিতনা শুরু হয়েছিল। এরপর মুসলিমরা গত ১৪০০ বছরে নিজেদের মধ্যে প্রচুর যুদ্ধ করেছে। এই সকল গৃহযুদ্ধই ফিতনার অন্তর্ভুক্ত এবং ৬৫৬ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত চলমান পুরো সময়টাই ফিতনার সময়ের অন্তর্ভুক্ত।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: সময় সংকুচিত হবে, জ্ঞান হ্রাস পাবে, ফিতনা দেখা দেবে, মানুষের অন্তরে কৃপণতা প্রবেশ করবে এবং হার্জ ছড়িয়ে পড়বে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল: হে আল্লাহর রাসূল! এটা কী? তিনি বললেন: হত্যা, হত্যা। (সুনান আবু দাউদ ৪২৫৫)

যে ফিতনার কথা সুনান আবু দাউদের ৪২৫৫ নাম্বার হাদিসে আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন তা আমাদের সময়ের বহু আগেই শুরু হয়েছে এবং এখনো চলমান আছে।

আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: তোমাদের সামনে অন্ধকার রাতের টুকরোর মতো এমন কিছু বিপর্যয় (ফিতনা) দেখা দেবে, যেখানে সকালে মানুষ মুমিন হবে এবং সন্ধ্যায় কাফের হবে। এই সময় যে বসে থাকবে সে উঠার চেয়ে উত্তম, আর যে উঠবে সে হাঁটার চেয়ে উত্তম, আর যে হাঁটবে সে দৌড়ানোর চেয়ে উত্তম। তারা (লোকেরা) বলল: আপনি আমাদের কী করতে আদেশ করেন? তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের ঘরে থাকো। (সুনান আবু দাউদ ৪২৬২)

সুনান আবু দাউদের ৪২৬২ নাম্বার হাদিসে আল্লাহ এর রসূল সাঃ এমন একটি ফিতনার জমানার কথা বলেছেন যে জমানায় মুসলিমরা নিজেদের ঘরে থাকলে, তারা নিজেদেরকে ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখতে পারত। আমার মতে, এটি উমাইয়া খেলাফতের (Umayyad Caliphate) শুরুর সময়কাল থেকে উসমানীয় খেলাফত (Ottoman Caliphate) পর্যন্ত সময়কাল (কম-বেশি ৭০০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত) । কারণ এই সময় খিলাফত নিয়ে প্রচুর যুদ্ধ হলেও তাতে যারা অংশগ্রহন করতে চাইত না বা সেটা নিয়ে কথা বলত না, তারা সেই সময়ের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকতে পারত। বর্তমানে, আপনি ঘরে থাকলেও নিজেকে ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখতে পারবেন না কারণ এই জমানার ফিতনার ধরণ-ই আলাদা যে সময়ে আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) আমাদেরকে অন্য কিছু করার নির্দেশ দিয়েছেন; আল্লাহ চাইলে, যা আমরা অন্য হাদিসে পাবো।

আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: এমন এক সময় আসবে যখন শুয়ে থাকা ব্যক্তি বসা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে, বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে, দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি হাঁটার চেয়ে উত্তম হবে, এবং হাঁটা ব্যক্তি দৌড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাকে কী করতে আদেশ করেন? তিনি বললেন: যার উট আছে সে যেন তার উট নিয়ে থাকে, যার ভেড়া আছে সে যেন তার ভেড়া নিয়ে থাকে, এবং যার জমি আছে সে যেন তার জমি নিয়ে থাকে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: যদি কারও কাছে (এই সকল সম্পদ) বেশি (পরিমাণে) থাকে, (তার কী করা উচিত)?

তিনি (সাঃ) উত্তর দিলেন: তার তরবারি তুলে নেওয়া উচিত, পাথরে আঘাত করে তার (তরবারির) ধার নষ্ট করা উচিত এবং যদি সে পারে তবে পালিয়ে যাওয়া উচিত। (সুনান আবু দাউদ ৪২৫৬)

সুনান আবু দাউদের ৪২৫৬ নাম্বার হাদিসে বেশি সম্পদের মালিক হতে নিষেধ করা হয়েছে। উমাইয়া খেলাফত থেকে উসমানীয় খেলাফত পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাক্তি রাজত্ব পাবার আশায় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র করত। মুসলিমদের বিভিন্ন সাম্রাজ্য দখলের জন্য বিভিন্ন ব্যাক্তির অধীনে মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করত। এই ফিতনার সময়ে কত মুসলিম যে নিহত হয়েছেন – আল্লাহ-ই জানেন। বলতে গেলে, এই সময়ে মুসলিমদের নিজেদের মধ্যে কোন ধরণের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়াই ছিল ফিতনায় জড়িয়ে পড়া। তাই, এই সময়ে আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) কথা মেনে চলাই ছিল উত্তম ছিল যে, কারো যদি সম্পদ বেশি হয় তাহলে সে তার তরবারি পাথরে আঘাত করে তরবারির ধার নষ্ট করবে অর্থাৎ মুসলিমদের কোনো গৃহযুদ্ধে সে অংশগ্রহন করবে না এবং সমাজ ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে

যাবে যাতে তাকে কেউ খুঁজে না পায় কারণ বেশি সম্পদশালী ব্যাক্তি ঐ সমাজে থাকলে সে ফিতনায় জড়িয়ে পড়বে – ঐ সময় এটাই স্বাভাবিক ছিল।

সাঈদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত: আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তিনি গৃহযুদ্ধের (ফিতনার) কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং এর ভয়াবহতা প্রকাশ করেছিলেন। আমরা অথবা লোকেরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, যদি এটি আমাদের সাথে ঘটে তবে এটি আমাদের ধ্বংস করে দেবে। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: না। তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে তুমি নিহত হবে। সাঈদ বলেন: আমি দেখেছি যে আমার ভাইদের হত্যা করা হয়েছে। (সুনানে আবি দাউদ ৪২৭৭)

বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত ফিতনা সম্পর্কিত প্রচুর ঘটনা ও সময় যে আমাদের সময়ের আগেই পার হয়ে গেছে তা আবু দাউদের ৪২৭৭ নাম্বার হাদিস থেকে বুঝা যায় কারণ সাইদ ইবনে জায়েদ (রাঃ) বলেছেন যে, তিনি তার ভাইদের নিহত হতে দেখেছেন। হাদিসে আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) গৃহযুদ্ধের সময় অন্য একজন মুসলিমকে হত্যা না করে, নিজে নিহত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুনান আবু দাউদ সহ অন্য কিতাবে খুজলে আপনারা এই রূপ আরও অনেক হাদিস পাবেন যেখানে আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) কোন মুসলিমকে হত্যা না করে তার হাতে নিজে নিহত হতে বলেছেন। এই রূপ সতর্কতার কারণ কি?

হানাফ বিন কায়স বলেন:

আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম। আবু বকর রাঃ আমার সাথে দেখা করে বললেন: ফিরে যাও, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: যখন দুজন মুসলিম তাদের তরবারি নিয়ে একে অপরের মুখোমুখি হয়, তখন হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল, একজন হত্যাকারী (তাই স্বাভাবিকভাবেই তার জাহান্নামে যাওয়া উচিত), কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপারটি কি? তিনি বললেন: সে তার সঙ্গীকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল। (সুনান আবু দাউদ ৪২৬৮)

সাঈদ বিন জুবাইর বলেন: আমি ইবনে আব্বাসকে (সূরা আন নিসার ইচ্ছাকৃত হত্যা সম্পর্কিত আয়াত সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: "যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না এবং আল্লাহ যাকে হারাম করেছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত হত্যা করে না" এই আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন মক্কার মুশরিকরা বলে: "আমরা আল্লাহর নিষিদ্ধ আত্মাকে হত্যা করেছি, আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে উপাসনা করেছি এবং অশ্লীল কাজ করেছি।" তাই আল্লাহ আয়াতটি নাযিল করেন "যদি না সে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, কারণ আল্লাহ তাদের মন্দকে ভালোয় পরিবর্তন করে দেবেন।" এটি তাদের জন্যই। "যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম" এই আয়াতটি সম্পর্কে তিনি বললেন: "যদি কেউ ইসলামের নির্দেশ জানে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তবে তার তওবা কবুল করা হবে না।" আমি মুজাহিদের কাছে এটি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন: "যারা (তার পাপের জন্য) লজ্জিত, তাদের ছাড়া।" (সুনানে আবি দাউদ ৪২৭৩)

ইবনে আব্বাস বলেন: "যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে" এই আয়াতটি অন্য কোন আয়াত দ্বারা বাতিল করা হয়নি। (সুনানে আবি দাউদ ৪২৭৫)

আমি মনে করি, "যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে” উক্ত আয়াত সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মতামত-ই সঠিক যে, এই রূপ হত্যাকারীর তওবা আল্লাহ কবুল করবেন না এবং তাকে চিরদিন জাহান্নামে থাকতে হবে। তবে আল্লাহ যদি কাউকে ক্ষমা করতে চান, তিনি সেটা করতে পারেন। সাধারণ নিয়ম হিসাবে, এই রূপ হত্যাকারীর তউবা আল্লাহ কবুল করবেন না – কোরআন, হাদিস এবং ইবনে আব্বাস রাঃ এর মতামত অনুসারে এটাই সঠিক। গৃহযুদ্ধের সময় বা মুসলিমদের নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ের সময় কে ভুল, কে ঠিক, কোনটি সঠিক পথ বুঝা বড় দুষ্কর। তাই, এই সময়ে যেন কোন মুসলিম অন্য মুসলিমকে হত্যা না করে এজন্য আল্লাহ এর রসূল সাঃ এর নির্দেশ যে, সেই সময়ে একজন মুসলিম যেন অন্য মুসলিম দ্বারা নিহত হয় কিন্তু নিজে যেন অন্য কোন মুসলিমকে হত্যা না করে।

আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: কিয়ামতের পূর্বে অন্ধকার রাতের টুকরোর মতো গোলমাল বা অশান্তি হবে। সকালে মানুষ মুমিন থাকবে, সন্ধ্যায় কাফের হবে, অথবা সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে এবং সকালে কাফের হবে। এই সময় যে বসে থাকবে সে উঠে দাঁড়ানো ব্যাক্তির চেয়ে উত্তম এবং যে হাঁটবে সে দৌড়ানো ব্যাক্তির চেয়ে উত্তম। অতএব, তোমাদের ধনুক ভেঙে ফেলো, ধনুকের তার কেটে ফেলো এবং পাথরে তরবারি মারো। যদি লোকেরা তোমাদের কারো কাছে আসে, তাহলে সে যেন আদমের দুই পুত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। (সুনান আবু দাউদ ৪২৫৯)

মুসলিমরা যখন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করেছে এবং করবে তখনকার সময়ে আল্লাহ এর রসূল সাঃ আমাদেরকে যুদ্ধে বা মারামারিতে অংশগ্রহন করতে নিষেধ করেছেন। তারপরও কেউ যদি আমাদেরকে হত্যা করতে আসে তাহলে তিনি আমাদেরকে আদম (আঃ) এর ছেলে হাবিলের মত কাউকে হত্যা না করে নিজে নিহত হতে বলেছেন। আমার মতে কিছু কম-বেশি ৭০০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত এই অবস্থা মুসলিমদের মাঝে বিরাজমান আছে। কিন্তু ফিতনার বর্তমান রূপ আগের চেয়ে ভিন্নতর হয়েছে।

আল্লাহ এর রসূল সাঃ এর ফিতনা সম্পর্কিত অনেক হাদিস আছে। এই সকল হাদিসে বিভিন্ন ফিতনার সময় উম্মতরা কি করবে, সেই ব্যাপারে আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) সকল ফিতনার সময়ের জন্য একই নির্দেশ দেননি। তিনি বিভিন্ন ফিতনার সময় বিভিন্ন কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলিমদের নিজেদের মধ্যে লড়াই বা যুদ্ধই হচ্ছে ফিতনা। এখন জেনে নেই মুসলিম কারা?

আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) বলেছেন, "আমার উম্মত তিহাত্তরটি দলে বিভক্ত হবে, একটি দল ছাড়া তাদের সকলেই জাহান্নামে যাবে।" তারা জিজ্ঞাসা করল: হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা? তিনি বললেন: "[যারা] সেই পথ অনুসরণ করে যা আমি এবং আমার সাহাবীরা অনুসরণ করি।" (তিরমিযী-২৬৪১)

তিহাত্তর দলের সবাই পৃথিবীতে মুসলিম বলে পরিচিতি পাবে। শুধুমাত্র একটি দল কিয়ামতের দিন জান্নাতে যাবে। আল্লাহ ছাড়া কেউই এটা বলতে পারবে না যে, বর্তমানে এই দলটির অন্তর্ভুক্ত কে বা কারা। তাহলে, বর্তমানে যে বা যারাই কালিমা স্বীকার করে এবং মুসলিম বলে নিজেদের দাবী করে তারা সবাই দুনিয়াতে মুসলিম বলে পরিচিত হবে।

কিছু হাদিসে আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) ফিতনার সময়ের নির্দেশনা (যেমন গৃহে অবস্থান করা) ছিল আমাদের আগের জমানার মুসলিমদের সময়ের ফিতনার জন্য (আমার মতে, এটা প্রায় ৭০০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত) । যেহেতু সেই সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং আমরা দাজ্জালের ফিতনার ভিতরে আছি তাই, আমাদের জন্য নবী (সাঃ) অন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। এখন আমরা আমাদের বর্তমান সময়ের ফিতনা সম্পর্কিত হাদিস এবং এক্ষেত্রে কি করনীয় সেই সম্পর্কে হাদিস থেকে জানবঃ

হুযাইফা ইবনে আল ইয়ামান থেকে বর্ণিত: সুবাই ইবনে খালিদ বলেন: তুস্তার বিজয়ের সময় আমি কুফায় এসেছিলাম। সেখান থেকে আমি কিছু খচ্চর নিয়েছিলাম। যখন আমি (কুফার) মসজিদে প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে কিছু মাঝারি গড়নের লোককে দেখতে পেলাম, এবং তাদের মধ্যে একজন লোক ছিল যাকে দেখে তুমি চিনতে পারতে যে, সে হিজাজের লোক।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তিনি কে? লোকেরা আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে বলল: তুমি তাকে চিনতে পারছ না? ইনি হলেন হুযাইফা ইবনে আল ইয়ামান, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সাহাবী। তারপর হুযাইফা বললেন: লোকেরা আল্লাহর রাসূলকে (সাঃ) কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত, আর আমি তাকে মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। তখন লোকেরা তার দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।

তিনি বললেন: আমি জানি কেন আপনি এটি অপছন্দ করেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে আল্লাহর রাসূল, এই কল্যাণ যা আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন তার পরে কি আগের মতো মন্দ থাকবে?

তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এর থেকে রক্ষা কোথায়? তিনি বললেন: তরবারিতে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে আল্লাহর রাসূল, তারপর কী হবে?

তিনি বললেন: যদি পৃথিবীতে আল্লাহর এমন একজন খলিফা থাকে যে তোমার পিঠ ছিঁড়ে তোমার সম্পত্তি কেড়ে নেয়, তারপরও তার আনুগত্য করো; অন্যথায় গাছের গুঁড়ি ধরে মৃত্যুবরণ করো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এরপর কী হবে? তিনি বললেন: এরপর দাজ্জাল নদী ও আগুন নিয়ে বেরিয়ে আসবে। যে তার আগুনে পড়ে সে অবশ্যই তার প্রতিদান পাবে এবং তার বোঝা তার থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে, কিন্তু যে তার নদীতে পড়ে তার বোঝা তার উপর রেখে দেয়া হবে এবং তার প্রতিদান তার থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: এরপর কী হবে? তিনি (সাঃ) বললেন: কিয়ামত আসবে। (সুনান আবি দাউদ ৪২৪৪)

উল্লেখিত হাদিসের খলিফা না থাকার পর্যায় মুসলিমরা ১৯৩১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত অতিক্রম করছে। খলিফাবিহীন থাকা অবস্থায় আমরা যেন গাছের গুড়ি ধরে থাকি যতক্ষন না মৃত্যু আমাদের কাছে আসে। এরপর

দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। ১৯৪৭ সালে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর পদটি দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং ১৯৫৮ সালে লেবাননের বৈরুতে আমেরিকা প্রথমবারের মত সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মধ্য প্রাচ্যে বা আরব বিশ্বে অর্থাৎ মুসলিমদের উপর তার প্রভাব বিস্তার শুরু করে। আমেরিকা তারপর থেকে মধ্য প্রাচ্যে নিয়মিত-ই যুদ্ধ করেছে এবং করছে। আমেরিকা ইসরায়েলকে নিঃশর্ত সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ দাজ্জাল তার নদী ও আগুন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এই ফিতনার সময় ঘরে থাকার কথা বলা হয়নি। হাদিস অনুসারে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবার উপায় হচ্ছে দাজ্জালের আগুনের নদী থেকে পান করা। অর্থাৎ আপনি সেই যুবকের মত হবেন যে দাজ্জালের পরিচয় মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেয় ফলে দাজ্জাল তাকে গ্রেফতার করে, মামলা দেয়, নির্যাতন করে, জেল দেয়, এমন কি হত্যা করে – এটাই হচ্ছে দাজ্জালের সাথে থাকা দেখতে আগুনের মত নদী থেকে পান করা। এরপর কিয়ামত হবে। অর্থাৎ আমাদের এবং কিয়ামতের মাঝে আর কিছু নেই। আমরা কিয়ামতের এতটাই নিকটে আছি।

হুযাইফা রাঃ থেকে বর্ণিত: তিনি বলেছেন: আমরা বনু লাইথের একদল লোকের সাথে আল-ইয়াশকুরিতে এসেছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: এরা কারা? আমরা উত্তর দিলাম: বনু লাইথ। আমরা আপনার কাছে হুযাইফার হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। এরপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করে বললেন: আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আল্লাহর রাসূল সাঃ, এই কল্যাণের পরে কি মন্দ আসবে?

তিনি উত্তর দিলেন: ফিতনা (ফিতনা) এবং মন্দ আসবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আল্লাহর রাসূল সাঃ, এই কল্যাণের পরে কি মন্দ আসবে? তিনি (সাঃ) উত্তর দিলেন: হুযাইফা, আল্লাহর কিতাব শিখুন, এবং এর বিষয়বস্তু মেনে চলুন। তিনি এই কথাটি তিনবার বললেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আল্লাহর রাসূল, এই কল্যাণের পরে কি মন্দ আসবে? তিনি উত্তর দিলেন: একটি অলীক যুদ্ধবিরতি এবং একটি (অলীক) সম্প্রদায় যার চোখে কণা থাকবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে আল্লাহর রাসূল, আপনি একটি অলীক সম্প্রদায় বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন?

তিনি উত্তর দিলেন: মানুষের হৃদয় তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে আল্লাহর রাসূল, এই ভালোর পরে কি মন্দ আসবে? তিনি উত্তর দিলেন: এমন ভুল বিশ্বাস আসবে যা মানুষকে সত্যের প্রতি অন্ধ ও বধির করে দেবে এবং জাহান্নামের দরজায় আহ্বানকারীরা উপস্থিত হবে। হুযাইফা, যদি তুমি (গাছের) গুঁড়ির সাথে লেগে থেকে মারা যাও, তবুও তাদের অনুসরণ করার চেয়ে তোমার জন্য এটি উত্তম। (সুনানে আবি দাউদ ৪২৪৬)

উপরে উল্লিখিত হাদীসটি হুযাইফা (রাঃ) কর্তৃক নবী (সাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসটি বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে। একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে: তিনি (সাঃ) বললেন: "যদি তুমি ঐ দিনগুলিতে কোন খলিফা না পাও, তাহলে পালিয়ে যাও যতক্ষণ না তুমি মারা যাও, এমনকি যদি তুমি গাছের গুঁড়ি ধরে থাকো।" আমি জিজ্ঞাসা

করলাম: এরপর কী হবে? তিনি বললেন: "যদি কেউ চায় যে তার ঘোড়া বাচ্চা দিবে, তাহলে কিয়ামত না আসা পর্যন্ত ঘোড়াটি বাচ্চা দেবে না।" (সুনান আবু দাউদ ৪২৪৭)

কোরআন বুঝে পড়ার গুরুত্ব কতটুকু সেটা আবু দাউদের ৪২৪৬ নাম্বার হাদিস থেকে বুঝা যায়। মন্দ সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে মুহাম্মাদ সাঃ প্রথমেই বলেছেন, কোরআন শিখতে এবং এর বিষয়বস্তু মেনে চলতে। কোরআন না বুঝে পড়লে কোরআনের বিষয়বস্তু বুঝা সম্ভব নয় তাই কোরআন বুঝে বুঝে পড়তে হবে। আল্লাহ এর রসূল সাঃ একটি অলীক সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন যাদের চোখে কণা (Specks in eye) থাকবে।

(Specks in eye যাকে চোখের ভিতর স্পট (spot) বলা যেতে পারে। চোখের রেটিনায় দাগ বা স্পট পড়লে মানুষ চোখে কালো স্পট দেখতে পায়। যেই অংশে স্পট পড়েছে সেই অংশের কিছু দেখতে পায় না কিন্তু অন্য সকল কিছু দেখতে পায়।)

চোখে কণা থাকার অর্থ হচ্ছে তারা সত্যকে সম্পূর্ণরূপে দেখতে পাবে না। ইসলামের ভিতরে শিরক ও কুফর ঢুকিয়ে সেই ইসলাম তারা অনুসরণ করবে অথবা তারা ইসলাম আংশিকভাবে মেনে চলবে। তারা ইসলামের কিছু নিয়ম কানুন ও বিশ্বাস মানবে আবার শিরক, কুফর ও করবে। তারা ইসলামের অনেক কিছুকে মানবে আবার অনেক কিছুকে বাদ দিবে। যেমনঃ রাষ্ট্রে মুসলিমরা সালাত (নামায), সওম (রোজা), হাজ্জ মানে কিন্তু ইসলামের ফৌজদারি আইন মানে না।

অলীক শব্দের অর্থ হচ্ছে কাল্পনিক বা অবাস্তব। যা বাস্তবে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না – তাকে অলীক বিষয় বলে। অলীক সম্প্রদায় হচ্ছে এমন সম্প্রদায় যারা অলীক বিষয়ে বিশ্বাস করে, অলীক বিষয়ের চর্চা করে এবং অলীক বিষয় ব্যবহার করে। যেমনঃ নাটক, সিনেমা, গানের রোমান্টিক কল্পনার জগতে হারিয়ে যাওয়া, মহাকাশে এলিয়েন আছে – এই বিষয় নিয়ে সায়েন্স ফিকশন নাটক, বই, সিনেমা তৈরি করা, কম্পিউটার সফটওয়্যার, ভিডিও, ভিডিও গেমস, ইন্টারনেটে তথ্য আদান-প্রদান, মোবাইলে কথা বলা, Artificial Intelligence বা AI (ChatGPT,DeepSeek, etc) ইত্যাদি বিষয়গুলো অলীক বিষয় কারণ এগুলো ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, কিভাবে কাজ করে তা দেখাও যায় না – এই সকল কিছুই হচ্ছে অলীক বিষয়, এই রূপ হাজারো অলীক বিষয় এই সম্প্রদায় বিশ্বাস করে, চর্চা করে এবং ব্যাবহার করে। বর্তমানে আমরা টেকনোলজির অত্যধিক উৎকর্ষতার ভিতরে জীবন-যাপন করছি- আমরাই হচ্ছি অলীক সম্প্রদায়। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলইজেন্স (Artificial Intelligence) নামক একটি উদ্ভাবনের মাধ্যমে চ্যাটজিপিটি (ChatGPT), ডিপসিক (DeepSeek) ইত্যাদি হাজারো সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ৫ বছর আগের মৃত ব্যাক্তিও আজকের বিষয় নিয়ে কথা বলছে বলে ভিডিওতে দেখানো সম্ভব হচ্ছে, একজনের কণ্ঠ স্বর নকল করে নিজের বলে ভিডিও, অডিওতে চালিয়ে দেয়া যাচ্ছে। বাস্তবে যা নেই তা ভিডিও আকারে দেখানো হচ্ছে। এই সব কিছুই অলীক সম্প্রদায়ের কাজ। প্লাস্টিক সার্জারি করে মানুষ নাক, গলা, বুক, নিতম্ভ, গাল ইত্যাদি নিজের ইচ্ছামত করে নিচ্ছে –যদিও বাস্তবে তার নাক, বুক, গাল সে রকম নয় কিন্তু সিলিকন ইমপ্ল্যান্ট করে তেমন-ই দেখানো হচ্ছে। এই সব কিছুই প্রমাণ করছে যে,

আমরাই হচ্ছি অলীক সম্প্রদায়। একটি ১ মাসের মুরগীর বাচ্চা যার ওজন ২ কেজির মত তাকে দেখতে বয়স কমপক্ষে ৩ বছর মনে হচ্ছে। খাদ্য অনেক লোভনীয় ও মজাদার মনে হলেও তাতে পুষ্টি বলতে কিছুই থাকছে না। আমাদের চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন আমাদের ভিতরে বাস্তব বলতে খুব কম জিনিস-ই আছে। এই সব কিছুই প্রমাণ করছে যে, আমরাই হচ্ছি অবাস্তব ও অলীক সম্প্রদায়।

অলীক সম্প্রদায়ের লোকদের হৃদয় পূর্বের অবস্থানে ফিরবে না। এই কথার অর্থ ব্যাখ্যা করছি অন্য একটি হাদিসের সাথে তুলনা করে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি ব্যভিচার করে, তখন তার থেকে ঈমান এমনভাবে সরে যায় যেন তার মাথার উপর মেঘ। যখন সে তার কাজ (ব্যভিচার) বন্ধ করে দেয়, তখন ঈমান তার কাছে ফিরে আসে। (সুনান আবী দাউদ ৪৬৯০)

অলীক সম্প্রদায়ের লোকেরা যেহেতু অলীক বিষয়ে বিশ্বাস করবে বা অলীক বিষয় চর্চা করবে, অলীক বিষয় নিয়েই সময়, শ্রম ব্যয় করবে তাই তাদের অন্তর গুনাহ করার পর আর পূর্বের নিস্পাপ অবস্থায় ফিরবে না। অর্থাৎ কোনটি গুনাহের কাজ তা তারা চিনবে না, বুঝবে না ফলে তারা সেই সব গুনাহ থেকে তউবাও করবে না তাই তাদের অন্তর গুনাহ করার পূর্বের অবস্থায় ফিরবে না। যেমনঃ পীরতন্ত্রের বা সুফিজমের অনুসারীরা যারা পীরতন্ত্রকে ইসলাম বলে মনে করে এবং গণতান্ত্রিক ইসলামের অনুসারীরা যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করে – এরা তো এই সকল কাজকে নেকীর কাজ বলে মনে করে ফলে তারা এই সকল শিরক, কুফর থেকে তউবা করবে না আর তাদের অন্তরও পূর্বের নিস্পাপ অবস্থায় ফিরবে না। এদের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানে বা বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, সেকুলারিসমে বিশ্বাসী মুসলিমরাও অন্তর্ভুক্ত। এখন এমন শিরক, কুফর মিশ্রিত ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে যে, এই রূপ ভুল বিশ্বাসে মানুষ সত্যের প্রতি অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে। 'আলেমরা' শিরক কুফর মিশ্রিত ইসলাম – সুফিজম/পিরতন্ত্র মিশ্রিত ইসলামের দিকে, গণতান্ত্রিক ইসলামের দিকে মানুষকে আহবান করছে- এরাই হচ্ছে তারা, যাদের সম্পর্কে নবী সাঃ বলেছেন যে, 'জাহান্নামের দরজায় আহবানকারীরা উপস্থিত হবে' অর্থাৎ তারা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও জাহান্নামের দিকে মানুষকে ডাকবে। এদেরকে অনুসরণ করার চেয়ে বনে, জঙ্গলে গিয়ে গাছের গুড়িতে বসবাস করে মৃত্যু বরণ করাও অনেক উত্তম। এই রূপ নির্দেশনাই আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) আমাদেরকে দিয়েছেন।

উক্ত হাদিসের অন্য একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, নবী (সাঃ) বলেছেন যে, যদি খলিফা পাওয়া না যায় তাহলে আমরা যেন সমাজ ছেড়ে পালিয়ে যাই, এমন কি, গাছের গুড়ি ধরে থাকা অবস্থায় যদি আমাদের মৃত্যু হয় তবু এটাই আমাদের জন্য উত্তম। এরূপ সময় যখন আসবে তখন কিয়ামত এতটাই নিকটবর্তী যে তার তুলনা এমনঃ একটি ঘোড়ার মালিক যখন আশা করে যে, তার ঘোড়াটি বাচ্চা দিবে কিন্তু ঘোড়াটি বাচ্চা দেয়ার আগেই কিয়ামত চলে আসবে। আমার জানা মতে, ১৯৩১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত মুসলিমদের কোন খলিফা নেই। তাহলে, আমাদেরকে এখন সমাজ ছেড়ে বন- জঙ্গলে বা পাহাড়ে বা নিভৃত কোন স্থানে গিয়ে গাছের গুড়িতে

বসবাস করতে হবে যতক্ষণ মৃত্যু আমাদের কাছে না আসে। এরপর খুব অল্প সময়ের ভিতরে কিয়ামত হবে। ১৯৩১ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৯৪ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। বুঝা যাচ্ছে, কিয়ামত আমাদের খুবই নিকটে আছে। বর্তমান সময়ের দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাচার আরেকটি উপায় আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম যে, সমাজ ছেড়ে পাহাড়ে বা বনে-জঙ্গলে বা নিভৃত কোন স্থানে গিয়ে গাছের গুড়িতে বসবাস করা যতক্ষণ মৃত্যু আমাদের কাছে না আসে।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: এমন গৃহযুদ্ধ হবে যা আরবদের ধ্বংস করে দেবে এবং তাদের নিহতরা জাহান্নামে যাবে। সেই সময় জিহ্বার আঘাত তরবারির আঘাতের চেয়েও তীব্র হবে। (সুনান আবু দাউদ ৪২৬৫)

আমরা যদি সমসাময়িক সময়ের কথা বিবেচনা করে আবু দাউদের ৪২৬৫ নাম্বার হাদিসটি ব্যাখ্যা করি তাহলে দেখতে পাবো, ১৯৮০ সালে ইরাক-ইরানের মধ্যে যুদ্ধ হয় যা ৮ বছর ধরে চলে। তারপর ইরাক - কুয়েত যুদ্ধ হয়; তারপর সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ হয় যা এখনো চলমান, ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধ চলছে। এই সকল যুদ্ধে বেশিরভাগ মুসলিমরা বা আরবরা জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে যুদ্ধ করেছে, তারা ইসলামের জন্য যুদ্ধ করেনি। তাহলে, এই সকল যুদ্ধে যে সকল আরব মারা গিয়েছে তারা তো জাহান্নামেই যাবে। বর্তমান সময়ে তরবারির আঘাতের চেয়ে মুখের কথার প্রভাব অনেক বেশি। তাইতো, মায়ানমারের রাখাইনে মুসলিমদের গণহত্যার খবর মায়ানমার সরকার প্রচার করতে দেয় না; ফিলিস্থিনে মুসলিমদের গণহত্যার সংবাদ বা ছবি ইসরাইল প্রচার করতে দেয় না; কোনো সাংবাদিককে গাজায় ঢুকতে দেয় না। 'ফেসবুক' মুসলিমদের গণহত্যার ছবি বা খবর প্রচার করতে দেয় না। হাদিস অনুসারে দাজ্জালের পরিচয় প্রকাশ করে দেয়াই এখন গুরুত্বপূর্ণ এবং নেকির কাজ (দাজ্জালের সাথে যুবকের ঘটনা সম্পর্কিত হাদিসটি স্মরণ করে দেখুন)। বুঝা যাচ্ছে, এখন তরবারির চেয়ে মুখের কথার প্রভাব অনেক বেশি। বর্তমান জমানার মুসলিমরা শিরক, কুফর মিশ্রিত বিকৃত ইসলামকে অনুসরণ করছে। অধিকাংশ মুসলিমরা ইসলামকে আংশিকভাবে মানছে ; তাদেরকে তরবারির মাধ্যমে সঠিক পথে আনা সম্ভব নয়। তাদেরকে কথার মাধ্যমে বুঝিয়ে, জ্ঞান বিতরণ করে সঠিক পথে আনা সম্ভব হতে পারে। আপনি একটি You tube channel এর মাধ্যমে যত জনের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে পারবেন - কোন অস্ত্রের মাধ্যমেই তত জন মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া সম্ভব নয়। তাই, বর্তমানে তরবারির চেয়ে কথার প্রভাব অনেক বেশি।

এই হাদিসগুলো পড়ার পর বুঝতে পারলাম যে, বর্তমানকালের দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকতে হলে দাজ্জালের পরিচয় মানুষের কাছে প্রকাশ করতে হবে ফলে দাজ্জাল ঐ ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করবে, জেল দিবে, নির্যাতন করবে, এমন কি হত্যাও করতে পারে – আর এটাই হচ্ছে দাজ্জালের আগুনে পড়া – যা করতে আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) নির্দেশ করেছেন। দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার আরেকটি উপায় হচ্ছে সমাজ ছেড়ে বন –জঙ্গলে বা পাহাড়ে বা নিভৃত এলাকায় গাছের গুড়িতে বসবাস করা যতক্ষণ মৃত্যু না আসে। এই দুইটি

পথের যেটি আপনার কাছে সহজ মনে হয় আপনি সেটি বেছে নিতে পারেন। দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাচার আর কোনো পথ আমার জানা নেই।

আমাদের সমাজের অনেক বিখ্যাত আলেমদের বলতে শুনি যে, তারা ইমাম মাহদি এবং ইসা আঃ এর আগমনের অপেক্ষায় আছেন; ইসা আঃ এবং ইমাম মাহদি কবে আসবেন – সেটা নিয়ে তারা চিন্তিত। আমাদের মনে রাখতে হবে, একজন মুসলিম আল্লাহ ছাড়া কারো উপর ভরসা করে না। আমি মনে করি, যারা ইমাম মাহদি এবং ইসা আঃ এর দলে থাকবেন তারাও ইসা আঃ বা ইমাম মাহদির উপর নির্ভর করবেন না, তারা নির্ভর করবেন এবং ভরসা করবেন একমাত্র আল্লাহ এর উপর। সুতরাং ইমাম মাহদি বা ইসা আঃ এসে মুসলিমদেরকে উদ্ধার করবেন বা রক্ষা করবেন – এরূপ আশা বা ভরসা করবেন না। আমাদের কাজ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ এর হুকুম মানা ও তার উপরই ভরসা করা এবং মুহাম্মাদ সাঃ এর নির্দেশনা অনুসরণ করা।

"আমরা একমাত্র আপনার-ই আনুগত্য করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই" । (সূরা ফাতিহাঃ৪)

অনেকে ভাবেন যে, ইমাম মাহদি আসলে বা ইসা (আঃ) আসলে আমাকে তাদের দলে যোগ দিতেই হবে, তা না হলে আমি সঠিক পথে থাকতে পারব না। ব্যাপারটা যে এমন না – সেটা আমরা উপরে বর্ণিত অনেক হাদিস থেকে বুঝতে পারলাম। ধরুন, ইমাম মাহদি বা ইসা আঃ চলে এসেছেন কিন্তু আপনি তাদের দলে যোগ দিতে পারলেন না কিন্তু আপনি সমাজ ছেড়ে বনে গিয়ে গাছের গুড়ির পাশে বাস করে ইসলামের উপর জীবন পার করে দিলেন। তাহলে, আবু দাউদ ৪২৪৭ হাদিস অনুসারে আপনি জান্নাত পাবেন বলে আশা করা যায়। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

দাজ্জাল কি কাফির?

দাজ্জাল কাফির কি না সেটা জানতে হলে আমাদেরকে ইবনে সাইদকে নিয়ে বর্ণিত হাদিসগুলো মনে করতে হবে। হাদিসগুলো এই বইয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ এর রসূল সাঃ ইবনে সাইদকে কাফির বলেছেন এমন কোন হাদিস পাওয়া যায়নি। হাদিস থেকে যতটুকু জানা যায়, ইবনে সাইদকে কখনো কোনো সাহাবী কাফির বলেন নি। তিনি সমাজে মুসলিম বলে স্বীকৃত ছিলেন। ইবনে ওমর (রাঃ) এবং জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) ইবনে সাইদকে দাজ্জাল বলেছেন কিন্তু উনারা ইবনে সাইদকে কাফির বলেন নি। দাজ্জালের বিষয়টা হচ্ছে তার ভিতরে সত্য- মিথ্যার সংমিশ্রণ থাকে। দাজ্জাল ইসলামের সাথে শিরক, কুফরকে মিশ্রিত করে কিন্তু সে সেই শিরক, কুফর মিশ্রিত ইসলামকেই আল্লাহ এর রসূলের সাঃ আনিত ইসলাম বলে মনে করে এবং শিরক, কুফর মিশ্রিত বিকৃত ইসলামকেই - ইসলাম মনে করে অনুসরণ করে। মুহাম্মাদ সাঃ এর উম্মতদের মধ্য থেকে যারা দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বা হবে তারা দাজ্জাল কিন্তু সমাজে তাদেরকে মুসলিম হিসেবেই স্বীকৃতি

দিতে হবে। অমুসলিমদের মধ্যে থেকে যে সকল দাজ্জাল আবির্ভূত হয়েছে এবং হবে তারা তো এমনিতেই কাফির কারণ তারা অমুসলিম।

যারা গণতান্ত্রিক ইসলাম অনুসরণ করে বা পিরতন্ত্রের ইসলাম বা সুফিজমের ইসলাম অনুসরণ করে তাদেরকে সামাজিকভাবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফির বলা যাবে না যদিও প্রকাশ্য শিরক করার কারণে সত্যিকার অর্থে তারা মুশরিক অর্থাৎ কাফির হয়ে গেছে। সমাজে তাদেরকে মুসলিম হিসাবেই স্বীকৃতি দিতে হবে। অনেক সালাফি বা আহলে হাদিস দলের লোকেরা এবং আলেমরা ছোট-খাট বিষয়ের কারণে মুসলিমদেরকে কাফির ফতোয়া দিয়ে দেয়। এটা করা যাবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ দাজ্জাল, দাজ্জালের সহযোগী, দাজ্জালের অনুসারীদের বিচার করবেন। এখন দাজ্জাল ইবনে সাইদের ব্যাপারে সাহাবী ইবনে ওমর (রাঃ) এবং জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) এর নীতি অনুসরণ করে বর্তমান পৃথিবীর দাজ্জাল, দাজ্জালের সহযোগী এবং দাজ্জালের অনুসারীদের কাফির না বলে - বলতে হবে যে, এরা দাজ্জাল, দাজ্জালের সহযোগী, দাজ্জালের অনুসারী।

অনেকে প্রশ্ন করেন যে, কিয়ামতের দিন দাজ্জালের আলাদা করে বিচার করা হবে কি না?

দাজ্জাল বা দাজ্জালদের আলাদা করে দাজ্জাল নামে কিয়ামতের দিন ডাকা হবে এমন কোন হাদিস আমি পাইনি। প্রতিটি মানুষকে তার বিশ্বাস ও কাজের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ কিয়ামতের দিন বিচার করবেন। যে সকল মানুষ দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং হবে তারাও এই নিয়মের বাহিরে নয়। 'দাজ্জাল' শব্দটি হচ্ছে একটি টাইটেল বা পদের নাম বা পদবী। দাজ্জাল বলতে আলাদা কোনো প্রজাতির মানুষ বা প্রাণী বা জীনকে বুঝায় না। তারা আমাদের মতই মানুষ অর্থাৎ আমাদের মতই তারা খাবার খায়, ঘুমায়, বিয়ে করে; তাদেরও আমাদের মতই হাত-পা, চোখ, নাক, কান ইত্যাদি আছে। আল্লাহ কোরআনের ভিত্তিতেই সকল মানুষের বিচার করবেন।

দাজ্জাল ও শেষ জমানা সম্পর্কিত আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদিস

‘আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“ফিতনাহু আল-আহলাস (ক্রমাগত দুর্যোগ) হলো গণপরিত্যাগ এবং যুদ্ধ। তারপর (আসবে), ‘ফিতনাতুস সারা’ (অর্থাৎ ‘ধনী’, যখন কিছু লোক তাদের অর্থ দিয়ে অন্যদেরকে তাদের জন্য যুদ্ধ করার জন্য ভাড়া করে) শুরু হবে এমন এক ব্যক্তির পায়ের নিচ থেকে যে দাবি করে যে সে আমার (অনুগত বন্ধু) । তবে, সে আমার নয়, কারণ আমার অনুগত বন্ধুরা হলেন তারাই যারা তাকওয়া সম্পন্ন। এরপর, মানুষ এমন এক ব্যক্তির চারপাশে একত্রিত হবে যার সময়কাল হবে অস্থিতিশীল। তারপর, ফিতনাহু আল-দুহাইমা (এর বিশালতার কারণে এটিকে ‘অন্ধকার এবং কালো ফিতনা’ বলা হয়) (শুরু হবে) এবং (এই ফিতনা) এই জাতির কোনও সদস্যকে কঠোরভাবে স্পর্শ না করে ছাড়বে না। যখন মনে করা হবে যে, এর সময় শেষ হয়ে গেছে, তখন তা দীর্ঘায়িত

হবে। ইতিমধ্যে (এই ফিতনার সময়), একজন ব্যক্তি (সকালে) বিশ্বাসী হিসেবে উঠবে এবং (সেই দিনই) রাত পর্যন্ত পৌছুতেই সে কাফের হয়ে যাবে, যতক্ষণ না লোকেরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়; "ঈমানের এমন একটি শিবির যেখানে কোন ভণ্ডামি নেই, এবং এমন একটি মুনাফিকির শিবির যেখানে কোন ঈমান (বিশ্বাস) নেই। যখন এটি ঘটবে, সেদিন অথবা তার পরের দিন দাজ্জালের জন্য অপেক্ষা করো।" (আহমদ, আবু দাউদ এবং আল-হাকিম; মিশকাতুল-মাসাবিহ, খণ্ড ৪, হাদিস নং ৫৪০৩)

ফিতনাহু আল –আহলাস অর্থাৎ গণ পরিত্যাগ ও যুদ্ধের সময় আমাদের সময়ের বহু আগেই চলে গেছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করে হাদিসে উল্লেখিত ফিতনাহু আল –আহলাসের সময়কালটি উমাইয়া খেলাফতের শুরু থেকে উসমানীয় খেলাফতের (অটোম্যান খেলাফতের) পূর্ব পর্যন্ত সময়কাল অর্থাৎ কম-বেশি ৭০০ সাল থেকে ১৪৫০ সাল পর্যন্ত। এ সময়ে মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে খেলাফত নিয়ে প্রচুর যুদ্ধ করেছে যা ফিতনাহের অন্তর্ভুক্ত। তারপর শুরু হবে 'ফিতনাতুস সারা'। এই ফিতনাহ হচ্ছে ধনী লোকেরা বা সম্রাটরা টাকার বিনিময়ে যুদ্ধে জন্য লোক ভাড়া করে। এটা হচ্ছে উসমানীয় বা অটোম্যান খেলাফতের সুলতানদের সময়কাল অর্থাৎ কম-বেশি ১৪৫০ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত। উসমানীয় বা অটোম্যান সুলতানরাই সর্বপ্রথম মুসলিম সৈন্যদের মাসিক বেতন ও ভাতা প্রদান শুরু করেন। ইসলামে নিয়ম হচ্ছে যুদ্ধে বিজয় লাভ হলে মুসলিম সৈন্যরা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদের একটি অংশ পান কিন্তু অটোম্যান সম্রাটরাই সর্ব প্রথম বেতন-ভাতা ভিত্তিক সৈন্য নিয়োগ শুরু করে। এছাড়া অটোম্যান বা উসমানীয় খেলাফতের সুলতানরা বেতন-ভাতা বা অন্য সুযোগ সুবিধা বা চুক্তিভিত্তিক খ্রিষ্টান এবং ভিন্ন ধর্মালম্বি যোদ্ধা নিজেদের পক্ষে যুদ্ধে নিয়োজিত করে। হাদিসে উল্লেখিত 'ফিতনাতুস সারা' যে অটোম্যান সুলতানরা এটা মোটামুটি নিশ্চিত। এই ফিতনাহ শুরু করে সুলতান মাহমুদ-২ বা তার মত কোন অটোম্যান সম্রাট। সুফিজম বা পিরতন্ত্রে বিশ্বাসী হিসেবে অটোম্যানরা নিজেদের নবীর বন্ধু বা আশেক বলে দাবী করলেও আসলে এরা নবীর (সাঃ) বন্ধু ছিল না।

'এরপর, মানুষ এমন এক ব্যক্তির চারপাশে একত্রিত হবে যার সময়কাল হবে অস্থিতিশীল'। আমার মতে, মক্কার শরীফ ও খলিফা হুসেইন বিন আলী আল হাসমিই হচ্ছেন এই ব্যাক্তি যাকে পৃথিবীর সকল মুসলিমরা খলিফা হিসেবে বায়াত দিয়েছিলেন (একমাত্র নজদের রাজা ইবনে সউদ ও তার অনুসারীরা ছাড়া) । কিন্তু খলিফা হুসেইন বিন আলীর শাসনকাল ছিল অস্থিতিশীল যা হাদিস অনুসারে মিলে যাচ্ছে।

তারপর এসেছে, 'ফিতনাহু আল-দুহাইমা'। এটি হচ্ছে মক্কা-মদিনার একটি রাজতান্ত্রিক দেশ সৌদি আরবের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যা গত ১০০ বছর ধরে একটি রাজপরিবার শাসন করছে। এই রাজপরিবারের নাম আল সউদ রাজপরিবার। এরা প্রথমে ব্রিটিশদের সাথে গোলামী করার বন্ধুত্ব করেছে তারপর আমেরিকার সাথে গোলামী করার বন্ধুত্ব করেছে। এদের ফিতনা প্রতিটি মুসলিমের ঈমানের উপর হামলা চালিয়েছে কারণ এরা ওয়াহাবি বা সালাফি বা আহলে হাদিস নামে খেলাফতবিহীন ইসলাম সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আল্লাহ এর রসূল সাঃ যে

বলেছেন, 'ফিতনাহু আল-দুহাইমা' নামের ফিতনা পৃথিবীর সকল মুসলিমকে কঠোরভাবে স্পর্শ না করে ছাড়বে না – বাস্তবে এটাই হয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিম আজ অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার। কাশ্মীর, প্যালেস্টাইন, ইরাক, সিরিয়া, চীন, মায়ানমার, বাংলাদেশ, সৌদি আরব, ইত্যাদি পৃথিবীর সকল অঞ্চলের সকল মুসলিম আজ নিদারুণ ফিতনার মধ্যে নিমজ্জিত। মুসলিমরা আজকে ইসলামের কথা, খেলাফতের কথা প্রকাশ্যে বলতে পর্যন্ত পারছে না। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্রকে অস্বীকার করে ইসলামী সরকার ব্যবস্থা খেলাফতের কথা বললেই তাকে গ্রেফতার করে মিথ্যা মামলা দেয়া হচ্ছে। পৃথিবীর সকল জায়গায় আজকে মুসলিমদের একই অবস্থা। অর্থাৎ 'ফিতনাহু আল-দুহাইমা'র ফিতনা হাদিস অনুসারে পৃথিবীর সকল মুসলিমকেই কঠোরভাবে স্পর্শ করেছে। এমন অবস্থার ভিতরে মানুষ সকালে মুমিন থাকবে কিন্তু একই দিনের রাতের ভিতরেই কাফির হয়ে যাবে। এই অবস্থা চলতে চলতে যখন মুমিন ও মুনাফেকরা দুইটি শিবিরে ভাগ হয়ে যাবে সেইদিন বা তার পরের দিন দাজ্জাল আসবে। এই দাজ্জালটি এখনো আবির্ভূত হয়েছে কি না – তা বুঝতে পারছি না। হয়তো আবির্ভূত হয়েছে বা আবির্ভূত হবে। (দাজ্জালের মেয়াদকাল জানতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পদ ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর পদ - দুটিই দাজ্জাল। এদের মধ্যে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর পদটি হচ্ছে বর্তমানকালের সবচেয়ে নিকৃষ্ট দাজ্জাল)

ইবনে মাজাহ, ইবনে খুজাইমাহ এবং আদ-যিয়া' কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিস, যা আবু উমামা থেকে বর্ণিত, বর্ণনা করে যে,আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"দাজ্জালের আবির্ভাবের আগে তিনটি কঠিন বছর আসবে। সেই সময় মানুষ এক মহা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়বে। প্রথম বছরে, আল্লাহ আকাশকে তার বৃষ্টির এক তৃতীয়াংশ এবং পৃথিবীকে তার ফসলের এক তৃতীয়াংশ বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দেবেন। দ্বিতীয় বছরে, আল্লাহ আকাশকে তার বৃষ্টির দুই তৃতীয়াংশ এবং পৃথিবীকে তার ফসলের দুই তৃতীয়াংশ বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দেবেন। তৃতীয় বছরে, আল্লাহ আকাশকে তার সমস্ত বৃষ্টি বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দেবেন, এবং এক ফোঁটাও বৃষ্টি বর্ষণ করবে না। তিনি পৃথিবীকে তার সমস্ত ফসল বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দেবেন, এবং কোন উদ্ভিদ জন্মাবে না। সমস্ত খুরওয়ালা প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যা চান তা ছাড়া।"

তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "সেই সময় মানুষকে কী টিকিয়ে রাখবে?" তিনি বললেন, "তাহলিল, তাকবীর এবং তাহমিদ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং আলহামদুলিল্লাহ বলা) । এটি তাদের ঠিক যেমন খাবার টিকিয়ে রাখে।" (সহীহ আল-জামি' আস-সাগীর, নং ৭৮৭৫)

ইতিহাস পর্যালোচনা করে মনে হচ্ছে, এই দাজ্জালটি এখনো আবির্ভূত হয়নি। হয়তো এটি সর্বশেষ দাজ্জাল হতে পারে।

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"মদীনা তার উৎকর্ষের সময় জনশূন্য হয়ে যাবে! তখন, এটিতে পাখি এবং পশুরা বাস করবে।" আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৩৬

"তারা (অর্থাৎ মুসলিমরা) মদিনার উৎকর্ষের সময় মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। কেবল বন্য পশু এবং পাখিরা সেখানে ঘুরে বেড়াবে। (কিয়ামতের শুরুতে) শেষ ব্যক্তিরা হবে মুযাইনা (গোত্রের) দুই রাখাল যারা মদীনার দিকে যেতে থাকবে। তারা তাদের ভেড়া চরাবে, এবং (যখন তারা সেখানে পৌঁছাবে) তারা এটিকে নির্জন দেখতে পাবে। যখন তারা 'সানিয়্যাতুল ওয়াদা'তে পৌঁছাবে তখন তারা তাদের কপালের উপর লুটিয়ে পড়বে (কারণ তখন কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে) ।" (আহমদ, আল-বুখারী এবং মুসলিম। আস-সিলসিলাহ আস-সহীহা, খণ্ড ২, নং ৬৮৩)

মদিনাতে এক সময় কোন মানুষ বসবাস করবে না। কেবল বন্য পশু ও পাখিরা সেখানে থাকবে। কিয়ামতের একদম পূর্ব মুহূর্তে মদিনার এই অবস্থা হবে যা আমরা আস-সিলসিলাহ আস-সহীহা, খণ্ড ২ এর ৬৮৩ নাম্বার হাদিস থেকে জানতে পারছি। মদিনার এই অবস্থা হবার সাথে দাজ্জালের আবির্ভূত হবার সময়কালের কোন সম্পর্ক নেই। দাজ্জাল বিষয়ে উপরের ২ টি হাদিসে কিছু বলাও হয়নি।

কিন্তু অনেকে মদিনার গুরুত্ব কমে যাবার সাথে দাজ্জালের আবির্ভাবের সম্পর্ক বিষয়ক একটি হাদিসের সাথে উপরের দুইটি হাদিসকে মিলিয়ে ফেলেন। মদিনায় পশু-পাখি বসবাস করবে কিয়ামতের একদম পূর্ব মুহূর্তে আর 'জেরুজালেমের সমৃদ্ধ অবস্থা তখনই হবে যখন ইয়াসরিবের (মদিনার) গুরুত্ব কমে যাবে' – এটি অনেক আগেই হয়ে গেছে এবং দাজ্জালও আবির্ভূত হয়ে গেছে।

মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন: জেরুজালেমের সমৃদ্ধ অবস্থা তখনই হবে যখন ইয়াসরিবের (মদিনার) গুরুত্ব কমে যাবে, ইয়াসরিবের (মদিনার) গুরুত্ব কমে যাওয়ার অবস্থা তখনই হবে যখন বড় যুদ্ধ আসবে, বড় যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব হবে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সময় এবং যখন কনস্টান্টিনোপল বিজয় হবে তখন দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। তিনি তাঁর উরুতে অথবা কাঁধে হাত দিয়ে আঘাত করে বললেন: এটা ততটাই সত্য যতটা তুমি এখানে আছো অথবা যতটা তুমি বসে আছো (অর্থাৎ মু'আয ইবনে জাবাল) । (সুনান আবি দাউদঃ ৪২৯৪)

এই হাদিসটি ইতিপূর্বে এই বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের জন্য কিছু কথা

আপনারা কি জর্জ গ্যালোওয়ের (George Galloway) নাম শুনেছেন? তিনি একজন সাবেক ব্রিটিশ এমপি (সংসদ সদস্য)। তিনি ১৯৮৭ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত এবং ২০১২ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের সংসদ সদস্য ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডের বৃহৎ একটি রাজনৈতিক দল লেবার পার্টির সদস্য ছিলেন। কিন্তু আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের ইরাকে হামলার বিরোধিতা করায় তাকে লেবার পার্টি বহিস্কার করে। জর্জ গ্যালোওয়ে বিগত ২ বছরে ইসরায়েলের গাজায় হামলার বিরুদ্ধে যত বক্তব্য দিয়েছেন -যে কঠিন ভাষায় তিনি ইসরায়েল এবং বিশ্ব নেতাদের সমালোচনা করেছেন – যে ভাবে তিনি প্রতিদিন প্রতিবাদ করেই চলেছেন তা বাংলাদেশের সকল আলেম সমাজ

মিলিয়েও এতটুকু প্রতিবাদ করা হয়নি। জর্জ গ্যালোওয়েকে ব্রিটিশ মিডিয়া বলে যে - সে মুসলিম হয়ে গেছে কিন্তু জর্জ গ্যালোওয়ে বার বার-ই বলছেন যে, তিনি একজন রোমান ক্যাথোলিক খ্রিষ্টান।

জর্জ গ্যালোওয়ের অফিসিয়াল ইউটিউব পেজঃ https://www.youtube.com/@GeorgeGallowayOfficial

বাংলাদেশে দাজ্জালের ধোঁকায় বিভ্রান্ত আলেমরা ব্যস্ত আছেন - নারীর পোশাক নিয়ে গবেষণাতে, কোন দু'আ করলে রিজিক বাড়বে, স্ত্রীর সাথে সহবাসের নিয়ম কি? কোন কোন গুণ দেখে একটি মেয়েকে বিয়ে করতে হবে? সম্মিলিত মুনাজাত জায়েজ নাকি নাজায়েজ? সালাতে (নামাযে) হাত বুকে বাধব নাকি নাভির নিচে বাধব, বিপদ দূর করার দু'আ কি, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। একজন আলেমের প্রধান গুণ হচ্ছে একজন আলেম বুঝতে পারেন কখন, কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ; কখন, কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে হবে? ২ বছর ধরে প্যালেস্টাইনে ইসরায়েল আমেরিকার সহযোগিতায় মসুলিম শিশুদের গণহত্যা করছে, নারীদের ধর্ষণ করছে, দুর্ভিক্ষ তৈরি করে মুসলিম শিশুদের অনাহারে রেখে তিলে তিলে হত্যা করছে। দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে মুসলিম শিশুরা মারা যাচ্ছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের তথাকথিত আলেমদের কতটুকু বক্তব্য আছে? কতটুকু প্রতিবাদ তারা করেছেন? মানুষকে এই বিষয়ে কতটুকু সজাগ তারা করেছেন? এ বিষয়ে তারা কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন? একজন তথাকথিত আলেম ওয়াজের মাঝে ২-৪ টা ইংলিশে কথা বলে বিখ্যাত হয়ে গেছেন; আরেকজন বাংলাদেশের তরুণদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করে জীবিকার ব্যবস্থা করছেন , মসজিদ তৈরি করছেন, কোরবানির ঈদে গরু কিনে গরীব মানুষদের মাংস দেন --- কিন্তু যখন মুসলিমদের হত্যা করা হচ্ছে, অনাহারে রেখে মেরে ফেলা হচ্ছে তখন – প্যালেস্টাইনের, রাখাইনের, ইয়েমেনের, কাশ্মীরের, ইরানের, ইত্যাদি অঞ্চলের মুসলিমদের রক্ষায় কাজ না করে, কথা না বলে --- এই সকল কাজ করলে কি নবীর (সাঃ) সুন্নত অনুসরণ করা হয়?

আপনারা কি জানেন ইউরোপিয়ান ইউনিউনে একটি দেশ আছে যার নাম আয়ারল্যান্ড। এই দেশটি সমগ্র ইউরোপে একাই প্যালেস্টাইনের পক্ষে কথা বলছে। আয়ারল্যান্ড একা প্যালেস্টাইনের পক্ষে যত বক্তব্য দিয়েছে সমগ্র মুসলিম দেশগুলো মিলেও এতটুকু বক্তব্য সরকারীভাবে প্যালেস্টাইনের পক্ষে দেয়নি।

বাংলাদেশের তথা বিশ্বের অনেক তথাকথিত আলেম ইসরায়েলের গাজায় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছেন, লং মার্চ করেছেন। এতে কি লাভ হয়েছে? কোন লাভ হয়নি। ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় বন্ধু ও সহযোগী হচ্ছে আমেরিকা, আমেরিকার টাকা এবং অস্ত্র ছাড়া ইসরায়েল অচল - আপনি কি আমেরিকার পণ্য বয়কটের ডাক দিতে পারবেন? তাহলে আপনাকে Microsoft (Windows, MS Office, etc) এর সকল পণ্য বয়কট করতে হবে । এতটুকুই তো আপনি করতে পারবেন না। facebook এর মালিক হচ্ছে মার্ক জাকারবারগ; জাকারবারগ একজন কট্টর ইসরায়েলের সমর্থক; সে একজন মুসলিম বিদ্বেষী ইহুদী। ফেসবুক রাখাইনে মুসলিম রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা তথ্য ছড়াতে সহযোগিতা করেছে যার ফলে মায়ানমারের

বৌদ্ধ চরমপন্থিরা মুসলিম রোহিঙ্গাদের উপর গণহত্যা চালাতে সুবিধা পেয়েছে। বিষয়টা এতটাই গুরুতর ছিল যে, মার্কিন সিনেটে এটা নিয়ে মার্ক জাকারবারগকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ফেসবুক গাজা গণহত্যার ভিডিও, ছবি শেয়ারিং এ বিভিন্ন কমিনিটি পলিসির কথা বলে বাধা দেয় – আসল কথা হচ্ছে মার্ক জাকারবারগ চায় না যে, গাজা গণহত্যার কথা মানুষ জানুক – তাহলে মানুষ যে ইসরায়েলের অপকর্মের কথা জেনে যাবে এবং প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের পক্ষে চলে যাবে। এখন আপনি কি ফেসবুক বয়কটের ডাক দিবেন? গুগল বয়কটের ডাক দিবেন? ইউটিউব বয়কটের ডাক দিবেন? মাইক্রোসফট গাজা গণহত্যায় সরাসরি জড়িত। মাইক্রোসফট বিভিন্ন তথ্য- উপাত্ত ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর সাথে নিয়মিত শেয়ার করে ইসরায়েলী বাহিনীকে গাজায় আগ্রাসনে সহযোগিতা করেছে এবং এখনো করছে - আপনি কি মাইক্রোসফটের সকল পণ্য, যেমনঃ Windows operating system, MS Office (MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power point,etc) বয়কটের ডাক দিবেন? আপনি বয়কটের ডাক দিতে পারেন কিন্তু কেউই আপনার ডাকে সাড়া দিবে না।

অর্থনৈতিক অবরোধ দেয়া বা পণ্য বয়কটের ডাক দেয়া নবী (সাঃ) এর সুন্নাহ নয়। এটা হচ্ছে কাফিরদের সুন্নাহ। মক্কায় কাফিররা মুহাম্মাদ সাঃ এবং সাহাবীদের 'শাবে আবু তালিব' নামের একটি উপত্যকায় বন্দি করে তাদের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ দিয়েছিল; তাদের সাথে কারো কোনো প্রকার লেন-দেন করা নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমান সমসাময়িক সময়ে আমেরিকা এবং ন্যাটো (NATO) ইরাক, ইরান, আফগানিস্থানের উপর একই রকম অর্থনৈতিক অবরোধ দিয়েছে। দাজ্জালের অনুসারী তথাকথিত আলেমরা তাদের মূর্খতার কারণে কাফিরদের রীতি-নীতি মুসলিমদের শিক্ষা দিচ্ছে এবং এটাকে ইসলামের নিয়ম বলে প্রতিষ্ঠা করছে। এখন এই সকল তথাকথিত আলেমরা বলবেন যে, "মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ"। আমরা আলেম, আমরা আরবি বুঝি, আমরা মাদ্রাসায় পড়েছি, ইত্যাদি।" উত্তরে আমি তাদের বলতে চাই, "আপনারা আলেম নন, সুতরাং আপনাদের নবীর ওয়ারিশ হবার প্রশ্নই উঠে না"। উক্ত হাদিসটি বলে তথাকথিত আলেমরা নিজেদেরকে নবীর ওয়ারিশ বলে দাবী করে এবং এভাবে তারা ইসলামকে নিজেদের বাপ-দাদার সম্পত্তি বানিয়েছে। তারা 'আলেম' এই কথা আল্লাহ বলেন নি, মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেন নি - তাই তাদেরকে আলেম হিসাবে স্বীকার করি না। মাদ্রাসায় পড়লে, আরাবী ভাষা জানলে আলেম হয় – এই কথা কোরআন, হাদিসে কোথাও বলা নেই। তথাকথিত এই আলেমরা সত্য অন্বেষণকারী নন, তারা অর্থ (টাকা) অন্বেষণকারী। যখন মক্কায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল না তখন মুহাম্মাদ (সাঃ) ও সাহাবীরা কি আরাম -আয়েশে থাকতে পেরেছিলেন? পারেন নি। মক্কার মত এখন বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই কিন্তু এখনকার তথাকথিত আলেমদের দেখেন – তাদের ফ্ল্যাট, বাড়ি, গাড়ি, ইত্যাদি সব আছে। তারা আরামে থাকেন, ওয়াজ মাহফিল করেন আর টাকা উপার্জন করেন। বেশিরভাগ আলেম-ই তো শাপলা চত্বরে মাদ্রাসা ছাত্র হত্যাকারী শেখ হাসিনার থেকে দাওরা পাসকে মাস্টার্সের সমমান দেয়া নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিল। তারা হাসিনাকে সংবর্ধনাও দিয়েছিল। এখন হাসিনার পতনের পর তারা বলছে যে, তাদেরকে নাকি জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সংবর্ধনা দিতে ! নিজের ভাইদের হত্যাকারী হাসিনার থেকে

মাস্টার্স পাসের মর্যাদা নেয়ার কারণেই হয়তো আল্লাহ এদেরকে জেলে ঢুকিয়ে ছিলেন, শাস্তি দিয়েছিলেন। মানুষের সামনে ভণ্ড আলেম সমাজের মুখোশ আল্লাহ এই ঘটনার মাধ্যমে উম্মোচন করে দিয়েছেন যে, তারা শাপলা চত্বরে মাদ্রাসা ছাত্র হত্যাকারী হাসিনার থেকেও সুযোগ -সুবিধা (মাস্টার্স পাস সমমান) পেতে চায় এবং তা পেলে খুশি হয়। এরপর – ও আমরা যদি এই সকল মূর্খ ও ভণ্ড আলেমদের কথা শুনি ও মানি তাহলে নিজেদের জাহান্নামে যাবার জন্য আমরাই দায়ী থাকব। আমার জানা মতে, বাংলাদেশে কোনো আলেম নেই। যারা নিজেদের আলেম বলে পরিচয় দেয় -তারা বেশিরভাগ ভণ্ড আর বাকিরা মূর্খ। ইসলাম শিখবেন কার কাছ থেকে?

আপনি যদি কখনো দেখেন যে, একজন ব্যাক্তি মসজিদে ইমামতি করে বিনিময়ে টাকা বা কোন সুযোগ - সুবিধা নেয় না, ওয়াজ মাহফিল করে টাকা (হাদিয়া) নেয় না, ইসলামের কথা বলে টাকা (হাদিয়া) নেয় না, কোনো সংগঠনের সাথে জড়িত নয়; নিজেকে আলেম, মাওলানা, মুফতি, মুহাদ্দিস বলে দাবী বা প্রচার করে না, কোরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময়ে টাকা (হাদিয়া) নেয় না; গণতন্ত্রকে, পিরতন্ত্রকে, রাজতন্ত্রকে শিরক বলে প্রচার করে - তাহলে তার কাছ থেকে কোরআন, হাদিস শিক্ষা করবেন। ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে সাদাকাত – এই ধরণের বই শিরক, কুফরে পরিপূর্ণ। আপনি শুধু কোরআন, হাদিস শিক্ষা করবেন এবং কোরআন, হাদিস নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন, অন্য কোনো বই থেকে ইসলাম শিক্ষা করবেন না। তারপর আল্লাহ এর কাছে সঠিক পথ চাইবেন, তিনি-ই তো একমাত্র সঠিক পথ দেখানোর মালিক।

তাহলে, ইসরায়েলের ব্যাপারে আমরা কি করবো? আমাদেরকে সমস্যার মূলে বা শিকড়ে যেতে হবে। সমস্যা চিহ্নিত করতে পারলেই সমস্যা সমাধান সম্ভব।

আমাদেরকে দেখতে হবে, দাজ্জাল রাষ্ট্র ইসরায়েলের সহযোগী কে কে? তাদের মুখোশ উম্মোচন করতে হবে। দাজ্জাল ইসরায়েলের মুসলিম সহযোগীদের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলঃ

মিশরের সরকারঃ গত প্রায় ১ যুগ ধরে মিশর ইসরায়েলকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। বর্তমানে যে সকল প্যালেস্টাইনের মুসলিমরা মিশরে যেতে চাচ্ছে তাদের থেকে প্রতিদিন গড়ে ২ মিলিয়ন ডলার আয় করছে মিশরের একটি প্রতিষ্ঠান। গাজার একমাত্র স্থল সীমান্ত আছে মিশরের সাথে কিন্তু মিশর একজন গাজার মুসলিমকেও মিশরে ঢুকতে দিচ্ছে না। ক্ষুধা, অনাহারে শিশুরা মারা গেলেও মিশর তার বর্ডার প্যালেস্টাইনের তথা গাজার মুসলিমদের জন্য খুলে দিচ্ছে না।

সৌদি আরবের সরকারঃ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মেয়ের জামাই জেরাড ক্রসনারের (Jared Kushner) একটি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান আছে যার নাম এফিনিটি পার্টনার (Affinity Partners)। জেরাড ক্রসনার তার এই প্রতিষ্ঠানটিকে উপসাগরীয় (আরব) অঞ্চল থেকে অর্থ ইসরাইলে বিনিয়োগের জন্য একটি দরজা বলে

অভিহিত করেছেন। সৌদি সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে ২ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে, মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং কাতার। এই প্রতিষ্ঠানটি ইসরাইলের জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান "স্ল মো" গ্রুপের কিছু শেয়ার কিনে নিয়েছে এবং অর্থ বিনিয়োগ করেছে। 'স্ল মো' গ্রুপ-ই ইসরাইলী বাহিনীকে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করছে যা গাজায় ইসরাইল ব্যাবহার করছে। বুঝা গেলো, সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকারের টাকায় নির্মিত অস্ত্র দিয়েই গাজায় মুসলিমদের গণহত্যা করছে ইসরাইল। সৌদি আরবের অর্থ দিয়েই এফিনিটি পার্টনার (Affinity Partners) ইসরাইলের সামরিক খাতে বিনিয়োগ করছে এবং ড্রোন নির্মাণ করছে যা গাজায় মুসলিম হত্যায় বেবহ্রিত হচ্ছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকারঃ ২০২১ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রীয় সমরাস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এজ গ্রুপ (EDGE Group) এবং ইসরাইলের এরোস্পেস ইন্ডাস্ট্রির (IAI) মধ্যে যৌথভাবে ড্রোন নির্মাণের চুক্তি হয়েছে। শুধু তাই নয়; সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রীয় সমরাস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এজ গ্রুপ (EDGE Group) ইসরাইলের ডিফেন্স ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান থার্ড আই (Third Eye) এর ৩০% শেয়ারের মালিক। থার্ড আই (Third Eye) ইসরাইলের বাহিনীতে স্থল অভিযানে ভুমিতে থাকা সৈন্যদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে। ইসরাইলী শমরাস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এলবিট সিস্টেম (Elbit System) সংযুক্ত আরব আমিরাতে তাদের শাখা খুলেছে যেখানে শমরাস্ত্র নির্মাণ করা হচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান মুবাদালা (Mubadala) টামার গ্যাস ফিল্ডের (Tamar Gas field) ১১% এর মালিক যা ইসরাইল দখলকৃত প্যালেস্টাইনের ভূখণ্ডে পরিচালনা করে। এত দিন জানতাম যে, ইসরাইল প্যালেস্টাইনের ভূমি দখল করে গ্যাস নিয়ে যাচ্ছে এখন দেখি সংযুক্ত আরব আমিরাত-ও একই কাজে জড়িত। টামার গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস ছাড়া ইসরাইল গাজায় হামলা চালাতেই পারত না কারণ সামরিক যানবাহন চালাতে ইসরাইলের গ্যাস দরকার হয়। বুঝা গেলো, সংযুক্ত আরব আমিরাত গাজা হামলায় ইসরাইলের সাথে সরাসরি সহযোগী ও জড়িত।

কাতারের সরকারঃ গাজা গণহত্যায় কাতারের আল -উদাইদ আমেরিকান মিলিটারি বেইজ থেকে অস্ত্র - ইসরাইলে সরবরাহ করা হয়েছে। কুয়েতের আমেরিকান মিলিটারি বেইজ থেকেও অস্ত্র ইসরাইলে সরবরাহ করা হয়েছে যা গাজার গণহত্যায় বেবহ্রিত হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে কাতার, কুয়েতের "মুসলিম সরকার" আমেরিকাকে কেন তাদের ভূমি ব্যাবহার করে অস্ত্র ইসরাইলে পাঠাতে দিলো যেখানে ইসরাইল এই অস্ত্র ব্যাবহার করে গাজায় মুসলিমদের গণহত্যা করছে ?

তুরস্কের সরকারঃ তুরস্ক দীর্ঘদিন ধরেই তুরস্কের কনিয়াতে ইসরাইলী বিমান বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে যাতে তারা পাহাড় ঘেরা এলাকায় টার্গেট প্র্যাকটিস করতে পারে এবং পরবর্তীতে প্রশিক্ষিত ইসরাইলী পাইলটরা যাতে প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের বাড়ি ঘরে নির্ভুলভাবে হামলা চালাতে পারে বিনিময়ে তুরস্কের পাইলটদের ইসরাইল দখলক্রীত প্যালেস্টাইনের নেভাটিম এয়ার বেইজে প্রশিক্ষণ নিতে দিয়েছে। মুসলিম দেশ আজারবাইজান ও

তুরস্কের মধ্য দিয়ে তেলের পাইপলাইন ইসরাইলে তেল সরবরাহ করে যা ইসরাইলের চাহিদার ৪০% মেটায়। গাজার গণহত্যার সময় তুরস্ক বা আজারবাইজান চাইলেই এই তেলের পাইলাইন বন্ধ করে দিতে পারত কিন্তু তারা তা করেনি।

বাংলাদেশ, পাকিস্থান, ইন্দোনেশিয়ার সরকারঃ তিনটি দেশের সরকার-ই ইসরাইলী হ্যাকিং সফটওয়্যার পেগাসাস বা সেলিব্রেট ব্যাবহার করে নিজ দেশের লোকদের উপর গোয়েন্দাগিরি করে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই সফটওয়্যারগুলো ইসরাইল থেকে বাংলাদেশ, পাকিস্থান, ইন্দোনেশিয়া ক্রয় করেছে।

বাংলাদেশের মুসলিমরা প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের জন্য মায়াকান্না করে অথচ তাদের দেশে যখন মায়ানমার থেকে প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের মতই নির্যাতিত হয়ে মুসলিম রোহিঙ্গারা আসে তখন তারা মুসলিম রোহিঙ্গাদের নিজেদের ভাই হিসেবে গ্রহন না করে শরণার্থী শিবিরে রাখে। সেখানে মুসলিম রোহিঙ্গারা বস্তির জীবনের চেয়েও খারাপ অবস্থায় জীবন যাপন করে। বাংলার তথাকথিত আলেমরা কখনো মুসলিম রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে সম্মানের সাথে বসবাসের এবং আমাদের ভাইয়ের মতই - এই দেশের-ই অন্য জনসাধারণের মত মুসলিম রোহিঙ্গাদের গ্রহন করার দাবী বা আন্দোলনের ডাক দেয়নি।

প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের রক্ষা করতে হলে আমাদেরকে উপরের আলোচনার মত আলোচনা আরবিতে, ইংলিশে, বাংলায়, উর্দুতে, টার্কিশ ভাষায় ফেসবুক ও ইউটিউবে প্রচার করতে হবে যাতে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, পাকিস্থান, বাংলাদেশ, তুরস্ক, ইত্যাদি মুসলিম ভূখণ্ডের মুসলিমরা জাগ্রত হয় এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) যা করতে বলেছেন - তা করে। আমরা আমাদের সরকারকে বলব এবং দাবী করব - প্রয়োজনে আন্দোলন করব যেন মুসলিম রোহিঙ্গাদের এবং প্যালেস্টাইনের গাজার মুসলিমদের বাংলাদেশে আমাদের ভাই হিসেবে, আমাদের মতই সমান অধিকার দিয়ে বসবাসের সুযোগ দেয়া হয়। মিশর প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের মিশরে ঢুকতে দিচ্ছে না কিন্তু বাংলাদেশও তো প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত নয়। বাংলাদেশ সরকার চাইলে জাতিসংঘ প্যালেস্টাইনের গাজার মুসলিমদের বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে - এটা নিশ্চিত। বাংলাদেশের তথাকথিত আলেম সমাজ যদি ইসলাম বুঝত এবং মানত তাহলে তারা এই ধরণের দাবী করত এবং এই দাবী আদায়ে কর্মসূচি দিত। এতে আমরা অন্তত আমাদের মুসলিম ভাই, বোন ও শিশুদের জীবন রক্ষা করতে পারব। গাজায় মুসলিমদের মোট সংখ্যা মাত্র ১২ লাখ। ১৮ কোটি লোকের দেশে ১২ লাখ নতুন লোক আসলে তেমন কোনো সমস্যা হবার কথা নয়।

ইরানের ভুমিকাঃ ইরান সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে শিয়াদের সম্পর্কে জানতে হবে। শিয়াদের উৎপত্তি কি ভাবে? সুন্নিদের উৎপত্তি কি ভাবে? এই বিষয়গুলো না জানলে ইরানকে বুঝা যাবে না।

৬৫৬ সাল (উটের যুদ্ধ) থেকে ৬৫৭ সালে (সিফফিনের যুদ্ধ) মুসলিম বিশ্বে দুটি বড় যুদ্ধ হয়। এই সময়ের ভিতরে যারা আলী রাঃ এর পক্ষ নিয়েছিলেন তাদেরকে বলা হত 'শিয়া'ত আলী' (Shi'at Ali) অর্থাৎ 'আলীর দল' (Party of Ali)। আলী (রাঃ) এর মৃত্যুর পর মুয়াবিয়া (রাঃ) এর থেকে ইসলামে প্রথম রাজতান্ত্রিক খিলাফতের সূচনা হয়। আলীর দলে যারা ছিলেন – যাদেরকে 'শিয়া'ত আলী' বলে অভিহিত করা হত - তারাই পরবর্তীতে হাসান (রাঃ) এবং হোসাইনকে (রাঃ) সমর্থন করতে থাকেন। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাঃ)। আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের (রাঃ) পিতা হচ্ছেন জুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) এবং মাতা হচ্ছেন আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)। আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হচ্ছেন আবু বকরের (রাঃ) সেই মেয়ে যিনি হিজরতের সময় নবী (সাঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) এর পান করার জন্য বকরি চড়িয়ে পাহাড়ে নবী সাঃ এবং আবু বকর রাঃ এর কাছে নিয়ে যেতেন।

অনেকেই মনে করেন যে, হোসাইন রাঃ এর শাহদাতের পর ইয়াজিদ তথা উমাইয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে আর কোনো শক্ত প্রতিরোধ মুসলিমরা গড়ে তুলেনি। কিন্তু ব্যাপারটা এমন নয়। হোসাইন (রাঃ) এর শাহাদাতের পরও আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) ইয়াজিদকে খলিফা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং খলিফা নির্বাচনের জন্য ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী শুরার ডাক দেন যাতে শুরার মাধ্যমে নতুন খলিফা নিযুক্ত করা যায়।

এদিকে ইয়াজিদকে যেহেতু মদিনার মুসলিমরা খলিফা হিসেবে মানতে অস্বীকার করেন তাই ইয়াজিদ মদিনার মুসলিমদের দমন করতে তার সেনাপতি 'মুসলিম ইবনে উকবা'র (Muslim ibn Uqba) নেতৃত্বে একটি বাহিনী মদিনার উদ্দেশ্যে প্রেরন করেন। মদিনার মুসলিমদের সাথে ইয়াজিদের প্রেরিত বাহিনীর যুদ্ধ হয় – এ যুদ্ধটিকে ইতিহাসে হাররার যুদ্ধ (Battle of al-Harra) নামে অভিহিত করা হয়। এই যুদ্ধে মদিনার বাহিনী - যারা সঠিক পথে ছিল - তারা পরাজিত হয়। বিজয়ী হয়ে ইয়াজিদের বাহিনী তিনদিন ধরে মদিনার মুসলিমদের উপর ব্যাপক ধ্বংস, নির্যাতন করে বলে অনেকে বর্ণনা করেছেন। ৬৮৩ সালের হাররার যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে উক্ত ইয়াজিদের বাহিনী মক্কায় আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে রাঃ দমন করার জন্য মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় কিন্তু পথিমধ্যে তাদের সেনাপতি মুসলিম ইবনে উকবার মৃত্যু হয়। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে - হাররার যুদ্ধেই ইবনে সাইদকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, ইবনে সাইদকেই ইবনে ওমর (রাঃ) এবং জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) দাজ্জাল বলে অভিহিত করেছেন।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত: "আমরা হাররার যুদ্ধে ইবনে সাইদের শেষ দেখেছি"। (সুনানে আবু দাউদ ৪৩৩২)

ইয়াজিদের মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) প্রকাশ্যে মক্কা - মদিনা ভিত্তিক একটি খিলাফতের ঘোষণা দেন এবং নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন (কিছু সূত্র মতে, ৬৮০ সালে হোসাইন রাঃ এর শাহাদাতের পরই আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) গোপনে মক্কা - মদিনা ভিত্তিক একটি খিলাফতের ডাক দেন এবং গোপনে

বায়াত নিতে থাকেন)। মক্কা, মদিনার প্রায় সকল মুসলিম ইয়াজিদকে এবং তার পরের অন্তত ৩-৪ জন উমাইয়া খলিফাকে অস্বীকার করেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে (রাঃ) তারা খলিফা হিসেবে মানতেন। তবে বনু হাশিম ও আলী রাঃ এর অনেক বংশধর তাকে খলিফা হিসেবে মানতে নারাজ হন। কিছু সুত্রমতে, বনু হাশিমসহ আলী রাঃ এর বংশধররা আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে (রাঃ) খলিফা হিসেবে মানেন নি আবার উমাইয়া খিলাফতের ইয়াজিদকেও খলিফা হিসেবে মানেন নি।

৬৮০ সালে হোসাইন (রাঃ) এর শাহদাতের পর মুখতার আল সাকাফি (Mukhtar al-Thaqafi) আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) এর সাথে যৌথভাবে উমাইয়া খিলাফত তথা ইয়াজিদের বিরোধিতা করলেও কয়েক বছর পর মুখতার আল সাকাফি আলীর (রাঃ) ছেলে মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়াকে (Muḥammad ibn al-Ḥanafiyya) ইমাম হিসেবে ঘোষণা করেন। ৬৮৬ সালে মুখতার আল সাকাফি কুফা অঞ্চলটি আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের রাঃ নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছিলেন।

৬৯২ সালে উমাইয়া খলিফা আবদ আল মালিকের নির্দেশে তার সেনাপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার বাহিনী নিয়ে মক্কা অবরোধ করেন। প্রায় ৬ মাস অবরোধ চলে। নিজ বাহিনীর বেশিরভাগ লোক আত্মসমর্পণ করলেও, মাতা আসমা বিনতে আবু বকরের পরামর্শে, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) আত্মসমর্পণ না করে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। তারপর সমগ্র আরব অঞ্চল ধীরে ধীরে উমাইয়াদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

এখন চিন্তা করে দেখুন তো, বর্তমানে কারা ইয়াজিদকে মুসলিমদের শাসক বলে মানে? কারা বলে যে - হোসাইন রাঃ এর হত্যায় ইয়াজিদের তেমন কোনো ভূমিকা ছিল এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না? সালাফি বা আহলে হাদিস গ্রুপের লোকেরা। বর্তমানে তাদের সাথে অনেক কওমি আলেমও যুক্ত হয়েছে যারা ইয়াজিদকে নির্দোষ প্রমাণে ব্যস্ত। যদিও দাজ্জালের অনুসারী এই সালাফি বা আহলে হাদিসরা জানে না যে ইতিহাস কখনো লুকানো যায় না। মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান কুফার গভর্নর হিসেবে নু'মান ইবনে বশিরকে (রাঃ) (Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd al-Ansari) নিযুক্ত করেছিলেন। নু'মান ইবনে বশির ছিলেন একজন সাহাবী। উমাইয়াদের পক্ষে থাকলেও তিনি কুফায় হোসাইনের (রাঃ) সমর্থকদের প্রতি নমনীয় ছিলেন। ৬৮০ সালে যখন মুয়াবিয়া মারা যায় তখন ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া লক্ষ্য করে যে, মুসলিম ইবনে আকিলের নেতৃত্বে হোসাইন রাঃ এর সমর্থকরা কুফায় সংগঠিত হচ্ছে কিন্তু কুফার গভর্নর নু'মান ইবনে বশির (রাঃ) কুফায় হুসাইনের (রাঃ) সমর্থকদের কঠোর হাতে দমন করছেন না। তাই, ইয়াজিদ কুফার গভর্নর হিসেবে নু'মান ইবনে বশির (রাঃ) কে পরিবর্তন করে চরম নিষ্ঠুর, কঠোর এবং ইয়াজিদের প্রতি আরও বেশি বিশ্বস্ত ওবায়েদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে নিযুক্ত করে। ওবায়েদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের বাহিনীর হাতেই কারবালার ঘটনার ঘটে যাতে হোসাইন (রাঃ) সহ আল্লাহ এর রসূলের সাঃ অনেক আত্মীয় ও বংশধর শহীদ হন। যে সকল তথাকথিত আলেমরা বলে যে, ইমাম হোসাইনের হত্যায় ইয়াজিদের কোনো দোষ পাওয়া যায় না - তাদের জিজ্ঞেস করুন – কে কুফার গভর্নর হিসেবে নু'মান ইবনে বশিরকে (রাঃ)

পরিবর্তন করে চরম নিষ্ঠুর, কঠোর এবং উমাইয়াদের প্রতি আরও বেশি বিশ্বস্ত ওবায়েদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে নিযুক্ত করেছিল ? ইয়াজিদ করেছিল। তারপরও তারা ইয়াজিদের কোনো দোষ খুঁজে পান না। যারা ইয়াজিদের তেমন কোনো দোষ খুঁজে পান না - তাদের দলে বাংলাদেশের শায়েখ আহমদুল্লাহ, আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাকের নাম উল্লেখযোগ্য। তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন তারা ইয়াজিদকে খলিফা হিসেবে মানেন কি না? তারা দোষ খুঁজে পান না কারণ তারা উমাইয়া খিলাফতে বিশ্বাস করেন। এটা হচ্ছে সুন্নিদের খেলাফতের সিলসিলা। আপনি যদি সেই সময়ে থাকতেন তাহলে আপনি কি ইয়াজিদকে খলিফা বলে মানতেন? মুয়াবিয়া-২ কে খলিফা বলে মানতেন? মারওয়ান-১ কে খলিফা বলে মানতেন? আবদ আল মালিককে খলিফা বলে মানতেন ? যতদিন (৬৮০-৬৯২ সাল) আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) মক্কা-মদিনায় খলিফা হিসেবে ছিলেন ততদিন একজন মুসলিম কিভাবে উমাইয়া খেলাফতের খলিফাদের খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারে ? ইয়াজিদের সময়কাল থেকে অর্থাৎ প্রায় ৬৮০ সাল থেকে ৬৯২ সালে উমাইয়া খলিফা আবদ আল মালিকের বাহিনীর হাতে নিহত হবার আগ পর্যন্ত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাঃ মক্কা-মদিনা ভিত্তিক একটি খেলাফতের খলিফা ছিলেন। আপনি সেই সময়ে থাকলে কাকে খলিফা বলে মানতেন? উমাইয়া খেলাফতের খলিফাদের নাকি আবুদল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে (রাঃ) ? বনু হাশিম ও আলী রাঃ এর বংশধররা এই সকল উমাইয়া খলিফাদের একজনকেও খলিফা হিসেবে মানে নি। উমাইয়া খেলাফতের মুয়াবিয়াকে খলিফা হিসেবে মেনে নেয়া যায় যেহেতু হাসান রাঃ এবং হোসাইন রাঃ মুয়াবিয়াকে কিছু শর্ত সাপেক্ষে খলিফা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াজিদের সময় হোসাইন রাঃ এর শাহাদাতের সময় থেকে আবদ আল মালিকের ৬৯২ সাল পর্যন্ত সময়কালে মক্কা-মদিনা ভিত্তিক খেলাফতের দাবীদার ছিলেন হাসান রাঃ এবং হোসাইন রাঃ এর পক্ষের মানুষ আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাঃ)। তাই, এই সময়ের মধ্যে অন্য কাউকে কিভাবে খলিফা স্বীকৃতি দেয়া যায় ? আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, ইয়াজিদ ও তার পরের উমাইয়া খলিফাগণ (অন্তত ইয়াজিদ থেকে আবদ আল মালিক পর্যন্ত) হোসাইন রাঃ এর রক্তের উপর খলিফা হয়েছেন কারণ ইয়াজিদের বাহিনী যদি হোসাইনকে (রাঃ) হত্যা না করত তাহলে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা পেত না।

এখন আমরা জানব, মুখতার আল সাকাফি (Mukhtar al-Thaqafi) কে? মুখতার আল সাকাফি সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র থেকে বিভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া যায়। সুন্নি ও শিয়া মতাদর্শের সুত্র ও চিন্তা -চেতনা থেকে মুক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে আমরা মুখতার আল সাকাফির প্রমাণিত ও সর্বজন স্বীকৃত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব।

মুখতার আল সাকাফি হোসাইন রাঃ এর পক্ষে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে ছিলেন। ওবায়েদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের পূর্বে কুফার গভর্নর নু'মান ইবনে বশির (রাঃ) ছিলেন মুখতার আল সাকাফির শ্বশুর। ইয়াজিদ যখন নু'মান ইবনে বশিরকে পরিবর্তন করে চরম নিষ্ঠুর ও কঠোর ওবায়েদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে কুফার গভর্নর করে তখন ইবনে যিয়াদ হোসাইন (রাঃ) এর পাঠানো দূত মুসলিম ইবনে আকিল ও কুফায় হোসাইন রাঃ এর সমর্থকদের কঠোর হাতে দমন করা শুরু করেন। ইবনে যিয়াদ যখন মুসলিম ইবনে আকিলকে হত্যা করে তখন মুখতার আল

সাকাফি কুফায় ছিলেন না। তিনি যখন কুফায় ফিরে আসেন তখন তাকে ইবনে যিয়াদ বন্দি করেন। মুখতার আল সাকাফি জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় ইয়াজিদের বাহিনী হোসাইন (রাঃ) কে কারবালায় হত্যা করে। পরবর্তীতে ওমর (রাঃ) এর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের (রাঃ) হস্তক্ষেপে মুখতার আল সাকাফি মুক্তি পান কিন্তু তাকে কুফা থেকে বহিস্কার করা হয়।

মুক্তি পেয়ে মুখতার আল সাকাফি মক্কায় চলে আসেন, সেখানে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) কাছে বায়াত দেন। ৬৮৩ সালে যখন ইয়াজিদ মক্কা দখল করতে আসে তখন মুখতার আল সাকাফি আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের নেতৃত্বেই ইয়াজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যখন ইয়াজিদ মারা যায় তখন আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাঃ প্রকাশ্যে নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন। হেজাজ, কুফাসহ বিশাল এলাকা আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের (রাঃ) খিলাফতের অধীনে আসে। কিন্তু কুফার লোকেরা মুখতার আল সাকাফিকে জানান যে, তারা নিজেদের মধ্য থেকে অর্থাৎ আলী রাঃ এর বংশধরদের মধ্য থেকে কাউকে খলিফা হিসেবে চান। এ ব্যাপারে তারা মুখতার আল সাকাফির সহযোগিতা চান। হাসান রাঃ এবং হোসাইন রাঃ এর মৃত্যুর পর মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়াকে আলী রাঃ এর সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যোগ্য বলে বিবেচনা করে তাকে মুখতার আল সাকাফি ইমাম হতে বলেন। মুখতার আল সাকাফি কুফায় নিজেকে মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে প্রচার করেন এবং হোসাইন (রাঃ) হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার দৃঢ় সংকল্প মানুষের মাঝে প্রচার করেন। এতে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(*** বাংলাদেশের সুন্নি মুসলিমরা বেশিরভাগ জানেই না যে, কারবালায় কতজন সাহাবী এবং আল্লাহ এর রসূলের সাঃ বংশের কত লোককে হত্যা করেছিল ইয়াজিদ বাহিনী কারণ ১০-ই মহররম আসলে প্রায় সকল মসজিদে ইমাম সাহেবরা কারবালার ঘটনায় মুয়াবিয়া রাঃ এবং ইয়াজিদের তেমন কোন দোষ ছিল না - এর পক্ষে যুক্তি দিতে দিতেই খুতবাহ শেষ করেন। তাদের খুতবার আরেকটি মূল বিষয় থাকে বর্তমান শিয়াদের ১০ই মহররম উদযাপনের ভুলত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা, শিয়াদের ভুলগুলো মানুষের সামনে বেশি বেশি প্রচার করাই এদের উদ্দেশ্যে। ফলে শিয়া -সুন্নি বিভাজন আরও প্রকট আকারে মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

কারবালার প্রান্তরে ইয়াজিদ বাহিনী হোসাইনসহ আলীর (রাঃ) আট (৮) ছেলেকে হত্যা করে। এছাড়া তারা হাসান রাঃ এর চার (৪) ছেলেকে হত্যা করে এবং হোসাইন রাঃ এর দুই (২) ছেলেকে হত্যা করে। অর্থাৎ কারবালায় ইয়াজিদ বাহিনী মুহাম্মাদ সাঃ এর কমপক্ষে ছয় (৬) জন সরাসরি বংশধরকে হত্যা করে কারণ হাসান রাঃ এবং হোসাইন রাঃ এর সন্তানরা মুহাম্মাদ সাঃ এর সরাসরি বংশধর। এছাড়া ইয়াজিদ বাহিনী আলী রাঃ এর ছেলে আব্বাস ইবনে আলীর দুই (২) সন্তানকেও হত্যা করে। এছাড়া ইয়াজিদ বাহিনী মুহাম্মাদ সাঃ এর চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবু তালিবের (রাঃ) তিনজন (৩) নাতিকে হত্যা করে। এছাড়া ইয়াজিদ বাহিনী মুহাম্মাদ সাঃ এর আরেক চাচাতো ভাই আকিল ইবনে আবু তালিবের (রাঃ) চার (৪) সন্তানকে হত্যা করে। এছাড়া মুহাম্মাদ সাঃ

এর বংশের আরও কত লোককে যে কারবালার দিন ইয়াজিদ বাহিনী হত্যা করে তার কোনো সঠিক হিসাব নেই। তবে কিছু শিয়া সুত্রমতে, সেদিন বনু হাশিমের ৪২ জনকে হত্যা করে ইয়াজিদ বাহিনী। এছাড়া অন্তত ৪ জন সাহাবী কারবালার প্রান্তরে শহীদ হন। হোসাইনের (রাঃ) কাছের কত লোক সেদিন শহীদ হয়েছিলেন – সেটা আল্লাহ-ই ভালো জানেন। আমি আমার জীবনে কোনো দিন বাংলাদশের কোনো সুন্নি মসজিদে মহররম মাসে এই বিষয়গুলো তুলে ধরতে দেখি নাই। মহররম মাস আসলে মসজিদে জুম্মার খুতবায় - মুয়াবিয়া একজন খাঁটি সাহাবী, ইয়াজিদের তেমন কোনো দোষ ছিল না, শিয়ারা কত খারাপ, শিয়াদের কি কি ভুল ত্রুটি আছে এই সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলে। কারবালায় মুহাম্মাদ সাঃ এর বংশের কত জনকে হত্যা করা হয়েছিল, মুহাম্মাদ সাঃ এর কত জন সরাসরি বংশধরদের হত্যা করা হয়েছিল – এই বিষয়গুলো নিয়ে জুম্মার খুতবায় কোনো আলোচনা নেই। নবীর (সাঃ) বংশের লোকদের প্রতি এটাই তোমাদের ভালবাসা? সত্য গোপনকারী দাজ্জালের অনুসারী মসজিদের তথাকথিত ইমামরা সাবধান হয়ে যাও। মুহাম্মাদ সাঃ এর রক্ত যাদের শরীরে বহমান তাদের রক্তকে হালকাভাবে নিলে আর তাদের হত্যাকারীদের নির্দোষ প্রমাণে ব্যস্ত থাকলে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই পাবে না।)

এখন আমরা ৬৮০ সাল থেকে ৬৯২ সাল পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহের দিকে ফিরে আসি।

কিছু সুত্রমতে, মুখতার আল সাকাফি যখন মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়াকে - হোসাইন রাঃ এর হত্যার প্রতিশোধ নিতে এবং ইমাম হবার প্রস্তাব দেন এবং তার অবস্থান শক্ত করতে বলেন তখন আলী রাঃ এর ছেলে মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়া এই প্রস্তাবে 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বলেন নি কিন্তু এতটুকু বলেছেন যে, "রক্তপাত থেকে বিরত থাকা উচিত"। ইতিপূর্বে, আলী রাঃ এর নাতি, হোসাইন রাঃ এর ছেলে 'আলী আল সাজ্জাদকে' একই প্রস্তাব মুখতার আল সাকাফি দিলে আলী আল সাজ্জাদ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিছু দিন পরে মুখতার আল সাকাফি আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে রাঃ কিছু না জানিয়েই কুফায় চলে যান।

কুফায় গিয়ে মুখতার আল সাকাফি, মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়াকে মাহদি হিসাবে ঘোষণা করেন এবং নিজের দলে লোক ঢুকানো শুরু করেন। এতে কুফার লোকদের সন্দেহ হলে তারা মক্কায় মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়ার কাছে ছুটে যান। মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়া তাদের বলেন, যে কেউ নবীর সাঃ বংশের লোকদের শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিবে - তিনি তার উপর সন্তুষ্ট। তার এই কথাকে কুফার লোকেরা মুখতার আল সাকাফির কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়া অনুমতি দিয়েছেন বলে ধরে নিয়েছিল।

কিছু সুত্রমতে, কুফায় মুখতার আল সাকাফি মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়ার নাম ব্যাবহার করে তার দলে আলীর সমর্থকদের অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করল। সে ইব্রাহীম ইবনে আল আসতার (Ibrahim ibn al-Ashtar) নামের একজন গোত্র প্রধানের থেকে সমর্থন পাবার আশায় মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়ার লিখিত একটি চিঠি তার হাতে তুলে দেন। চিঠিতে লিখা ছিল যে, মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়া নিজেকে প্রকারন্তরে মাহদি বলে

দাবী করছেন এবং মুখতার আল সাকাফিকে সমর্থন করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। ইব্রাহীম ইবনে আল আসতার প্রথমে সন্দেহ করলেও পরে মুখতার আল সাকাফিকে সমর্থন করতে রাজি হন। কিছু সূত্র মতে, চিঠিটি ধোঁকাবাজি ছিল। এই ধরণের কোনো চিঠি মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়া লিখেন নি। মুখতার আল সাকাফির উদ্দেশ্য ছিল কুফা থেকে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের রাঃ গভর্নরকে বিতাড়িত করে নিজে কুফার শাসনকর্তা হওয়া - এই জন্যই সে এই সকল কিছু করছিল বলে প্রতীয়মান হয়। শেষ পর্যন্ত মুখতার আল সাকাফি আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের রাঃ নিযুক্ত গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে মুতিকে পরাজিত করে কুফার শাসনভার গ্রহন করেন। মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়া - আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের রাঃ বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে অংশগ্রহন করেন নি কিন্তু তিনি তার নাম ব্যাবহার করা হচ্ছে জেনেও চুপ ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়ার নাম ব্যাবহার করে মুখতার আল সাকাফি কুফায় নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়ার সাথে মুখতার আল সাকাফির অন্য কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়া হয়তো তার নাম মুখতার আল সাকাফি ব্যাবহার করছে জেনেও চুপ ছিলেন এই কারণে যে, মুখতার আল সাকাফি নবী সাঃ এর পরিবারের শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার কথা বলেছিলেন। বাস্তবে সেটা কিছুটা হলেও হয়েছিল।

৬৮৬ সালে খাযিরের যুদ্ধ (Battle of Khazir) হয়। এ যুদ্ধে মুখতার আল সাকাফির প্রেরিত বাহিনী, যার নেতৃত্বে ছিলেন আলীর (রাঃ) দলে যুদ্ধ করা যোদ্ধা ইব্রাহীম ইবনে আল আসতার, এর সাথে উমাইয়া খেলাফতের খলিফা মারওয়ান ইবনে আল হাকামের প্রেরিত বাহিনীর যুদ্ধ হয়। মারওয়ান ইবনে আল হাকামের প্রেরিত বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল ওবায়েদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ। এই সেই ওবায়েদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ যার বাহিনী হোসাইনকে (রাঃ) কারবালা প্রান্তরে হত্যা করেছিল। খাজিরের যুদ্ধে উমাইয়া খেলাফতের খলিফা মারওয়ান ইবনে আল হাকামের প্রেরিত বাহিনী পরাজিত হয় অর্থাৎ ওবায়েদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ পরাজিত হয়। ইব্রাহীম ইবনে আল আসতার নিজে ওবায়েদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে হত্যা করে হোসাইন রাঃ সহ কারবালার শহীদদের প্রতিশোধ নেন। এই সমসাময়িক সময়েই মুখতার আল সাকাফিকে কুফার ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা অবরোধ করে এবং তার পতন ঘটাতে চায় কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। বিদ্রোহ দমনের পর মুখতার আল সাকাফি কারবালার ঘটনায় যারা জড়িত ছিল তাদের প্রায় সবাইকেই হত্যা করেন। কারবালা হত্যাকাণ্ডে জড়িত মূল ২ জন ব্যাক্তি 'উমর ইবনে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস' এবং 'শিমর ইবনে যিলজাওশান আল-আমিরি' (Shimr ibn Dhi al-Jawshan) কেও মুখতার আল সাকাফি হত্যা করেন। এভাবে মুখতার আল সাকাফি যে বলেছিলেন - তিনি হোসাইনের (রাঃ) হত্যাকারীদের উপর প্রতিশোধ নিবেন সেটা তিনি রক্ষা করেছিলেন।

মুখতার আল সাকাফিকে সবচেয়ে বেশি সমর্থন করে মায়ালিরা (Mawali)। মায়ালিরা হচ্ছে অনারব মুসলিম। তাদের বিভিন্ন সুযোগ -সুবিধা দেবার কথা বলে মুখতার আল সাকাফি নিজ দলে প্রচুর মায়ালি যোদ্ধা অন্তর্ভুক্ত করেছিল। মুখতার আল সাকাফির ব্যাক্তিগত প্রহরীদের সবাই ছিল মায়ালি যাদের প্রধান ছিল 'আবু আমরা কায়সান' (Abu Amra Kaysan)। 'আবু আমরা কায়সান' ছিল পারস্যের একজন মায়ালি।

কিছু সুত্রমতে, 'আবু আমরা কায়সানের' নাম থেকেই শিয়াদের 'কায়সানি' (Kaysanites) নামে একটি শাখার উদ্ভব হয়। শিয়াদের এই শাখাটি মুখতার আল সাকাফির সময়ে শুরু হয়। মুখতার আল সাকাফির অনুসারীদের বলা হত 'কায়সানি'। তারা মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়াকে তাদের ইমাম বলে মানে। যারা মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়াকে ইমাম বলে মানে তাদেরকে প্রথমে 'মুখতারিয়া' (Mukhtariyya) বলে অভিহিত করা হলেও পরবর্তীতে তাদেরকে 'কায়সানি' (Kaysanites) বলে অভিহিত করা হয়। প্রশ্ন আসে - তারা যদি আলী (রাঃ) এর ছেলে মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়াকেই ইমাম বলে মানে বা উনার আদর্শ অনুসরণ করে তাহলে তো তাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়ার নাম অনুসারেই কোনো নামে অভিহিত করার কথা কিন্তু সেটা না করে তাদেরকে মুখতার আল সাকাফির নাম অনুসারে 'মুখতারিয়া' বা 'কায়সানি' বলে অভিহিত করা হয়েছিল কেন? আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখেছি যে, মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়ার সাথে মুখতার আল সাকাফির তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না।

৬৮৬ সালে খাযিরের যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী উমাইয়ারা বলেছিল যে, তারা মুখতার আল সাকাফির প্রেরিত বাহিনীতে আরবীতে কথা বলে এমন কোনো যোদ্ধা দেখতে পায়নি বললেই চলে। সাকাফির প্রেরিত যোদ্ধারা ছিল অধিকাংশই পারস্যের - যাদের ভাষা আরবী নয়, তাদের ভাষা হচ্ছে পার্সি বা ফার্সি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। মুখতার আল সাকাফির বাহিনীতে পারস্যের প্রচুর যোদ্ধা ছিল।

এখন আমরা কায়সানিদের বিশ্বাস এবং মতাদর্শ সম্পর্কে জানবঃ

১) কায়সানিরা আবু বকর রাঃ, ওমর রাঃ, ওসমানকে (রাঃ) খলিফা হিসেবে অস্বীকার করে এবং তাদের খেলাফতকে অবৈধ বলে দাবী করে।

২) তারা বিশ্বাস করে আলী রাঃ এর তিন ছেলে হাসান, হোসাইন এবং মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়া হচ্ছেন তাদের ইমাম এবং তাদের অতি প্রাকৃত গুণাবলী আছে।

৩) তারা মুহাম্মাদ ইবনে আল হানাফিয়াকে ইমাম মাহদি বলে বিশ্বাস করে।

৪) কায়সানিদের বিশ্বাস ও মতাদর্শ দ্বৈতবাদ ভিত্তিক জরথুস্ত্রবাদের শাখা 'মাজদাকিসম' (Mazdakism) ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল। (রেফারেন্সঃ The new encyclopedia of Islam, by Cyril Glassé, Huston Smith, p. 252)

কায়সানিদের আরও কিছু বিশ্বাস বা মতাদর্শ আছে যেগুলো এখানে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই বলে মনে হচ্ছে।

আপনাদের কি মনে আছে, আল্লাহ এর রসূলের সাঃ সেই হাদিসটি যাতে তিনি ঘুম থেকে উঠে বলেছিলেন যে, আজকে ইয়াজুজ-মাজুজের দেয়াল এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। তারপর তিনি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েও দিয়েছিলেন যে কতটুকু ছিদ্র হয়েছে। খুব সম্ভবত আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) ৬৩০ সালে এই কথাগুলো বলেছিলেন। আমার এই কথার পক্ষে যুক্তি হচ্ছে, ৬৩০ সালে পারস্য ও বাইজেন্তাইন এম্পায়ারের মধ্যে শান্তি চুক্তি হয়েছিল। এখন দেখতে পাচ্ছি ৬৮২ থেকে ৬৯০ সালের মধ্যেই শিয়াদের কায়সানি শাখার মধ্যে পারস্যের দ্বৈতবাদভিত্তিক জরথুস্ত্রবাদের বিশ্বাস ও মতাদর্শ প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল। এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে, সবকিছু একই সুত্রে গাঁথা। জুলকারনাইনের প্রাচীরের একটি উদ্দেশ্য ছিল পারস্যের দ্বৈতবাদভিত্তিক জরথুস্ত্রবাদের বিশ্বাস ও মতাদর্শের বিস্তার রোধ করা। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে মুখতার আল সাকাফির দলে পারস্যের প্রচুর যোদ্ধা ছিল। 'আবু আমরা কায়সান' নিজেও একজন পারস্যের মায়ালি ছিলেন। খুব সম্ভবত কায়সানিদের মাধ্যমেই প্রথম মুসলিমদের মধ্যে দ্বৈতবাদ ভিত্তিক জরথুস্ত্রবাদের বিশ্বাস ও মতাদর্শ ঢুকা শুরু হয়েছিল - যেটা আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম। এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, শিয়াদের বর্তমানে যা কিছু ভুল বিশ্বাস ও মতাদর্শ আছে তা সর্ব প্রথম এসেছে কায়সানিদের কাছ থেকে আর কায়সানিদের বিশ্বাস ও মতাদর্শ ছিল পারস্যের দ্বৈতবাদভিত্তিক জরথুস্ত্রবাদের বিশ্বাস ও মতাদর্শের প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, ঐ সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাঃ সঠিক পথে ছিলেন। তিনিই তখন সত্যিকারের খলিফা ছিলেন। ৬৯২ সালে উমাইয়াদের হাতে শাহাদাতের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের (রাঃ) খেলাফত শেষ হয়। নু'মান ইবনে বশির (রাঃ) যিনি পূর্বে কুফার উমাইয়া গভর্নর ছিলেন তিনিও পরবর্তীতে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের কাছে বায়াত দেন এবং তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নেন।

এখন প্রশ্ন আসবে, কেন শিয়াদের মুসলিম বলে অভিহিত করলাম ? এজন্য বর্তমান কালের শিয়াদের বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। আলোচনার প্রথমেই বলে নেই যে, নবী- রসূল ছাড়া ইসলামে সবার জন্য আইন সমান। সাহাবীদের জন্য এক রকম আইন আর অন্য মুসলিমদের জন্য আলাদা আইন – এমন কিছু ইসলামে নেই। সবার জন্য ইসলামে আইন সমান – এই সূত্র ধরে আলোচনা করব।

১) অধিকাংশ শিয়ারা আবু বকর, ওমর, ওসমান রাঃ কে খলিফা বলে মানেন না। তারা আবু বকর, ওমর, ওসমানের খেলাফতকে অস্বীকার করেন। → মুয়াবিয়া কখনো আলীকে (রাঃ) খলিফা বলে স্বীকার করেছেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আলীর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মুয়াবিয়া আলীর সাথে খেলাফত নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন – সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, মুয়াবিয়া কখনোই আলীকে (রাঃ) খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি দেন নি। পৃথিবীর সকল সুন্নিরা একমত যে, মুয়াবিয়া মুসলিম ছিলেন। বুঝা গেলো যে, সুন্নিদের আকিদা অনুসারে, আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), ওসমানকে (রাঃ) খলিফা হিসেবে অস্বীকার করলেও একজন ব্যাক্তি এই কারণে কাফির হবে না। সে গুনাহগার হবে কিন্তু কাফির হবে না।

২) চরমপন্থী শিয়া ছাড়া অন্য সাধারণ শিয়ারা আয়েশা রাঃ, আবু বকর রাঃ, ওমর রাঃ, ওসমানকে রাঃ গালি দেয় না।

৩) শিয়ারা কোনো পাথর বা মাটির চাকতিকে সিজদা করে না। তারা বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রাকৃতিক বস্তুর (যেমনঃ পাথর, বালি, মাটি, ইত্যাদির) উপর কপাল রেখে আল্লাহকে সিজদা করতেন তাই তারা একটি মাটির তৈরি চাকতি বা পাথর নিজের কাছে রাখে যাতে বিল্ডিং এ নামাজ পড়লে মাটির চাকতি বা পাথরের উপর কপাল রেখে আল্লাহকে সিজদা করা যায়। এভাবে তারা নবীকে (সাঃ) অনুসরণ করতে চায়। এতে শিরকের কিছু নেই।

৪) শিয়ারা আলীকে (রাঃ) নবী বলে মানে না। শিয়ারা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর চেয়ে আলীকে বেশি সম্মানিত মনে করে না। → কারো নামের শেষে আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আঃ) বললেই তাকে নবী বলে মানা হয় না। আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আঃ) হচ্ছে একটি দুয়া যার অর্থ হচ্ছে, " তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক"। শিয়ারা আলীর (রাঃ) নামের শেষে আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আঃ) বলে - এতে গুনাহের কিছু নেই। আপনি নবী মুসা, ইসার নামের শেষে আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে পারেন আবার নাও বলতে পারেন। কারো জন্য দুয়া করা বা না করা - আপনার ব্যাক্তিগত ব্যাপার – এজন্য আল্লাহ আপনাকে আটকাবেন না। আপনি চাইলে, সাধারণ কোনো লোকের নাম স্মরণ করার পর তার নামের শেষেও আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে তার জন্য দুয়া করতে পারবেন। এতে গুনাহের কিছু নেই। যে কোনো মুসলিমের শান্তি কামনার জন্য আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করা যায়। পবিত্র কুরআনুল কারিমে এবং হাদিস শরীফের কোথাও বলা হয় নি যে কেবল নবী - রাসূল এবং ফেরেশতাদের নাম ব্যাতীত 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম' ব্যবহার করা যাবে না। অনেক শিয়া অন্য সকল সাহাবীর চেয়ে আলীকে বেশি ভালবাসে - এটা গুরুতর কোনো অন্যায় নয়।

৫) শিয়ারা মহররমের দিন নিজেদের শরীরে থাপ্পড় দেয় বা নিজেকে রক্তাক্ত করে - এতে তাদের গুনাহ হতে পারে কিন্তু এজন্য তারা কাফির হবে না।

৬) শিয়ারা মনে করে যে, তাদের ইমামদের অতি প্রাকৃত গুণ রয়েছে। → সুন্নিদের মধ্যে পিরতন্ত্রের অনুসারী কোটি কোটি সুন্নি মনে করে যে, তাদের পীরের অতি প্রাকৃত গুণ বা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে , কাসফ খোলা আছে - কিন্তু এজন্য সুন্নিরা তো পিরপন্থি সুন্নিদের কাফির বলে না।

৭) শিয়ারা তাদের ইমামদের 'মাসুম' বা গুনাহবিহীন মনে করে। → সুন্নিদের মধ্যে পিরতন্ত্রের অনুসারীরা তো আরও ভয়াবহ দাবী করে যে, তাদের পীর নাকি আল্লাহ এর সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে অর্থাৎ ফানা হয়ে গেছে। তারা আরও দাবী করে যে, তাদের নাকি নামাজ, রোজা, হাজ্জ, জাকাত কিছুই করতে হয় না। এরা তো শিয়াদের চেয়ে আরও ভয়াবহ দাবী করছে। শিয়ারা তো তবু এই কথা বলে না যে - তাদের ইমামদের নামাজ,

রোজা হাজ্জ কিছুই করতে হয় নাই বা হয় না। কিন্তু পিরপন্থি অনেক সুন্নি দাবী করে যে, তাদের পীরের নাকি নামাজ -ই পড়তে হয় না। এই সুন্নিরাতো আরও ভয়াবহ – কিন্তু এদেরকে কোনো সুন্নি আলেম কি কাফির বলে ? সুন্নিরা গণতন্ত্র মানে যেখানে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে 'রব' (আইনদাতা) বলে দাবী করছে। কিন্তু তাদেরকে কেউ তো কাফির বলে না।

৮) সুন্নিরা যাদের সাহাবী বলে মানে তাদের অনেককে শিয়ারা সাহাবী বলে মানে না। → সকল মানুষের বুঝার ক্ষমতা এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা সমান নয়। হাদিস ব্যাখ্যায় চুলের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনেক ব্যাপার আছে যা সবাই একইভাবে বুঝে না বা একইভাবে ব্যাখ্যা করে না। আলীকে (রা:) নিয়ে এবং আহ্‌লুল বাইতদের নিয়ে আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) বর্ণিত হাদিসগুলো পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন, মুয়াবিয়া এবং আলীর মধ্যে কে ভুল আর কে সঠিক ছিল। এ হাদিসগুলোকে গাদির খুমে (Ghadīr Khumm) বর্ণিত হাদিস হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই হাদিসগুলো সুন্নিরা একভাবে আর শিয়ারা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে। হাদিসগুলো পড়ার পর আপনি বুঝতে পারবেন যে, কোনো মুসলিমের জন্য আলী (রাঃ) এবং তার বংশধর, আকিল এবং আকিলের বংশধর, জাফরের বংশধর, আব্বাসের বংশধরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা কবিরা গুনাহের কাজ হবে। কোনো মুসলিম যদি তাদের কাউকে আহত করে বা নিহত করে তাহলে তার জান্নাতে যাবার সম্ভাবনা খুবই কম। এই কাজ যে সকল মুসলিম করেছে বা করতে নির্দেশ দিয়েছে তাদেরকে কেউ যদি সাহাবী হিসাবে স্বীকার না করে - তাহলে এজন্য সে কাফির হবে না, এমন কি তার কোনো গুনাহও হবে না। অর্থাৎ মুয়াবিয়াকে কেউ যদি সাহাবী হিসাবে স্বীকার না করে তাহলে সে কাফির হবে না কারণ মুয়াবিয়াকে সাহাবী হিসাবে অস্বীকার করার মত যথেষ্ট যুক্তি-প্রমান ইতিহাসে আছে। আলী রাঃ এর সাথে, হাসান রাঃ এবং হোসাইন রাঃ এর সাথে মুয়াবিয়া তার জীবনের শেষ দিকে যে ব্যাবহার করেছেন তা থেকে অনেকেই এই সিদ্ধান্ত নিবে যে, তিনি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিলেন। একজন ব্যাক্তি তার জীবনে যত ভালো কাজ-ই করুক না কেন – তার জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে সে যদি সঠিক পথে থাকতে না পারে তাহলে তার পূর্বের জীবনের ভালো কাজ - তার তেমন কোনো কাজে আসবে না। মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "যে তার জীবন যেভাবে চালাবে তার মৃত্যু সেভাবে হবে আর যার মৃত্যু যেভাবে হবে সে কিয়ামতের দিন সেভাবেই উঠবে"। অর্থাৎ মৃত্যুর সময় আপনার ঈমান আকিদা যেমন থাকবে, আপনি কিয়ামতের দিন সেভাবেই উঠবেন।

আসুন আমরা গাদীরে খুমে বর্ণিত হাদিসগুলো পড়ি।

সাঈদ বিন ওয়াহব এবং জায়েদ বিন ইউসায়াই থেকে বর্ণিত, 'আলী 'রাহবায়' লোকদেরকে শপথ করিয়ে বললেন, গাদীরে খুমের দিন যে কেউ আল্লাহর রাসূলকে (সাঃ) বলতে শুনেছে, সে যেন উঠে দাড়ায়। আর সাঈদের আশেপাশের লোকদের মধ্যে ছয়জন লোক দাড়ায় এবং জায়েদের আশেপাশের লোকদের মধ্যে থেকে ছয়জন লোক দাঁড়ায় এবং তারা সাক্ষ্য দেয় যে, গাদীরে খুমের দিন তারা রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) আলীকে (উদ্দেশ্য

করে) বলতে শুনেছে, "আল্লাহ কি মুমিনদের নিকটতম নন?" তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, যদি আমি কারো মাওলা হই, তাহলে আলীও তার মাওলা; হে আল্লাহ, যারা তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো এবং যারা তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের শত্রু হিসেবে গ্রহণ করো।"

আবু ইসহাকের অনুরূপ একটি হাদীস আমর যি মুর থেকে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ সাঈদ ও যায়েদ থেকে, এবং তিনি এর সাথে আরও যোগ করেছেন: 'যারা তাকে সমর্থন করে তাদের সাহায্য করো এবং যারা তাকে পরিত্যাগ করে তাদের পরিত্যাগ করো।' আবুত-তুফায়েল থেকে যায়েদ বিন আরকাম থেকে নবী (সাঃ) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২)

আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আলী (রাঃ) কে আর-রাহবাহে লোকদেরকে শপথ করতে দেখেছি, তিনি বলছেন: আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, যারা গাদীরে খুমের দিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছে: "যদি আমি কোনো ব্যাক্তির মওলা হই, তাহলে আলীও তার মওলা", তারা যেন উঠে সাক্ষ্য দেয়।' আবদুর রহমান বলেন: বারোজন ব্যক্তি যারা বদরে (যুদ্ধ করে) ছিলেন তারা দাড়িয়ে গেলেন। মনে হচ্ছে যেন আমি তাদের একজনকে দেখতে পাচ্ছি। তারা বললেন: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমরা গাদীরে খুমের দিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি: 'আমি কি মুমিনদের নিজেদের চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ নই এবং আমার স্ত্রীরা তাদের মা?' আমরা বললাম: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। তিনি বললেন: "যদি আমি কোন ব্যক্তির মওলা হই, তাহলে আলীও তার মওলা; হে আল্লাহ, যারা তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো এবং যারা তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের শত্রু হিসেবে গ্রহণ করো।" (মুসনাদে আহমদ ৯৬১)

ইয়াযীদ বিন হাইয়ান বর্ণনা করেছেন, আমি হুসাইন বিন সাবরা এবং উমর বিন মুসলিমের সাথে যায়েদ বিন আরকামের কাছে গেলাম। আমরা যখন তার পাশে বসেছিলাম, তখন হুসাইন তাকে বললেন: জায়েদ! তুমি অনেক সওয়াব অর্জন করতে পেরেছো যে, তুমি আল্লাহর রাসূলকে সাঃ দেখেছ, তার কথা (সরাসরি) শুনতে, তার পাশে (বিভিন্ন) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে এবং তার পিছনে সালাত আদায় করেছ। যায়েদ, তুমি আসলেই প্রচুর সওয়াব অর্জন করেছো। যায়েদ, তুমি আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) কাছ থেকে যা শুনেছো তা আমাদের কাছে বর্ণনা করো। সে বলল: আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং আমার বয়স প্রায় শেষ হয়ে গেছে এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সাথে সম্পর্কিত কিছু কথা আমি ভুলে গেছি, তাই আমি তোমাকে যা বর্ণনা করি তা গ্রহণ করো, এবং যা বর্ণনা করি না তা (বর্ণনা) করতে আমাকে বাধ্য করো না। তিনি বললেন: একদিন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী খুম নামক একটি জলাশয়ের (পাশে) খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তার (আল্লাহ এর) প্রশংসা করলেন এবং খুতবা দিলেন। তিনি (আমাদের) উপদেশ দিলেন এবং বললেন: (এবার আমাদের উদ্দেশ্যে কথা) হে মানুষ, আমি একজন মানুষ। আমার প্রতিপালকের

পক্ষ থেকে একজন দূত (মৃত্যুর ফেরেশতা) আমার কাছে আসতে চলেছে এবং আমি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে (তোমাদের বিদায় জানাচ্ছি), কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে দুটি ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি: একটি হলো আল্লাহর কিতাব যাতে সঠিক পথনির্দেশনা এবং আলো রয়েছে, তাই আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং তা আঁকড়ে ধরো। তিনি (আমাদের) আল্লাহর কিতাবকে (দৃঢ়ভাবে ধারণ করার) উপদেশ দিলেন এবং বললেন: দ্বিতীয়টি হলো আমার পরিবারের সদস্যগণ। আমি তোমাদের আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি (তোমাদের কর্তব্য) স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি (হুসাইন) যায়েদকে বললেন: তার পরিবারের সদস্য কারা? তার স্ত্রীরা কি তার পরিবারের সদস্য নয়? তখন তিনি বললেন: তার স্ত্রীরা তার পরিবারের সদস্য, তার পরিবারের সদস্যরা হল তারা যাদের জন্য যাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ। তিনি বললেন: তারা কারা? তখন তিনি বললেন: 'আলী এবং আলীর বংশধর, আকিল এবং আকিলের বংশধর, জাফরের বংশধর এবং আব্বাসের বংশধর। হুসাইন বললেন: এরা হল সেইসব লোক যাদের জন্য যাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ। যায়েদ বললেন: হ্যাঁ। (সহীহ মুসলিম ২৪০৮ ক, অনুরূপ হাদিস রিয়াদ আস-সালিহিন ৩৪৬)

উপরোক্ত হাদিসগুলো সুন্নি আলেমরা এত বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছে যা চিন্তা করার মত নয়। অন্য দিকে শিয়া আলেমরাও হাদিসগুলোর কিছু আনুষঙ্গিক তথ্য খেয়াল করেন নি বলে মনে হচ্ছে।

মুসনাদে আহমদের ৯৫০,৯৫১,৯৫২ ও ৯৬১ নাম্বার হাদিসে 'মাওলা' শব্দের অর্থ নিয়ে সুন্নি এবং শিয়াদের মধ্যে মতভেদ আছে। সুন্নিরা বলে মাওলা শব্দের অর্থ হচ্ছে বন্ধু ও সহযোগী (friend and supporter)। অপরদিকে শিয়ারা বলে যে, মাওলা শব্দের অর্থ হচ্ছে নেতা (Leader). আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) বলেছেন, "যদি আমি কোনো ব্যাক্তির মওলা হই, তাহলে আলীও তার মওলা"। আপনার কি মনে হয় – আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) সবার সামনে আলীকে নিয়ে কথা বলেছেন শুধু এতটুকু বলার জন্য যে, আমি যার বন্ধু ও সহযোগী, আলীও তার বন্ধু ও সহযোগী ? আল্লাহ এর রসূলের সাঃ সাথে আমাদের সবচেয়ে বড় যে সম্পর্ক তা হচ্ছে - আমরা হচ্ছি উনার অনুসারী, আমরা উনার আনুগত্য করি আর তিনি হচ্ছেন আমাদের নেতা (Leader)। এখানে শিয়া আলেমরা মাওলা শব্দের যে অর্থ করেছে তা সুন্নিদের চেয়ে অনেক বেশি সঠিক। আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে মুহাম্মাদ (সাঃ) আপনার কে হয়? আপনি কি বলবেন যে - মুহাম্মাদ (সাঃ) আমার বন্ধু ও সহযোগী হয়? নাকি আপনি বলবেন যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ এর রসূল আর আমি উনার অনুসারী; তিনি আমাদের নেতা; আমরা উনার কথা মেনে চলি। এখনো যদি কেউ মনে করেন যে, মাওলা শব্দের অর্থ নেতা নয় – তাহলে খেয়াল করে দেখুন, মুসনাদে আহমদের ৯৫০,৯৫১,৯৫২ ও ৯৬১ নাম্বার হাদিসগুলো কবে, কোথায়, কার থেকে বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি হাদিস আলীর (রাঃ) কথা থেকে বর্ণিত হওয়া শুরু হয়েছে। আলী (রাঃ) 'রাহবা' (Ar-Rahbah) নামক জায়গায় লোকদের শপথ করিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, সেখানে এমন কেউ কি আছে যে গাদিরে খুমে আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) কথা শুনেছে? তখন ১২ জন সাহাবী যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছেন তারা নবী (সাঃ) আলী সম্পর্কে যা বলেছেন তা বর্ণনা করেছেন। আলী (রাঃ) 'আর রাহবায়' যান ৬৫৭ সালে। 'আর রাহবা'

জায়গাটি কুফার কাছে অবস্থিত। ৬৫৭ সালেই মুয়াবিয়ার সাথে আলীর রাঃ সিফফিনের যুদ্ধ হয়। এখন কি আপনারা বুঝতে পারছেন কেন আলী (রাঃ) এই সময়ে লোকদের শপথ করিয়ে গাদিরে খুমের হাদিস সম্পর্কে কেউ জানে কি না - সেটা জিজ্ঞেস করেছেন? কারণ মুয়াবিয়ার সাথে তখন আলীর খেলাফত তথা নেতৃত্ব নিয়ে লড়াই এবং দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে ছিল। এই সময়ে আলী (রাঃ) লোকদের মাধ্যমেই গাদিরে খুমের হাদিস মুসলিমদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যার উদ্দেশ্য প্রতীয়মান হয় যে - মুয়াবিয়ার দলে যোগদান করো না, মুয়াবিয়াকে নেতা মেনো না, আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরো না, আলীর অবাধ্য হয়ো না, নেতা হিসেবে আলীকে মানো। আলী (রাঃ) যে সময়ে যেই ক্ষেত্রে গাদিরে খুমের হাদিসগুলোকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তাতে বুঝা যায়, মাওলা শব্দের অর্থ 'বন্ধু - সহযোগী' নয়। 'মাওলা' শব্দের অর্থ আনুগত্য, নেতৃত্বের সাথে জড়িত। এই হাদিসগুলো জানার পর মুয়াবিয়াকে (রাঃ) যদি কেউ সাহাবী হিসাবে অস্বীকার করে তাহলে তাকে দোষারোপ করা যায় না। মুয়াবিয়া হাসান (রাঃ) এর সাথে কৃত চুক্তি - ওয়াদা ভঙ্গ করে নিজের ছেলে ইয়াজিদকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করে যান। কিছু সূত্রমতে, এই কাজে মুয়াবিয়া অবৈধ পথ ব্যাবহার করে ছিলেন। তিনি কি এতটুকু জানতেন না যে, ইসলামে চুক্তি ভঙ্গ করা হারাম? তিনি কি এতটুকু বুঝতে পারেন নি যে, চুক্তি ভঙ্গ করে ইয়াজিদকে খলিফা বানালে আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) নাতি হোসাইনের (রাঃ) সাথে ইয়াজিদের দ্বন্দ্ব হবে? একজন মুসলিম হয়ে আপনি কিভাবে আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) নাতির সাথে কৃত খেলাফত নিয়ে চুক্তি (*) ভঙ্গ করতে পারেন? খেলাফতের ব্যাপারটা কোনো মামুলি ব্যাপার নয় – খেলাফতের সাথে পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিমের অধিকার জড়িত। এই সকল কারণে কোনো মুসলিম যদি মুয়াবিয়াকে সাহাবী হিসাবে অস্বীকার করে এবং তার বর্ণিত হাদিস প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাকে আমরা অপরাধী বলতে পারি না।

((*) আলী (রাঃ) এর মৃত্যুর পর হাসান (রাঃ) নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং কুফায় লোকদের থেকে বায়াত নেয়া শুরু করেন কিন্তু সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া হাসানকে (রাঃ) খলিফা হিসেবে মানতে অস্বীকার করেন এবং সেনাবাহিনী নিয়ে কুফায় হাসানের (রাঃ) বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। মাঝে আরও কিছু ঘটনা আছে তবে মূল কথা হচ্ছে হাসান (রাঃ) মুয়াবিয়ার সাথে চুক্তি করেন। চুক্তিমতে, ১) মুয়াবিয়া খলিফা হবেন, তাকে অবশ্যই কোরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক খেলাফত চালাতে হবে এবং তার পূর্বের খলিফাদের মত আচরণ করতে হবে। ২) মুয়বিয়ার পরে হাসান রাঃ খলিফা হবেন। যদি কোনো দুর্ঘটনা হয় তাহলে হোসাইন (রাঃ) খলিফা হবেন। মুয়াবিয়া অন্য কাউকে খলিফা নিযুক্ত করতে পারবেন না। অন্য একটি সূত্র মতে, মুয়াবিয়ার পরে কে খলিফা হবেন সেটা মুয়াবিয়া নির্ধারণ করতে পারবেন না এবং শূরার মাধ্যমে পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করা হবে। ৩) মুয়াবিয়া আলী রাঃ সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে পারবেন না, অভিশাপ দিতে পারবেন না। ৪) মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন নিরাপদে থাকবে। আলীর (রাঃ) সঙ্গীরা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের নিরাপত্তা দিতে হবে। মুয়াবিয়া হাসান, হোসাইন বা মুহাম্মদের (সাঃ) পরিবারের কারোর গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না। এই সকল শর্তসহ আরও কিছু শর্তে হাসান রাঃ নিজে খেলাফত ছেড়ে দেন এবং মুয়াবিয়াকে

খলিফা হিসেবে মেনে নেন। হাসান রাঃ সাত (৭) মাস খলিফা ছিলেন। চুক্তিতে আরও কিছু ধারা ছিল – আমি কিছু ধারা এখানে উল্লেখ করলাম। কিছু সূত্র মতে, মুয়াবিয়া খলিফা হবার পর এই চুক্তিকে অস্বীকার করা শুরু করেন এবং আলী রাঃ এর সঙ্গী - সাথীদের নির্যাতন শুরু করেন)

এখন মুয়াবিয়াকে যে সকল সুন্নি আলেম ভালবাসেন, যারা মহররম মাস আসলেই মুয়াবিয়াকে খাঁটি সাহাবী প্রমাণে খুতবাহ দেন তারা বলবেন, মুয়াবিয়ার দোষ ধরার আপনি কে? মুয়াবিয়া ও আলীর (রাঃ) যুদ্ধে আমি আলীর দলে, হাসান রাঃ ও মুয়াবিয়ার বিরোধে আমি হাসানের (রাঃ) পক্ষে, হোসাইন রাঃ এবং ইয়াজিদের বিরোধে আমি হোসাইনের (রাঃ) পক্ষে। যারাই নবীর (সাঃ) পরিবারকে কষ্ট দিয়েছে আমি তাদের মুখোশ উম্মোচন করবোই। মহররম মাসে মসজিদে জুম্মার খুতবায় ভণ্ড ইমামদের - 'মুয়াবিয়া খাঁটি সাহাবী ছিলেন, খুব ভালো খলিফা ছিলেন, হোসাইন হত্যায় ইয়াজিদের তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না' - বয়ান যারা দেন তাদের জন্য আজ সত্য উম্মোচন করলাম – যদি এই সকল সুন্নি ইমামদের হুশ হয়। এই বিষয়গুলো না জানলে আপনারা শিয়াদের বুঝতে পারবেন না - তাই এই বিষয়গুলো আলোচনা করা জরুরী ছিল।

মুয়াবিয়াকে কি সাহাবী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যায়? সহীহ মুসলিম ২৪০৮ ক নাম্বার হাদিসটি খেয়াল করুন। আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) বলেছেন যে, তিনি আমাদের কাছে দুটি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছেন। একটি হচ্ছে কোরআন অপরটি হচ্ছে নবী (সাঃ) এর পরিবারের সদস্যগণ। হাদিসে মুহাম্মাদ (সাঃ) এই কথা বলার আগে বলেছেন যে, "হে মানব সকল, আমি একজন মানুষ। আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন দূত (মৃত্যুর ফেরেশতা) আমার কাছে আসতে চলেছে এবং আমি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে (তোমাদের বিদায় জানাচ্ছি),……..."।

মানুষ যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যায় তখন সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা তার সন্তানদের বলে যায়। যেমনঃ অমুক কাজটি করো না তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে বা অমুক কাজটি অবশ্যই করবে, ইত্যাদি। মুহাম্মাদ (সাঃ) তার উম্মতদের ছেড়ে যাবার পূর্বে বিদায় নিয়েছেন এবং তারপর তিনি বলেছেন যে, তিনি আমাদের জন্য কি রেখে যাচ্ছেন। দুটি ভারী জিনিস। কোরআন এবং নবী (সাঃ) এর পরিবারের সদস্যগণ। এখন আপনি এই দুটির যে কোন একটিকে যদি ছেড়ে দেন তাহলে আপনার কি হবে? যদি কেউ মুহাম্মাদ সাঃ এর পরিবারের সদস্যদের প্রতি অবহেলা করে তাহলেই তো সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যাবে। মুয়াবিয়া তো শুধু অবহেলা করে নি, সে আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। হাসান (রাঃ) নিজেকে খলিফা ঘোষণা করার পর মুয়াবিয়া তার বাহিনী নিয়ে হাসান রাঃ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কুফার দিকে রওনা দিয়েছে, যার ফলে, শেষ পর্যন্ত হাসান রাঃ নিজে খেলাফত ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন; মুয়াবিয়া হাসান রাঃ এর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে ইয়াজিদকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করে গেছে। এরপর যদি আমি মুয়াবিয়াকে সাহাবী হিসাবে স্বীকৃতি দেই তাহলে তো আলী (রাঃ), হাসান (রাঃ), হোসাইনকেই (রাঃ) অবজ্ঞা করা হয়। কিন্তু এটা তো আমি করবো না। তাই, আমার মতে মুয়াবিয়াকে সাহাবী হিসাবে স্বীকৃতি

দেয়া যাবে না। ইতিহাস থেকে আমি যতটুকু জেনেছি তাতে বুঝেছি যে, মুয়াবিয়ার পিতা আবু সুফিয়ান (রাঃ) সাহাবী ছিলেন এবং মুয়াবিয়ার মাতা হিন্দ বিনতে উতবাও (রাঃ) সাহাবী ছিলেন।

অন্যদিকে শিয়া আলেমরা গাদিরে খুমে বর্ণিত হাদিসের উপর ভিত্তি করে আলী (রাঃ) এর পূর্বের তিনজন খলিফাকেই অস্বীকার করে। কিন্তু তারা কি এই বিষয়টা খেয়াল করেনি যে, আলী (রাঃ) ওসমানের (রাঃ) খিলাফত পর্যন্ত কাউকে গাদিরে খুমে বর্ণিত হাদিস মনে করিয়ে দেন নি। আবু বকর, ওমর, ওসমানের খিলাফতের সময় আলী রাঃ চাইলে গাদিরে খুমে বর্ণিত হাদিসের রেফারেন্স টেনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারতেন যেমনটি তিনি মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে করেছিলেন, কিন্তু আলী (রাঃ) সেটা করেন নি। এখান থেকেই বুঝা যায় যে, আলী (রাঃ) আবু বকর, ওমর, ওসমানকে খলিফা হিসেবে মানতেন, সুতরাং শিয়াদের উচিত আবু বকর, ওমর, ওসমানকে খলিফা হিসেবে মানা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে, শিয়া, সুন্নি উভয় দল -ই হাদিস ব্যাখ্যায় চরমপন্থা গ্রহন করে এক দল অন্য দলকে পরাস্ত করতে চেয়েছে।

বুঝা গেলো, শিয়াদের যে সকল বিশ্বাসের কারণে সুন্নি আলেমরা তাদেরকে কাফির বলে বা ঘেন্না করে বা তুচ্ছ – তাচ্ছিল্য করে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি গুনাহের কাজ বা দাবী করার পরও সুন্নিরা নিজেদের লোকদের কাফির বলে না, তুচ্ছ – তাচ্ছিল্য করে না। বরং যে পীর শিরকে পরিপূর্ণ বই লিখেছে তাকে বিরাট সম্মান করে, নেতা বানায়। উদাহরণঃ চরমোনাই পীর।

এখন কেউ কেউ ইউটিউব থেকে ২-৪ টা ভিডিও এনে দেখাবেন যে, শিয়ারা আবু বকর (রাঃ) বা আয়েশাকে (রাঃ) গালি দিচ্ছে। ধরুন, ইরান থেকে একজন মুসলিম (শিয়া) বাংলাদেশে আসল। বাংলাদেশে এসে সে দেওয়ানবাগি পীরের কিছু মুরিদের সাথে কথা বলে নিজ দেশে গিয়ে প্রচার করল যে, "তোমরা জানো, বাংলাদেশের সুন্নি মুসলিমরা কি বিশ্বাস করে? এই রকম ভয়াবহ শিরক আর কুফরে তারা বিশ্বাস করে - তাহলে আপনি কি বলবেন যে, সেই ব্যাক্তি বাংলাদেশের মুসলিমদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেয়েছে?

শিয়া -সুন্নি একটি রাজনৈতিক খেলা যার মাধ্যমে দাজ্জাল ইসরায়েলের সহযোগী সৌদি আরব সরকার, কাতার সরকার, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকার নিজের দেশের মুসলিমদের ব্যস্ত রেখেছে যাতে তারা নিজ দেশের সরকারের বিরুদ্ধে কিছু না বলে, চিন্তা-ভাবনা না করে। এ কাজে এই দেশগুলোর শাসকগণ টাকার বিনিময়ে কিছু আলেম রেখে দিয়েছে যাদের কাজ হচ্ছে শিয়াদের দোষ-ত্রুটি প্রচার করা। এদের মধ্যে সালাফি বা আহলে হাদিস দল প্রধান ভূমিকা পালন করে। কিছু দিন আগে আইএসআইএস (ISIS) নামের একটি চরমপন্থি, বিপথগামী সুন্নি সংগঠন শিয়া মুসলিমদের নির্বিচারে হত্যা করেছিল। এটা হচ্ছে বিভিন্ন আরব দেশের দাজ্জাল

শাসকদের একটি খেলা। খেলাটি হচ্ছে শিয়া- সুন্নি দ্বন্দ্ব লাগিয়ে রাখো আর নিজেরা সরকার প্রধান হয়ে আজীবন থেকে যাও।

যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিবেচনা করি তাহলে আরব দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র ইরান দাজ্জাল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছে, প্যালেস্টাইনের পক্ষে কথা বলছে। প্যালেস্টাইনের মুসলিমরা শিয়া নয় তারা বেশিরভাগ সুন্নি; তারপরও ইরানের মুসলিমরা (শিয়ারা) যে প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের পক্ষে লড়াই করে, কথা বলে। শিয়ারা আমাদের শত্রু নয়, সুন্নিরাও আমাদের শত্রু নয় - আমাদের শত্রু হচ্ছে ইসরায়েল।

আমার জানা মতে, মুয়াবিয়ার অধীনে যে সকল সাহাবী আলীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তাদেরকেও শিয়ারা সাহাবী বলে মানে না এবং তাদের থেকে বর্ণিত হাদিস গ্রহন করে না।

‘ইকরিমা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ ইব্‌নে ‘আব্বাস (রাঃ) তাকে ও আলী ইব্‌নে আবদুল্লাহ্‌কে বলেছিলেন যে, তোমরা আবূ সা’ঈদ (রাঃ)-এর নিকট যাও এবং তার কিছু বর্ণনা শোন। অতঃপর আমরা তার নিকট গেলাম। সে সময় তিনি ও তার ভাই বাগানে পানি সেচের কাজে ছিলেন। আমাদের দেখে তিনি আসলেন এবং দু’ হাঁটু বুকের সঙ্গে লাগিয়ে বসে বললেন, মসজিদে নববীর জন্য আমরা এক একটি করে ইট বহন করছিলাম। আর ‘আম্মার (রাঃ) দু’ দু’টি করে বহন করছিল। সে সময় নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার পাশ দিয়ে গেলেন এবং তার মাথা থেকে ধূলাবালি মুছলেন এবং বললেন, আম্মারের জন্য বড় দুঃখ হয়, সীমা লঙঘনকারী দল তাকে হত্যা করবে। সে (‘আম্মার) (রাঃ) তাদেরকে আল্লাহ এর দিকে ডাকবে এবং তারা আম্মারকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে। (সহীহ আল-বুখারী ২৮১২)

আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) মুয়াবিয়া এবং আলীর মধ্যে সংগঠিত সিফফিনের যুদ্ধে আলীর (রাঃ) পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তিনি মুয়াবিয়ার বাহিনীর হাতে শহীদ হন। সহিহ বুখারির ২৮১২ নাম্বার হাদিস থেকে এটা প্রমাণিত যে, আলী রাঃ ছিলেন সঠিক পথে - আল্লাহ এর পথে, অন্য দিকে মুয়াবিয়া ও তার দলের লোকেরা ছিল জাহান্নামের পথে। এখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝানোর কিছুই নেই বা অর্থ পাল্টানোর কোনো সুযোগ নেই। এখন কেউ যদি মুয়াবিয়া এবং তার দলে থাকা লোকদেরকে সাহাবী ও তাবেঈ-তাবেঈন হিসাবে অস্বীকার করে এবং তাদের থেকে বর্ণিত হাদিস গ্রহন না করে - তাহলে আমরা তাদের কাফির বা ফাসিক বলতে পারি না কারণ আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, আম্মার ইবনে ইয়াসিরের (রাঃ) বিরুদ্ধে যারা লড়াই করবে এবং আম্মারকে (রাঃ) হত্যা করবে তারা আম্মারকে অর্থাৎ মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে। জাহান্নামের দিকে যারা আম্মারকে (রাঃ) ডাকবে তাদের থেকে বর্ণিত হাদিস আমরা কিভাবে গ্রহন করতে পারি? – ধরুন, এটা হচ্ছে শিয়াদের যুক্তি। শিয়াদের পক্ষে আমি সাফাই করছি না। এই কথাগুলো আলোচনা করা জরুরী যাতে মানুষ শিয়াদের সম্পর্কে জানতে পারে, তাদের চিন্তা-ভাবনাগুলো বুঝতে পারে। শিয়াদের সম্পর্কে প্রকৃত সত্যটা না জানলে শিয়া-সুন্নি বিভেদ দূর করা সম্ভব নয়।

আমার মতে, একজন মুসলিমের উচিত আবু বকর, ওমর, ওসমানকে খলিফা হিসেবে মানা ও সম্মান করা এবং মুয়াবিয়াকে সাহাবী হিসাবে অস্বীকার করা এবং ইয়াজিদকে ঘৃণা করা।

দেখা যাচ্ছে যে, শিয়া-সুন্নি উভয় দলেই ব্যাপক ভুলত্রুটি আছে। শিয়া-সুন্নি একে অপরকে কাফির না বলে, কিভাবে একত্রে ইসরায়েলের মুকাবিলা করা যায় -সেটা নিয়েই চিন্তা করতে হবে, কাজ করতে হবে।

শিয়া - সুন্নি আলোচনায় আমার উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম রক্ষায় শিয়া-সুন্নি বিভেদকে পাশে রেখে একত্রে ইসরাইল ও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে কিভাবে একতাবদ্ধ হওয়া যায় সেই রাস্তা খুঁজে বের করা। শিয়াদেরকে কাফির বলে ফতোয়া দিবেন না। শিয়ারা কাফির নয়। সুন্নিদের মধ্যে পীরপন্থিদেরও কাফির বলে ফতোয়া দেয়া যাবে না। শিয়া-সুন্নি সহ পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম-ই বর্তমান বিশ্বে দাজ্জালের মতাদর্শ দ্বারা আক্রান্ত ও বিপথগামী হয়ে গেছে। আমাদের একে অপরের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে হবে, একে অপরকে বুঝতে হবে, সঠিক জ্ঞানের প্রচার করতে হবে এবং সহনশীল হতে হবে।

আফগানিস্থানে তালেবান সরকারের অধীনে সুন্নি ও শিয়া মুসলিমরা মিলে-মিশে আছে। আফগানিস্থানে শিয়ারা সংখ্যায় অনেক কম হলেও তালেবান সরকারের অধীনে কেউ তাদের উপর অত্যাচার করতে পারছে না। সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভণ্ড সুন্নিরা ইরানের শিয়াদের নিয়ে কিছু মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ভিডিও বানিয়ে ছাড়ে আর সেই সব ভিডিও দেখে বাংলাদেশের মূর্খ সুন্নিরা আস্ফালন করে।

বর্তমানে ঈমান, আকিদার ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে আফগানিস্থানের মুসলিমরা।

ফিলিস্থিনে মুসলিমদের উপর গণহত্যা করছে ইসরায়েলের ইহুদীরা। গাজাতে মুসলিমদের গণহত্যা চলছে; মুসলিম নারীরা ধর্ষিত হচ্ছে, শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে। ভারতে ওয়াকফ বিলের মাধ্যমে মুসলিমদের সম্পদ কেড়ে নেয়া হচ্ছে, তাদের ব্যবসা নিয়ে যাচ্ছে হিন্দু চরমপন্থীরা। মায়ানমারের মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর পর তাদেরকে বাড়ি ছাড়া করা হয়েছে। কাশ্মিরে মুসলিম নিধন চলছে। এই অবস্থার জন্য অন্যতম দায়ী একটি মতাদর্শ যার নাম জাতীয়তাবাদ। তুরস্কে মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক যখন দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হন, তিনি-ই প্রথম মুসলিমদের মাঝে জাতীয়তাবাদের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করেন। তুর্কি জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তুরস্ক নামের একটি আধুনিক রাষ্ট্র। তারপর ইবনে সউদ আরব জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করেন সৌদি আরব। এখন সকল মুসলিম দেশের মুসলিমরাই জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী; যেমনঃ বাংলাদেশী, ইনডিয়ান, পাকিস্থানি, আরব,ইত্যাদি। এর ফলে ভারতের মুসলিমদের বা মায়ানমারের মুসলিমদের গণহত্যা করা হলে আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকি। আমরা ভাবি যে, আমার দেশে তো কিছু হয়নি, অথচ মায়ানমার যদি বাংলাদেশের ছোট একটি অঞ্চল বা একটি উপজেলাও দখল করে নেয় তাহলে পুরো দমে যুদ্ধ করবে বাংলাদেশ মায়ানমারের বিরুদ্ধে। এটাই হচ্ছে জাতীয়তাবাদের কুফল। ফিলিস্থিনের মুসলিমদের গণহত্যা করা হলেও মিশর,

জর্ডান, লেবানন, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, তুরস্ক কোন সামরিক পদক্ষেপ নেয় না কারণ তারা মনে করে যে, ফিলিস্থিন তাদের দেশ নয়, তাদের দেশের কারো উপর হামলা হয়নি, সুতরাং তাদের কোন সামরিক পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন নেই। বরং তারা শুধু নিজের দেশের ভূমি ও জনগণের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে। এজন্য-ই মুসলিমরা সব জায়গায় নির্যাতিত, নিপীড়িত, ধর্ষিত ও গণহত্যার শিকার হচ্ছে। জাতীয়তাবাদ একটি দাজ্জালের বিশ্বাস বা মতাদর্শ। এই বিশ্বাস বা মতাদর্শ যতদিন মুসলিমদের মাঝে থাকবে ততদিন তারা নির্যাতিত হবে।

অন্য সকল পরিচয় বাদ দিয়ে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে এবং বলতে হবে যে, আমরা শিয়া নই, সুন্নি নই - আমরা মুসলিম, শুধু মুসলিম। এই পরিচয়ে ভারত, পাকিস্থান, বাংলাদেশ, মায়ানমার, প্যালেস্টাইনসহ সারা দুনিয়ার মুসলিমদের একতাবদ্ধ হতে হবে। আল্লাহ চাইলে, তাহলে, মুসলিমদের এই ইঁদুরের মত জীবন শেষ হয়ে সম্মানের জীবন শুরু হবে।

ইয়াজুজ –মাজুজকে আল্লাহ ছাড়া কেউ পরাজিত করতে পারবে না – যেটা ইসা আঃ আসার ও বহু পড়ে আল্লাহ কীট পাঠিয়ে তাদের মৃত্যু দিবেন –তখন তারা পরাজিত হবে। তাই, আমাদের (মুসলিমদের) উচিত হবে আমাদের নিজেদের ভূখণ্ডকে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের হাত থেকে রক্ষা করা।

জাবির বিন সামুরাহ থেকে বর্ণিত, নাফি' বিন 'উতবা বিন আবু ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ বিজয় দান করবেন। তারপর তোমরা রোমানদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ বিজয় দান করবেন। তারপর তোমরা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ বিজয় দান করবেন।" জাবির বলেন: "তোমরা রোমানদের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত দাজ্জালের আবির্ভাব হবে না।" সুনান ইবনে মাজাহ ৪০৯১

অর্থাৎ, দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদেরকে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। আর ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে নিরাপদ থাকতে হলে আমাদেরকে পর্বতমালা বা পাহাড়ী ভূখণ্ডে থাকতে হবে কারণ এই ব্যাপারে হাদিসে ইঙ্গিত দেয়া আছে। ইসা আঃ কে আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে নিরাপদে থাকার জন্য সঙ্গী- সাথী নিয়ে পাহাড়ে চলে যেতে বলেছেন। ইসা আঃ পাহাড়ে ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে নিরাপদে থাকবেন। এখন বাংলাদেশে পার্বত্য চিটাগাং এ কিছু পাহাড় আছে তবে এটুকু পাহাড় যথেষ্ট নাও হতে পারে; তাই আরাকান পর্বতমালা হতে পারে এই অঞ্চলের মুসলিমদের জন্য ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে নিরাপদ একটি জায়গা।

যদি হিন্দু চরমপন্থিরা অখণ্ড ভারতের নামে বাংলাদেশ ও ভারতের মুসলিমদের উপর হামলা করে তাহলে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, রাখাইন, মিজোরাম,আসাম এবং আরাকান মিলিয়ে যে অঞ্চল হয় এই অঞ্চলেই ভারত, মায়ানমার এবং বাংলাদেশের মুসলিমদের মূল ভূখণ্ড তৈরি করতে হবে এবং এই অঞ্চলে একত্রিত হয়েই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে । গৌড় তথা লখনৌতিকে কেন্দ্র করে বাংলার সুলতানরা, দিল্লি থেকে মুক্তভাবে,

বাংলা শাসন করেছেন। আল্লাহ চাইলে, এই অঞ্চলকে ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে মুক্ত করে রাখা যাবে। পাহাড়ি এলাকায় ইয়াজুজ-মাজুজের সামরিক সরঞ্জাম; যেমনঃ ট্যাঙ্ক, বিমান, সাঁজোয়াযান, ইত্যাদি ঠিকমত চলে না। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে হিন্দুকুশ পর্বতমালা বেষ্টিত আফগানিস্থানে। ইয়াজুজ-মাজুজের বোমার আঘাত পাহাড়ে পড়লে, পাহাড়ের তেমন কোন ক্ষতি হয় না। পাহাড়ে থাকে অনেক গুহা। এই সবকিছুই ইয়াজুজ-মাজুজের জন্য অসুবিধাজনক। কিন্তু সমতল ভূমিতে ইয়াজুজ-মাজুজের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। তাই, আরাকান পর্বতমালা এবং এর আশে-পাশের পাহাড়ী অঞ্চল মুসলিমদের জন্য খুবই উপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। বর্তমানে, রাখাইন ও আরাকান অঞ্চল ঘিরে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। আরাকান আর্মির মাধ্যমে আমেরিকা, ইন্ডিয়া আরাকান অঞ্চলকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে চাইছে। অপরদিকে মায়ানমার আরাকানকে নিজেদের নিয়ন্ত্রনেই রাখতে চাইছে। এ নিয়ে এই অঞ্চলে যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধে বাংলদেশের ও জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। অপরদিকে ভারত বাংলাদেশকে চেপে ধরতে চাইছে। বাংলাদেশে সারজিকাল স্ট্রাইক করার প্রচ্ছন্ন হুমকিও ভারত দিয়ে রেখেছে। ভারত-পাকিস্থান প্রায়ই যুদ্ধ হচ্ছে। এই সকল বিষয় মিলিয়ে উপমহাদেশ গাজয়াতুল হিন্দের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে।

ভারতের হিন্দু চরমপন্থিদের হামলা ও আগ্রাসন থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হলে এখন থেকেই মুসলিমদের প্রস্তুতি নিতে হবে। এই জন্য সর্ব প্রথমে মুসলিম পরিচয়ে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্থান ও মায়ানমারের মুসলিমদের একতাবদ্ধ হতে হবে। যদি এভাবে একতাবদ্ধ না হতে পারি – তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। এই বিষয়ে আলেমদের উচিত প্রতিটি ওয়াজে, বক্তব্যে কথা বলা যে, ভারত, পাকিস্থান, মিয়ানমারের মুসলিমরা আমাদের ভাই। আলেম পর্যায়ে ভারত, পাকিস্থান, মিয়ানমার, বাংলাদেশের মধ্যে গভীর যোগাযোগ রাখতে হবে, তাহলে এই সব দেশের মুসলিমরা একে অন্যকে আপন ভাবতে শিখবে। বাংলাদেশের আলেম পাকিস্থানে গিয়ে ওয়াজ করবে আবার রাখাইনের আলেম এসে বাংলাদেশে ওয়াজ করবে – এভাবে সবাই একে অন্যের আপন হয়ে উঠবে। এভাবে ধীরে ধীরে সবার মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হবে ফলে এদের মধ্যে কেউ আক্রান্ত হলে অন্যরা তাকে রক্ষায় ঝাপিয়ে পড়বে।

আপনারা কি আল্লাহ এর দলে থাকবেন না ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালের পক্ষে? বাংলাদেশ সরকার যতই ভারতকে সুযোগ – সুবিধা দিক না কেন ভারত বাংলাদেশকে ভালো থাকতে দিবে না এবং যা মনে হচ্ছে, একদিন তারা এই দেশে হামলা করবে। এটা বুঝতে পেরেই ইউনুস সরকার চীনের সাথে এবং তুরস্ক ও পাকিস্থানের সাথে সামরিক সহযোগিতা বাড়াতে চেষ্টা করছে কিন্তু উপমহাদেশের মুসলিমদেরকে একতাবদ্ধ করতে না পারলে বাংলাদেশের মুসলিমদের অস্তিত্ব সংকটে পড়তে পারে। আল্লাহ চাইলে, যদি আরাকান পর্বতমালা ও আশেপাশের পাহাড়- পর্বত বিসৃত অঞ্চল (পার্বত্য চিটাগাং সহ) মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে ভারতের হিন্দু চরমপন্থিরা তাদের পূর্ণ শক্তি দিয়েও মুসলিমদের পরাজিত করতে পারবে না কারণ ইসা আঃ ও ইয়াজুজ-

মাজুজ সম্পর্কিত হাদিসে ইঙ্গিত আছে যে, পাহাড়ে ইজাজুজ-মাজুজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। আফগানিস্থানের যুদ্ধে এটাই হয়েছে।

বাংলাদেশে কিছু মুসলিম শেষ জমানার প্রকৃতি সম্পর্কে না বুঝে ছোট ছোট দল করে হামলা করে – এটা অনেক বড় একটি ভুল। আমাদেরকে মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম প্রচার করতে হবে, দাজ্জাল কে – তার পরিচয় সাধারণ মানুষের/ মুসলিমদের কাছে প্রচার করতে হবে –তখন দাজ্জালের শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে আর এভাবেই মুসলিমদের বিজয়ের সূচনা হবে। খেয়াল করে দেখুন, হাদিসে আছে, দাজ্জালের পরিচয় এক যুবক প্রকাশ করে দেবে ফলে দাজ্জাল তাকে হত্যা করতে চাইলেও আর হত্যা করতে পারবে না। বাংলাদেশে এখন হচ্ছে ইসলাম প্রচারের সময়। এই দেশে সুফিবাদ, পীরতন্ত্র, আহলে হাদিস, গণতান্ত্রিক ইসলাম এবং বিভিন্ন তরিকার ইসলামের নামে শক্তিশালী দাজ্জালের মতাদর্শ মুসলিমদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় আছে; প্রথমে এদেরকে সঠিক ইসলাম বুঝাতে হবে, দাজ্জালের মতাদর্শ কি এবং দাজ্জাল কে সেটা প্রচার করতে হবে, এজন্য মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রচার করতে হবে। নির্যাতন, নিপীড়ন আসলেও তা ধৈর্য ধরে সহ্য করতে হবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহ এর উপর ভরসা রাখতে হবে। সময় ও পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে পারেন একমাত্র আল্লাহ।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ মুসলিমরা ৫ ওয়াক্ত নামাজ-ই পড়ে না। যে অল্প কিছু মুসলিম ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ দাজ্জালের ধোঁকায় (পীরতন্ত্র, গণতান্ত্রিক ইসলাম, তাবলীগ জামাত, আহলে হাদিস দল) পড়ে আছে। এই দেশে এখন প্রয়োজন মুহাম্মাদ সাঃ এর আনীত ইসলামের প্রচার যা বিকৃত ইসলামের মধ্যে পড়ে থাকা মুসলিমদের শিরক থেকে মুক্ত করে প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলবে।

ভারতীয় চরমপন্থি অনেক সংগঠন ও রাজনৈতিক দল এবং কিছু বাংলাদেশী ও পাকিস্থানী সেকুলার আশা করছে এবং পরিকল্পনা করছে যে, কিভাবে ভারত, পাকিস্থান, বাংলাদেশ আবার একীভূত হতে পারে যাতে চরমপন্থি হিন্দুদের স্বপ্ন ‘অখণ্ড ভারত’ বাস্তবায়িত হয় যেখানে সনাতনী (হিন্দু) সংস্কৃতি চলবে এবং সনাতনীরা রাজত্ব করবে – মুসলিমরা হবে তাদের ক্রীতদাসের মত। অখণ্ড ভারত নিয়ে ভারতের প্রখ্যাত একজন হিন্দু পুরোহিত বলেছেন যে, অখণ্ড ভারত অর্থ এই নয় যে, ভারত বাংলাদেশ, পাকিস্থান, নেপাল ইত্যাদিকে দখল করে নিবে - অখণ্ড ভারতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারত, পাকিস্থান, বাংলাদেশ, নেপালে সনাতনী সংস্কৃতি, কৃষ্টি চলবে এবং রাষ্ট্রগুলোতে এমন সরকার থাকবে যারা সনাতনীদের সুযোগ-সুবিধাকে প্রাধান্য দিবে। সনাতনী সংস্কৃতি, কৃষ্টি -কালচার লালন করবে ও সনাতনীদের চাকরী, ব্যবসায় বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দিবে এমন সরকার এই সকল দেশে বসানোই হচ্ছে 'অখণ্ড ভারত' মতাদর্শের মূল উদ্দেশ্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুক্ত ক্রীতদাস সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা

করবেন: একটি দল যারা ভারত জয় করবে এবং আরেকটি দল যারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে থাকবে।” (আন-নাসাঈ (নং ৩১৭৫) এবং ইমাম আহমদ আল-মুসনাদ (৩৭/৮১)

বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদ থেকে, তিনি সফওয়ান থেকে, তিনি জনৈক শায়খ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন; আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিন্দুস্তানের যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘অবশ্যই তোমাদের একটি দল হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাঁদের বিজয় দান করবেন। তাঁরা হিন্দুস্তানের রাজাদের শিকল দিয়ে বেঁধে টেনে আনবে। আল্লাহ তাআলা সেই মুজাহিদদের সকলকে ক্ষমা করে দেবেন। অতঃপর মুসলিমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ঈসা ইবনে মারইয়ামকে আঃ শামে পেয়ে যাবে।’ আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, ‘আমি যদি গাজওয়াতুল হিন্দের সময় বেঁচে থাকি, তাহলে আমার সমস্ত সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে দেব এবং সেই যুদ্ধে শরীক হব। এরপর যখন আল্লাহ তা’আলা আমাদের বিজয় দান করবেন এবং আমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসব, তখন আমি হব (জাহান্নামের আগুন হতে) মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরাইরা, যে শামে গিয়ে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে মিলিত হবে।’ (আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আমি তখন নবীজীকে বলেছিলাম,) ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার খুব আকাংখা যে, আমি ঈসা আলাইহিস সালাম-এর নিকটবর্তী হয়ে তাঁকে সংবাদ দেব যে, আমি আপনার সংশ্রবপ্রাপ্ত একজন সাহাবী।’ তিনি বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন এবং বললেন, সে (যুদ্ধ) তো অনেক দেরি! অনেক দেরি!” (-আলফিতান, নুআইম ইবনে হাম্মাদ ১/৪০৯, হাদীস ১২৩৬)

আল্লাহ এর রসূলের সাঃ গাজওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কিত হাদিসগুলোতে মুসলিমরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে বা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এমন কোন কথা নেই। হাদিসগুলোতে মুসলিমরা মুশরিক বা সনাতনী বা হিন্দু রাজাদের শিকল পড়াবে এমন কোনো কথাও নেই। আলফিতান, নুআইম ইবনে হাম্মাদ ১/৪০৯, হাদীস ১২৩৬ তে বলা হয়েছে মুসলিমরা হিন্দুস্থানে যুদ্ধ করবে, হিন্দুস্থানের রাজাদের অর্থাৎ সরকার প্রধানদের শিকল পড়াবে। আল্লাহ এর রসূলের সাঃ সময়ে হিন্দুস্থান ছিল বর্তমানের বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, পাকিস্থান ও মায়ামারের রাখাইন অঞ্চল (৬২৫ সালের হিন্দুস্থান মানচিত্র দেখুন)। হিন্দুস্থান বলতে হিন্দুদের বুঝায় না। হিন্দুস্থান হচ্ছে একটি জায়গার নাম। হিন্দুস্থানের রাজাদের বা সরকার প্রধানদের শিকল পড়ানোর অর্থ হচ্ছে এই অঞ্চলের রাজাদের বা সরকার প্রধানদের শিকল পড়াবেন হিন্দুস্থানের যুদ্ধে বিজয়ী মুসলিমরা। এখন এই রাজারা হিন্দু হতে পারে আবার নামধারী মুসলিম -ও হতে পারে। (-আলফিতান, নুআইম ইবনে হাম্মাদ ১/৪০৯, হাদীস ১২৩৬) থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, যেহেতু আমরা ইসা আঃ এর আগমনের খুব কাছাকাছি সময়ে আছি তাই গাযয়াতুল হিন্দ-ও খুব নিকটবর্তী বলে মনে হচ্ছে।

গাযওয়াতুল হিন্দে শুধু হিন্দুস্থানের মুসলিমরা নয় - অন্য অঞ্চলের মুসলিমরাও অংশ নিবে বলে মনে হচ্ছে কারণ হাদিসের ভাষা খেয়াল করুন - "অতঃপর মুসলিমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ঈসা ইবনে মারইয়ামকে আঃ

শামে পেয়ে যাবে"। মুসলিমরা যুদ্ধ করছিল হিন্দুস্থানে কিন্তু তারা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে শামে ইসা আঃ কে পেয়ে যাবে এর অর্থ হচ্ছে হিন্দুস্থানে যারা যুদ্ধ করবে তারা সবাই হিন্দুস্থানের মুসলিম নয়, শাম অঞ্চল থেকে বা পৃথিবীর অন্য অঞ্চল থেকেও মুসলিমরা হিন্দুস্থানের যুদ্ধে যোগ দিবে বলে মনে হচ্ছে। যদি শুধু হিন্দুস্থানের মুসলিমরা এই যুদ্ধ করত তাহলে তাদের যুদ্ধ শেষে কোথাও ফিরে যাবার প্রশ্ন আসত না কারণ তারা তো হিন্দুস্থানের-ই বাসিন্দা, তারা আর যুদ্ধ থেকে ফিরে কোথায় যাবে? কিন্তু যদি এই সকল যোদ্ধারা অন্য অঞ্চলের হয় তাহলেই তাদের যুদ্ধ শেষে নিজের অঞ্চলে বা বাড়িতে ফিরে যাবার প্রশ্ন আসে। গাযওয়াতুল হিন্দের যুদ্ধ থেকে ফিরে মুসলিমরা যখন নিজ নিজ অঞ্চলে বা বাড়িতে যাবে বা বাড়িতে যাবার পথে থাকবে তখন তারা শামে ইসা আঃ কে পেয়ে যাবে।

ইসা আঃ এর আগমন এবং গাযয়াতুল হিন্দ – কোনটি আগে হবে? এর উত্তর আছে, আলফিতান, নুআইম ইবনে হাম্মাদ ১/৪০৯, হাদীস ১২৩৬ তে। হিন্দুস্থানের যুদ্ধে যে সকল মুসলিম হিন্দুস্থানের বাহির থেকে এসে হিন্দুস্থানে যুদ্ধ করবে তারা যুদ্ধের জন্য হিন্দুস্থানের দিকে যখন রওনা হয়েছিল তখন তারা শামে ইসা আঃ কে পায়নি অর্থাৎ তখন ইসা আঃ আগমন করেন নি কিন্তু যুদ্ধ শেষে তারা যখন ফিরে যাবে তখন তারা ইসা আঃ কে শামে পেয়ে যাবে। তারা যখন হিন্দুস্থানে যুদ্ধ করতে থাকবে তখন শামে ইসা আঃ এর আগমন ঘটবে বলে মনে হচ্ছে। এখান থেকে এটাও বুঝা যাচ্ছে যে, হিন্দুস্থানের যুদ্ধ অনেক দিন ধরে চলবে। এখান থেকে এটাও বুঝা যাচ্ছে যে, ইসা আঃ যখন আগমন করবেন তখন বিশ্বে মুসলিমদের সাথে অন্যদের যুদ্ধ চলমান থাকবে।

ভারতে গাজয়ায়ে হিন্দ এর পটভূমি রচনা করেছেন এবং করছেন মোদী ও তার দল বিজেপি। মোদী মুসলিমদের উপর চরম নিপীড়ন করছেন। মোদী ভারতে NRC ও CAA,2019 বিল পাস করার পর ভারতীয় লাখ লাখ মুসলিম – বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, দিল্লি, জনপুরে বসবাসরতরা ভারতীয় নাগরিকত্ব হারাবেন এবং তারা কোন জমির মালিক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ইত্যাদি হতে পারবেন না, নিজ দেশ ভারতে মুসলিমদেরকে শরণার্থী হিসেবে বসবাস করতে হবে। বিগত ১০ বছরে মোদী ভারতে মুসলিমদের উপর ভয়াবহ নির্যাতন করেছেন। সেই সাথে বাংলাদেশে হাসিনা মুসলিমদের উপর ভয়াবহ নির্যাতন করেছে। উভয় ঘটনাই আমাদেরকে গাজওয়াতুল হিন্দের দিকে অনেকটুকুই এগিয়ে নিয়ে গেছে। ভারতীয় উগ্র হিন্দুত্ববাদ, মুসলিম নির্যাতন ও তাদের অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন আমাদেরকে গাজওয়াতুল হিন্দের দিকে অনেকটুকুই এগিয়ে নিয়ে গেছে।

গৌড় হচ্ছে দুই বাংলার মুসলিমদের একত্রিত হবার জায়গা। ১৯৪৭ -এ দেশভাগের সময় মুসলিম, হিন্দু জনবসতির ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে দেশভাগ করা হয়েছে কিন্তু আপনি অবাক হবেন যে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর দিনাজপুরে এখনো ৫০% এর বেশী মুসলিম থাকা সত্ত্বেও এই জেলাগুলোকে ভারতের অংশ করা হয়েছে ।

যে রাশিয়ায় কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে সেই রাশিয়াই কিছুদিন আগে আফগানিস্থানের তালিবান সরকারকে সর্ব প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছে, আমেরিকা কখনোই ইসরায়েলের বিপক্ষে দাড়ায়নি কিন্তু রাশিয়া ১৯৭৩ সালের আরব- ইসরায়েল যুদ্ধে (রামাদান যুদ্ধ বা অক্টোবর যুদ্ধে বা Yom Kippur War) আরবদের পক্ষে ছিল এবং আরবদেরকে ট্যাঙ্ক সহ অন্য আরও অনেক সমরাস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছিল। অপরদিকে আমেরিকা ছিল ইসরায়েলের পক্ষে। কিন্তু সৌদি আরবের দাজ্জাল আল-সউদ রাজপরিবার রাশিয়ার সাথে সন্ধি না করে বন্ধুত্ব করেছে আমেরিকার সাথে।

আমার এই বইটি পড়ে 'ওয়াহাবি' বা সালাফিরা এবং তাদের বাংলাদেশী শাখা আহলে হাদিসের অনুসারীরা ক্ষিপ্ত হবেন কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যখন গাজায় ইসরায়েলী হত্যাকাণ্ডে সারা বিশ্বের মুসলিমরা নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে তখন বাংলাদেশে আহলে হাদিসের বড় আলেম সৌদি আরবের আল সউদ রাজপরিবারের দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের বড় আলেম ড. মুজাফফর বিন মহসিন এক ওয়াজের মাহফিলে বলেছেন যে, "সকল দোষ হামাসের; হামাস কেন সৌদি আরবের অনুমতি ছাড়া ইসরায়েলে হামলা করল? সকল দোষ হামাসের, হামাস হচ্ছে ইরানের বন্ধু, সৌদি আরব কেন ফিলিস্থিনে সহযোগিতা করবে?"

অন্যদিকে বাংলাদেশের সুন্নি জামাতের (সুফি ও পিরতন্ত্রে বিশ্বাসী) ২৯ জনের একটি দল যার নেতা ছিল হাইকোর্ট মাজার মসজিদের ইমাম ও খতিব - নুরুল ইসলাম ফারুকির সন্তান - আহমদ রেজা গত ১৩ই এপ্রিল,২০২৫ সালে ইসরায়েলে গিয়ে ছবি তুলে ফেসবুকে দেয় এবং বলে যে, "ইসরায়েলে কোন সমস্যা নাই, সবকিছু ভালো আছে। বাইতুল মুকাদ্দাস ভালো আছে, অক্ষত আছে, নিরাপদ আছে, সবকিছু নিরাপদ আছে, সব কিছু ঠিক আছে" । কোনো মুসলিমকে ইসরায়েল যখন তাদের দেশে ঢুকতে দেয় না, বাংলাদেশের পাসপোর্ট দিয়ে যখন ইসরায়েলে ভ্রমন করা যায় না, সেখানে তারা ইসরায়েলে রাজার মত আছে। তারা আবার লিখেছে, "ইসরায়েলের সেনাবাহিনী নাকি অনেক ভালো, তাদেরকে অনেক সহযোগিতা করেছে" ।

ইসরায়েল হচ্ছে এক দাজ্জাল আর সুফিজম / পীরতন্ত্র হচ্ছে আরেক দাজ্জাল। দুই দাজ্জালের মধ্যে মিল মহব্বত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। 'মুফতি আলাউদ্দিন জিহাদি', মুফতি গোলাম রাব্বানি, মুফতি হাসিনুর রাহমান তাদের ইসরায়েল ভ্রমনের ছবিও দিয়েছেন। মুফতি আলাউদ্দিন জিহাদি সহ অন্য আরেকজনকে ইসরায়েল পুলিশের কপালে চুমু দিতেও দেখা যায়। তারা একসাথে এ সকল কিছু ভিডিও করেছেন এবং তা নেট দুনিয়ায় ছড়িয়েও দিয়েছেন। এরাই হচ্ছে বাংলাদেশে সুফিজমের / পীরতন্ত্রের ধারক,বাহক। এদের কি আর কোন পরিচয়ের দরকার আছে? এরা মাদ্রাসা থেকে পাস করে 'মুফতি' হয়েছেন, 'আলেম' হয়েছেন – এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, কেন ১৪৫৩ সালের পর থেকে কাউকেই আর আলেম বলে স্বীকৃতি দেয়া যাবে না। এটা আমার ব্যাক্তিগত মতামত।

আপনি যদি এতটুকু পর্যন্ত বইটি পড়ে থাকেন তাহলে আপনি অবাক হচ্ছেন যে, চারিদিকে তো তাহলে প্রকৃত মুসলিম বলে কাউকেই দেখছি না। যাদেরকে 'আলেম' বলে জানতাম তারা তো দেখছি দাজ্জালের অনুসারী। বিজ্ঞান দেখছি যাদুর ফসল। জ্যোতির্বিজ্ঞান হচ্ছে যাদু। চারিদিকে শিরক, কুফরে পরিপূর্ণ – এটা কিভাবে সম্ভব? জুলকারনাইনের প্রাচীরের কথা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন সুতরাং এই প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ার প্রায় ৫৬০ বছর পর পৃথিবীর অবস্থা এর চেয়ে ভালো কি হবে? দাজ্জালের আবির্ভাবের প্রায় ৫৬০ বছর পর শিরক-কুফরে সমাজ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এটাই তো স্বাভাবিক যেখানে দাজ্জাল ২ বার আবির্ভূত হয়ে গেছে, প্রথমবার সে নিজেকে নবী দাবী করেছে, পরের বার সে নিজেকে রব দাবী করেছে। এই অবস্থা এখনো চলমান আছে। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন ফিতনা বা পরীক্ষা হচ্ছে দাজ্জালের ফিতনা বা পরীক্ষা যার মুখোমুখি হয়েছি আমরা।

'ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, "আদম সৃষ্টির সময় থেকে কিয়ামতের দিনের মধ্যে, দাজ্জালের ফিতনা বা পরীক্ষার চেয়ে বড় আর কিছু নেই।" (রিয়াদ আস-সালিহিন ১৮১৪)

অনেককেই বলতে শুনেছি যে," দাজ্জাল আবির্ভাবের সময় যদি আমি থাকি তাহলে আমি সেই যুবকের মত হব যে যুবক দাজ্জালের পরিচয় মানুষের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিল"। অনেকেই বলে, " ইশ, আমি জীবিত থাকা অবস্থায় যদি দাজ্জাল আসত তাহলে আমি দাজ্জালের বিরুদ্ধে দাঁড়াতাম। কত ভালো হত যদি আমি সেই যুবক হতাম - যে দাজ্জালের কাছে গিয়ে বলেছে যে, তুমিই দাজ্জাল"। আল্লাহ আপনাকে সেই যুবক হবার সুযোগ দিয়েছেন। আপনি কি দাজ্জালের পরিচয় মানুষের কাছে প্রকাশ করে দিবেন? এই বইটি অনলাইনে আপনার পরিচিত সকল গ্রুপে ও পরিচিত লোকদের সাথে শেয়ার করলেও তো দাজ্জালের পরিচয় প্রকাশে আপনার ভূমিকা রাখা হয়। আল্লাহ চাইলে, এটা অনেক বড় সওয়াবের কাজ হবে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই তকদীর কি; তকদীর অপরিবর্তনীয় আবার দুয়ার মাধ্যমে তকদীর পরিবর্তন হয় – এই বিষয়গুলো কিভাবে হয় – সেটা বুঝেন না, তাই আমি তকদীর কি এবং তকদীরের ব্যাখ্যা এখানে দিয়ে দিলাম।

তকদীর কি এবং তকদীরের ব্যাখ্যা

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এক রাতে কা'বার মাসজিদ থেকে সফর করানো হয়। বিবরণটি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ওয়াহী পাঠানোর আগে তাঁর কাছে তিনজন ফেরেশতার একটা জামা'আত আসল। যখন তিনি মাসজিদুল হারামে ঘুমিয়ে ছিলেন। এদের প্রথম জন বলল, তিনি কে? মধ্যের জন বলল, তিনি এদের সব চেয়ে ভাল লোক। সর্বশেষ জন বলল, তা হলে তাদের সব চেয়ে ভাল লোকটিকেই নিয়ে চল। সে রাতের ঘটনা এতটুকুই। এরপর তিনি আর তাদেরকে দেখেননি।

শেষপর্যন্ত তারা অন্য এক রাতে আসলেন, যা তিনি অন্তর দ্বারা দেখছিলেন। তাঁর চোখ ঘুমায়, অন্তর ঘুমায় না। যে রকম অন্য নবীগণের (আঃ) চোখ ঘুমিয়ে থাকে, অন্তর ঘুমায় না। এ রাতে তারা তাঁর সঙ্গে কোন কথা না বলে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যমযম কূপের কাছে রাখলেন। জিবরীল (আঃ) তাঁর সাথীদের থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দায়িত্ব নিলেন।

জিবরীল (আঃ) তাঁর গলার নিচ হতে বুক পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন এবং তাঁর বুক ও পেট থেকে সবকিছু নেড়েচেড়ে যমযমের পানি দ্বারা নিজ হাতে ধৌত করেন। সেগুলোকে পরিস্কার করলেন, তারপর সোনার একটি তশ্তরী (gold tray) আনা হল। এবং তাতে ছিল একটি সোনার পাত্র যা ঈমান ও জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর বুক ও গলার রগগুলো এর দ্বারা পূর্ণ করলেন। তারপর সেগুলো যথাস্থানে রেখে বন্ধ করে দিলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে পৃথিবীর আসমানের দিকে উঠলেন। আসমানের দরজাগুলো হতে একটি দরজাতে নাড়া দিলেন। ফলে আসমানবাসীগণ তাঁকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? তিনি উত্তরে বললেন, জিব্রীল। তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সঙ্গে কে?

তিনি বললেন, আমার সঙ্গে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জিজ্ঞেস করলেন, তাকে কি ডেকে আনা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তাঁরা বললেন, মারহাবান ওয়া আহলান (আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি আপনজনের মধ্যে এসেছেন) । আপনার আগমনে আসমানবাসীরা খুবই আনন্দিত। আল্লাহ্ যমীনে তার রসূলকে সাঃ নিয়ে কী করতে চাচ্ছেন, তা আসমানবাসীদেরকে না জানানো পর্যন্ত তারা জানতে পারে না। দুনিয়ার আসমানে তিনি আদম (আঃ)-কে পেলেন।

জিবরীল (আঃ) তাঁকে দেখিয়ে বললেন, তিনি আপনার পিতা, তাঁকে সালাম দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সালাম দিলেন। আদম (আঃ) তাঁর সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, মারহাবান ওয়া আহলান হে আমার পুত্র! তুমি আমার কতই না উত্তম পুত্র। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি প্রবহমান নদী দুনিয়ার সবচেয়ে কাছের আসমানে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এ নদী দু'টি কোন নদী হে জিবরীল? জিবরীল (আঃ) বললেন, এ দু'টি হলো নীল ও ফুরাতের উৎস।

এরপর জিবরীল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সঙ্গে নিয়ে এ আসমানে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি আরো একটি নদী দেখলেন। এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল মোতি ও পান্নার তৈরি একটি প্রাসাদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নদীতে হাত দিলেন এবং দেখলেন এর নিচে মাটি উন্নতমানের মিস্ক দিয়ে তৈরি। তিনি বললেন, হে জিব্রীল! এটি কী? জিবরীল (আঃ) বললেন, হাউযে কাউসার। যা আপনার রব আপনার জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন।

তারপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সঙ্গে করে দ্বিতীয় আসমানে গেলেন। প্রথম আসমানের ফেরেশ্তাগণ তাঁকে যা বলেছিলেন এখানেও তা বললেন। তারা জানতে চাইল, তিনি কে? তিনি বললেন, জিবরীল! তাঁরা বললেন, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁরা বললেন, তাঁর কাছে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁরা বললেন, মারহাবান ওয়া আহলান। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সঙ্গে করে তিনি তৃতীয় আসমানের দিকে গেলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আসমানের ফেরেশতারা যা বলেছিলেন, তৃতীয় আসমানের ফেরেশতারাও তাই বললেন। তারপর তাঁকে সঙ্গে করে তিনি চতুর্থ আসামনের দিকে গেলেন। তাঁরাও তাঁকে আগের মতই বললেন। তারপর তাঁকে নিয়ে তিনি পঞ্চম আসমানে গমন করলেন। তাঁরাও পূর্বের মতো বললেন। এরপর তিনি তাঁকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দিকে গেলেন। সেখানেও ফেরেশতারা আগের মতই বললেন।

সর্বশেষে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিয়ে সপ্তম আসমানে গেলে সেখানেও ফেরেশ্তারা তাঁকে আগের ফেরেশতাদের মতো বললেন। প্রত্যেক আসমানেই নবীগণ রয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে আমি সংরক্ষিত করেছি যে, দ্বিতীয় আসমানে ইদরীস (আঃ), চতুর্থ আসমানে হারুন (আঃ), পঞ্চম আসমানে অন্য একজন নবী, যার নাম আমি স্মরণ রাখতে পারি নি। ষষ্ঠ আসমানে রয়েছে ইব্রাহীম (আঃ) এবং আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার মর্যাদার কারণে মূসা (আঃ) আছেন সপ্তম আসমানে। সে সময় মূসা বললেন, হে আমার রবব। আমি তো ধারণা করিনি আমার ওপর কাউকে উচ্চমর্যাদা দান করা হবে। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এত উপরে উঠানো হলো, যে ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউই জানে না। শেষে তিনি 'সিদরাতুল মুনতাহায়' পৌঁছলেন। এখানে প্রবল অপ্রতিরোধ্য আল্লাহ্ তাঁর নিকটবর্তী হলেন।

অতি নিকটবর্তীর ফলে তাঁদের মাঝে দু'ধনুকের ফারাক রইল অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ওয়াহী পাঠালেন। অর্থাৎ তাঁর উম্মাতের উপর রাত ও দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের কথা ওয়াহীযোগে পাঠানো হলো। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামলেন। আর মূসার কাছে আসলে মূসা (আঃ) তাঁকে আটকিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার রবব আপনাকে কী নির্দেশ দিলেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রাত ও দিনে পঞ্চাশ বার সালাত আদায়ের। তখন মূসা (আঃ) বললেন, আপনার উম্মাত তা আদায় করতে পারবে না। কাজেই আপনি ফিরে যান, তাহলে আপনার রবব আপনার এবং আপনার উম্মাত হতে এ আদেশটি সহজ করে দেবেন।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীল (আঃ) এর দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন তিনি এ ব্যাপারে তাঁর থেকে পরামর্শ চাচ্ছিলেন। জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে ইশারায় বললেন হ্যাঁ, আপনি ইচ্ছে করলে তা হতে পারে। তাই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিয়ে প্রথমে আল্লাহর কাছে গেলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাস্থানে থেকে বললেন, হে আমার রবব! আমার উম্মাত এটি আদায় করতে

পারবে না। তখন আল্লাহ্ দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দিলেন। এরপর মূসা (আঃ)-এর কাছে ফিরে আসলে তিনি তাঁকে থামালেন। এভাবেই মূসা তাঁকে তাঁর রবের কাছে পাঠাতে থাকলেন। শেষে পাঁচ ওয়াক্ত বাকী থাকল। পাঁচ সংখ্যায়ও মূসা (আঃ) তাঁকে থামিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি আমার বনী ইসরাঈল কাওমের কাছে এটা হতেও সামান্য কিছু পেতে চেয়েছি। তবু তারা দুর্বল হয়েছে এবং পরিত্যাগ করেছে। অথচ আপনার উম্মাত শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি সব দিক দিয়ে আরো দুর্বল। কাজেই আপনি আবার যান এবং আপনার রবব থেকে আদেশটি আরো সহজ করে আনুন।

প্রতিবারই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শের জন্য জিবরাঈলের দিকে তাকাতেন। পঞ্চমবারেও জিবরীল তাঁকে নিয়ে যাত্রা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে আমার রবব! আমার উম্মাতের শরীর, মন, শ্রবণশক্তি ও দেহ খুবই দুর্বল। তাই আদেশটি আমাদের জন্য আরো সহজ করে দিন।

এরপর অপ্রতিরোধ্য আল্লাহ্ বললেনঃ "আমার পক্ষ থেকে যে কথা আসে তা পরিবর্তিত হয় না, তাই আমি তোমাদেরকে যেমন নির্দেশ দিয়েছি, মূল কিতাবে তেমনই থাকবে।" আল্লাহ আরও বলেন, "প্রতিটি সৎকর্মের প্রতিদান দশগুণ হবে, তাই মূল কিতাবে নামায পঞ্চাশটিই থাকবে, কিন্তু তোমরা কেবল পাঁচটি নামাযই আদায় করবে।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মূসার কাছে ফিরে গেলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কী করেছ?" তিনি বললেন, "তিনি (আল্লাহ) আমাদের বোঝা হালকা করেছেন: তিনি আমাদের প্রতিটি নেক কাজের জন্য দশগুণ সওয়াব দিয়েছেন।" মূসা বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি বনী ইসরাঈলকে এর চেয়ে কম পালন করাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা তা ছেড়ে দিয়েছে। অতএব, তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাও যাতে তিনি তোমার বোঝা আরও হালকা করেন।"

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "হে মূসা! আল্লাহর কসম! আমি আমার প্রতিপালকের কাছে বারবার ফিরে যেতে লজ্জা বোধ করি।" জিবরীল বললেন, "আল্লাহর নামে নেমে যাও।" এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে হারামে থাকা অবস্থায় ঘুম থেকে উঠলেন। (তথ্যসূত্র: সহীহ আল-বুখারী ৭৫১৭; বইয়ের মধ্যে তথ্যসূত্র: বই ৯৭, হাদিস ১৪২)

উল্লেখিত হাদিস থেকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়ঃ

১) পৃথিবী থেকে উপরের দিকে গেলে প্রথম আসমানে যাওয়া যাবে, আরও উপরে গেলে দ্বিতীয় আসমান, এভাবে উপরে যেতে থাকলে শেষ পর্যন্ত ৭ম আসমানে যাওয়া যাবে তবে প্রতিটি আসমানে গেট বা দরজা রয়েছে যাতে ফেরেশতারা পাহারা দিচ্ছেন; ফেরেশতারা এই গেট/দরজা খুলে দিলেই কেবল এক আসমান থেকে অন্য আসমানে যাওয়া যাবে। আর ফেরেশতারা আল্লাহ এর হুকুম ছাড়া কোন আসমানের গেট বা দরজা খুলবেন না। সপ্তম আসমানের পর রয়েছে একটি গাছ (Lote tree) – এর কাছেই রয়েছে জান্নাত।

আল-বুখারী (৭৪৩২) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি তুমি আল্লাহর কাছে কিছু চাও, তাহলে তাঁর কাছে ফিরদাউস চাও, কারণ এটি জান্নাতের মধ্যম এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ অংশ এবং এর উপরে রয়েছে পরম করুণাময়ের আরশ।"

আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন, আল্লাহ এর আরশ হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদৌসের ছাদ। সুতরাং বুঝা গেলো জান্নাত আছে সাত আসমানের উপরে।

২) তকদীর কি? তকদীর হচ্ছে আল্লাহ এর বানি/কথা যা আল্লাহ লিখে রেখেছেন 'উম্মুল কিতাবে' (Mother of the book). তকদীর অপরিবর্তনীয় – অর্থাৎ আল্লাহ এর কথা অপরিবর্তনীয়। কোন কাজের মাধ্যমে তকদীর পরিবর্তন হবে না। আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন, দুয়ার মাধ্যমে তকদীর পরিবর্তন হয় যার উদাহরণ আমরা উপরের হাদিসে দেখতে পাই। আল্লাহ বলেছেন, "আমার পক্ষ থেকে যে কথা আসে তা পরিবর্তিত হয় না, তাই আমি তোমাদেরকে যেমন নির্দেশ দিয়েছি, মূল কিতাবে (তকদীরে) তেমনই থাকবে।" আল্লাহ আরও বলেন, "প্রতিটি সৎকর্মের প্রতিদান দশগুণ হবে, তাই মূল কিতাবে নামায পঞ্চাশটিই থাকবে, কিন্তু তোমরা কেবল পাঁচটি নামাযই আদায় করবে।"

অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তকদীর পরিবর্তন হয়নি কারণ মূল কিতাবে/উম্মুল কিতাবে (Mother of the book) মুহাম্মাদ সাঃ এর উম্মতের উপর নামায ৫০ টিই ছিল এবং আছে এবং থাকবে – এই হিসাবে তকদীর অপরিবর্তনীয়; কিন্তু আল্লাহ প্রতিটি ভালো কাজকে ১০ গুণ করে দিলেন তাই আমাদেরকে ৫০ টি নামায পড়তে হবে না – পড়তে হবে ৫ টি নামায – এই দিক থেকে চিন্তা করলে আমাদের জন্য তকদীর পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং কিতাবে যা লিখা আছে তার কোন পরিবর্তন হয়নি – তাই তকদীর পরিবর্তন হয়নি কিন্তু আল্লাহ নতুন একটি আইন আমাদের জন্য দিলেন যে, প্রতিটি ভালো কাজকে ১০ গুণ করে ধরা হবে তাই, আমাদেরকে আর ৫০ টি নামায পড়তে হবে না, পড়তে হবে ৫ টি নামায – এই দিক থেকে চিন্তা করলে তকদীর পরিবর্তন হয়েছে নবী সাঃ এর চাওয়ার (দুয়ার) মাধ্যমে। তকদীর, তকদীর অপরিবর্তনীয়, দুয়ার (চাওয়ার) মাধ্যমে তকদীর পরিবর্তন হয় – এই তিনটি বিষয় আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম। সুতরাং, তকদীর একই সাথে অপরিবর্তনীয় আবার দুয়ার মাধ্যমে পরিবর্তনযোগ্য।

আল্লাহ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন

'আমরা একমাত্র আপনার ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনার কাছেই সাহায্য চাই'। (সূরা ফাতিহাঃ৫)

*** আমি এই বইয়ে যত হাদিস উল্লেখ করেছি তার মধ্যে কিছু হাদিসকে অনেক মুহাদ্দিস যইফ হাদিস বলেছেন। তবে অনেক মুহাদ্দিসদের মতে, কিছু ক্ষেত্রে যইফ হাদিস গ্রহন করা যায়ঃ (১) কুরআনের 'তাফসীর' বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, (২) ইতিহাস বা ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে। আমি এই বইয়ে কোরআনের তাফসির

করছি না। আমি ইতিহাস বা ঐতিহাসিক ঘটনাকে হাদিসের সাথে মিলিয়ে বর্ণনা করছি এবং হাদিসের আলোকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করছি; যইফ হাদিসের মাধ্যমে এটি করা যাবে। আমি এখানে যইফ হাদিসের উপর ভিত্তি করে কাউকে কোন আমল করতে বলছি না। কোরআনের আয়াত এবং হাদিস অনুসারে ইতিহাসের তথ্য অনুসন্ধান, ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ইতিহাসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এই বইয়ে উল্লেখিত হাদিসগুলোর তথ্য সঠিক। সুতরাং এই হাদিসগুলো যঈফ হবার কোন কারণ আমি খুঁজে পাইনি।

সম্পূরক অংশ

আমরা দাজ্জাল সম্পর্কিত কিছু হাদিস মূল আরবীতে দেখব এবং একটি শব্দ أَعْوَر এর সম্পর্কে জানব কারণ এই শব্দটির অর্থ সম্পর্কে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ . وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ . وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ

আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তোমাদের কাছে গোপন নন। আল্লাহ্ কানা (One Eyed) নন। এর সঙ্গে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাত দিয়ে স্বীয় চোখের দিকে ইশারা করলেন। মাসীহ্ দাজ্জালের ডান চোখ কানা (One Eyed)। তার চোখটি যেন আংগুরের মত ভাসমান। (সাহিহ বুখারি ৭৪০৭)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . صلى الله عليه وسلم . " الدَّجَّالُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُسْرَى جُفَالُ الشَّعَرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ " .

হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: 'দাজ্জাল তার বাম চোখে অন্ধ (One Eyed) এবং তার প্রচুর চুল রয়েছে। তার সাথে জান্নাত এবং জাহান্নাম থাকবে, কিন্তু তার জাহান্নাম হচ্ছে আসলে জান্নাত এবং তার জান্নাত হচ্ছে আসলে জাহান্নাম।" (সুনান ইবনে মাজাহ ৪০৭১)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَانَىِ النَّاسِ فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ . أَلاَ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِئَةٌ " .

আবূ বকর ইবনু আবূ শাইবাহ ও ইবনু নুমায়র (রহঃ) .... ইবনু উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে দাজ্জালের আলাপ-আলোচনা করে বললেন, আল্লাহ তা’আলা কানা (One Eyed) নন, কিন্তু সতর্ক হও! দাজ্জালের ডান চোখ কানা (One Eyed) হবে। আর তা আঙ্গুরের মতো ফোলা হবে।(সাহিহ মুসলিমঃ ৭২৫১; আন্তর্জাতিক নাম্বার ১৬৯)

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ."

আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্‌ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি তাঁর জাতিকে কানা (One Eyed) মিথ্যুকটির (দাজ্জালের) ব্যাপারে সতর্ক করেননি। সে (দাজ্জাল) কানা (One Eyed)। আর তোমাদের রব কানা (One Eyed) নন। তাঁর দু’চোখের মাঝখানে ‘কাফির’ লেখা থাকবে। (সাহিহ বুখারিঃ আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ৭৪০৮)

أَعْوَرَ শব্দটির ব্যুৎপত্তি (Etymology) সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে। কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি বা Etymology হচ্ছে কোন শব্দের উৎপত্তি ও ইতিহাস অধ্যয়ন - সময়ের সাথে শব্দের রূপ ও অর্থ কেমন পরিবর্তন হয়েছে তা জানা। আরবী শব্দ - أَعْوَرَ - শব্দটির আদি শব্দের (عور) অর্থ ছিল ‘ত্রুটিযুক্ত’। أَعْوَرَ শব্দটির আদি শব্দ বা মূল বা root হচ্ছে - عور - যার অর্থ হচ্ছে ত্রুটিযুক্ত বা defect. (রেফারেন্সঃ https://en.wiktionary.org/wiki/أعور); (অথবা etymology of أعور লিখে গুগলে search দিতে পারেন।)

সাহিহ বুখারি ৭৪০৭; সুনান ইবনে মাজাহ ৪০৭১; সাহিহ মুসলিমঃ ৭২৫১; সাহিহ বুখারিঃ ৭৪০৮ হাদিসগুলোতে - أَعْوَرَ শব্দটির অর্থ গ্রহন করা হয়েছে ‘কানা’ বা One Eyed যা عور (ত্রুটিযুক্ত) শব্দটির পরিবর্তিত রূপ। কিন্তু হাদিসগুলো ব্যাখ্যায় - أَعْوَرَ – শব্দটির আদি শব্দ বা মূল বা root عور - শব্দের অর্থ ‘ত্রুটিযুক্ত’ শব্দটিকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। এটি একটি মারাত্মক ভুল। হাদিসের আলোকে বিগত ১৪০০ বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণের পর হাদিসগুলোতে - أَعْوَرَ – শব্দটির অর্থ হিসেবে এর আদিরূপ عور শব্দের অর্থটিই (‘ত্রুটিযুক্ত’) সবচেয়ে বেশি গ্রহনযোগ্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। দাজ্জালের বিষয়টিই এমন যে, দাজ্জাল বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদেরকে অনেক গভীরে যেতে যাবে।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, দাজ্জাল শব্দটির আদি শব্দ বা মূল বা root শব্দ "দাজালা" (dajala) শব্দের অর্থ ‘মিশ্রিত করা’। আমরা দেখেছি যে, দাজ্জাল ইসলামের ভিতরে শিরক, কুফরকে মিশ্রিত করে সেই বিকৃত ইসলামকেই ইসলাম বলে প্রচার করে। অর্থাৎ দাজ্জাল বিষয়টি বুঝতে হলে হাদিসে বেবহ্রিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শব্দের আদি শব্দ বা মূল বা root সম্পর্কে জানা জরুরী কারণ তাহলে পুরো বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝা যায়। নবীর (সাঃ) সময়ের ১৪০০ বছর পরে আমরা অবস্থান করছি। ১৪০০ বছরে অনেক শব্দের-ই রূপ ও অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেছে।

তাহলে, আমরা যদি أَعْوَر – শব্দটির অর্থ হিসেবে এর আদি শব্দ বা মূল বা root শব্দ عور শব্দের অর্থটি (‘ত্রুটিযুক্ত’) গ্রহন করি তাহলে হাদিসগুলোর অর্থ হবেঃ

আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তোমাদের কাছে গোপন নন। আল্লাহ্ ত্রুটিযুক্ত নন। এর সঙ্গে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাত দিয়ে স্বীয় চোখের দিকে ইশারা করলেন। মাসীহ্ দাজ্জালের ডান চোখ ত্রুটিযুক্ত। তার চোখটি যেন আংগুরের মত ভাসমান। (সাহিহ বুখারি ৭৪০৭)

হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: 'দাজ্জাল তার বাম চোখে ত্রুটিযুক্ত এবং তার প্রচুর চুল রয়েছে। তার সাথে জান্নাত এবং জাহান্নাম থাকবে, কিন্তু তার জাহান্নাম হচ্ছে আসলে জান্নাত এবং তার জান্নাত হচ্ছে আসলে জাহান্নাম।" (সুনান ইবনে মাজাহ ৪০৭১)

আবূ বকর ইবনু আবূ শাইবাহ ও ইবনু নুমায়র (রহঃ) .... ইবনু উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে দাজ্জালের আলাপ-আলোচনা করে বললেন, আল্লাহ তা’আলা ত্রুটিযুক্ত নন কিন্তু সতর্ক হও! দাজ্জালের ডান চোখ ত্রুটিযুক্ত হবে। আর তা আঙ্গুরের মতো ফোলা হবে।(সাহিহ মুসলিমঃ ৭২৫১; আন্তর্জাতিক নাম্বার ১৬৯)

আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি তাঁর জাতিকে ত্রুটিযুক্ত মিথ্যুকটির (দাজ্জালের) ব্যাপারে সতর্ক করেননি। সে (দাজ্জাল) ত্রুটিযুক্ত। আর তোমাদের রব ত্রুটিযুক্ত নন। তাঁর (দাজ্জালের) দু’চোখের মাঝখানে ‘কাফির’ লেখা থাকবে। (সাহিহ বুখারিঃ আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ৭৪০৮)

আমি ইতিহাস যাচাই করে জানতে পারলাম যে, নবীর (সাঃ) সময়ে অর্থাৎ পঞ্চম- ষষ্ঠ- সপ্তম শতাব্দীতে আরব অঞ্চলে চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে গেলে তা প্রকাশ করার জন্য কোন শব্দ বা term ছিল না। যেমনঃ বর্তমানে যে চোখ কাছের জিনিস দেখতে পায় না তার এই রোগকে ডাক্তারি ভাষায় মাইয়োপিয়া (Myopia) এবং যে চোখ দূরের জিনিস দেখতে পায় না তার এই রোগকে হাইপারপিয়া (Hyperopia) বলে উল্লেখ করা হয়। পঞ্চম- ষষ্ঠ- সপ্তম শতাব্দীতে আরব অঞ্চলে এই ধরণের কোন শব্দ বা term ছিল না; তখন এই ধরণের চোখকে ‘ত্রুটিযুক্ত চোখ’ বলেই উল্লেখ করা হত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। পঞ্চম- ষষ্ঠ- সপ্তম শতাব্দীতে চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নত ছিল না ফলে চশমা পরিধানের বিষয়টিও আরব অঞ্চলে ছিল না এবং মাইয়োপিয়া,হাইপারপিয়ার মত কোন শব্দ বা term ও ছিল না।

এখন 'দাজ্জাল পৃথিবীতে কতদিন থাকবে?' অধ্যায়টি পুনরায় পড়ুন। অথবা আপনার যদি মূল বইয়ের - 'দাজ্জাল পৃথিবীতে কতদিন থাকবে?' - অধ্যায়টির তথ্যগুলো মনে থাকে তাহলে আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে, আমেরিকার ২৫ তম প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজ্‌ভেল্ট, আমেরিকার ২৮ তম প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্সন (১৯১৩-১৯২১ সাল), আমেরিকার ৩৩ তম প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান (১৯৪৫-১৯৫৩) দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন – এটা নিশ্চিত। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট (সরকার প্রধান) এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী (সরকার প্রধান) - পদ দুটির নাম বা টাইটেল বা পদবী বা উপাধি হচ্ছে দাজ্জাল। আমেরিকা এবং ইসরায়েল উভয় দেশ-ই মুসলিমদের ভূখণ্ড জোর করে দখল করে মুসলিমদের শাসন করেছে এবং মুসলিমদের উপর চরম নির্যাতন চালিয়েছে এবং চালাচ্ছে। আমেরিকাই ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করেছে এবং আমেরিকাই ইসরায়েলকে মুসলিম নির্যাতনে সকল সাহায্য এবং সহযোগিতা করে যাচ্ছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট (সরকার প্রধান) পদে যারাই বসেছে তাদের মধ্যে অনেকেই দাজ্জাল ছিল। এদের মধ্যে হাদিসের ব্যাখ্যা মোতাবেক বর্তমান সমসাময়িক সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ হারবার্ট ওয়াকার বুশ (George H. W. Bush) (১৯৮৯-১৯৯৩ সাল) দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

আমেরিকার ২৫ তম প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজ্‌ভেল্ট (১৯০১-১৯০৯) এর সময় বর্তমান সময়ে মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দাজ্জাল আল সউদ রাজপরিবারের উত্থান হয়েছিল। সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল রাহমান আল সউদ ১৯০২ সালে রিয়াদ দখলের মাধ্যমে রিয়াদের আমিরাত (Emirate of Riyadh 1902-1913) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০২ সালে 'সৌদি আরবের একত্রীকরণ' (Unification of Saudi Arabia) আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল রাহমান আল সউদের মাধ্যমে শুরু হয় যা খিলাফতবিহীন সৌদি আরব নামে একটি রাষ্ট্রের মাধ্যমে ১৯৩২ সালে শেষ হয় এবং বর্তমান সৌদি আরব রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯৩২ সালেই সৌদি আরবে তেলের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৪১ সালে আমেরিকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান ARAMCO তেল ক্ষেত্রগুলোর উন্নয়নের নামে প্রকৃত অর্থে তেল ক্ষেত্রগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছিল। এই সকল কিছুর শুরুটা হয়েছিল ১৯০২ সালেই।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজ্‌ভেল্টের (১৯০১-১৯০৯) সময়েই তুরস্কে অটোম্যান খিলাফতের বিরুদ্ধে ইয়াং টার্ক (Young Turk Revolution1908) নামের জাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্রপন্থী, সেকুলার মতাদর্শের উত্থান হয়। ইয়াং টার্ক গ্রুপটির সবচেয়ে বড় অংশীদার দল ছিল 'কমিটি অফ ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস' (Committee of Union and Progress/CUP)। প্রথমে এই দলটি গোপনে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল। ১৯০২ সালে ফ্রান্সে এই সংগঠনটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যাতে সুলতান আব্দুল হামিদকে তথা অটোম্যান খেলাফতকে উৎখাতের জন্য কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ১৯০৩ ক্যু এর মাধ্যমে আব্দুল হামিদকে উৎখাতের চক্রান্ত বিফল হয়। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন বড় আকার ধারণ করে। বিভিন্ন দল ও সংগঠন এই আন্দোলনে যোগ দেয় যাদের সকলকে একত্রে দি ইয়াং টার্ক (The Young Turk) বলা হয়। তাদের দাবী ছিল ১৮৭৮ সালের সংবিধানকে পুনরায়

চালু করা। তারা চাচ্ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার মত সংবিধান তুরস্কে প্রচলন করা (*)। সংক্ষেপে বললে, এই আন্দোলনের ফলে অটোম্যান খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ১৯০৮ সালে তুরস্ক প্রথমবারের মত বহুদলীয় গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যায় এবং একই বছরে তুরস্কে প্রথমবার বহু দলের অংশ গ্রহনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালেই তুরস্কের সংবিধান পুনরায় চালু করতে অটোম্যানরা বাধ্য হয় যাকে Second Constitutional Era বলা হয়। বলকান যুদ্ধে অটোম্যানদের পরাজয়ের পিছনে ইয়াং টার্কদের সরকার বিরোধী ভূমিকা বড় ভূমিকা রেখেছিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজ্‌ভেল্টের (১৯০১-১৯০৯) সময়েই অটোম্যান খিলাফত পতনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

(*) যারা বিশদভাবে এই বিষয়গুলো জানতে চান তারা, Young Turk Revolution 1908; Young Turks, Second Constitutional Era (Turkey) টপিকগুলো সম্পর্কে ইন্টারনেটে পড়ে নিতে পারেন।

যদিও ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ টার্কিশ পার্লামেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বশেষ অটোম্যান খলিফা আব্দুল মজিদ-২ (Abdul Mejid II) কে বরখাস্ত করে কিন্তু অটোম্যান খেলাফতের পতন ১৯১৮ সালেই নিশ্চিত হয়ে যায় যখন ১৯১৬ সালের গোপন সাইকেস-পিকট চুক্তি (Sykes–Picot Agreement) মোতাবেক মিত্র বাহিনী অটোম্যান সাম্রাজ্যকে ভাগ করে দখল করে নেয়। ১৯১৮ সালে নভেম্বর থেকে ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান এবং গ্রীক সৈন্যরা কনস্টান্টিনোপলসহ (ইস্তাম্বুল) বিভিন্ন টার্কিশ শহর দখল করে নেয়। কিন্তু তুরস্কের বিপ্লবীরা (Turkish National Movement) মিত্রবাহিনী কর্তৃক তাদের দেশের এই বিভাজনকে মেনে নেয়নি। ১৯১৯ সালের জুনে আমাশা সার্কুলার (Amasya Circular) হয় যেখানে বিভিন্ন তুর্কি জাতীয়তাবাদীরা তুরস্কের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষায় একতাবদ্ধ হয়। ১৯১৯ সালের অগাস্ট মাসে জাতীয়তাবাদী তুর্কি নেতাদের মাঝে ‘এরজুরুম কংগ্রেস’ (Erzurum Congress) অনুষ্ঠিত হয়। এই এরজুরুম কংগ্রেস আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্সনের কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠায়। এটা অটোম্যানসহ অন্য সবদলকে একটি ইঙ্গিত দেয় যে, জাতীয়তাবাদী এরজুরুম কংগ্রেসের নেতারা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্সনের ১৪ দফা (Wilsonian principles / Fourteen Points) সম্পর্কে সচেতন আছে। জাতীয়তাবাদী এরজুরুম কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের নাম উল্লেখযোগ্য। এরজুরুম কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদী নেতাদেরকে আমেরিকার অনুমতি (ম্যান্ডেট) নিতে পরামর্শ দেয়া হয়।

১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিভাস কংগ্রেস (Sivas Congress) অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে ‘প্রতিনিধি কমিটি’ গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয় যা সহজেই নতুন সরকার রূপে আবির্ভূত হতে পারবে। মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক এমন কিছু প্রস্তাব দেন যা তাদের সংগঠনকে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে অন্যদিকে অটোম্যানদের অগ্রহনযোগ্য করে তুলবে। তার প্রস্তাবগুলো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্সনের দেয়া নিয়ম – কানুনে (Wilsonian principles / Fourteen Points) পূর্ব থেকেই বলা ছিল। সেলফ ডিটারমিনেশন (Self-determination) ছিল

প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্সনের বক্তব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সেলফ ডিটারমিনেশন বলতে বুঝায়, জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে; জনগণ রাজনৈতিক দল গঠন করবে এবং নির্বাচন বা অন্য প্রতিনিধিত্বমূলক উপায়ে সরকার গঠন করবে। জাতীয়তাবাদকেও প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্সন গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আর এই সব কিছুই মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে বাস্তবায়ন করেছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্সনের মতাদর্শ-ই হয়ে উঠে নতুন রাষ্ট্র রিপাবলিক অফ টার্কির নতুন সংবিধান (*)।

(*) যারা এই সকল বিষয়ে বিশদভাবে জানতে চান তারা 'Turkish War of Independence', 'Turkish National Movement', 'Partition of the Ottoman Empire' এই বিষয়গুলো ইন্টারনেট থেকে পড়ে নিতে পারেন।

১৯২০ সালের ২৩ এপ্রিল তুরস্কের গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি নিজেদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ককে মনোনীত করে। আপনার কি মনে হয় ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, গ্রীক সৈন্যরা তুরস্কের বিভিন্ন শহর দখল করার পরও এমনিতেই তুরস্ককে ছেড়ে চলে গেছে? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্সনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতি নিয়েই তুরস্ক স্বাধীন হয়েছিল। উড্রো উইল্সনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন নিয়েই মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক তার পরিকল্পনায় সফল হয়েছিল এবং প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। এভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্সনের কূটনৈতিক পদক্ষেপে অটোম্যান খিলাফত বিলুপ্ত হয়ে যায়। আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্টরা একই ধরণের পররাষ্ট্রনীতি গ্রহন করে চলেছিল। আমেরিকার ২৮ তম প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্সনের (১৯১৩-১৯২১ সাল) সময়েই অটোম্যান খেলাফতের (উসমানীয় খেলাফতের) শুধু যে বিনাশ হয়েছিল তাই নয় বরং তিনি এমন একটি সরকার ব্যবস্থা (গনতন্ত্র) তুরস্কে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন যাতে তুরস্কে খিলাফত আর ফিরে আসতে না পারে।

প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রম্যান (১৯৪৫-১৯৫৩) এর প্রত্যক্ষ সমর্থনে ও উদ্যোগে ইসরায়েল রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিষয়ে এই বইয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবার পর যে সকল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ইসরায়েলকে নিঃশর্ত সমর্থন দিয়ে গেছেন তারা সবাই দাজ্জাল। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল একটি দাজ্জাল রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল যার সরকার প্রধানের পদটির পদবী বা টাইটেল বা উপাধি হচ্ছে দাজ্জাল। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে আরব অঞ্চলের বিশেষ করে প্যালেস্টাইন, জর্ডান, লেবাননের মুসলিমরা শান্তিতে থাকতে পারছে না। সর্বশেষ ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরায়েল গাজায় মুসলিমদের গণহত্যা করছে। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় ইসরায়েল মুসলিমদের ক্ষতি করতে পারলেই খুশি।

প্রেসিডেন্ট জর্জ হারবার্ট ওয়াকার বুশের (George H. W. Bush) সময় ১৯৯১ সালের গালফ যুদ্ধের পর থেকে আমেরিকা নিয়মিত মুসলিম ভূখণ্ডে হামলা করেছে এবং মুসলিম ভূখণ্ড দখল করেছে। প্রেসিডেন্ট জর্জ হারবার্ট

ওয়াকার বুশের ছেলে জর্জ ডব্লিউ বুশ (George W. Bush) ২০০১-২০০৯ পর্যন্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ২০০১ সালে আফগানিস্থানে হামলা করেন। তিনি ২০০৩ সালে ইরাকে হামলা করেন এবং ইরাক দখল করেন। "ওয়ার অন টেরর" (War on Terror) নামের এই সব যুদ্ধে যেমনি মুসলিম দেশগুলোর লাখ লাখ মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে তেমনি মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী, জঙ্গি নামে অভিহিত করার প্রচলনও এই সময়ে করা হয়। জর্জ ডব্লিউ বুশ মুসলিমদেরকে যেভাবে জঙ্গি, সন্ত্রাসী হিসেবে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করেছেন মানবজাতির ইতিহাসে এই রকম আর কখনোই হয়নি। বর্তমানে, যে কোন মুসলিম যদি গনতন্ত্রকে অস্বীকার করে, খেলাফত চায়, শরিয়া আইন চায় তাকেই জঙ্গি, সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং জেল, গুম ও হত্যা করা হয়। দাজ্জালের বিষয়টাই এ রকম। দাজ্জাল ইসলামের এবং মুসলিমদের ক্ষতি করার জন্য বিভিন্ন মতাদর্শ ও বিশ্বাস মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় এবং সাধারণ মানুষ তা গ্রহন করে। এটাই হচ্ছে দাজ্জালের ধোঁকা।

এখন কি আপনারা বুঝতে পারছেন যে - আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) প্রতিটি দাজ্জালের ব্যাপারে আমাদের বলে গেছেন। যখন কোনো দাজ্জাল নতুন কোনো মতাদর্শ বা আগেরটির চেয়ে আরও বেশি ভয়াবহ হয়ে আবির্ভূত হয়েছে তার পরিচয় মুহাম্মাদ সাঃ আমাদের বলে গেছেন। মুহাম্মাদ (সাঃ) যে সকল দাজ্জালের পরিচয় আমাদের বলে গেছেন তারা নিম্নরূপঃ

১) ১৪৫৩-১৪৫৪ সালের মধ্যে সর্ব প্রথম দাজ্জাল হিসেবে অটোম্যান সম্রাট সুলতান মাহমুদ-২ আবির্ভূত হয়েছিল। তারপরে প্রায় সকল অটোম্যান সম্রাট বা খলিফারাই ছিল দাজ্জাল কিন্তু তাদের মতাদর্শের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি তাই তাদের পরিচয় আলাদা করে বলাটা জরুরী ছিল না। হাদিস থেকে অন্য কোন অটোম্যান সম্রাটকে আলাদা করে দাজ্জাল হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না কারণ দাজ্জাল হিসেবে তারা সুলতান মাহমুদের-২ চেয়ে আলাদা কোন মতাদর্শ নিয়ে আসেনি।

২) হাদিস থেকে পাওয়া তথ্য মোতাবেক ১৯০০ সালের দিকে একটি নতুন মতাদর্শের দাজ্জালের পরিচয় পাওয়া যায় নাম থিওডোর রুজভেল্ট যিনি ছিলেন আমেরিকার ২৫ তম প্রেসিডেন্ট। এই সময়ে অটোম্যান খিলাফতের পতনের শুরু হয়। ইয়াং টার্কদের মধ্যে গনতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সংবিধানের মত মতাদর্শগুলো জায়গা করে নেয়। অর্থাৎ দাজ্জাল তার নতুন মতাদর্শ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল।

৩) আমেরিকার ২৮ তম প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্সন (১৯১৩-১৯২১ সাল) খিলাফতকে শুধু ধ্বংস-ই করেন নি। তিনি সেকুলার, গনতন্ত্রপন্থী, জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক নতুন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা মুসলিমদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন যার ফলে নতুন রাষ্ট্র রিপাবলিক অফ টার্কির জন্ম হয়। এর ফলে তুরস্ককে পুনরায় খেলাফতের পথে ফেরত আনার পথ বন্ধই হয়ে যায়। অর্থাৎ দাজ্জাল নতুন মতাদর্শ নিয়ে এবং আগের চেয়ে আরও ভয়াবহ হয়ে আবির্ভূত হয়েছিল – যে দাজ্জালের নাম প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্সন (১৯১৩-১৯২১ সাল)। হাদিস থেকে দাজ্জাল হিসেবে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্সনকে পাওয়া যায়।

৪) হাদিস থেকে তারপরে দাজ্জাল হিসেবে প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রম্যানকে (১৯৪৫-১৯৫৩) পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে, দাজ্জাল হিসেবে যারা আবির্ভূত হয়েছিল তারা কেউই মুসলিমদের ভূখণ্ড অন্য কারো হাতে তুলে দেয়নি কিন্তু হ্যারি এস ট্রম্যান এই কাজটি করেছিল ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ দাজ্জাল নতুনভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। সুতরাং প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রম্যান একজন গুরুত্বপূর্ণ দাজ্জাল যার কথা হাদিস থেকে পাওয়া যায়।

৫) হাদিস থেকে তারপরে পাওয়া যায় ১৯৪৮ সালে ইসরায়েলের সরকার প্রধানের পদটির দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হবার বিষয়টি।

৬) হাদিস থেকে তারপর ১৯৮৯ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ হারবার্ট ওয়াকার বুশের (১৯৮৯-১৯৯৩) দাজ্জাল হিসেবে আবির্ভূত হবার বিষয়টি পাওয়া যায়।

আমরা যদি দাজ্জালের ক্রমানুসার দেখি ,তাহলে দেখতে পাই যে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ প্রতিটি দাজ্জালের কথাই বলে গেছেন। যারা "মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল" বইটি পড়েছেন তারা এই সকল দাজ্জালের আবির্ভূত হবার বিষয়টি জানেন।

সুলতান মাহমুদ-২ , আমেরিকার ২৫ তম প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজ্‌ভেল্ট, আমেরিকার ২৮ তম প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্সন (১৯১৩-১৯২১ সাল), আমেরিকার ৩৩ তম প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রম্যান (১৯৪৫-১৯৫৩) ছাড়া অন্য কোন অটোম্যান খলিফা বা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কি দাজ্জাল নয়? এরা ছাড়াও অন্য অনেক অটোম্যান খলিফা ও আমেরিকার প্রেসিডেন্টরাও দাজ্জাল কিন্তু নবীর (সাঃ) হাদিস বিশ্লেষণ করে আমরা সেই সব দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা পরিষ্কারভাবে জানতে পারছি যারা ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে নতুন কোনো মতাদর্শ বা ক্ষতিকর পদক্ষেপ নিয়েছিল যার ফলে মুসলিমদের ইতিহাসের পট পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমনঃ সুলতান মাহমুদ- ২ প্রথম খলিফা বা শাসক যিনি পীরতন্ত্র বা সুফিজমকে ইসলামের অংশ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল, প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজ্‌ভেল্ট ও প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্সন খিলাফত ধ্বংস করে মুসলিম রাষ্ট্রে সর্ব প্রথম সেকুলার, গনতন্ত্রপন্থী, জাতীয়তাবাদী সরকার বসিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রম্যান মুসলিমদের ভূমি ইহুদীদের দিয়ে দিয়েছিল এবং ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে মুসলিমদের জন্য চরম অত্যাচারের সূচনা করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের (১৯৯১) পর যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আমেরিকার স্নায়ু যুদ্ধের (Cold War) অবসান হয় তখন প্রেসিডেন্ট জর্জ হারবার্ট ওয়াকার বুশ ইসলাম ও মুসলিমদেরকে আমেরিকার শত্রু হিসেবে গ্রহন করে এবং প্রথমে ইরাকে হামলা (gulf war,1991) করে। তারপর থেকে আমেরিকা মুসলিম দেশগুলোতে নিয়মিত হামলা ও দখল করেই চলেছে। আল্লাহ এর রসূল সাঃ এই সকল, ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য ক্ষতিকর, ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দাজ্জালদের পরিচয় আমাদের সরাসরি দিয়ে গেছেন। এছাড়াও অন্য অনেক অটোম্যান শাসক বা খলিফা এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট দাজ্জাল ছিল তবে তারা নতুন কোন মতাদর্শ

নিয়ে আসেনি বরং তারা হাদিসের ব্যাখ্যা থেকে প্রাপ্ত উপরে নাম সহ উল্লেখিত দাজ্জালদের মতাদর্শই অনুসরণ করেছে।

দাজ্জালের সময়কাল, দাজ্জালের এক চোখ ত্রুটিযুক্ত (কানা) সম্পর্কিত হাদিসগুলো থেকে এই সকল দাজ্জাল সম্পর্কে জানা যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে বুসর থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "ভয়াবহ যুদ্ধ এবং মদীনা বিজয়ের মধ্যে ছয় বছর থাকবে এবং সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।"

সুনান ইবনে মাজাহ অধ্যায় ৩৯, ফিতনা সম্পর্কিত অধ্যায়, ৪০৯৩ এবং মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৪২৬ - হাদিসগুলো থেকে মুসলিমদের মধ্যে থেকে আবির্ভূত হওয়া দাজ্জালদের পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় – যে বিষয়ে মূল বইয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বুঝা যাচ্ছে, এমন কোন দাজ্জাল নেই যার পরিচয় আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) আমাদের বলেন নি।

এখনো দাজ্জালের অনুসারী - পীরপন্থী, গনতন্ত্রপন্থী, রাজতন্ত্রপন্থী - যে সকল আলেমরা বলবেন যে, দাজ্জাল আবির্ভূত হয়নি তাদেরকে বলব, আরবী ভাষা জানলে আর মাদ্রাসায় কোরআন হাদিস পড়লেই যদি ঈমানদার ও আলেম হওয়া যেত তাহলে আবু জেহেল, আবু লাহাব অনেক বড় ঈমানদার ও আলেম হত কারণ আবু জেহেল, আবু লাহাবের মাতৃভাষা ছিল আরবী, তারা তো সরাসরি নবীর (সাঃ) কাছ থেকে কোরআন শুনেছিল এবং নবীর (সাঃ) কথা তারা সরাসরি নবীর (সাঃ) কাছ থেকেই শুনেছিল। কোটি কোটি প্রমাণ এনে হাজির করলেও দাজ্জালকে চিনতে পারবেন না যদি আপনার ঈমান না থাকে।

মাদ্রাসা থেকে পাস করলেই আলেম – এই ধারণা কোথা থেকে আসল? ৩০০ বছর আগেও তো মুসলিমদের মধ্যে এ রকম কিছু ছিল না। ইহুদী, খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই সিস্টেম করেছে বলেই প্রতীয়মান হয়। কারণ মাদ্রাসা থেকে পাস করা 'আলেম' নামধারী অল্প কিছু মুসলিমকে নিয়ন্ত্রণ করলেই তারা পুরো মুসলিম জাতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং সেটা তারা করছেও। যারা মাদ্রাসা থেকে পাস করেছেন তাদের নিজেকে আলেম, মুফতি, মাওলানা, মুহাদ্দিস হিসেবে পরিচয় দেয়া উচিত নয় কারণ কোরআন হাদিস ও বাস্তব সমাজে কোরআন হাদিসের প্রয়োগ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। কেউ যদি ইংলিশে অনার্স / মাস্টার্স পাস করে তাহলে সে নিজেকে ইংলিশের আলেম বা 'জ্ঞানী লোক' বলে দাবী করে না। সে এত টুকু বলে যে, আমি ইংলিশে অনার্স/মাস্টার্স পাস করেছি। কিন্তু একমাত্র মাদ্রাসা থেকে পাস করলেই লোকেরা নিজেদের আলেম বা 'জ্ঞানী লোক' বলে দাবী করে। অথচ মাদ্রাসায় পড়ার মাধ্যমে ইসলামের মত এত বড় একটি বিষয়ে তাদের খুব সীমিত জ্ঞান-ই অর্জিত হয়। তারা এটা বলতে পারেন যে, আমি মাদ্রাসা থেকে আলিম বা দাওরা পাস করেছি কিন্তু নিজেকে 'আলেম' দাবী করাটা তাদের ঠিক হবে না। বর্তমান সময়ে তাদের-ই সঠিক পথ পাবার সম্ভাবনা

বেশি যারা অহংকার না করে, সকলের কাছ থেকে খোলা মনে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং সত্য এসে সামনে দাঁড়ালে তাকে গ্রহন করে। সত্যিকারের আলেম তো সেই ব্যাক্তি হবেন যিনি অহংকার ত্যাগ করে নিজেকে একজন সাধারণ মুসলিম বলে পরিচয় দিবে এবং সাধারণ মুসলিমদের কাতারে নেমে এসে মুহাম্মাদ সাঃ এর আনীত ইসলাম প্রচার করবেন, দাজ্জালের পরিচয় মানুষের কাছে বর্ণনা করবেন; গনতন্ত্র, পীরতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কমিউনিসম, রাজতন্ত্রকে প্রকাশ্যে শিরক বলে প্রচার করবেন; আল্লাহ দেয়া দীন ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য নিজের সময়, সম্পদ ও জীবন দিয়ে দিবেন। আল্লাহ এর প্রতি তাদের সত্যিকারের ভালোবাসা থাকবে।

*** যে কেউ এই বইটিকে সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখে প্রকাশ করতে পারবেন। বইটি ইন্টারনেটে যে কেউ পিডিএফ (PDF) আকারে যে কোন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে পারবেন।

*** বইটি সম্পূর্ণ কপিরাইট মুক্ত (copyright free / Public Domain / Public property)। কিন্তু বইটি থেকে প্রাপ্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ যদি কেউ তার বইয়ে ব্যাবহার করেন তাহলে অবশ্যই রেফারেন্সে তথ্যটি যে এই বই থেকে পেয়েছেন তা উল্লেখ করবেন। অর্থাৎ রেফারেন্সে বইটির নাম, লেখকের নাম এবং পৃষ্ঠা নাম্বার উল্লেখ করবেন। এটা সাহাবী এবং তাবেঈনদের আমল থেকে পাওয়া যায়। যেমনঃ আপনারা এমন অনেক হাদিস পাবেন যেখানে কোন সাহাবী বা তাবেঈ বলেছেন যে, আমি ওমরকে বা আলীকে বা ইবনে আব্বাসকে বা অমুক সাহাবীকে বা অমুক তাবেঈকে বা অমুককে এই ব্যাপারে এই ফয়সালা / ইস্তিহাদ দিতে দেখেছি বা এই কথা বলতে শুনেছি। উনারা কখনোই অন্যের ব্যাখ্যা, মতামত, ফয়সালাকে নিজের নামে চালিয়ে দিতেন না। টাকা বা সুনাম কামানোর জন্য এই ধরণের কাজ যারা করবেন তাদের ফয়সালা আল্লাহ এর হাতে।

*** আল্লাহ চাইলে, বইটি আপনি যতবেশি অন্যদেরকে দিবেন এবং অন্যদের সাথে বইটি অনলাইনে ও অফলাইনে শেয়ার করবেন তত বেশি আল্লাহ আপনাকে নেকী দিবেন। আশা করি, এতে আপনি দাজ্জালের পরিচয় মানুষের কাছে প্রকাশ করার নেকী পাবেন। আল্লাহ আমাদেরকে সেই সকল যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করুক যারা দাজ্জালের পরিচয় মানুষের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিল।

*** যে কেউ চাইলে, এই বই থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে ভিডিও বানিয়ে ইউটিউব (youtube) বা Instagram বা অন্য যে কোন ভিডিও শেয়ারিং ওয়েবসাইটে দিতে পারবেন। তবে খেয়াল রাখবেন যেন, বইয়ের কোন কিছু বলার আগে তার পক্ষে বইয়ে থাকা যুক্তি প্রমাণ যেন অবশ্যই উল্লেখ করা হয় এবং বইটির নাম উল্লেখ করবেন।
*** বইটির PDF link অনলাইনে সহজেই অন্যদের সাথে শেয়ার করতে পারেন।

*** ইংলিশে বইটির নাম "Released Yajuj Majuj and Emerged Dajjal”.

*** এটি বইটির তৃতীয় সংস্করণ।

আমি এই বইয়ে যা লিখেছি তাতে ভুল কিছু থাকলে সেটা আমার এবং শয়তানের পক্ষ থেকে আর ভালো কিছু থাকলে সেটা আল্লাহ এর পক্ষ থেকে। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।